ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৫

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

শান্তিনিকেতন
সবুজ বনানীর নীচে প্রার্থনা সঙ্গীত
শালবীথির ফাঁকে ফাঁকে নিঃস্তব্ধ চন্দ্রালোক
বাতাসে বাতাসে সঙ্গীত ও নৃত্যের ছন্দ
প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে
অনুপম চিত্র ও ভাস্কর্যের সমারোহ
কবির স্বপ্নের পূর্ণতা।
শান্তিনিকেতনে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
লাক্সারি ট্যুরিস্ট কটেজ অথবা
ইকনমি ট্যুরিস্ট লজে বুকিং-এর
জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ ডালহৌসী স্কোয়ার (ঈষ্ট)
কলিকাতা-১
ফোন ঃ ২৩-৮২৭১ গ্রাম ঃ 'TRAVELTIPS'
IPC/TB/75

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

কতটুকু জানি তাকে? কতটুকু চিনি?
স্বদেশকে জানা, দেশকে আপন করার সাধনা।

শুধু মানচিত্র বা পণ্ডিতের পুঁথি থেকে
দেশকে জানা সম্পূর্ণ হয় না। দিনে দিনে
প্রত্যক্ষ পরিচয়ে সেই জ্ঞান পূর্ণতা
পায়। বাংলা দেশের পরিচয় মূর্ত হয়ে আছে
তার অগণ্য মন্দিরে মসজিদে, পোড়ামাটির
কাজে, ইতিহাসের নানা কীর্তিস্তম্ভে,
শান্তিনিকেতনে। ভবিষ্যৎ গড়ছে যে
মানুষ তার বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডে।

জানো জানাও

টুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২, ডালহৌসি স্কোয়ার ঈস্ট
কলিকাতা-১ ফোন: ২৩-৮২৭১
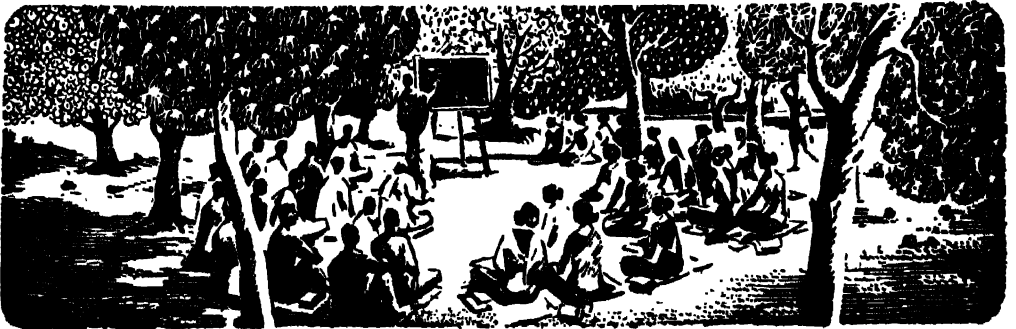
ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধারাকে স্বীকার করে তাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে ভারতীয় ঐতিহ্য চিরঞ্জীব, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। প্রাচীন ভারতের ধর্মচিন্তার বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের বিবিধ বিকাশে তার পরিচয় স্পষ্ট। মধ্যযুগে বিভিন্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত সমাজদৃষ্টি ও ধর্মচিন্তার মধ্যে সমন্বয় না হলেও সামঞ্জস্য করবার যে অন্তহীন প্রয়াস সে চেষ্টার মধ্যেও এই একই শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই। বিভিন্ন সংস্কৃতি যে বিভিন্ন ইতিহাসের পশ্চাৎপটে বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল, তাদের মিলিয়ে এক নতুন সমৃদ্ধির সংস্কৃতি গড়বার এ প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয়েছিল, একথাও প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির মিলনে স্থাপত্যে শিল্পে সঙ্গীতে কাব্যে যে সমস্ত বিকাশ হয়েছিল, পৃথিবীতে তাদের তুলনা বেশী মিলবে না। সামঞ্জস্য সমন্বয়ে পরিণত হবার পূর্বেই কিন্তু নূতন এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত যে সব উপাদান এসে জুটল, তাতে ভারতবর্ষের চিরাচরিত জীবনধারায় ছেদ না পড়লেও এক নতুন গতির আবির্ভাব দেখা দিল। ইয়োরোপের নৌ-বাহিনী যেদিন এসে ভারতের তটভূমিতে নোঙর ফেলল সেদিন কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা দিল।

যে সমস্ত লক্ষণ ও গুণ আধুনিক যুগকে পূর্বের সমস্ত যুগ থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে, বিজ্ঞানের ব্যবহারে প্রাকৃতিক শক্তিকে স্ববশে আনবার মানুষের যে সাধনা, তাই বোধ হয় তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক অর্থে প্রকৃতির শক্তিকে স্ববশে আনবার সাধনাই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। অন্য সমস্ত প্রাণী খাদ্য ও পানীয়ের জন্য প্রকৃতির মুখাপেক্ষী, প্রকৃতিই তাদের বসনভূষণ বাসস্থান যোগায়, কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ এ সমস্ত ব্যাপারে খোদার উপর খোদকারি করবার চেষ্টা করেছে। মানুষ কবে জমি চষতে শিখেছিল, আজ কেউ তার হিসাব দিতে পারে না, কিন্তু যেদিন সে প্রথম নিজের পরিশ্রমে নিজের বোনা ধান বা গম নিজের ক্ষেতে আবাদ করল, সেদিন মানবসমাজে এক বিপ্লবকারী পরিবর্তন ঘটে গেল। তারপরে সে ঘর তৈরী করতে শিখল, গ্রাম জনপদ নগরের পত্তন করল, নিজের তৈরী পোশাক শীতগ্রীষ্মের কষ্ট লাঘবের সাধনায় রত হ'ল।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এ সংগ্রাম আদিকাল থেকে চলে আসছিল কিন্তু খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতকের গোড়ায় এ সংগ্রামের প্রকৃতি ও গতি দুই-ই আকস্মিকভাবে বদলে গেল। ইয়োরোপের মানুষ যেন হঠাৎ আবিষ্কার করল যে এতদিন যে জ্ঞান বিজ্ঞান কেবল চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করেছে, নিছক বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রত্যয় সীমিত ছিল, বিজ্ঞানের সেই সমস্ত সাধারণ সূত্র ও প্রত্যয়কে প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে লাগানো সম্ভব, এবং সেভাবে তাদের ব্যবহার করলে রূপকথার আলাউদ্দিনের প্রদীপের মতন দুর্বার শক্তি মানুষের আয়ত্তে আসবে। কেন সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র একই সঙ্গে ইয়োরোপের মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর আজো কেউ দিতে পারেন নি, বোধহয় কোনদিন দেওয়া সম্ভবও হবে না। এ সমস্যার একটি দিক আংশিকভাবে আমি *Science, Democracy And Islam* বইখানিতে আলোচনা করেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানের যে প্রগতি সুরু হল, তার গতিবেগ প্রতি দশকেই যেন বেড়ে চলেছে। পূর্বে মানুষ সমুদ্রপর্বতের বাধা দূর করে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারত না। আজকাল সে সব বাধা বিলীয়মান, দূরত্বও আজ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। পশুশক্তির ব্যবহার অতিক্রম করে মানুষ যেদিন যন্ত্রশক্তির ব্যবহার সুরু করল, সেদিন যে বিপ্লবের সুরু, আজকার দুনিয়ায় তার প্রকৃতি ও গতি দুই-ই দিনদিন বদলাচ্ছে। একশো বছর আগেও কয়লা ছিল মানুষের শক্তির প্রধান উৎস, বাষ্পচালিত যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যে সব কাজে হাত দিয়েছিল, তিন-চারশো বছর আগে তা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। গত একশো বছরের মধ্যে কয়লার বদলে এল পেট্রোল, বাষ্পচালিত যন্ত্রের বদলে এল নানাধরনের তৈলচালিত ইঞ্জিন অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার। আজ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াও বদলে যাচ্ছে, আণব শক্তির নব নব ব্যবহারে শক্তির সীমাহীন উৎসের সন্ধান আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে আজ মানবসমাজ যে স্তরে পৌঁছেচে, পূর্বের কোন যুগের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। পুরাকালে ইতিহাস এক একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকত। চলাচলের মুশকিলের জন্য মানুষ এবং তার ভাবনাচিন্তাও সেকালে অনেকটা সীমিত থাকত। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্ম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ সেকালে স্বাভাবিক ছিল, বর্তমানের পৃথিবীতে আজ আর তা সম্ভব নয়। এক দেশে আজ যা ঘটে, তার প্রতিক্রিয়া অন্য দেশে তখুনি দেখা দেয়। কোন অঞ্চলে সংস্কৃতির কোন নূতন বিকাশ হলে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর তার প্রভাব দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে মনুষ্যজাতির ঐক্য এরকম প্রত্যক্ষভাবে পূর্বে কোনদিন দেখা দেয় নি। বিজ্ঞানের শক্তি আজ সমস্ত মানুষের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে।

ইতিহাসের সুরু থেকেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা মিশেছে। বর্তমানের একীভূত পৃথিবীতে যে সমস্ত জগতের বিচিত্র স্রোতোধারা এখানে নতুন করে মিলবে, তাতে বিচিত্র কি? ইয়োরেশিয় যুগ্মমহাদেশের এক সীমান্তপ্রান্তে অবস্থিত বলে অতীতের অনেক ঝড়ঝাপটা এদেশে লাগেনি, বিরাট জনপ্রবাহের স্রোতে যে ধ্বংস ও দুঃখের অভিজ্ঞতা, তা থেকেও ভারতবাসী অনেকটা বেঁচেছে কিন্তু বর্তমানের পৃথিবীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ভারতবর্ষের আবস্থানিক সুবিধার আর কোন মর্যাদা নেই। এ সমস্ত নতুন শক্তি

নতুন প্রভাব নতুন পথে এদেশে এল, যেন বিধাতা অলঙ্ঘ্যভাবে ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যে পুরোনো দিনের হিসাব এ নতুন যুগে একেবারে অচল। পূর্বে বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সম্পর্ক, তা প্রধানত স্থলপথেই স্থাপিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বের পর্বতমালার মধ্যে যে সব গিরিপথ, সেই পথেই যুগ যুগ ধরে অভিযাত্রীর আবির্ভাব ঘটেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর ভারতের যে সাংস্কৃতিক বিস্তার, তাকে বাদ দিলে ভারতবর্ষে সমস্ত রাজ্য ভাঙাগড়ার মধ্যে স্থলসাম্রাজ্যেরই প্রাধান্য। বস্তুতপক্ষে, ভারতবর্ষে যে সমস্ত সমৃদ্ধিশালী সম্রাট রাজত্ব করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই কখনো নৌ-বাহিনী বা সমুদ্রকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যের কথা ভাবেন নি। ইয়োরোপিয় নৌ-শক্তি যেদিন অজানা অগম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের অরক্ষিত ও অপ্রস্তুত তট-ভূমিতে পৌঁছল, সেদিন এদেশের রাজশক্তি এ নতুন আবির্ভাবকে কি ভাবে গ্রহণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও কোন স্থিরসিদ্ধান্ত বহুদিন গ্রহণ করতে পারেনি।

পুরাকালেও বহু অভিযাত্রী এদেশে এসেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাদের সবাইকে গ্রহণ করে কালক্রমে নতুন মানুষ ও নতুন ভাবধারাকে আপন করে নিয়েছে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটবার পর ইয়োরোপিয় প্রভাব এদেশে যে নতুন শক্তি ও ভাবধারা নিয়ে এসেছে, তাকেও গ্রহণ করবার প্রয়াস ভারতবর্ষ সুরু করল। আজও ভারতীয় জীবনে নানাদিকে যে চাঞ্চল্য এবং ভাঙাগড়া, তা এই সমন্বয়সাধনার প্রয়াসেরই লক্ষণ। এদেশের পুরোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে একটি নতুন অনুভূতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের চেয়েও ভারতবাসী বেশী করে জানে যে সামগ্রিক পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন যে ভাবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরস্পরের সম্মুখীন, তাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে এক বিশ্বজীবনদর্শনের সম্ভাবনা যদি দেখা না দেয়, তবে তাদের পরস্পরের সংঘাতে সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস বোধ হয় অনিবার্য। চিরকাল বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রেখে ভারতবর্ষ তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের ইতিহাস সমগ্র পৃথিবীর বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের মধ্যেও মানবিক ঐক্য-সূত্র আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের কাহিনী। এ সাধনায় যদি সিদ্ধি না মেলে, তাহলে ভারতবর্ষ অথবা বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ নেই একথা জানে বলেই আজ ভারতবর্ষে মানুষের ভাগ্যনির্ণয় হবে।

পূর্বেই বলেছি ইয়োরোপ যেদিন ভারতবর্ষে পৌঁছল, তখন এদেশের বিবিধ যুধ্যমান শক্তির মধ্যে একটা সাময়িক সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছিল। সাধু সন্ত পীর মুর্শেদেরা যে মানবধর্মের প্রচার করেছেন, সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টার সেটি একটি উজ্জ্বল দিক। জাতি-ভেদের লৌহকাঠামো উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলে শিথিল হয়ে এসেছিল, সামঞ্জস্যসাধনার তাও আর একটি দিক। রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রেও যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের মধ্যে একটি বোঝাপড়া করেছিল, মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, শক্তি এবং ঐশ্বর্য তার সাক্ষী।

যে বোঝাপড়া হয়েছিল, তাকে হয়তো সামঞ্জস্য বলা চলে কিন্তু সমন্বয় মনে করলে ভুল হবে। আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে প্রাচীন ভারতে যে সমন্বয় ঘটেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলেই একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এক অর্থে কোন সমন্বয়ই চিরস্থায়ী বা শাশ্বত নয়। জীবনের অনন্ত প্রবাহে যে নিত্যনূতন অভিজ্ঞতা, যুবকের প্রৌঢ়ত্বপ্রাপ্তি এবং বালকের নবযৌবনলাভে বিভিন্ন পুরুষের মধ্যে যে পরিবর্তন ও সংঘাত, তার ফলে আজকের

প্রশান্তি কালকার অশান্তিতে রূপান্তরিত হয়। কোন সুসংবদ্ধ সমাজেও যদি নতুন কোন উপাদানের আবির্ভাব হয়, অথবা বিরাজমান উপাদানগুলির পারস্পরিক মূল্যায়নে তারতম্য ঘটে, তাহলেই সে সমাজে নানারকমের নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তার ফলে যুগান্তর ঘটে যায়। ভারতবর্ষে ইয়োরোপের আবির্ভাব এক অসামান্য ঘটনা। তার ফলে বাইরে থেকে বহু নতুন উপাদান তো এলই, সঙ্গে সঙ্গে এদেশের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা চিন্তাধারায় যে সব শক্তি কার্যকরী, তাদের স্বরূপ ও শক্তি আমূল বদলে গেল। বহুযুগের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে ভারতীয় সমাজজীবনে যে শক্তিধারা সঞ্চিত হয়েছিল, তারা এ নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পথ খুঁজতে চাইল। পাহাড়ে যখন ধ্বস নামে, তখন একটি পাথর খসলেই সমগ্র পাহাড় কেঁপে উঠে। ইয়োরোপের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিল, তার জের আজো চলছে এবং কবে শেষ হবে সে কথা কে বলতে পারে?

প্রতিবার যখন নতুন অভিযাত্রী বা নতুন কোন চিন্তাধারা এদেশে এসেছে, তার প্রভাবে ভারতীয় প্রকৃতির গ্রহণশীলতা ও নমনীয়তা প্রতিবার বেড়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্ম, আচার ও দৃষ্টিভঙ্গী যে এদেশে একই সঙ্গে বিকাশলাভ করেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এ বৈশিষ্ট্য তার অন্যতম কারণ। পূর্বেকার সমস্ত অভিযাত্রী বা চিন্তাধারার সঙ্গে ইয়োরোপিয় আবির্ভাবের পরে যেসব অভিযাত্রী যে সকল নূতন চিন্তাধারা নিয়ে এল, তার একটি মৌলিক পার্থক্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পূর্বে যে সমস্ত অভিযাত্রী ভারতবর্ষে এসেছে, তারা তাদের নিজেদের বিশ্বাস, আচার ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে এদেশে স্থায়ী বসবাস করবে বলেই এসেছিল।, এদেশের প্রচলিত রীতিনীতি বা বিশ্বাসের অনেক জিনিস তাদের পছন্দ হয়নি, কিন্তু তবু তারা তা সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেনি। বহুযুগের সঞ্চিত যে সমস্ত ঐতিহ্য, বহুদিন ধরে গড়ে তোলা যে সমস্ত আচার ব্যবহার, সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম বলে অভিযাত্রীরা তা ধীরে ধীরে প্রায় নিজেদের অজান্তে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। প্রথম সংঘাতে এদেশের প্রচলিত রীতিনীতিও খানিকটা বদলিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনদৃষ্টির যেটি মূল সুর, তার বিশেষ বদল হয়নি। কালক্রমে বিভিন্ন অভিযাত্রীর দল ভারতের জনসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে। বিদেশাগত যারা এদেশে স্থায়ী বসবাস করেছে, তাদের মধ্যে একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ই নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, কিন্তু তাদের বেলায়ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে যে ভারতীয় মুসলীম সমাজ গড়ে উঠেছে, তার প্রকৃতি মুসলীম জগতের অন্যান্য দেশের মুসলীম সমাজ থেকে স্বতন্ত্র। হিন্দুসমাজের জীবনদর্শনের উপরেও ইসলামের প্রভাব পড়েছে, কিন্তু প্রধানত নগরে জনপদে সে প্রভাব সীমিত ছিল বলে ভারতবর্ষের বিপুল গ্রামজীবনে চিরাচরিত জীবনধারা অনেক ক্ষেত্রেই অব্যাহত রয়েছে।

পাশ্চাত্যের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে যে অবস্থার সৃষ্টি হল, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদেশে স্থায়ী বসবাসের পরিকল্পনা নিয়ে পর্তুগীজ ওলন্দাজ ইংরেজ ফরাসী এদেশে আসেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য ভারতীয় সভ্যতার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে এদেশকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এ ধরনের ভারত-অনুরাগী ইয়োরোপিয় সংখ্যায় নগণ্য। সাধারণ ইয়োরোপবাসীর মনোবৃত্তির তুলনায় তাদের ব্যতিক্রম মনে করাই সঙ্গত। ইয়োরোপিয় যারা এদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসেছিল, তাদের পরবর্তী অন্যান্য ইয়োরোপিয় অভিযাত্রীর মতন তারাও প্রথম থেকেই বিদেশী বলে নিজেদের গণ্য করেছে। বাণিজ্য অথবা পরে রাজকার্যের প্রয়োজনে তারা এদেশে কিছুদিন কাটিয়েছে কিন্তু নিজেদের

দেশের জীবনদৃষ্টি বা জীবনধারার পরিবর্তন করতে চায়নি। প্রথম থেকে সজ্ঞানে এই পরিকল্পনা নিয়েই এসেছে যে এদেশে কিছুদিন প্রবাসজীবন যাপন করে যেদিন সুবিধা হবে স্বদেশে ফিরে যাবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিদেশাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদেশকে স্বদেশ বলে মানল না। ফলে ভারতবাসীর এবং ইয়োরোপিয়দের জীবনধারা বিভিন্ন খাতে বইতে লাগল। পূর্বে প্রত্যেকবার বিভিন্ন এবং বিপরীতধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে বলে তাদের মোকাবিলায় দুইয়েরই মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এবার যে সভ্যতা এল তা সচেষ্টভাবে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। ইয়োরোপ নতুন সভ্যতার গর্বে ভাবল যে সে ভারতবর্ষকে কেবল দেবে, ভারতবর্ষ থেকে কিছুই নেবে না। ভারতবাসীও এই স্বতন্ত্র সভ্যতার সংস্পর্শ বাঁচাবার জন্যই সেদিন ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের মাটিতে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব কিন্তু সম্ভব নয়। সম্পর্ককে অস্বীকার করতে চাওয়াও এক ধরনের সম্পর্ক। দুইদিক থেকে প্রয়াস হলেও তাই ভারতবাসী এবং নবাগত ইয়োরোপিয় মানুষ একেবারে সম্পর্কহীন জীবনযাপন করতে পারেনি, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নানা ধরনের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

ইয়োরোপিয় এবং ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম যে সম্বন্ধ স্থাপিত হল, জীবনযাত্রার ব্যবহারিক স্তরেই তা প্রথম প্রকাশ পেল। বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই সে সম্বন্ধ, কারণ প্রধানত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই ইয়োরোপিয় মানুষ এদেশে প্রথম আসে। ব্যবহারের নানা আসবাব সাজ-সরঞ্জাম অদল-বদল হল, কিন্তু এ প্রাথমিক পরিচয়ে ভাবের আদান-প্রদান হয়নি বললেই চলে। কেবল ব্যবসা করে কিন্তু মানুষ তৃপ্ত থাকে না। অর্থনৈতিক প্রয়োজন যত বেশীই হোক না কেন, কেবলমাত্র অর্থনীতির সম্বন্ধ নিয়ে মানুষ তুষ্ট থাকতে পারে না। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে যে সংযোগ স্থাপিত হল, অল্পদিনের মধ্যেই তা মানবিক সম্বন্ধে রূপান্তরিত হল। ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় এ বিবর্তন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। একদিন যারা কেবলমাত্র বণিক হিসাবে এসেছিল, ঘটনাচক্রেই তারাই দেশের শাসক হয়ে রাজ্যশাসনের ভার নিল। অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক সম্বন্ধে রূপান্তরিত হয়ে মানবিক সমস্যাগুলিকে আরো জোরালো করে তুলল। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও মানবিক সম্বন্ধকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, রাজনৈতিক স্তরে সে সম্বন্ধ আরো প্রবল হয়ে উঠে। তখন আর কেবল জিনিসপত্রের লেনদেন দিয়ে চলে না, ভাবের ঘরেও আদান-প্রদান আপনি থেকেই সুরু হয়ে যায়।

যেদিন বহির্বাণিজ্যের তাগিদে ইয়োরোপ এদেশে এল, ভারতবর্ষে তখনো গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির ধারাই সর্বস্তরে শক্তিমান। পরিবারকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের জীবন-ধারা সেদিন প্রবাহিত, বস্তুতপক্ষে আজো ভারতবর্ষের জীবনধারায় পরিবারের প্রভাব সবচেয়ে সক্রিয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন আচারের মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসী যেভাবে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা রক্ষা করে, সামাজিক ক্ষেত্রে তার পরিচয় বহুক্ষেত্রে মেলে না। ঘরের আঙিনা নিকিয়ে দিনে দুবার তিনবার স্নান করেও আঙিনার বাহিরে আবর্জনাস্তূপ দেখে আমাদের সক্রিয় বিতৃষ্ণা জাগে না। ধর্মভীরু ব্যক্তিও আত্মীয় পরিবার পোষণের জন্য অনাত্মীয়ের প্রতি অবিচার করতে অনেক সময়েই দ্বিধা করে না। ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজসত্তাকে এসে প্রচণ্ড আঘাত করল নতুন শিল্পবিপ্লবের ফলে এক নতুন সমাজসচেতন ইয়োরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গী। ধনতন্ত্রের নব আবির্ভাব, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রগতি এবং আমেরিকা আবিষ্কারে এক নতুন জগতের

সন্ধান পেয়ে সেদিন ইরোরোপিয় মানসে যে জোয়ার এসেছিল, তারই প্লাবনে ভারতবর্ষের সনাতন সমাজব্যবস্থা ও পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি পর্যন্ত টলে উঠল।

ভারতীয় জীবনযাত্রার ভঙ্গীতে যে তার ফলে নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বস্তুতপক্ষে গত প্রায় দুশো বছর ধরে ভারতীয় সমাজে এক নীরব ও অপরিকল্পিত বিপ্লবের ধারা প্রায় আমাদের অজান্তে বয়ে চলেছে। পূর্বে সমাজের যে শাসন ছিল, আজ তার শক্তি শিথিল। সঙ্গে সঙ্গে সনাতন মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে যাকে মানুষ অপ্রশ্ন শ্রদ্ধায় স্বীকার করত, আজ বহুক্ষেত্রে তাকে সরাসরি অস্বীকার করতে সুরু করেছে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধও বদলে গেছে। অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যাদের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত, আজ তাদের মধ্যে অনেকে সমাজের নিম্নতম স্তরে নেমে এসেছে। কত বড় সামাজিক অদলবদল হয়ে গেছে, কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলীম সমাজের কথা আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। খৃষ্টিয় ১৭৭৪ সালের আগে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মুসলমানের প্রাধান্য অনস্বীকার্য, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতেও তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী। উইলিয়ম হান্টার তাঁর বইতে লিখেছেন যে তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান পুরুষদের মধ্যে অশিক্ষিত বা বেকার লোক ছিল না বললেই চলে। সত্তর বছরের মধ্যে অবস্থা একেবারে পালটে গেল। ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলমান নায়েব গোমস্তা সরিয়ে রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন কাজে হিন্দু আমলা নিয়োগের যে সূত্রপাত করলেন, তার ফলে মুসলমান সমাজে বেকারের সংখ্যা বাড়তে লাগল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আঘাতও মুসলমান সমাজকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করল। লাখেরাজ সম্পত্তিগুলির পুনর্দখলে সরকারের যে লাভ, তার প্রায় সমস্ত খেসারত মুসলমান সম্পদশালী পরিবারকেই দিতে হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অধিকাংশ মুসলমান জমিদার পরিবারের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। দুচার ঘর যারা সে ধাক্কা সামলাল, লাখেরাজ সম্পত্তির স্বত্ব চলে যাওয়ায় তারাও প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল। এই সমস্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাধারায়ও বিরাট পরিবর্তন সুরু হ'ল। ধীরে ধীরে ফারসীর বদলে ইংরাজি রাজকর্মের ভাষা হয়ে দাঁড়াল। ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতকের সুরু থেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তনের প্রচেষ্টা সুরু হ'ল। শিক্ষার ধারা ও বাহন বদলের ফলে বাঙলার মুসলমান সমাজ আরো পিছিয়ে পড়ল। তারা ইংরাজিকে গ্রহণ করল না এবং পুরাতন শিক্ষাধারাকে সঞ্জীবিত করবার কোন চেষ্টাও করল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেদিন মেকলে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক ফরমান জারী করলেন, সরকারীভাবে ইংরাজির প্রাধান্য স্বীকৃত হল, সেদিন বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। উইলিয়ম হান্টারের ভাষায় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই সম্ভ্রান্ত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে অর্থ উপার্জন বা মর্যাদাবান সরকারী চাকুরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

যে পরিবর্তনের জোয়ার সেদিন ভারতবর্ষে এসেছিল, কোন একটি সম্প্রদায় বা জীবনের কোন একটি বিশেষ দিকের মধ্যে তা সীমিত থাকেনি। প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মূল্যবোধেই সেদিন দারুণ ধাক্কা লেগেছিল। প্রাচীন সমস্ত অনুষ্ঠান, আচার ও প্রতিষ্ঠানই সেদিন নতুন করে বিচারসাপেক্ষ হয়ে উঠল। পুরোনো ধর্মবিশ্বাস টলে গেল, সমাজের বহু শাসনবন্ধন শিথিল হয়ে এল, ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে যে শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিভেদ

গড়ে উঠেছিল, তারও ভিত্তি টলে উঠল। পূর্বের ইতিহাসে নজীর মেলে না, এমন অনেক নতুন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উদ্ভবে অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠল। ইয়োরোপিয় শক্তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করেও ক্ষান্ত হল না, ভারতীয় মানসকে রূপান্তরিত করবার জন্য পাশ্চাত্য জগতের সংগঠিত ধর্মপ্রচারের দল এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে যেভাবে এগিয়ে এলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনদিন সেভাবে রাজশক্তির সহায়তায় ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা হয়নি। গ্রামে জনপদে এমন কি যে সমস্ত অঞ্চলে সাধারণ ভারতবাসী পর্যন্ত সহজে যেতে চায় না, সেই সমস্ত বনেজঙ্গলে পাহাড়ী অঞ্চলেও মিশনারীর দল ছড়িয়ে পড়ল। যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাদের মধ্যেও ইয়োরোপিয় খৃষ্টিয় ধর্মচিন্তার প্রভাব ছড়াবার জন্য শিক্ষায়তন, হাসপাতাল ও সেবাধর্মের মাধ্যমে যে বিরাট প্রচেষ্টা, তার ফলে ভারতীয় জনমানসের প্রত্যেক স্তরেই এক নতুন জাগরণ দেখা দিল। ইয়োরোপিয় মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জীবনচাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্যবোধ ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরেই প্রতিফলিত হল। একদিকে মানুষের জীবনযাত্রা যাপনের যে পদ্ধতি, তার মধ্যে এক বিপুল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল, অন্য দিকে চিরাচরিত বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের ধারা নতুন সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

প্রকৃতির শক্তিকে মানুষ যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখেছে, তার ফলে সমাজ সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও গতি দুই-ই বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত একশো বৎসরের ইতিহাসে এইটিই বোধহয় সবচেয়ে বড় কথা। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের যে অন্তহীন প্রয়াস, তার উল্লেখ বারবার করেছি। প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের দখল ছিল না বলে সে প্রচেষ্টা পূর্বে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেনি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান মিলিয়ে নতুন সমৃদ্ধতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনের সাধনা নিয়েও আলোচনা করেছি। যে সমস্ত নতুন ধর্মমত ও জীবনদর্শন পঞ্চদশ শতকের সুরু থেকেই এদেশে দেখা দিয়েছিল, তারা সবাই এ প্রয়াসের সাক্ষ্য। হিন্দু সমাজের বাঁধন দক্ষিণ ভারতে যত প্রবল, উত্তর ভারতে তত নয়। ইসলামের প্রভাবেই যে উত্তর ভারতে সমাজ ও বিশ্বাসে এ বদল এসেছিল, সে কথাও সর্বজনস্বীকৃত। জাতিভেদের তীক্ষ্ণতা উত্তর ভারতে অপেক্ষাকৃত শিথিল, কিন্তু এ ধরনের বহু ছোটখাট অদলবদল সত্ত্বেও উত্তর ভারতেও হিন্দু সমাজ বা মুসলীম সমাজ পরস্পরকে পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। একে তো ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, তার এক প্রান্তে যা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া অন্য প্রান্তে পৌঁছতে বহুদিন লাগে। দেশকালের বিস্তৃতি, প্রাকৃতিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহারে অক্ষমতা এবং সমস্ত দেশের সমস্ত সমাজের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার ফলে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সাময়িক বোঝাপড়া হল বটে কিন্তু মনের আদান-প্রদানে স্থায়ী সমন্বয় গড়ে উঠতে পারেনি।

ইয়োরোপের প্রভাব যে যুগে ভারতবর্ষে শক্তিশালী হয়ে উঠল, ততদিনে সনাতন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের অসহায়তা অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছে। ইয়োরোপিয় প্রভাব প্রথমে জীবনের বাহ্যিক প্রকাশে দেখা দিলেও অতি শীঘ্রই মানসজীবনেও তার প্রতিচ্ছায়া পড়ল। মানুষের চলাচল এবং ভাবের আদানপ্রদানব্যবস্থায় সেদিন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এল, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তর ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন লেনদেন সুরু হল। ভৌগোলিক অর্থে পৃথিবী যেন আগেকার তুলনায় ছোট হয়ে এল। আগে যে পথ চলতে মাস কেটে যেত, মানুষ তা চব্বিশ

ঘণ্টার মধ্যেই অনায়াসে যেতে সুরু করল। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতি পূর্বে পরস্পরের সংস্পর্শে আসেনি, তাই পুরাকালে ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবনদর্শন সবই আঞ্চলিক ছিল। বর্তমানের পৃথিবীতে প্রত্যেক আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত সংস্কৃতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তাই প্রত্যেক আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আজ অনিবার্য। পূর্বে যেখানে দৈবাৎ কদাচিৎ বিদেশী মানুষ ভিন্নদেশে যেত, আজ সেখানে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। একশো দেড়শো বছর আগেও ভারতবর্ষে কেউ যখন তীর্থযাত্রা করত, তখন বহুক্ষেত্রে নিজের শ্রাদ্ধ শেষ করে রওয়ানা হ'ত। তার অর্থ যে দূর তীর্থ থেকে জীবন্ত ফেরা সম্ভব হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের পরিপূর্ণ অবকাশ ছিল। আজ সাধারণ গ্রামবাসীও ভারত-দর্শনে বেরিয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আসে। আমেরিকার মানুষের পক্ষে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ আজ বহুজনেরই আয়ত্তাধীন। তাই দেশকালের পরিধি কমে মানুষ যেন সর্বত্রই পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী হচ্ছে। পূর্বে মানুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও বহুক্ষেত্রে তার জীবনধারণের রীতিনীতির বিশেষ বদল হ'ত না। আজ মানুষ অত সহজে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে না, কিন্তু স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও জীবনদর্শন ও জীবনধারার রীতি পরিপূর্ণ বদলাতে দ্বিধা করে না। ভারতবর্ষে খৃষ্টানের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষিত সমাজে আজ খৃষ্টিয় আদর্শের যে গভীর প্রভাব, তার কারণও এইখানেই মিলবে।

ইসলামের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের নগর-জনপদবাসীর মনে গভীর ছায়া ফেলেছিল। সেকালের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের উপরের স্তরের মানুষই তাই সেদিন মুসলীম সংস্কৃতির দ্বারা বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আহ্বানে বিপুল জন-সাধারণের মধ্যে যে সাড়া প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক, চলাচলের অসুবিধা এবং বৃত্তিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ফলে তা সম্ভব হয়নি। সেকালে গ্রামবাসীদের মধ্যে শতকরা একজনও নিজের গ্রামপুঞ্জের গণ্ডীর বাইরে যেতো কিনা সন্দেহ। দেশের বিরাট আয়তন এবং জনসাধারণের ভ্রমণবিমুখতার ফলে সমাজের সচেতন নেতৃশ্রেণীর বাইরে তাই সেদিন ইসলামের প্রভাব খুব বেশী কার্যকরী হয়নি। তবু বিশ্বাসের দেয়ালে এখানে ওখানে ফাটল দেখা দিয়েছিল বলে ইউরোপ যেদিন এদেশে শক্তিশালী হয়ে উঠল, সেদিন খৃষ্ট-ধর্মের আহ্বান সমাজে বেশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তাই পাশ্চাত্য প্রভাব কেবলমাত্র নগরে জনপদে সীমাবদ্ধ রইল না। দূরদূরান্তরে গ্রামদেশেও এক নতুন সম্ভাবনার হাওয়া বইতে সুরু করল এবং তার প্রভাব দিনদিন ক্রমবর্ধমান পরিধির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পাশ্চাত্য জগতের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে স্ববশে আনবার সাধনা যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে গ্রহণ করতে পারত, তাহলে গত দুই শতকের পৃথিবীর ইতিহাসের রূপ আমূল বদলে যেত। স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভারতবর্ষ ইয়োরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যেকটি উপাদানের বিচার করে কোনটিকে গ্রহণ করবে, কোনটিকে বর্জন করবে, বর্জন করলেও তার কোনো অংশকে স্বীকার করবে কিনা এসব কথা নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে বিচার করতে পারত। আজ মানুষের পক্ষে সমস্ত বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ এক উদার বিশ্বসংস্কৃতি রচনা ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মিলনে সেই বিশ্বসংস্কৃতি রচনার পথ হয়তো সুগম হ'ত। ইতিহাসের বিধানে তা ঘটেনি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না বলে

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দোষগুণের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারেনি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কোন কোন উপাদান বিদেশী শাসকের প্ররোচনায় অথবা প্রভুত্বের জন্য তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতিও স্বতন্ত্র রইল না, সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ইংরেজ তাকে নিজের অর্থনীতির বাহক ও পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করতে সুরু করল। বহুযুগের পরীক্ষা ও প্রচেষ্টার ফলে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, ইংরেজ নিজের স্বার্থে তাকে অস্বীকার করে সমস্ত জীবনব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়ে দিল। পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নবাগত দৃষ্টি-ভঙ্গীর সমন্বয়ে এক নতুন জীবনদৃষ্টি গড়বার চেষ্টা হয়নি, হওয়া এ অবস্থায় অসম্ভব ছিল। পুরোনো বিশ্বাস, পুরোনো আচার ভেঙে পড়ল, কিন্তু তাদের স্থলে নতুন বিশ্বাস, নতুন ব্যবস্থা, নতুন আচার সুসংবদ্ধভাবে গড়ে উঠেনি। সংসারে কিন্তু কিছুই খালি থাকে না। পুরোনো বিশ্বাস বা আচারের ভগ্নাংশের সঙ্গে মিলল নবাগত বিশ্বাস ও আচারের সম্বন্ধহীন ভগ্নাংশ। পুরোনো জীবনদর্শন ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু নতুন জীবন-দর্শনের সন্ধান আজো স্পষ্ট নয়।

ক্রমশঃ]
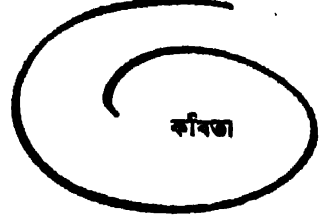
এতো মায়ামমতার জাল ফেলি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এতো মায়ামমতার জাল ফেলি জাল তুলি
রূপোলি সোনালি মাছ কোনোখানে নেই
রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসছে না ডানা মেলে
কথাও বলে না
আমি যাদুকর নই
মাছের চোখের ভাষা কোন্ রত্নদ্বীপের সন্ধান
দিতে পারে দিতে চায়
শোনার মতন কান দেখার মতন চোখ নেই
মায়ামমতার মানে রূপকথার যাদুকর জানে

এখন সময় নয় সোনালি মাছের গল্প শিশুকে শোনাবো
শিশুর জগতে কোনো স্বপ্ন নেই
চোখে নেই সঠিক কম্পাস
সঞ্জয় পেয়েছে দিব্য চক্ষু দীর্ঘ ইতিহাস-পথ-পর্যটনে
সঞ্জয় নির্মোহ আর চক্ষুষ্মান
একালের শিশুর প্রতীক

এতো মায়ামমতার জাল ফেলি জাল তুলি
রূপোলি সোনালি মাছ কোনোখানে নেই
বুকের মোহনা জুড়ে বালিয়াড়ি ধু-ধু বালিয়াড়ি
হাতের মুঠোয় জাল গুটিয়ে নদীর উৎস তোমার হৃদয়

সন্ধানে কাটিয়া যায় দীর্ঘবেলা　　একক জীবন
বহুশত জীবনের প্রয়াণের ইতিহাসে উত্তরণ নেই
শুধু জাল ফেলে গেছে
　　শামুক গুগুলি মৃত মানুষের হাড়
পেয়েছে　　পায়নি সেই রুপোলি সোনালি মাছ
　　　　শতমুখী নদীর মোহনা।

সে কোন্ অগস্ত্য ক্রোধে গণ্ডুষে সমুদ্র হ্রদ নদী পান করে
আমাদের ফেলে গেছে খাড়ির কর্দমে যেন মাছের কঙ্কাল?
কে দেবে জীবন? মায়ামমতার লৌহকপাট
খুলে দেবে? স্রোতে স্রোতে সমুদ্র ভাসাবে হ্রদ নদীর মোহনা?

ভুলেও কি ঋষ্যশৃংগ
　　পা দেবে এ অভিশপ্ত চম্পকনগরে?

আবিষ্কার

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সেদিন এবং এদিন, হৃদয় রোদসী নিঃসীম,
তোমার সিঁথির প্রান্তে স্মৃতি অশান্ত রক্তিম!

আজ তুমি দূর অনধিকার, সেদিন তুমি ছিলে
আমার শরীর আমারই মন মাত্রাবৃত্ত মিলে।

ছন্দপতন অনন্বয়, পরে পেলাম মানে
জন্ম-মৃত্যু তোমার-আমার বিদ্যাপতির গানে।

তুমি কি জানো তুমি যে কার, কিংবা তুমি জানো
অনেক বেশি তোমাকে নীল কান্না-নিংড়ানো।

যমুনা আর আকাশে তাই নীলান্ত বন্ধুতা,
অনেক দূরের তুমি—আমার বৃষ্টিতে আপ্লুতা!

সিঁথিতে তাই আঙুল তোমার কাঁপে বারংবার,
তুমি আমার চোখের জলের গোপন আবিষ্কার॥

দ্বিধা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বর বললেন, 'তুমি কী কী পেয়ে গেছ?'
দ্বিধাভরে আমি জানালাম—
'এক, সচ্ছলতা, আর দুই
সক্ষম রমণীদের সুঘ্রাণ নিঃশ্বাসে, সুতরাং
ইচ্ছাকে অনেক দূর ছেড়ে দিতে পারছি, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
আসতে পারছি সমুদ্র বনানী মেঘমালা ধ্বংসস্তূপ।

ঈশ্বর বললেন, 'তুমি আরো কিছু চাও?' ... দ্বিধাহীন
বললাম, 'খড়ের তৈরী এই শুকনো দেহে
মাটির প্রলেপ,
ঠান্ডা এলা-রং একটু ঘাম-তেল, কারো
সস্নেহে রচিত চালচিত্র চারিপাশে;'

'উপরন্তু, ডানহাতে পূর্ণ কমন্ডলু, আমি যেন
বেদনা বাসনা স্বেদ অভিমান অহংকার ঘৃণা
আমার আনন্দ কৃতজ্ঞতা
অজস্র ঝরাতে পারি শিলাখন্ডময় পৃথিবীতে।'

ঈশ্বর হাসলেন, 'বৎস, দুটি বিপরীত বর দিতে
পারবো না; ... যে-হাত কমন্ডলু
ধরে, সে যে সন্ন্যাসীর, তিনি
নিজেকে নিঃশেষ করে স্থাপনে ব্যাপৃত
তাঁর অবগাহনের অবসর কোথায়; বৎস হে
একটি বেছে নাও—'

তাই শুনে
একদিকে দেখছি, চালচিত্র শান্ত নধর প্রতিমা (আকর্ষণ)
অন্যদিকে কঠোর সন্ন্যাসী,—(আকর্ষণ)
কার কাছে যাই! ... কার কাছে
আমার দ্বিধাবিভক্ত মুন্ডটির রক্তধারণের পাত্র আছে—
কার কাছে!

দুঃখের কারণগুলি

কবিতা সিংহ

যত দিন যায় রাত যায় দিন
দুঃখের কারণগুলি তত নেমে যায়
ভিতরে কোথাও যেন নিঃশ্বাস নিলেই সূচ বেঁধে!
জিহ্বায় গলায়
দুঃখের কারণগুলি স্বপ্নের গভীর থেকে
আরো ঘোর নীচে নেমে যায়!
দুঃখের কারণগুলি হঠাৎ সুখের ঘরে
চায়ের কাপের গায়ে কল্‌কা ফোটায়
দুঃখের কারণগুলি যখন আয়নায়
নিজের চোখের কোলে জল দেখে দেখে নিজেকে সান্ত্বনা!
দুঃখের কারণগুলি কার যেন কবে যেন
কখন অজান্তে যেন বুকে বিঁধে সুখ হয়ে যায়

দুঃখের কারণগুলি হঠাৎ বিকেলে
একহ্রদ জল দেখে চুপচাপ ঢেউ হয়ে যায়।

বোমা পড়ল

যুবনাশ্ব

বুদ্ধিসুদ্ধি সব ভোঁতা মেরে গেছে, ধন্দ-ধরা লাগছে অনিমেষের। মাথার ঘিলু পর্যন্ত তেষ্টায় শুকিয়ে উঠেছে, কি তেষ্টা, কি তেষ্টা!

নিজেকে দেখে নিল একবার। পোষাক পরিচ্ছদ ফিট্‌ফাট, টাইটা খোলা, একটা দিক পিঠের দিকে ঝুলছে। বাঁ হাত প্যান্টের পকেটে, ডান হাত বুকের ওপর ঝুলিয়ে নিল। ভেতর পকেটে ব্যাগ ঠিক জায়গাতেই আছে।

খুলে কি হবে। টাকাকড়ি হয়ত আছে, নয়ত নেই। না থাকলে হাজার ভাবলেও এখন আর গজাবে না। তবু বার করল ব্যাগ, এক ভাঁজ খুলতেই নোটের তাড়া চোখে পড়ল। কত, গোনার দরকার কি? Sufficient unto damnation! পাৎলা ঠোঁটের কোণে হাসির চিলতে উঠেই মিলিয়ে গেল। উঠিয়ে রাখল ব্যাগ আবার যথাস্থানে।

নেহাৎই অভ্যাসবশে ডানহিল পাইপটা টেনে বার করল, লতানো নলের মুখে কলকে ভরা তামাক। দেশলাই জ্বালবার আগেই এরিনমোরের সুঘ্রাণ নাকে এল। সুবাসিত তামাক, ঠিক আউটডোর নয়। ম্যান্‌লি নয়। ধরালো না, পাইপ ফিরে পকেটে পুরল।

বাঁ পকেট থেকে তোব্‌ড়ানো ক্যামেলের প্যাকেট বার করে কাঁপা কাঁপা আঙুলে ঠোঁটে গুঁজল অনিমেষ। দুটো সুখটান দিয়ে ভারী তৃপ্তি পেল। ঐটুকুই। তার পর থেকে ঝুলতে লাগল সিগারেটটা সুতলির মতো ধোঁয়ার রেখা ছাড়তে ছাড়তে ঠোঁটের কোণে।

যা কিছু করছে ও, কিছু যেন নিজে করছে না। ও যেন পুতুল, ওস্তাদ খেলুড়ে আড়াল থেকে সুতো টেনে খেলাচ্ছে ওকে। ও মজার মজার করে হাত পা ছুঁড়ছে মাত্র।

শুধু আকণ্ঠ তেষ্টাটা নিজের, সুখটানের তৃপ্তিটুকু নিজের।

কখন থেকে পথ হাঁটছে মনে পড়ছে না, বেশীক্ষণ নয়, বা হয়ত অনেকক্ষণ। হাঁটার বিরাম নেই। এখন ত হেস্টিংস স্ট্রীট, স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজছে, বন্ধ হয়ে আছে? না বন্ধ হয় নি। খুলে দম দিয়ে নিয়ে আবার পরল ঘড়িটা--কাঁচে একটা চিড় খেয়েছে না? বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে পরখ করে নিল, ফাটা নয়, শুধু স্ক্র্যাচ্‌। মজবুৎ ঘড়ি মোভাতো ক্রোনোমিটর, সহজে ঘায়েল হয় না।

বন্ডেড ওয়্যারহাউসগুলো বাঁয়ে রেখে পুরোনো মিন্টমুখো চলেছে অনিমেষ। ভূতে-পাওয়া ধন্দ-ধরার মতো। মগজে জ্ঞানের ঝিলিক দিচ্ছে না, তা নয়। সে শুধু পা থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত একটা তীব্র পিপাসার। বুক চোখ জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

অথচ এ অঞ্চলে তৃষ্ণাহরা পানীয় কোথায় যে পাওয়া যাবে তাও সঠিক জানা নেই। জল নয় যে রাস্তার কলে পাবে। দুধ নয় যে হাওড়াপুলের মোড়ে পাবে।

যা খুঁজছে তার সরকারী দোকান আটটার আগে খোলে না, সেও সাহেব পাড়ায়, এ পাড়ায় নয়। ভাবছে নিমতলায় যারা মড়া পোড়াতে আসে তারা হয়ত সন্ধান দিতে পারে। হয়ত সেখেনেই স্পিকিজি মিলে যাবে একটা। যা হোক হবে।

হঠাৎ জ্ঞানোদয় হয়ে একটা গানের কলি মনে পড়ল, লজ্জায় জিভ কাটল অনিমেষ, চল্লিশ বছরের বুড়ো মাতাল অনিমেষ। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে। ছি ছি।

কিছু যে আবছা মনে পড়ছে না, তা নয়। কাল রাতে অফিসে এয়ার রেড ডিউটি ছিল। কারেন্সিতে বোমা পড়বার পর থেকে সরকারী অফিসগুলোতে ডিউটি চালু হয়েছে। এক বোতল ব্রান্ডি নিয়ে গিয়েছিল, আট দশটা স্যান্ডউইচ। স্যান্ডউইচ বরং দু'চারটে পড়ে আছে ভোরে দেখল। বোতলে এক ফোঁটা তলানিও নেই।

রাস্তার ঠিক মাঝখানটা দিয়ে চলেছে অনিমেষ। ইয়া চাঁই চাঁই পাথর বাঁধানো রাস্তা। ট্রাম চলতে সুরু হয় নি, শুধু রাস্তা-ধোওয়া হোসপাইপের তীব্র ধারা তাকে এড়িয়ে আগ-পাছ ধুয়ে চলেছে। মাথা বুকে ঝুঁকে পড়েছে, তাকাচ্ছে না কোনো দিকে। ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত শোলোক শোনা যাচ্ছে গঙ্গার দিক থেকে। পোস্তার কাছাকাছি আসতে ঠেলার ঘড়ঘড়ি। অনিমেষের লম্বা শরীর দুটো লম্বা পায়ে ভর দিয়ে মামুলি মানুষের চারগুণ বেশী রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। যদিও হাঁটছে সে ঢিমেয়।

নিমতলা ঘাটে পৌঁছে এক লাকড়ির আড়তের ছোকরাকে জিজ্ঞেস করল অনিমেষ, --হ্যাঁরে, এখানে বিলিতি মদ পাওয়া যাবে?

সপ্রতিভভাবে ছোকরা জবাব দিল,—এজ্ঞে এখেনে লয়, সোনাগাছির মোড়ে পাবেন।

—সে আবার কোন্ দিকটায়? কতদূর?

—দূর বেশী নয়। হুই পূবের গলি বরাবর গেলে চিৎপুর, তা' পর ডানে মোড় দেবেন। দু' কদম গেলেই বাঁয়ে দুগ্গো মিত্তিরের গলি, ওইটেই সোনাগাছি। বিলিতি মাল কত্তা মোড়ের ওপরই আলিন হোটেলে পাবেন।

বেলা প্রায় স'ছটা, হন হন করে পা চালায় অনিমেষ। রাস্তার হদিস্ ভোলে না। ঠিক পৌঁছে যায় অ্যালেন হোটেলে। বড় হোটেল, কিন্তু ও হরি, দরজাকবাট সব বন্ধ। অত ভোরে খোলা থাকে কখনো।

বহু ডাকহাঁকেও কেউ দোর খোলে না। সামনেই যে রাস্তা, তাই ধরে আবার পূব-মুখো পা চালায়।

—কে র‍্যা ড্যাক্‌রা, চোকের মাতা খেইছিস্ নাকি র‍্যা? দিলে, দিলে—গঙ্গাজলটুকু ধাক্কা দিয়ে ফেলে—ওরে ও গন্‌শা, ইদিক আয় না বাছা, সাত সকালে এ কোন মাতালের খপ্পরে পন্নু গো—

সম্বিৎ ফেরে অনিমেষের। সত্যিই ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোককে। গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছে, কাঁখে ছোট্ট ঘড়া, মাথায় লাল ভিজে গামছা। হাত জোর করে অনিমেষ। বলে,—মাপ করবেন, সত্যিই আমি দেখতে পাই নি। অনেকটা আপন মনেই মাথা নীচু করে যাচ্ছিলাম—

স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই অনেক দেখেছে। অনিমেষের কথায় ঘুরে সামনে এসে ভালো করে ওকে দেখে। বলে,—তাই ত! এ যে খোঁয়াড়ি কাটার চেহারা গো! রেতে যেতা ছেলেন, মিলল না সেতা দু'এক পাঁট?

—রাত্তিরে ডিউটিতে ছিলুম, আপিসে। আপনি ধরেছেন ঠিকই—মদের সন্ধানেই বেরিয়েছি। নিমতলায় ওরা বলল অ্যালেন হোটেল। সে ত বন্ধ। তাই হাঁটছিলুম যদি পানের দোকান টোকানে—

—এত ভোরে কি আর কেউ জেগে আছে গো বাবু। আসুন আপনি আমার সাথে,— বলে হাত বাড়িয়ে অনিমেষের ডান হাত ধরে বলল,—আসুন—এই ত বাসা। দোতলায় উঠতে হবে, পারবেন ত? চেয়ারা দেখেই বুঝেচি ভদ্দর নোক, নেশার ঝোঁকে চলতে পারছেন

না। কোনো ভয় নেই আপনার, আসুন—

স্ত্রীলোকটির হাত ধরে ধরে দোতলায় উঠলো অনিমেষ। একটি ঘরের কুলুপ খুলে. জানলা খুলে দিল মেয়েটি। ডাকল,—আসুন, জুতো খুলে ঐ ফরাসটায় বসুন।

ঘরটা বড়ই। এক দিকে দেয়াল ঘেঁসে খান চারেক পিঠসোজা চেয়ার, একটা ছোট চৌকো টেবিলও আছে। টেবিলের ওপর একটা ছাইদান।

মাঝ বরাবর খানিকটা ফাঁকা জায়গা. তাই দিয়ে আর একটা ঘরে যাওয়া যায়। ওপাশে দেয়ালের গায়ে দুটো কাঁচের আলমারী, একটা ভর্তি নানারকম পুতুল, মাটির পাখী, চিনে-মাটির পেলেট পেয়ালা কাঁচের ফুলদান, হরেক জিনিষ। আর একটা ভর্তি কাপড় চোপড়।

দেয়ালে টাঙানো রামকেষ্ট বিবেকানন্দ গান্ধীর ছবি, ডানাকাটা হুরী পরীর তস্‌বির আঁকা ক্যালেন্ডার, তাও দু'চার বছর আগেকার। জানালাগুলোয় পুরোনো ডুরে সাড়ী কেটে পরদা টাঙানো।

অনিমেষ ঘরে ঢুকেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে চোখ বুঁজল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে বলল,—ব্রান্ডি পাওয়া যাবে? বিলিতি?

—যাবে না কেনে গো, দাম দিলেই পাওয়া যাবে।

—তবে এই নাও। এক বোতল ব্রান্ডি আর গোটা কত সোডা আনাও।

পার্সটা বার করে যে কখানা নোট উঠলো প্রথম ধাক্কায়, ফেলে দিল ফরাসে। গুনলো না কত। পার্সটা আবার বুক পকেটে ঢোকাল।

—এ যে অনেক টাকা গো—অত কি হবে! কুড়িটে রাখলুম, এগুলো উঠিয়ে রাখুন।

—কত আছে আর?

—আরো চল্লিশ। ষাট টাকা ফেলেছেন ছুঁড়ে।

—ও তুমি রাখো। কথা কইয়ো না। ভালো লাগছে না। বলে চেয়ারে আড় হয়ে বসে লম্বা পা ছড়িয়ে অনিমেষ চোখ বুজল। হাত দিয়ে কলাপের চুলের গোছা পেছনে ঠেলে দিতে দিতে মুঠোয় ধরে টানতে লাগল শক্ত করে।

স্ত্রীলোকটা দরজা ভেজিয়ে বারান্দায় এসে ডাকল,—নন্দ, ও বাবা নন্দ. একটিবার শুনে যা না বাবা।

—যাই মৌসি, বলে সাড়া দিয়ে কে একজন নীচতলা থেকে ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো।

—কি মাঙ্‌ছো মৌসি,—

—এই যে নন্দ। টাকাটা ধর বাবা। এক বোতল বেলাইতি, মানে অষুধের, মানে দাওয়াইকে বেরান্ডি এনে ফেলা বাবা, আর দুটো সোডা। যাবি আর আস্‌বি, বুঝলি?

পাড়ার চাকর বেশী কথা কয় না। টাকা নিয়ে যাবার আগে দরজা ফাঁক করে নন্দ ঘরের বাবুটিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল মাত্র।

ঘরে ঢুকে স্ত্রীলোকটি বলল,—বাবু একটু আরাম করে বিছানায় গড়ান। বেরান্ডি এলো বলে।

—আসুক। পরে হবে।

কপালের দু'টো দিক দপ দপ করছে। সার্টের নীচে ঘাড়ে পিঠে অনেক সুড়সুড়ে পোকা চলাফেরা করছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডারের কেষ্টঠাকুর হঠাৎ হেলমেট মাথায় জর্ম্যান ফৌজির মতো রাইফেল চার্জ করতে নেমে আসছে। মাথার ভেতর অনেক ঝিঁঝি পোকা

ঝিঁ ঝিঁ না করে সুরে বেসুরে কি যেন আবোল তাবোল গান ধরেছে।

খাড়া চেয়ারে আরেক কাৎ হয়ে বসল অনিমেষ। বলল,—তোমার নাম কি?

—সরলাবালা দাসী।

—আমি কিছুক্ষণ থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না?

—কিছু না বাবু। আপনি অষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ুন। দু'ঘণ্টা ঘুমোতে পারলেই শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। তা' পর যা করবার তাই করবেন।

—তুমি খুব ভালো। হাত ধরে নিয়ে এলে, ব্রান্ডি আনতে দিলে, তাড়িয়ে দিচ্ছো না,—

—মানুষের কদর বোঝা যে আমাদের পেশা গো বাবু, আমরা পেশাকর।

—তোমাকে চাকরটা মাসী বলল না?

—আমি এখন এই বাড়ীটের বাড়ীউলি। মেয়েমানুষ ভাড়াটে সাত ঘর। বলতে গেলে মালিক এখন ত।

—বুঝলাম।

কি বুঝল অনিমেষই জানে।

তারজড়ানো ১নং এক্‌শ আর সোডা নিয়ে নন্দচাকর ঘরে ঢুকল। কর্কস্ক্রু পেঁচিয়ে ফট্‌ আওয়াজ করে পেল্লায় বড় কর্ক বার করে ফেলল। এক বোতল সোডাও খুলে দিল। দু'টো গেলাস আনতে যেতে সরলাবালা একটা আনলে। অনিমেষ চোখ বুজেই আছে।

—খাবার কিছু আনাবো?

—না না না—

—বুঝেছি। ও নন্দ, পাঁচটা টাকা রাখ বাবা। গনশার দোকান খুললেই গরম সিঙ্গাড়া আর গরম জিলেপী এক টাকার আনবি। দু'টো টাকার বাজার করবি বুদ্ধি করে—আর এক টাকা তোর, আর এক টাকা ফেরৎ। বুঝলি?

নন্দ চলে গেল।

কাঁপা কাঁপা হাতে গেলাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে সোডা মেশালো অল্প একটু। একচুমুকে সেটা খেয়ে আবার ঢাললো। সেটাও একচুমুকে। তৃতীয়টি ঢেলে, সিগারেট ধরালো অনিমেষ।

পাঁচ, বড় জোর দশ মিনিট। বাঃ, সব পরিষ্কার হয়ে আসছে। ব্রেন ক্লিয়ার।

পিঠের সুড় সুড়ে পোকারা পালিয়েছে। ক্যালেন্ডারের কেষ্টঠাকুর কেষ্টঠাকুরই আছেন।

কোথায় এসেছে, এ কোন জায়গা, মেয়েটি কে, এসব আঁচতে আর বেগ পেতে হচ্ছে না। বেশ লাগছে অনিমেষের। সরলাটিও তো গিন্নিবান্নি গোছের ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে ওর।

জিজ্ঞেস করল,—তুমি ত খেলে না?

—আমি ও সব আর খাই নে। পাঁচ-সাত বছর চব্বিশ ঘণ্টা গিলেছি, এখন পাঁচ-সাত বছর একেবারে ছাড়ান দিছি।

—হুঁ, এখন হিসেবি বাড়ীউলি হয়েছ।

—তা ত বটেই। তা ছাড়া, ও আমার ভালোই লাগে না। আপনিও এত খাবেন না।

—এখন ত খাই।

—তা খান। বাবুর কি করা হয়? বৌ ছেলেমেয়ে আছে ত?

অনিমেষ ক্ষেপে ওঠে।

—তা শুনে তোর কি হবে রে মাগি!

বলেই লজ্জায় জিভ কাটে। বলে,—না না, ঠিক অমনি করে বলিনি। শোনো, আমি কে, আমার কে কে আছে, এসব শুনে তোমার কি লাভ বলো?

—বুঝেছি। আর কথা কইতে হবে না আপনার। এখন ত মাথা সাফ আছে, জামা-কাপড় ছেড়ে একটু গড়িয়ে নেন। দাঁড়ান, সিঙ্গাড়া জিলিপি এসে গেছে, একটু মুখে দিন।

দুটো প্লেটে গরম সিঙ্গাড়া আর জিলেপি ভাগ করে নিয়ে এল সরলা। আশ্চর্য, আধ ঘণ্টা আগে দাঁতে কুটোটি কাটবার কথায় গা বমি বমি করেছিল অনিমেষের, এখন ভর প্লেট সিঙাড়া জিলেপি সাবড়ে দিল রা'টি না করে। বলল,—জামা কাপড় ছাড়বার দরকার নেই। এইটুকু খেয়েই আমি ঘুমোই একটু। তোমার রান্না-বান্না হলে তুলে দিয়ো। পারি ত কিছু খাব তখন আবার। টাকা আছে ত? আছে, বেশ।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, এই দিকটা বিছানা করে দিচ্ছি।

আলমারী খুলে নতুন সুজনী বালিশ বার করে ফরাসের একধারে বিছানা করে দিল। দু'তিনটি তাকিয়ার দেয়াল তুলে জায়গাটাকে বেশ আলাদা দেখতে করে ফেলল সরলা। বলল,—এইবারে সব ঠিক হয়ে গেল। আপনি গেলাস ফুরোলেই, আর খাবেন না, শুয়ে পড়বেন। বোতল ত থাকলই, সোডাও আর দু'টো আমি আনিয়ে রাখব। রান্না হলেই ডাক দেব, মনে থাকে যেন, সদর দরজার হুড়কো তুলে দিচ্ছি ঘরে, আমি ভেতর বারান্দায় রান্না করতে বসলুম। ভেতর থেকেও আমি শেকল তুলে রাখব, কেউ জ্বালাতে আসবে না আপনাকে।

ঘড়ি পার্স খুলে মাথার বালিশের তলে রেখে প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়ল অনিমেষ। মাথাটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসছে মনে হচ্ছিল। পরিষ্কার!

কাল রাত্রে আপিস বাড়ীতে এয়ার রেড ডিউটি, সমস্ত রাত টহল দিয়ে স্কোয়াডের কাজ দেখা, ফায়ার ফাইটার, ফার্স্ট এড্‌ সাজ-সরঞ্জামগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখা, তার ফাঁকে ফাঁকে এসে মদ্যপান। মদ্যপান যেন নাক দিয়ে নিশ্বাস টানবার মতো একটা সুস্থ জৈবিক প্রক্রিয়া। অন্তত পানের সময় তাই। তারপর ভেতর থেকে অন্য একটা অনিমেষ জাগতে থাকে। সে কখন কি করে বসবে ভেবে আকুল হবার মতো মনোস্থৈর্য তার নেই। সে যা করবার করবেই। শুধু নেশা কাটার মুখে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আরো মদ কোথায় মদের সন্ধান।

অথচ নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতো ঘূর্ণিতে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে না। তার মনে হয় নোঙর ছেঁড়ে নি, না হয় ঘূর্ণির পাকে তেমন জোর নেই।

আর তা না হলে, একটা জ্যান্ত মানুষ অনিমেষ, নৌকোর উপমা তার বেলা খাটেই না। যদি খাটেও, তা হলে শক্ত হাতে হাল ধরে বসে থাকা কোনো অভাব্য কর্ণধারের সদাজাগ্রত উপস্থিতিও মানতে হয়।

শেষেরটাই ঠিক, বোধ হয়। চোখ জড়িয়ে আসে।

হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বোতল থেকে দরাজ হাতে তিনপো গেলাস ভর্তি করে ঢক ঢক করে চুমুক দেয়। গলা হয়ত জ্বলে, ও জ্বলুনি সয়ে গেছে। একটু মুখ বিকৃত হয়, বুক চেপে ধরে, দু'চার বার এমনিই ঢোক গেলে, চিপতে গেলে আরো জ্বালা করে।

তারপর চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে। চকিতে একবার বাড়ীর কথা, বৌ ছেলে-মেয়ের কথা, মনে হয়। মনে হয় যেন তাদেরই কাছাকাছি রয়েছে সে। চৈতন্য হারাবার ক্ষণে দু' একটা প্রিয় নাম বেরোয় ঠোঁট থেকে।

ঘুম ভাঙে তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। জেগে উঠে অনিমেষ ধন্দ ধরে এক সেকেন্ড

বসে থাকে, তারপর তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। গায়ে কোট পায়ে জুতো গলিয়ে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়।

একজন মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক ফরাসের একটেরে গভীর ঘুমে। ঘরটা, পরিবেশটা, আবছা আবছা অনুধাবনযোগ্য হলেও, পষ্টাপষ্টি কিছু মনে পড়ে না। বরং আগের রাতের অফিসে ডিউটি, বাড়ী ঘর, এই সব বেশী করে মনে পড়তে থাকে।

আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অনিমেষ।

ট্যাক্সি—বাড়ী—ব্যস্—এই ধান্ধা এখন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শোনে দোতলার আর এক ঘর থেকে কোনো অল্পবয়সী কণ্ঠের আওয়াজ।

– অ কোকিলে, দেকেচিস্ বষ্টুমী মাগীর কান্ড! সব ছেড়েছুড়ে বিবেগিনি হইচি! ভোর না হতে দশা সৈ বাবু, বোতোল বোতোল বেরান্ডি- ঘেন্নায় মরি ঘেন্নায় মরি বুড়ি মাগীর কান্ড দেখে—

কোকিলা নাম্নীটি বোধ হয় পদ্মাপারের। তার গলার জবাবও শোনা গেল—

—বাবুডারে ত ছ্যাম্‌রা দ্যাখ্‌লাম না, বুড়াই মনে লয়। পুরনো আলাপি সালাপি কিনা কেডা জানে –

—হ্যাঁ হ্যাঁ রেকে দে তোর পুরোনো আলাপি! আমারো ছ' বছর কাটলো সরলা মাসির বাসায়, বাপের জন্মে দেখিনি একে। আর বুড়ো তোকে বলল কে রে – হেই জোয়ান না সেই জোয়ান। হ্যাঁ তবে, চ্যাংড়া নয়, আর বদ্ধ মাতাল—

—আমাগো কাম কি লো হেই সব কথায়। মাসি মাম্‌লত গুছাইয়া লইলেই অইলো—

—খপ্পরে এসে গ্যাছে—ছাড়বে কি আর! বলে, কম পয়সা করেচে বুড়ি মাগী? নন্তুবাবুকে বেহুঁস করে বাড়ীটা সুদ্ধো লিকিয়ে নিয়েছ্‌লো শুনতে পাই বিশ বছর আগে। টাকার আন্ডিল এই বাড়ীউলি, বুঝলি কোকিলে – তবু কি খাঁই কমল? আমাদের ঠেঁয়ে এক পয়সা কম নিয়েচে কখনো—

আর শুনতে পেল না অনিমেষ—ততক্ষণে সদর রাস্তায় পৌঁছে গেছে। আর যা শুনল তার একটি বর্ণও বোধগম্য হোলো না তার।

গলি ছেড়ে চিৎপুর পৌঁছে সামনেই পড়ল ট্যাক্সি। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল ঢের টাকাকড়ি আছে। এর বেশী তখন তার মাথা খাটতে নারাজ।

ট্যাক্সিতে উঠে বলল,—ভবানীপুর—জগুবাজার।

বাড়ীতে এ অবস্থায় পৌঁছানো, এও নতুন নয় অনিমেষের। তার ওপরে রাত্তিরে ডিউটি ছিল—ফিরতে সকাল না হয়ে বেলা প্রায় তিনটে হোলো—এ আর এমন কি। থোড়বড়িখাড়ার দিন সেই ভাবেই কাটল। সন্ধের পর স্নান করে এসে ঘড়ি বাঁধতে গিয়ে দেখল ঘড়ি নেই। আঁতি পাঁতি করে খুঁজল, আবার ভাবখানা দেখাতে হচ্ছে কিছুই যেন খুঁজছে না। যাক, সন্ধান হোলো না ঘড়ির।

মুস্কিল হোলো পার্স নিয়ে। সেটাও পাওয়া গেল না। টাকাকড়ি কি ছিল সঠিক মনে পড়ল না, তবে ছ' সাত শ'য়ের কম হবে না। এক 'ব্যাক্লাভা'তেই ত চারশ' বাইশ পেমেন্ট পেয়েছে। তা ছাড়া আরো দুটো উইনে। কাল দিন ভালো গেছে মাঠে।

টাকার ক্ষতি গায়ে না মাখা অনেকদিন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। ঘড়িরও। বহুবার এর আগে ট্রেনে ট্রামে পার্স ঘড়ি খোয়া গেছে। গিয়েছে—আবার হবে। আপাতত কেউ না টের

পেলেই হোলো। কিন্তু—

কিন্তু আইডেন্টিটি কার্ডও যে ঐ পার্সে। ওটা খোয়া গেলে আবার সেই সাহেব কর্তার কাছে ছুটতে হবে আপিসে, হারানোর কি সাফাই দেবে সেখানে? একটু দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হোলো অনিমেষ। বেশীক্ষণ নয়। ছ'টার শো-তে ছেলেমেয়ে নিয়ে ওয়াল্ট ডিস্নির ছবি দেখতে বেরিয়ে গেল।

শনিবার রাত্রের বাড়াবাড়ির পর আজ নিরম্বু চলবে কিছুক্ষণ—একথা অনিমেষের স্ত্রী জানেন, তাছাড়া ছেলেমেয়ে সাথে—ঐ এক জায়গায় একটুও অসাবধান নয় অনিমেষ। তিনি বিশেষ ভাবিত হলেন না।

ছবি দেখে রাত সাড়ে আটটায় কলরব করতে করতে ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরল অনিমেষ।

ছেলেমেয়েরা কত গল্প শুনেছে বাবার কাছে এয়ার রেড ডিউটির। কিভাবে সমস্ত রাত তৈরী হয়ে বসে থাকতে হয়। বোমা যদি আপিস বিলডিংয়ে পড়ে তবে প্রথমেই ত শেলটার মানে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে বালির বস্তা ঢাকা সব সুড়ঙ্গ পথে। তারপর বোমাবুরা চলে গেলে ফায়ার ফাইটিং, ফার্স্ট এইড, এই সবের ব্যবস্থা। কিভাবে স্টিরাপ পাম্প ব্যবহার করতে হয়—কিভাবে ছোটখাটো ব্যান্ডেজ করতে হয়—এই সব গল্প শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েরা বাপকে মস্ত একটা হিরো ঠাউরে নেয়। যদিও এতাবৎ একদিনও অনিমেষের বিলডিংয়ে বোমা পড়ে নি, এবং আজও স্টিরাপ পাম্প, ফার্স্ট এইড বাক্স—সব অব্যবহৃতই আছে, তবুও ছেলেদের মনে হয় তাদের বাবা রোজই ডিউটিতে বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলে অসীম বীরত্বের সাথে কর্তব্য করে আসছেন, এবং এই সব বীরত্বের পুরস্কার একদিন পাবেনই পাবেন।

সকাল থেকে বাড়ী না আসার সময় পর্যন্ত সময়টা কিভাবে পরের দলকে ডিউটি বুঝিয়ে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে আসতে হয়েছে সেই কথা বোঝাতে বোঝাতে বাড়ী পৌঁছে যায় ওরা।

বড় ছেলে তখনো বাপের হাত ধরে আছে। অনিমেষ তাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলছে—ছুটির দিন বলেই ত ডিউটি দুপুরেও থাকে। আরেক দল পরের রাতের ডিউটি দিতে এসে পৌঁছে গেলে তাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছুটি। খোলা দিনে ত সমস্ত দিন আপিসে লোকই থাকে—শুধু রাতটুকু ওয়ার ডিউটি। কিন্তু ছুটির দিনে—যেমন আজকে—দিনের বেলাও রেহাই নেই—

অনিমেষের স্ত্রী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ঝটকায় ছেলের হাত ছাড়িয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন বাপের কাছ থেকে। যাবার সময় যে চাউনীতে চেয়ে গেলেন তাতে রাগ বিদ্রূপ ঘৃণা তিনই মেশানো।

অনিমেষ পিতৃত্বের অভিমান ফলিয়ে বেশ একটা কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ তার চোখ পড়ল ড্রেসিং টেবিলের দিকে। সেখানে তার পার্স, ঘড়ি, এক থাক খোলা নোট, আইডেন্টিটি কার্ড সাজানো রয়েছে।

স্ট্যাচু বনে যাওয়া ছাড়া আর কিছু দরকার নেই তখন। স্ত্রীর গলার শেষ শেল বর্ষিত হোলো,—সরলাবালা দাসী, বড়বাজার ২১২৩, ফোন করতে বলে গেছে, সব জিনিষ পাওয়া গেছে কিনা জানাতে—

গরু ও অন্যান্য, ঈগল-পক্ষী

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বড় বড় কথা আজকাল কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। হয়তো ত্রিশ বছরেরও এমন দীপ্ত শিক্ষিত যুবক বা যুবতী নেই যে আজো বলবে সত্যের কথা, বা প্রেম ও ঈশ্বরের কথা—এমন কি রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর কথাই—এবং তা ব'লেই যেমন নিজের কাছে তেমনি অন্যের কাছে বেকুব ব'নে যাবে না। ইতিহাস যা, তা তা-ই—সুতরাং আক্ষেপ করব না, এটা কেন হ'ল, বা ওটা কেন হ'ল না। শুধু সেই বড় বড় কথার প্রসঙ্গে কতকগুলি চিত্র এখানে সবিনয়ে তুলে ধরছি।

১৯৬১ ও ১৯৬৬-তে সারা বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হয় দুটি মহান প্রথম শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনে—প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের, দ্বিতীয়টি রম্যাঁ রলাঁর। আগামী ১৯৬৯-এ এরকম আরো একটি প্রথম শতবার্ষিকীর পালনে আমরা আজ দেশ-দেশান্তরে প্রস্তুত হচ্ছি—সেটি মহাত্মা গান্ধীর। উৎসবের ছুতো পেলে চিরকালের মানুষের মন সহজেই মাতে সর্বত্র, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ যুগ ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সে-উৎসবের সার্থকতা কী বা কতখানি, সেটা অন্য প্রশ্ন।

দেখা যাক, আমাদের ঘরের রবীন্দ্রনাথকেই প্রথম। তাঁর নাম ও গান আজ চতুর্দিকে শুনি, কিন্তু তাঁরই বাংলা দেশে আজ তিনি অপঠিত, আজকের বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। সেটা ভালো কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, তা বর্তমান আলোচনার বাইরে—বলছি একটা সত্য কথা মাত্র। আর রলাঁ তো নোবেল প্রাইজ সত্ত্বেও বিরাট সাহিত্যিক হিসেবে তেমন একটা ঠাঁই কোনোদিনই পাননি। আজ তিনি সম্পূর্ণ অপঠিত, সম্পূর্ণ মৃত—বোধহয় সবচেয়ে মৃত তাঁর নিজেরই দেশে। বাকী রইলেন গান্ধী, যিনিও মার্টিন লুথার কিং সত্ত্বেও তাঁর নিজের দেশে আজ সমানই নিশ্চিহ্ন।

বহু শতবার্ষিকীই হয়েছে-হচ্ছে-হবে, কিন্তু তার মধ্য থেকে এই তিনজনকে বেছে নিয়েছি একটি বিশেষ কারণে—এঁরা সকলেই আমাদের বড় আপনার জন। সেই আপনার জনের প্রসঙ্গে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। রলাঁ বিদেশী, তাই তাঁর সম্বন্ধে এটুকু বলার দরকার। বিদেশী হ'য়েও তাঁর মত ভারতকে জানবার ও ভালোবাসবার প্রাণান্তময় প্রচেষ্টা বোধহয় খুব কম ভারতীয়ই আজ পর্যন্ত করেছেন। উপরন্তু, তিনি ছিলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁদের আত্মার আত্মীয়। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি গান্ধী সম্বন্ধে আমাদের আজ পর্যন্ত যে-জ্ঞান, তা নিশ্চয় আরো সমৃদ্ধ হবে এই দুই মনীষী সম্বন্ধে রলাঁর রচনাগুলি পড়লে। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ সেই রচনা আজো ফরাসী হ'তে ইংরেজীতেও অনূদিত হয়নি। এটা তাই সুখবর যে অন্তত গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর রচনাগুলি একত্র ক'রে শীঘ্রই বাংলা ও পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এঁদের কেউ মুখ্যত সাহিত্যিক, কেউ মুখ্যত জনগণের নেতা বা কেউ মুখ্যত নীতি-বাদী দার্শনিক হ'লেও এই তিনজনের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে এঁরা প্রত্যেকেই আপন-আপন চিন্তা-কর্ম-আদর্শের ক্ষেত্রে বিশ্বমানব ছিলেন, যে-রকম বিশ্বমানব এ-যুগে

আর একজনও নেই এবং যে-রকম বিশ্বমানবতার যুগ হয়তো এ'দের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষে শেষ হ'য়ে গেছে। এ'দের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট অংশ বিকশিত হতে পেরেছিল ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপ্নকে কেন্দ্র ক'রে—কিন্তু আজ যখন ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও দুই দশকেরও উপর অতিবাহিত, তাঁদের সেই স্বপ্নের এতটুকু অবশেষও কি কোনো দিগন্তে বহিমান? উল্টে দেখছি, সব থেকে বড় প্রশ্ন যা আজকের, তা দেশটা এক থাকবে কি না, এবং থাকলেও সেখানে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী। এই প্রচণ্ড প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর জীবনের সকল আশা-হতাশা-অভিনিবেশ অন্য রূপ নিয়েছে ও যার দুর্নিবার ছায়া প্রতিফলিত আমাদের সকল প্রচেষ্টায়, সাহিত্যে-শিল্পে-রাজনীতিতে। এই তিন মনীষী তাই আজ শুধু অস্তমিত সূর্যই নন, তাঁদের স্মৃতিও গমিতমহিমা। হয়তো প্রচণ্ড দুঃখের কথা সেটা, কিন্তু সত্য প্রায়ই ক্রূর—এদিকে উৎসবের দামামা বাজছে।

গান্ধীর আসন্ন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর সম্বন্ধে রলাঁর কয়েকটি উক্তি এলোপাথাড়ি উদ্ধৃত করছি, অনেকটা সে-যুগের সঙ্গে আজকের আমাদের এক ভয়াবহ ও করুণ আধ্যাত্মিক দূরত্বের পরিমাপটা নিতেই—এবং বিশ্বাস করুন, একেবারেই অশ্রদ্ধার ভাবে নয়, বরং শুধু অপরিচয়ের বিস্মিত বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়েই।

রলাঁর এই সব উদ্ধৃতিগুলিই ১৯২৩-এ লেখা। প্রথমটি :

'মহাত্মা—বিশ্বসত্তার সঙ্গে নিজেকে যিনি একাত্ম ক'রে দেখেছেন। শান্ত কালো চোখ। ছোট্ট মানুষ, পলকা শরীর, সরু মুখ, কান দুটো কুলোর মত। মাথায় সাদা টুপি, পরনেও করকরে সাদা কাপড়, খালি পা। খাওয়ার মধ্যে ভাত ও ফল, জল ভিন্ন পান নেই, শোন মাটির উপর, ঘুমোন কম, কাজ করেন অবিরত। শরীরটা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এক মহান ধৈর্য ও এক মহা প্রেম, তাঁর মধ্যে এ-দুটোই সর্বপ্রথমে নজরে পড়বার মত। পিয়ার্সন তাঁকে দেখেন ১৯১৩-তে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, দেখেই তাঁর মনে হয় ফ্রান্সিস অব আসিসিস-এর কথা। মানুষটি সরল শিশুর মত, মিষ্ট ও বিনয়ী তাঁর বিপক্ষীদের সঙ্গেও, আন্তরিকতায় এতটুকু খাদ নেই। সেই একই নম্রতা তাঁর বিচার-বিবেচনাতেও, এত সাবধানী যে বলতে দ্বিধা তাঁর, 'ভুল করেছি'; যদিও ভুল স্বীকারে কখনো পিছপাও তিনি নন, যেমন-তেমন আপোষও মেনে নেন না কিছুতে, কূটচক্রীর ভদ্রতাও তাঁর নয়। গালভরা বক্তৃতার মোহ থেকে দূরে থাকেন, মনই নেই তাতে, তাঁকে দেখেই যে-উচ্ছ্বাস জনতার, তাতেও তাঁর সমানই বিরাগ। কোনো কোনো সময় সে-উচ্ছ্বাস এত প্রচণ্ড যে তার চাপে তাঁর ছোট্ট শরীর হয়তো পিষেই মরত যদি না সুহৃদ মৌলানা শৌকাৎ আলির বলিষ্ঠ দেহ সামনে দুর্গপ্রাচীরের মত থেকে সর্বক্ষণ রক্ষা করত তাঁকে। তাঁর প্রতি আকুল শ্রদ্ধার এই সমবেত লম্ফে-ঝম্পে তিনি অসুস্থ আক্ষরিক অর্থে, এবং যেহেতু সংখ্যার প্রতি তাঁর শঙ্কা ও এক সমানই সন্ত্রাস উদ্দাম জনতায়, স্বস্তি বোধ করেন শুধু অল্পসংখ্যক লোকেরই মধ্যে, খুশী তিনি একমাত্র নির্জনতাতেই, শুনতে চান নীরব নিভৃত স্বরের বাণী।

'এই সেই ব্যক্তি যিনি জাগিয়েছেন ত্রিশ কোটি মানুষকে, কাঁপিয়ে তুলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে, এবং উদ্বোধন করেছেন মানবিক রাজনীতির এমন এক শক্তিমান আন্দোলন যার তুলনা প্রায় দু' হাজার বছরের ইতিহাসে নেই।'

অপরিচয়ের কথা বলছিলাম না? রলাঁর পরের উক্তিটি তাই বড্ড লোভনীয় সেই দিক থেকে : 'স্বদেশবাসীর হিন্দুধর্মে তিনি (গান্ধী) ভয়ংকর বিশ্বাস করেন, কিন্তু সে-বিশ্বাস

তাঁর গ্রন্থকীট পণ্ডিতের মত নয় বা যে সব ঐতিহ্য মেনে নেয় অন্ধভাবে, বিচারশক্তিহীন সেই ভক্তের মতও নয়। তাঁর ধর্মচেতনা নিয়ন্ত্রিত নিজেরি যুগপৎ বিবেক ও যুক্তির দ্বারা। বলেন : "ধর্ম নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করতে চাই না, এবং পবিত্র নামধারী ব'লেই যে কোনো পাপকে আমায় ক্ষমা করতে হবে, তাও নয়। কাউকেই নিজের সঙ্গে টানব না, যতক্ষণ না তারই যুক্তিতে আমি গ্রাহ্য হই। প্রাচীনতম শাস্ত্রেরও পবিত্রতা আমি অস্বীকার করতে প্রস্তুত, যদি তা আমার যুক্তিতে গ্রাহ্য না ঠেকে।" অন্যদিকে, এবং এটা জানার সব থেকে দরকার, হিন্দুধর্ম নিয়ে যুক্তিতর্কাতীত কোনো উগ্র উচ্ছ্বাস তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না : "আমি বিশ্বাস করি না যে বেদ পবিত্রতম গ্রন্থ। আমার মনে হয় বাইবেল, কোরান ও জেন্দ-আবেস্তা সমানই পবিত্রভাবে অনুপ্রেরিত। উগ্র ব্রতীদের জন্য নয় হিন্দুধর্ম —তাতে স্থান আছে জগতের সমস্ত মহান ধর্মপুরুষের পূজার। যে যার ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরের পূজা করবে, এ-কথাই সে বলে, তাই অন্য সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক কলহের নয়, শান্তির।"

'যুগ যুগ ধ'রে হিন্দুধর্মে যত পাপ বা ভুলত্রুটি ঢুকেছে, সে-দিকেও তিনি চোখ বন্ধ করেননি, বরং সে-সবের নিন্দাই তিনি করেন। তবু..."আমার নিজের স্ত্রীর প্রতি আমার যে-মনোভাব, একমাত্র তাই দিয়েই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণার সব থেকে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারি। সে যেমন আমার মনকে নাড়া দেয়, পৃথিবীর অন্য কোনো নারীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তার যে কোনো দোষত্রুটি নেই, তা একেবারেই নয় : হয়তো যা আমি দেখি, তার চেয়ে তার দোষত্রুটি আরো অনেক বেশি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার এমন এক বন্ধনের ভাব যা অক্ষয়। ঠিক সেই একই জিনিস হিন্দুধর্মের পক্ষেও. যে-ধর্মের প্রতি আমি সমানই আসক্ত, তার সব ত্রুটি ও সীমা সত্ত্বেও। হিন্দুধর্মের যে-দুটিমাত্র গ্রন্থ প'ড়েছি ব'লে বলতে পারি, সেই গীতা ও রামায়ণের সঙ্গীত যেমন আমার মনকে মুগ্ধ করে, তেমন অন্য কিছু পারে না...। হিন্দুধর্মের মহান স্থানগুলি কত পাপে আজ কলঙ্কিত, জানি—তবু সব সত্ত্বেও তাদের ভালোবাসি। মর্মে-মর্মে সংস্কারক হ'য়েও হিন্দুধর্মের মূল বিশ্বাসগুলির একটিকেও আমি দূরে ফেলে দিতে পারি না।"

'তাঁর স্বীকৃতি-পাওয়া সেই মূল সত্যগুলি তবে কী? ১৯২১-এর ৬ই অক্টোবরে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি যত্নসহকারে তাদের তালিকা দেন, প্রবন্ধটির মাধ্যমে সর্বসমক্ষে প্রচার করেন তাঁর ধর্মদর্শন : "১। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং হিন্দু শাস্ত্র বলতে আর যা কিছু বোঝায়, আমি তার সব তাতেই বিশ্বাস করি, এবং কাজে কাজেই অবতার ও পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করি; ২। শুধু মূল বৈদিক অর্থেই বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করি, তার বর্তমান ও সর্বজনগ্রাহ্য ইতর অর্থে নয়; ৩। বিশ্বাস করি, গরুকে রক্ষা করা উচিত—কিন্তু এখানেও কথাটির সর্বজনগ্রাহ্য অর্থে নয়, আরো অনেক বড় অর্থে; ৪। পৌত্তলিকতায় আমার অবিশ্বাস নেই।"

'গান্ধীর ধর্মদর্শন সম্বলিত এ-ক'টি পঙক্তি পড়তে গিয়ে যে-কোনো ইউরোপীয়ই থমকে দাঁড়াবেন, না ভেবে পারবেন না যে এতে প্রতিফলিত এমন একটি মনোভাব যা সম্পূর্ণ-ভাবে আমাদের থেকে ভিন্ন, এ এমন একটি বিশেষ সমাজ ও ধর্মের নীতিতে আবদ্ধ যার সঙ্গে আমাদের স্থানকালের দূরত্ব অসীম ও যা আমাদের বুদ্ধি-বিচারের এত অতীত যে তাকে বুঝতে চাওয়া ব্যর্থতার সামিল।'

তবে আজ জীবিত থাকলে রলাঁ জেনে হয়তো আশ্বস্ত হতেন যে একদিন যা বুঝতে

চাওয়া যে-কোনো ইউরোপীয়ের পক্ষে ব্যর্থতার সামিল ব'লে মনে হত তাঁর কাছে, সৌভাগ্যক্রমে এখনো সংখ্যালঘু জনসঙ্ঘ ও শ্রীগুলজারীলাল নন্দ সত্ত্বেও সেটা ইদানীংকালে গান্ধীর দেশবাসীর পক্ষেও বোঝা ক্রমশই শক্ত হ'য়ে পড়ছে। অবশ্য উপরের ঐ উক্তিটিও রলাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিস্ময়েরই দৃষ্টান্ত, কারণ ভারতে পদার্পণ না ক'রেও বুঝতে তিনি পেরেছিলেন অনেক—আমাদের তদানীন্তন মানস ও অভিনিবেশের যেমন স্থূলে তেমনি সূক্ষ্মের উভয় পিঠই—গান্ধীর মাহাত্ম্যটি ঠিক কোথায়, সেটাও নিরলস আগ্রহে চিহ্নিত ক'রে তাকে খানিকটা দূর থেকে অকুণ্ঠ নমস্কার জানিয়েছেন। 'দূর থেকে' বললাম এই কারণে যে গান্ধীকে মেনে নেওয়া রলাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল—প্রথমত, সোভিয়েট রাশিয়া ব্যাপারটা কী এবং প্রোলেট্যারিয়েট বস্তুটা আসলে কী, তা রলাঁ যেভাবে বুঝেছিলেন, গান্ধী একেবারেই বোঝেননি। দ্বিতীয়ত, শিল্পী ব'লেই রলাঁ বিশ্বমানবের যে-ব্যাপক সংজ্ঞায় প্রয়াসী হন, তা গান্ধীর ধ্যানধারণার শুধু বাইরেই ছিল না, ছিল বিপরীতও। এবং সেই কারণেই, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের চারিত্রিক অসাযুজ্যের আলোচনায় রলাঁকে কখনো কখনো পাই যেমন দক্ষ তেমনি দীপ্ত রূপে। এক জায়গায় রলাঁ বলছেন :

'আরো দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ, তাই তিনি ঠিকই দেখেছেন অসহযোগীদের ঔদ্ধত্যটি কোথায়। অতি আন্তরিকতার সঙ্গেই অহিংসার কথা যদিও বলছে অসহযোগীরা, তারা ইউরোপের পাপ সম্বন্ধে জনগণকে কেবলি সচেতনও ক'রে চলেছে; এবং এইভাবেই জনগণের চিত্তে তারা সঞ্চার করছে সেই জ্বরের বীজাণু, যা একদিন হিংসার আশ্রয় নেবেই। কিন্তু বিদ্বেষের সব ভাব হ'তে যাঁদের চিত্ত মুক্ত, সেই ধর্মপ্রচারকেরা এ-কথাটা বুঝছেন না। লোকেদের যিনি নামান কর্মে, নিজের হৃৎস্পন্দনটুকু শুনলে তাঁর চলবে না, অন্যদের হৃৎস্পন্দনটুকুই তাঁকে শুনতে হবে। জনতা সম্বন্ধে সাবধান! একবার মত্ত হ'লে কোনো গান্ধীর নৈতিক নির্দেশই তাদের ধ'রে রাখতে পারবে না। অবশ্য হয়তো একটিমাত্র সম্ভাবনা আছে, যার দ্বারা নেতার কঠিন শৃঙ্খলা নির্বিচারে মেনে নিতে রাজী থাকতে পারে জনতা : যদি নেতা নিজেকে ঈশ্বরের অবতার ব'লে জাহির করতে স্বীকৃত থাকেন। এবং সেইটেই তো জনগণের গোপন ইচ্ছা—তারা তো আজই গান্ধীকে শ্রীকৃষ্ণরূপে চিত্রিত করছে। কিন্তু যে-আন্তরিকতা ও বিনয় গান্ধীর, তাতে এমন কাজে স্বীকৃত হওয়া তাঁর পক্ষে তো সম্ভব নয়।

'অতএব শুধু যা বাকী থাকে, তা তাঁর সেই একক ও একাকী স্বর, যা পবিত্রতম এক মানুষের, ও যার বিচরণ গর্জনমুখর মনুষ্য-সমুদ্রের ঊর্ধ্বে। আরো কতদিন ধ'রে সে নিজেকে শোনাতে পারবে? কী মহান, করুণ প্রতীক্ষা!'

বিশ্বমানব নিয়ে মতামত সম্বন্ধে রলাঁর পরের উক্তিটি আরো পরিষ্কার, আরো অর্থপূর্ণ :

'আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীও সমান বিশ্বমানবতাবাদী, যদিও ভিন্ন অর্থে। গান্ধীর বিশ্বমানবতা নৈতিক বিবেকের দিক থেকে, যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা শুদ্ধ বুদ্ধির দিক থেকে। ঠিক যেভাবে প্রথম যুগের ধর্মপ্রচারক ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ টানেননি, কিন্তু সকলেরই উপর চাপাতে চেয়েছিলেন নৈতিক শৃঙ্খলার বাধ্যবাধকতা, গান্ধীও তেমনি প্রার্থনা ও দৈনন্দিন কর্তব্যের আচার আয়োজন হ'তে কাউকেই বাদ দেননি। এইটেই গান্ধী করতে চান এবং এখানেই তাঁর সংকীর্ণতা : সে-সংকীর্ণতা নয় তাঁর চিত্তের, যে-চিত্ত যীশু খৃষ্টের মতই উদার, সংকীর্ণতা তাঁর ত্যাগ ও বুদ্ধির কৃচ্ছ্রতা সাধনে (এবং এ-কথা সমানই প্রযোজ্য যীশু খৃষ্টের বেলাতেও)। গান্ধীর যে-বিশ্বমানবতা-

বোধ, তা মধ্যযুগীয়—তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ক'রেও আমরা পক্ষ নেব রবীন্দ্রনাথেরই।'

এ-প্রসঙ্গে রলাঁ রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ হ'তে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন, পরে বলছেন : 'এর চেয়ে মহামহিমান্বিত কথা কোনো জাতি কখনো শোনেনি। কথাগুলি যেন সূর্যকরোজ্জ্বল কবিতা, মানুষের সমস্ত সংগ্রামের ঊর্ধ্বে তার পক্ষবিস্তার। এবং তাদের যে-একমাত্র সমালোচনা সম্ভব, তা তাদের সে-পক্ষবিস্তার হয়তো একটু বড্ড ঊর্ধ্বে। অনন্ত কালের দিক থেকে যদি বিচার করা যায়, তবে রবীন্দ্রনাথই ঠিক। তিনি কবি-পক্ষী—আয়তনে ঈগলের মত বৃহৎ (এই ভাবেই হাইনে আমাদের এক মহান সংগীতকারের বর্ণনা দেন)—গান করছেন সময়ের ধ্বংসাবশেষের উপর ব'সে।'

কিন্তু গান্ধীকে ছোট করার কোনো উদ্দেশ্য দূরে থাকুক, তাঁকে তাঁর যথার্থ আসনেই চিনতে চেয়েছিলেন রলাঁ। এবং এটাও তো কম সত্য নয় যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও তাঁর আবেগে রীতিমত ভাঁটা পড়ে শেষের দিকে—যদিও সে-ক্ষেত্রেও, যেমন গান্ধীর ক্ষেত্রেও, রলাঁকে যুক্তিযুক্ত করার বা তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো অভিপ্রায় আমার এখানে নেই; যাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার, সেটা একটা ঘটনা মাত্র, তার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য নয়। অন্যদিকে, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভারত নিয়ে রলাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাসটাও সত্য, নইলে তিনি বলতে পারতেন না :

'সে-বাণী সীমাবদ্ধ নয় শুধু ভারতেই, তা ছড়িয়ে পড়ছে আরো বহু দূরে। একমাত্র ভারতই তা দিতে পারত। সে পবিত্র করেছে তার নিজের মহিমাই শুধু নয়, তার আত্ম-ত্যাগও। হয়তো হ'তে চলেছে খৃষ্টের ক্রুশ, উদ্যত নিজেকে উৎসর্গ করতে।

'জগৎ যাতে নব নব রূপে সঞ্জীবিত হ'তে পারে, তার জন্য হয়তো গোটা একটা জাতির এইরকম আত্মত্যাগ দরকার। ইহুদীরা তাঁদের ত্রাতার জন্য একই ভাবে নিজেদের বলি দেন, যে-ত্রাতার আগমনের আশা তাঁরা বহু শতাব্দী ধ'রে জাগিয়ে রেখেছিলেন মনে। কিন্তু সেই ত্রাতা যখন এলেন, অবশেষে পুষ্পিত হলেন রক্তমাখা ক্রুশে, তখন তাঁকে তাঁরা চিনতে পারলেন না। ভারতীয়েরা চিনেছেন তাঁদের ত্রাতাকে, সেটা তাঁদের সৌভাগ্য। মুক্তিদাতা সেই আত্মত্যাগে তাই তাঁরা এমন আনন্দে ছুটেছেন।

'কিন্তু প্রথম খৃস্টানদের মতই এ-যুক্তির প্রকৃত অর্থটি বুঝতে অনেকেই পারছেন না। ঐশী রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় বহু যুগ কাটান খৃস্টানরা। ভারতেও স্বরাজ ছাড়িয়ে আরো দূরে দৃষ্টি যায় না অনেকেরই। আমি অবশ্য মনে করি যে এই রাজনৈতিক লক্ষ্যে তাঁরা শীঘ্রই পৌঁছোবেন। যুদ্ধে ও বিপ্লবে ইউরোপ বহু ক্ষত সঞ্চয় করেছে, আজ তা অসমর্থ ও হীনবল—এশিয়ার উপর প্রভুত্ব ক'রে এসেছে ব'লে এশিয়াবাসীরা তার প্রতি সব সম্মানবোধ হারিয়েছে। মুশিলম দেশসমূহ, ভারত, চীন এবং জাপানের এইসব জাগ্রত জনগণের আশা-অভিনিবেশ দমিয়ে রাখতে ইউরোপ পারবে না বেশিদিন।

'তবু যত সুন্দর বা যত অভিনবই হোক না কেন সে-সংগীত, যা আরো কয়েকটি স্বাধীন জাতি মেলাবে বিশ্বের একতানে, তার অর্থ খুব বেশি দূর যাবে না যদি একই সঙ্গে এশিয়ার এত শক্তি বহন ক'রে না আনে জীবন ও মরণের এক নূতন আদর্শ, এবং তার চেয়ে বড় যা, যদি সে-শক্তি সমগ্র মানুষকে নূতনভাবে জাগাতে না পারে। পঙ্গু ইউরোপকে এক নতুন পথাদর্শও দিতে হবে তাকে।

'সারা জগতে হিংসার ঝড় বইছে। সে-ঝড়ের আগুনে পুড়ছে আমাদের সভ্যতার সকল ফসল, এবং তা আসেনি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। যুগ যুগ ধ'রে জাতীয়তাবাদের এক

পাশবিক অহমিকা বিপ্লবের পৌত্তলিক নীতিতে আস্কারা পেয়েছে, বেড়েছে গণতন্ত্রের অন্ধ ভণ্ডামিতে—তার মাথায় মুকুট পরিয়েছে শতাব্দীব্যাপী এক অমানুষিক শিল্পোন্নয়ন, লোভী ধনিক সম্প্রদায়ের শাসন, এবং বস্তুবাদী এমন এক অর্থনীতি যা আত্মাকে মারে গলা টিপে। আজকের যে-অনিবার্য হীন সংঘাত, তা এই সবেরই কারণে—এবং এভাবেই পাশ্চাত্ত্যের সব ঐশ্বর্য লোপ পেতে বসেছে। এটাকে শুধু অনিবার্য বললেই চলবে না, শাস্তি হিসেবেও মানতে হবে। এক জাতি আরেক জাতিকে খুন করছে একই আদর্শের নামে, এবং সেই আদর্শের মুখোশের পিছনে রয়েছে তাদের একই স্বার্থ, একই বিদ্বেষজনিত ভ্রাতৃহত্যার ভাব। জাতীয়তাবাদী, ফ্যাশিস্ট, বলশেভিক, অত্যাচারী, অত্যাচারিত—কেউই ছাড়ছে না চেঁচাতে যে বলপ্রয়োগ করার অধিকার আছে একমাত্র তারই, অন্যের নয়। অর্ধ শতাব্দী আগে যার বল ছিল, সে ন্যায়ের উপর প্রভুত্ব করত। আজ অবস্থা আরো অনেক খারাপ—আজ বলই ন্যায়, বল ন্যায়কে বেমালুম উদরসাৎ ক'রে ব'সে আছে।

'এই যে-পুরানো জগৎ ধ'সে পড়ছে, তাতে না আছে আশ্রয়, না আছে আশা। কোনো মহান আলোও নেই। গীর্জার উপদেশ পুরিয়ার মত, তা রোগীকে সান্ত্বনা দেয়, ধার্মিকতায় পূর্ণ, এবং সে-উপদেশে শব্দ এমন সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় যাতে তা যেন কোনোক্রমেই শক্তিশালীকে চটাতে না পারে। কিন্তু ঐ উপদেশ দিয়েই গীর্জার কর্তব্য শেষ, দৃষ্টান্ত স্থাপনে সে উদ্যোগী হয় না। শুধু দুর্বল শান্তিবাদী হ'য়ে ভেড়ার মত ভ্যা-ভ্যা করে, এবং তার ইতস্তত ভাবটা অন্যের পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। যে-বিশ্বাস তার নিজেরি আছে কি না জানে না, সে-বিশ্বাসের কথা বলে। কিন্তু সে-বিশ্বাস কী ক'রে প্রমাণিত হবে, বিশেষত এক অবিশ্বাসী জগতে? বিশ্বাস প্রমাণ করা যায় একমাত্র কর্মের দৃষ্টান্তের দ্বারা—কাজ করতে করতেই তাকে প্রমাণ করতে হয়।

'ভারতের বাণী আত্মত্যাগ। গান্ধী বললেন, একমাত্র সে-বাণীই জগৎকে দিতে পারে ভারত। রবীন্দ্রনাথও তাঁর যাদুকরী ভাষায় সেই একই কথা বলেছেন...এই গৌরবের নীতিতে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই একমত...

'সিন্ধু ও গঙ্গার মত ভারতের দুটি মহান নদী গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে তাঁরা এক আলিঙ্গনে বাঁধুন! পাশ্চাত্ত্য হ'ল বীর্যের শ্মশানভূমি, প্রাচ্যে আলোর প্রকাণ্ড স্বপ্ন। হিংসার লাঙলে ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীর মাটিতে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ যেন ঈশ্বরের দুই প্রবাহিণী হ'য়ে বইছেন—এবার দিকে দিগন্তে নিয়ে যান তাঁরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সকল সম্ভাবনাপূর্ণ বীজ!'

হায়, আজ আমরা অন্য এক সরযূর তীরে।

ঘর

মতি নন্দী

চারটি ভাই এবং তাদের বৌ ছেলেমেয়েরা থাকতেও অমলা জানে পৃথিবীতে তার একটি মাত্র ভরসা অন্ধ বুড়ি মা'টি। ছাদের এই ঘরটিতে সে থাকতে পারছে যেহেতু মাকে দেখাশুনো করার আগ্রহ কারুর নেই, এবং মা বলেই বারান্দায় ফেলে না রেখে আস্ত একটি ঘরে থাকতে দিয়েছে। ছোট ভাই কমলের আজও বিয়ে হয়নি, কারণ আলাদা কোন ঘর নেই। মা মারা গেলে অর্থাৎ তিন তলার ঘরটি হলে তার বিয়ের উদ্যোগ করা হবে। মেজ বৌয়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া একটি মেয়েকে পছন্দ করে রাখা হয়েছে।

সিঁড়িতে পিছলে পড়ে মা যেদিন মাথায় চোট পেল সেদিন থেকেই অমলার ভাবনা—মা' তো আর বাঁচবে না, তাহলে কি হবে। একদিন পনের টাকার টিউশনিতে যাবার পথে এই কথা ভাবতে ভাবতেই সে হাজির হল প্রভাসের বাড়ি।

প্রভাস মক্কেলের সংগে কথা বলছিল, অমলাকে দেখে অবাক হল; কেননা গত চব্বিশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ প্রভাসের বিয়ে হওয়ার পর পাঁচ-ছবারের বেশি তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। মক্কেলটি বিদায় নিতেই অমলা গম্ভীর হয়ে বলল, 'একটা ব্যাপারে পরামর্শ নিতে এলুম।'

প্রভাস তার পেশাগত গাম্ভীর্য মুখে ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল।

'মার অবস্থা তো গত কয়েক মাস থেকেই সুবিধের নয়। মারা গেলে আমি কি করব?'

'কি করবে মানে?'

'আমার ভাইদের তো জান, তখন আমি কোথায় দাঁড়াব? ঘর জুড়ে থেকে কমলের বিয়ে বন্ধ করে আছি, ওর বিয়ের বয়স তো পেরিয়ে যাচ্ছে। মেজ বৌ আমাকে দেখতে পারে না অথচ মেজদাই সংসারের বড় খুঁটি। বড়দা আর সুবল কোনক্রমে দিন চালায়। মা আছে তাই আমিও আছি, কিন্তু মা বেশিদিন আর বাঁচবে না।'

মোটা পেন্সিলটা টেবলে ঠুকতে ঠুকতে প্রভাস পেশাদারী পরামর্শ দিল—'তোমার উচিত খোরপোষ দাবী করে মামলা করা, বহুদিন আগেই অবশ্য করা উচিত ছিল।'

'কিন্তু স্বামী তো আমায় ত্যাগ করেনি, আমিই চলে এসেছিলাম।'

'শুনেছি আবার বিয়ে করেছে। তোমায় যখন ডিভোর্স করেনি তাহলে আইনের চোখে সে বিয়ে অবৈধ, তুমিই তার বৈধ স্ত্রী। আর কে কাকে ত্যাগ করেছে সে নয় উকিলে বুঝবে, মোট কথা তোমার ভরণপোষণে সে এখনো বাধ্য।'

অমলা ঘাড় হেঁট করে চিন্তা শুরু করল। প্রভাস নাগাড়ে ঠক ঠক করে যাচ্ছে। দেমাক দেখিয়ে যার কাছ থেকে চলে এসেছে এই বাইশ বছর পর তার কাছেই হাত পাততে হবে, এটা ভাবতে অমলার অস্বস্তি হচ্ছে। অন্য কিছু উপায়ে যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়!

'কি রাজি নও?' ভারি গলায় প্রভাস জানতে চাইল।

'তাই তো ভাবছি।'

পরিহাস করে প্রভাস বলল, 'মামলা-টামলা না হলে উকিলদেরই বা চলে কি করে, দু চারটে ফী তো খাব।'

অমলা হেসে বলল, 'মামলা করার টাকা কোথায়? ওটা তোমাকেই দিতে হবে।'

গম্ভীর হল প্রভাস, পেশাগত গাম্ভীর্যটা আবার মুখে লাগিয়ে বলল, 'আগে তুমি বরং দেখা কর। কি বলে শোন, যদি কিছু করতে রাজী না হয়, তখন মামলার কথা ভাবা যাবে, ও কোথায় থাকে তা জানো তো?'

'বাড়ি জানি না, ভাড়া বাড়িতে থাকে। তবে দোকানটা জানি। মনোহারী দোকান বাগবাজারে।'

'তাহলে আগে সেখানে গিয়েই দেখা করে কথা বল।'

অমলার মনে হল তার থেকে বরং মামলা করাই ভাল। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমাকে খেতে পরতে দাও বলার মত লজ্জা আর কি থাকতে পারে। কিন্তু মামলার খরচ কে দেবে!

'মামলার খরচ তুমিই দাও না।' অমলার অজান্তে স্বরটা কাকুতির মত শোনাল।

'আমার ফী নয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু কোর্ট খরচ তো আছে।'

'আশ্চর্য', হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল অমলা, 'আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? আর কয়েকটা টাকার জন্য সাহায্য করবে না?'

প্রভাস এমন ভাবে তাকাল যেন শেখান সাক্ষীটি সাক্ষী বক্সে উঠে উল্টো কথা বলছে। 'কে দায়ী, আমি?'

'তোমার চিঠিগুলো তো সর্বনাশ করে সব ওর হাতে পড়ে।'

'সে তো আর তোমায় তাড়িয়ে দেয়নি। এই তো বললে—নিজেই চলে এসেছি।'

'হ্যাঁ, তোমার ওপর ভরসা করেই চলে এসেছিলুম।'

'আমি তো তোমায় চলে আসতে বলিনি, কোন চিঠিতে কি সেরকম কথা ছিল? বোকামি করেছ যেমন তার ফল তো ভোগ করবেই।'

অমলা থিতিয়ে গেল। প্রভাসের মুখে বিরক্তি, অস্বস্তি। শীতকালেও কপালে ঘাম ফুটল, দুটো কাঠি ভেঙে সিগারেট ধরাল।

'চিঠিগুলো কি তোমার স্বামী রেখে দিয়েছে?'

'না।'

'কি বলেছিল?'

'শুধু বলেছিল, একেই কেন বিয়ে করলে না। ওকে বলিনি যে তুমি আগেই বিয়ে করেছ, বড় লোকের একমাত্র মেয়েকে।'

'তাতে কি হয়েছে', প্রভাস জবরদস্ত সাক্ষীর মত রোখা সুরে বলল, 'তোমার কি হিংসে হচ্ছে? লীলার বাবা না হলে কি ওকালতিতে দাঁড়াতে পারতাম?'

'আমি ওসব ভেবে বলিনি, তুমি চটছ কেন?' অমলা টেবলে কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল।

গলার স্বর দ্রুত নামিয়ে প্রভাস সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'চটেছি কে বলল, বয়েস পঞ্চাশ পেরোল, এ সব ছেলেমানুষী ব্যাপার নিয়ে চটাচটি করার ইচ্ছেও হয় না। অল্প বয়সে ছেলেমেয়েতে মেলামেশা হয়, বিয়ে থা করে সে সব ভুলে যায়। তুমিই বা ভুলে যাওনি কেন?'

'আমি পারিনি প্রভাস, আমি পারিনি।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল অমলা।

'থাম', প্রভাস রূঢ় ধমক দিল, 'কান্নাকাটি কোরো না। মনে রেখ আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা এ বাড়িতে রয়েছে। তোমার মামলা আমি করে দেব একটি পয়সাও লাগবে না, এখন এসো।'

কান্নার যে ইচ্ছেটা অমলাকে পেয়ে বসেছিল, তা প্রভাসের দ্রুত একটানা কথাতে মুছে গেল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'যা সব লিখেছিলে তার সব মিথ্যে ছিল?'

কি যেন বলতে গিয়ে প্রভাস থেমে গেল। টেবলে গ্লাস ভরা জল রয়েছে। এক চুমুকে শেষ করে গ্লাস হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মুখে মাথায় জল দিয়ে ফিরল।

'আমি যাচ্ছি,' অমলা উঠে দাঁড়াল। প্রভাস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমার কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তা সব কিছুরই একটা ছক তৈরী হয়ে গেছে অমু, তা ভেঙে বেরোনোর সাধ্য এখন আর আমার নেই। আমি সুখে আছি, আমায় তাই থাকতে দাও, আমায় কিছু মনে করতে বোলো না।'

অমলা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল, প্রভাসের কেশবিরল মাথাটা নুয়ে পড়ল টেবিলের উপর। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন সে সদর দরজায় পৌঁচেছে, তখন ছুটে এল প্রভাস।

'তোমায় আমি বরং মাসে মাসে কিছু দিয়ে সাহায্য করব, মামলা করে দরকার নেই।'

অমলার মনে হল প্রভাস যেন প্রায়শ্চিত্ত করতেই কথাটা বলল। ওর ভঙ্গিতেও অপরাধী অনুকরণ। দেখে মায়া হয়, সংসার নিয়ে যেমন আছে থাকুক।

'তার দরকার নেই। মনে হবে তোমায় ভয় দেখিয়ে আদায় করেছি!'

'তা হলে!' বিহ্বলের মত প্রভাস তাকিয়ে থাকল।

অমলা আর দাঁড়াল না। বোকামি করেছি কি? আনমনে ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে চলল। মায়া হয়। প্রভাস এখনো বুকে মোচড় দেয়, ও এখনো অমানুষ হয়ে যায়নি। এর থেকে বেশি আর কি চাইবার আছে, এ বয়সে এ জেনেই সুখ। কিন্তু আমি কি করব এখন? শেষে কি ভিখিরির মত হাত পেতে খোরপোষ নিতে হবে! বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে যাচ্ছে, এখন আর কোন রকম বোকামি করা চলবে না। প্রভাসের প্রস্তাবটা এক কথায় নাকচ করাটা বোধ হয় ঠিক হল না।

রাস্তা পার হবার জন্যে সে দাঁড়িয়েছে, পিছন থেকে 'দিদিমণি' বলে সরস্বতীবালা ডাক দিল, অমলাদের বাড়িতে কাজ করত। মেজ বৌ মাস তিনেক আগে হঠাৎ ছাড়িয়ে দেয়।

'দিদিমণি বাড়ি যাচ্ছ নাকি, চলো আমিও যাব।'

'কেন গো।'

'হেস্তনেস্ত করব একটা, নয়তো আত্মঘাতী হব। দেখ ছোটবাবু কি সর্বনাশ করেছে আমার।' সরস্বতীবালা দেহের সামনে থেকে আঁচল সরাল।

'কদ্দিন!' অমলা আঁতকে উঠল।

'চার মাস। এখন আমি কি করব বল তো, লোকে সন্দেহ শুরু করেছে। ছোটবাবু বলেছিল আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে আমায় রাখবে।'

চোখে জল নিয়ে কথা শুরু করে গনগনে রাগে শেষ করল সে। অমলা সিঁটিয়ে গেল কেলেঙ্কারির কথা ভেবে।

'আমার একটু কাজ আছে সরস্বতী, আমি যাই।'

বলেই অমলা হাঁটতে শুরু করল। ব্যাপারটা জানাজানি হলে পাড়ায় অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? কমল যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করুক ওর। এসব ছেলে-মানুষরা তো টাকা পেলেই খুশি। তবে কমল টাকা পাবে কোত্থেকে। তা যদি থাকত আলাদা বাসা করে বিয়েই করতে পারত। এখন যদি এই ঝিটাকেই বিয়ে করে বসে!

হাঁটতে হাঁটতে অমলা বাগবাজারের দিকে চলে এসেছে। আর কিছুটা গেলেই

প্রফুল্লর দোকান। আজকেই কথা বলে দেখি, মানসম্মান নিয়ে বসে থাকলে এ বয়েসে চলে না, তেজ দেখাবার বয়স চলে গেছে, লজ্জা কিসের, বিয়ে তো হয়েছিল, এই ভেবে অমলা দোকানের সামনে দাঁড়াল।

খদ্দের ভেবে এগিয়ে এসে প্রফুল্ল কাউন্টারে ঝুঁকে বলল, 'বলুন।'

বাইশ বছর দেখে না, সুতরাং পরিচয় না দিলে চিনতে পারবে না। নিজের নাম বলতে অমলার সঙ্কোচ হল। 'কিছু কিনতে আসিনি।' মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে সে বলল।

চশমার পুরু কাঁচের পিছনে প্রফুল্লর দুটি চোখ বিস্ময় প্রকাশ করতে করতে, হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে তীক্ষ্ম হয়ে গেল। দোকানের আলো মলিন। সামগ্রীগুলোও মলিন। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে অমলার যাবতীয় উত্তেজনা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

'তাহলে কি চাই।'

স্বরে গাম্ভীর্য পরিমাপ করে অমলা বুঝল, চিনতে পেরেছে।

'কথা ছিল।'

প্রফুল্ল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ডান গালের আঁচিলটার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি, গোঁফটা আগের থেকেও মোটা, জামার কলারে ময়লা, নখগুলো বড়, চামড়া খসখসে। এইসব জিনিস অমলাকে একদা বিরক্ত করেছিল। এখন সে তাই বোধ করল।

'আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছ?' স্পষ্ট করে উচ্চারণের জন্য অমলা কেটে কেটে বলল।

'আমার তো ভাবার কথা নয়।' জিভটা ঠোঁটে বুলিয়ে গুছিয়ে দেবার মত করে কথাটা মেলে ধরল।

'স্ত্রীর সম্পর্কে স্বামী ভাববে, এটাই তো নিয়ম।'

'স্ত্রীরও তো নিয়ম মানার অনেক কিছু আছে। তাছাড়া তুমি যে আমার স্ত্রী, কে বললো?'

'আইন।'

'ওঃ আইন দেখাতে এসেছ। বোধহয় তার কাছ থেকেই তালিম পেয়েছ!'

ঝগড়া করার জন্য প্রফুল্লর অবয়ব প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। অমলা ধীরকণ্ঠে বলল, 'তার কাছ থেকে তালিম পেলে এখানে না এসে কোর্টেই যেতাম।'

প্রফুল্ল থতমত হল। বিচলিত হয়েছে বোঝা গেল হঠাৎ ঝাড়ন নিয়ে প্ল্যাসটিক ব্যাগগুলোর ঝাড়ার বহর দেখে। এই সময় এক খদ্দের এল পাঁউরুটি কিনতে। অমলা একধারে সরে দাঁড়াল। যাবার সময় লোকটি অভিযোগ করল, কালকের রুটি শক্ত বাসি ছিল।

'কোম্পানি যেমন দেয়, আমি কি করব বলুন।'

'কোম্পানিকে জানান।'

লোকটি চলে যেতেই অমলা বলল, 'তাহলে কি? ভাইদের সংসারে আছি। তাদের অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। এই বয়েসে রোজগারই বা কি করব। শাড়ি গয়না চাই না, খাইখরচের টাকাটা তো দেবে।'

'কেন, আর কেউ কি দেবার নেই।'

'আর কেউ মানে?'

প্রফুল্ল চুপ করে রইল। অমলা কাউন্টারে চাপড় দিয়ে বলল, 'তোমাকে দিতে হবে।'

'যদি না দিই।'

'তাহলে মামলা করে আদায় করব।'

'যদি বলি তুমি স্বেচ্ছায় চলে গেছ, আমি বরাবরই তোমাকে আমার কাছে রাখতে রাজী ছিলাম, এখনও আছি।'

'বলব মিথ্যা কথা। বলব প্রমাণ কর যে, আমি স্বেচ্ছায় চলে গেছি। বলব, আর একটা বিয়ে করার জন্য আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে; বলব, এখনো আমি তোমার কাছে যেতে চাই। এক নিঃশ্বাসে বলে অমলা ভারী নিঃশ্বাস ফেলল, নাকের পাটা ফুলে উঠেছে।

'এ সবই তো মিথ্যা কথা। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য কি তোমাদের বাড়ি আমি যাইনি? বলেছিলে মনে আছে কি?—যখন দরকার বুঝব যাব। দুবছর অপেক্ষা করে তবেই বিয়ে করি। সেই চিঠিগুলো যদি তোমায় ফেরৎ না দিতাম, তাহলে কি বলতে পারতে, প্রমাণ করার কথা?'

'চিঠিগুলো রাখোনি কেন?'

'বোকামি করেছি।'

খদ্দের ঢুকতেই প্রফুল্ল থেমে গেল। জুতোর ক্রীম চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে নেই বলে দিয়ে কাউন্টারের ডালা খুলে সে বেরোল। দোকানের দরজার পাল্লা বন্ধ করে মাত্র একটুখানি খুলে রাখল।

'দাঁড়িয়ে কেন, এই টুলটায় বোস।'

অমলা বসল। 'কি কাজে লাগবে ভেবেছিলে?'

প্রফুল্ল কাউন্টারে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'অন্তত ওগুলো দিয়ে বাধ্য করতে পারতে তোমাকে বিয়ে করতে।'

'আমার তো বিয়ে হয়ে গেছল। ওরও হয়ে গেছল। ওসব চিন্তা আমি করিনি, করে লাভ হত না।'

'তোমার না হোক আমার তো হত। তাহলে খোরপোষের কথা আজ উঠত না। এইতো দোকান দেখছ, মাসে কতই বা রোজগার, বড়জোর শ' দুই টাকা। এর থেকে চল্লিশটা করে টাকা যদি দিতে হয়, তাহলে আমার সংসার অচল হয়ে পড়বে। তাছাড়া এখন যদি বলি, তোমাকে নিতে রাজী আছি। আসবে তুমি? পারবে আমার সংসারে থাকতে?'

প্রফুল্ল চোখ সরিয়ে গণেশ মূর্তিটার উপর রাখল। অমলা ইতস্তত করে কোনক্রমে বলল, 'ছেলেমেয়ে কটি?'

'বড়টি মেয়ে, আঠারোয় পড়ল। সম্বন্ধ করছি, তবে সকলেরই খাঁই বেশি। পরে চার ছেলে, সবাই পড়ছে। এই আয়ে চালাতে পারি না অমলা, ভিখিরিরও অধম হয়ে থাকি।' করুণভাবে প্রফুল্ল তাকিয়ে রইল। অমলা বাধ্য হল অন্যত্র তাকাতে।

'ওরা কি আমার কথা জানে?'

'জানে।'

'কি বলে?'

'তোমায় নিয়ে কোন আলোচনাই হয় না।'

'আর কেউ কিছু বলে না?'

'গীতা তোমায় শুধু একবার দেখতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলুম কিনা তুমি ওর থেকেও সুন্দরী।'

অমলা উঠে দাঁড়াল। প্রফুল্ল ধড়মড়িয়ে সিধে হয়ে বলল, 'চললে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি করবে?'

'কি আর করব, আমাকে তো বাঁচতে হবে। তোমরা সবাই বলছ বোকামি করেছি। এখন মনে হচ্ছে সত্যিই তাই করেছি।'

'তুমি দাবি করবে? তা অবশ্য পার। কিন্তু সেটা ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। কি করেছ স্ত্রী হিসাবে যে জন্য দাবি জানাতে পার?'

ফ্যাকাশে মুখে শুনে যাচ্ছিল অমলা, প্রফুল্লের ভাবভঙ্গিতে ভয় পেল। হয়তো ঝাঁপিয়ে গলা টিপে ধরতে পারে। দরজার দিকে এগোতেই প্রফুল্ল দরজা আগলে দাঁড়াল।

'যেতে দাও। নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।'

'অমলা। আমার সংসারের এই সামান্য আয়ে ভাগ বসিও না। জোর হাতে মিনতি করছি, ছা-পোষা মানুষ আমি।'

'তাহলে আমি কি করে বাঁচব!' এই বলে ধাক্কা দিয়ে প্রফুল্লকে সরিয়ে অমলা রাস্তায় নেমে এল। ওর সঙ্গে যাবার জন্য কয়েক পা এগিয়ে, দোকান খোলা আছে খেয়াল হতেই প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে পড়ল। অমলা ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে শীঘ্র দূরে চলে যেতে ভাবল, এমন একটা জায়গা কি কোথাও নেই, যেখানে মাথা কুটে রক্তারক্তি করা যায়!

বাড়ি ফিরে অমলা নিঃসাড়ে দোতলায় উঠল। মেজ-বৌয়ের ঘরের দরজায় তালা, বোধ হয় সিনেমা দেখতে গেছে। বড়-বৌ দালানে বাচ্চার দুধ গরম করছে। ফিসফিস করে অমলা জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ এসেছিল?'

'কে আবার আসবে।' বড়-বৌ কাজে মন দিল। অমলা তিন তলার সিঁড়ি ধরল। যেখানে বাঁক নিয়েছে সিঁড়িটা, একফালি চাতাল বেরিয়ে গেছে। কমল তার ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। ওর পাশ দিয়ে পা টিপে অমলা উপরে উঠে গেল।

মাঝ রাতে অমলার মনে হল, সিঁড়িতে কি যেন একটা হচ্ছে। বিছানা থেকে উঠে পা টিপে সিঁড়ির মাথায় এসে উঁকি দিল। অন্ধকারটা চোখে সয়ে যাবার পর বুঝল, উঁচু মত কিছু একটার উপর দাঁড়িয়ে একটা ছায়ামূর্তি কড়িকাঠে কিছু একটা বাঁধছে। কমলকে ধমক দেবার জন্য নিঃশ্বাস টেনে ওকে ব্যাঘাত না করে বিছানায় ফিরে এসে, অমলা সেই নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

রবীন্দ্রসংগীতে স্বর সংগতি ও সুর বৈচিত্র

অরূপ ভট্টাচার্য

সৃষ্টির ইতিহাসে কথা ও সুরের মধ্যে কে পূর্ববর্তী তা আজ সঠিক নির্ণীত না হলেও একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে কথার প্রয়োজনেই হোক বা সুরের প্রয়োজনেই হোক, একে অপরের পর নির্ভর করে একটি সুসম ঐক্যের দিকে এগিয়েছে। সামস্তোত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র একই স্বরে উচ্চারণ করলে তার অর্থ হয়ত ক্ষুন্ন হোত না, কিন্তু ব্যঞ্জনা অশ্রুত থাকতো। সেই ব্যঞ্জনার প্রকাশের জন্যেই স্বর থেকে স্বরান্তরে যাবার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, শুধুমাত্র ষড়্জ স্বরে সেই ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল না, নি ও রে এই দুটি স্বরকে যুক্ত করে সর্বশুদ্ধ তিনটি স্বরের মধ্যে একটি সংগতি আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে কথাকে টেনে তার ভাবরূপ থেকে ব্যঞ্জনালোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া হল। সংগীতসৃষ্টির এই তত্ত্বটুকু মনে রেখে রবীন্দ্রসংগীতের স্বর ও সংগতি ও সুরবৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের উপর সুবিচার করা সম্ভব হবে। এতকাল গুণীজন সকলেই বলেছেন কথা ও সুরের মিলনই রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য। একথা অসত্য নয়, কিন্তু যা ততোধিক সত্য, এবং যে বিচারে রবীন্দ্রসংগীত দেশকাল-উত্তীর্ণ সংগীতের পর্যায়ে পড়ে বলে আমাদের বিশ্বাস, তা হচ্ছে কথার সামান্যীকরণ থেকে সুরের অসামান্যতায় উত্তরণ, সাদা কথায় বলা যায়, সুরকে মেলোডিক এক্সটেনশন রূপে কল্পনা। এই প্রসঙ্গে বাক্যের ভাবরূপ ও সুরের ভাবরূপের বিশ্লিষ্ট আলোচনা সম্ভব এবং বাক্যের ভাবরূপ আলোচনা করতে গেলে সিমানটিকস্‌এর বেড়াজালে আটকে পড়ার সম্ভাবনা, এ দুয়ের ভাবরূপে কী পার্থক্য তা বুঝতে গেলে শব্দসৃষ্টি ও সুরসৃষ্টির উৎপত্তিগত কারণ খুঁজতে হবে। এর স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উপস্থিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ কথা ও সুরের হরগৌরীমিলনেই নয়, বরং অনুসৃতি যেখানে শেষ হয়েছে সুরের আবাহন ঠিক সেই পর্যায় থেকে শুরু। কথা শেষ হয়ে গেলেও মন যেন বলতে চায়, এর আরও একটি গভীর ব্যঞ্জনা আছে, তাকে ধরি কি করে। সুর তাই বাণীর সুদূরপ্রসারী অস্তিত্ব, তার আলোকিত বিকাশ। বলা বাহুল্য সকল গানে রবীন্দ্রনাথ শিল্প বিকাশের এই ধারাকে সার্থকভাবে ফোটাতে পারেন নি। কিন্তু যে সকল গানে প্রকৃতই এই আলোকিত বিকাশের স্বাক্ষর রেখেছেন সেখানে রবীন্দ্রসংগীতে ফুটে উঠেছে অলৌকিক ব্যঞ্জনা, অপরিমিত আস্বাদন, অনুপম রূপকল্প এবং এইসকল গুণাবলী বিচার করতে বসলে একমাত্র যে পদ্ধতি অবলম্বন করা শ্রেয় তা হচ্ছে, স্বর, স্বরসংগতি ও সুরবৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ। সেই সকল গানের অবয়ব অর্থাৎ সুরের কাঠামো নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যায়, কিভাবে এই সকল গানগুলি রূপের অন্তহীন ঐশ্বর্যে ভাবমণ্ডিত হয়েছে।

ইদানীং ইংরাজী সাহিত্য আলোচনায় ক্লোজড ক্রিটিসিজম নামক যে নতুন পদ্ধতির উদ্ভব এবং বাংলা কাব্যবিচারেও কোথাও কোথাও সে প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয় বলে আমাদের মনে হয়েছে, সংগীতের সুরবৈচিত্র্য ও তার অবয়ব অনুরূপ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে একটি বিশেষ ভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে। এমন কি, আলোচনাকে শুধুমাত্র উক্ত গানগুলির বিশ্লেষণে নিবদ্ধ রাখলে, পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়ে, সোজা-

সুজি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। ক্লোজড ক্রিটিসিজম্-এর সুবিধা এই তা অযথা ভাব ও কথার মায়াজাল সৃষ্টি করতে দেয় না। সংগীত সমালোচনায় অনেক সময়েই সাহিত্যের স্বারস্থ হ'য়ে সমালোচকগণ আসল কথাকে হারিয়ে ফেলেন। সুরের কাঠামো নিয়ে বিচার করার পরিবর্তে সংগীতের কাব্যাংশের অর্থ ও ভাব নিয়ে আলোচনাই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত ভারতীয় সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজে শুধুমাত্র একাধারে রচয়িতা সুরকার ও গায়ক নন, তাত্ত্বিকও বটে এবং আরও বড় কথা এই যে তিনি আগে রচয়িতা ও সুরকার, পরে গায়ক হন নি। তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন, কবে যে গান গাইতে পারতুম না তা মনেই পড়ে না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সংগীতসাধনা বা সংগীতরচনা তাঁর জীবনধারণে নিয়ত অভ্যাস ছিল। যাকে বলি আমরা সংস্কার, তা প্রাক্তন হোক, সহজাত হোক বা আয়াসলব্ধ হোক, সেই সাংগীতিক সংস্কার তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বকে শুধু আচ্ছন্ন করে রাখেনি, সর্বদা পরিচালিত করেছে। দীর্ঘ জীবনের সাধনার অধিকাংশ সময় তিনি নানা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করেছেন, কিন্তু সর্বাধিক আনন্দ পান তিনি গান রচনায়, একথাও তাঁর উদ্ধৃতি হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। সেকারণেই আমাদের মনে হয়েছে, তাঁর রচিত কাব্যই গানকে প্রভাবান্বিত করে নি, বরং তাঁর অজস্র সৃষ্টিকর্মের বহুবিচিত্র ধারায় তাঁর এই সাংগীতিক প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল, তাঁর জীবন কবির জীবন ত বটেই, হয়ত আরও বেশী সত্যভাষণ হবে একথা বললে যে তিনি সংগীতের অন্তর্লোকেই নিজের মুক্তি খুঁজেছেন যখন কাব্যরচনাও তাঁকে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারেনি। তিনি যখন গান রচনা করতে শুরু করলেন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে সুরসংযোজনা করতে থাকলেন তখন তিনি কোলকাতার বনেদি সমাজে রীতিমত সুগায়ক বলে পরিচিত। এই ঘটনাটি সামান্য নয়। অর্থাৎ যিনি নিজে গায়ক, তিনি যখন তাঁর নিজস্ব কাব্যরচনায় সুর আরোপ করেন তার মধ্যে একটি মস্ত বড় সত্যবস্তু থেকে যায়, তা ওপর থেকে আরোপিত নয়। তা অন্তরের নির্দেশে আপনা থেকে ঘটে, সে সময় রাগ-রাগিণীর বিচার হয় না, ব্যাকরণের শুদ্ধতা অনুযায়ী সুরমিশ্রণ ঘটে না। মন সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। এই মুক্ত মানসই সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহায়ক। এবং এই মুক্ত মানস সৌন্দর্যবোধকেই একমাত্র কষ্টিপাথর বলে জানে। ভারতীয় সঙ্গীত বা কাব্যসাধনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আর কে বেশী মুক্ত মানসের অধিকারী ছিলেন! তুলনা টানলে সংগীতের ক্ষেত্রে আমীর খুসরো বা গোয়ালিয়রের রাজা মান তোমর অথবা তাঁর সভাগায়ক তানসেন, পুত্র বিলাস খাঁ এ'দের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এ'রা সকলেই গায়ক ছিলেন এবং বিভিন্ন রাগ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজা মান ধ্রুপদ গানের প্রথম রচয়িতা বলে শোনা যায়। সুরের কাঠামো এবং স্বর সমাহারের যে পদ্ধতি থেকে একটি সম্পূর্ণ অবয়ব তৈরী হয় তা একমাত্র গায়কের পক্ষেই সঠিক ধারণা করা সম্ভব। এই প্রাথমিক ও মৌলিক অভিজ্ঞতার ফলে একজন গায়কের পক্ষে সুর-রচনায় যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ধারাবাহিকতায় ক্রমশ যে মৌলিক উপাদানগুলি ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে তার মূলে সম্ভবত এই সিদ্ধান্তই বেশী নির্ভরযোগ্য বলে আমাদের মনে হয়েছে। অন্য সুরের গ্রহণ বা বর্জন, কোথাও বা বিভিন্ন সুরের মিশ্রণ, কোথাও বা নানা গায়নরীতির একাত্মীকরণ এসকলই একজন শিল্পীর কাছে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও মৌলিক এক সৃষ্টিকর্মের পদ্ধতি অনুযায়ী এগিয়ে চলে। 'বাজে

করুণ সুরে' গানটিতে ভারতীয় রাগরাগিণীর ঈষৎ ছায়া আছে, দক্ষিণী গানের ঢং-এ তাতে সূক্ষ্মদানার গমকযুক্ত তান ব্যবহারের রীতি লক্ষ্যণীয়, তবুও তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টিকর্মের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। অথবা 'আমি কান পেতে রই' গানটিতে যতই কীর্তনাঙ্গ ঢং সোচ্চারে প্রকাশিত হোক না কেন, আমাদের কানে ঠিকই বাজে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুরণন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জিত হয়েছে এক দিনে নয়, যেভাবে দিনের পর দিন অভ্যাসে, চিন্তায়, পরিশ্রমে ভালোবাসায় রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে তার ঘনিষ্ট সহচর রূপে পেয়েছেন তাতে তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এক অনন্য সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব। এই সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রতিটি রচনায় নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছে—এমন কি বহু শত বর্ষ ধরে যেসকল রাগরাগিণী তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিরাজ করছিল সেই সকল সুর-কাঠামোকেও তিনি যখন ব্যবহার করেছেন তখনও নিজস্ব চিন্তার তত্ত্বের ও সৌন্দর্যানুভূতির আলোকে নতুন রূপ দান করেছেন। তিনি রাগসংগীতের অনুকরণ করেন নি, তিনি কত বিশুদ্ধ রাগসংগীত রচনা করতে পারেন একথা কোনদিনও তাঁর মনে আসেনি। বহুদিনের সংস্কারে যেসকল রাগরাগিণীর রূপ চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে এক প্রতীকী ভাবনা সৃষ্টি করেছিল সেগুলি নানা অলক্ষ্য মুহূর্তে ভাবঘন হয়ে তাঁর গানে বাঁধা পড়েছে। সেখানে রাগরাগিণীর মিশ্রণ যদি হয়ে থাকে ব্যাকরণের নিয়মে হয়নি। শিল্পীর নিজস্ব রূপচিন্তার স্বাভাবিক নিয়মে তা ঘটে গেছে। এই রূপচিন্তা তাঁর সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম স্তর এবং এই স্তরে তিনি উপস্থিত হয়েছেন নন্দনতত্ত্বের প্রধান রাজপথ ধরে। তিনি একবার বলেছিলেন অনেকটা এরকম যে সংগীত বা কাব্যসৃষ্টি দুয়ের থেকেই বড় সৌন্দর্যসৃষ্টি। এরই বিচারে সকল শিল্পের শেষ বোঝাপড়া হবে। রবীন্দ্রনাথের গানের বেলাতেও তাই, কথার মাধুর্য বা সুরের লালিত্য কোনটিই আলাদা করে বিচার্য নয়, সামগ্রিক যে সৌন্দর্য-সুষমা তাঁর রচিত গানগুলির থেকে ফুটে উঠছে সেই নিরিখেই তাঁর একমাত্র বিচার।

২

হার্বার্ট স্পেন্সরের একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে আমরা জানি। তার আগে তিনি সংগীত সম্বন্ধে, বিশেষ করে সুর-আরোপের বিষয়ে এবং সংগীতের উৎপত্তির কারণ হিসেবে যা ভাবতেন, নিজেই স্বীকার করেছেন, প্রাক্তন ধারণা তারপরে বদলে গিয়েছিল। সংগীত সম্পর্কিত বক্তৃতায় ও ভাষ্যে তিনি একাধিকবার সেকথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সুর জিনিসটা আমাদের কথা বলার টোন্-এর উচ্চতা নিম্নতা ইত্যাদি থেকেই পরিস্ফুট হয়েছে—এর একটা যেমন মনস্তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিক আছে তেমনি জৈব গঠনপ্রক্রিয়াও সে মেনে চলে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বহু গানের মধ্যে মাঝে মাঝে যখন তালছাড়া ভাবে কিছু কিছু গীত-শব্দকে ব্যবহার করেছেন, নাটকীয় ভাব তার মধ্যে সঞ্জাত করেছেন, ভাবগুলিকে সোজাসুজি শ্রোতার মনে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন সুরের সাহায্যে, তখন সম্ভবত স্পেন্সরের সংগীততত্ত্ব তাঁকে প্রভূত অনুপ্রাণিত করেছিল। গীতশব্দগুলির ভাব যথাযথ ফোটাবার জন্য মানুষের কণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে যেসব উচ্চনীচ সুরের পর্দায় ওঠানামা করে রবীন্দ্রনাথ তাই ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' গানটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়বার 'দূরে' শব্দটির ভাব ও ব্যঞ্জনা ফোটাবার জন্য এবং 'কোথায়' শব্দটির রহস্যময়তা প্রকাশে সুরটিকে বহুদূরে ছেড়ে

দিয়েছেন অথচ তৃতীয়বার 'দূরে' শব্দটিতে সুরপ্রয়োগের বেলায় আচমকা হ্রস্ব করে নাটকীয় গতি দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সুরযোজনায় সব সময়ই সংগীতের সামগ্রিক ব্যঞ্জনার পর, নান্দনিক প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন এবং গীতশব্দগুলির যথাযথ উচ্চারণের উপর সুরটিকে সহজভাবে বসিয়েছেন। যে কারণে কখনোই মনে হয় না এটি একটি বিশেষ সুর বা বিশেষ ঢং, অথবা তা মনে হলেও আরো একটি অপরূপ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য যেন তাতে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সুরপ্রয়োগের রীতিতে, গীতশব্দগুলির উচ্চারণ পদ্ধতিতে, ভাবপ্রকাশে নাটকীয়তা সঞ্জাত করে তিনি সমগ্রভাবে একটি গীতরূপ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতেন যা অবশেষে ঋজু সৌন্দর্যে মনোময় হয়ে উঠত। এবং এই মনোহারিত্ব নিঃসন্দেহে তাঁর গানটি সম্পর্কে সামগ্রিক রূপচিন্তার ফল। অন্যপক্ষে, শ্রোতার অনুভূতি ও সৌন্দর্য-চেতনাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হত। কেন না, শ্রোতার অন্তরে যে ভাবব্যঞ্জনা তাঁর নিজের অজান্তে গীতশব্দগুলির উচ্চারণে অস্ফুটে লুকিয়ে থাকত, যথাযথ শোনবার পর প্রকাশিত ব্যঞ্জনায় অনুরূপ 'ইমেজ' তার মনে তৈরী হত। তার মন তাৎক্ষণিক আনন্দে ও সমতুল্যতায় রসিয়ে উঠত। ইংরাজীতে যাকে বলা যেতে পারে complete identification বলা বাহুল্য, গান রচনার শিক্ষানবীশীর কালে এই আশ্চর্য জাদু তাঁর অনায়ত্ত ছিল। গীতশব্দগুলি গীতিময়তায় অনন্য হলেও সুর এসেছে তাঁর কাছে পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে। সেজন্য কানে শুনতে ভালো লাগলেও, মাধুর্যমণ্ডিত হলেও যৌবনের রচনায় এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ তখন সুগায়ক ছিলেন, ভালো গীতিকার ও সুরকারও ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের জন্ম তখনও হয়নি। তখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক চরিত্র ক্রমশ একটু একটু করে সবে গড়ে উঠতে সুরু করেছিল।

বর্তমান প্রবন্ধটির নামকরণে স্বর, সংগতি ও সুরবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পরপর ব্যবহৃত শব্দগুলি বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে কেন এই নামকরণের সার্থকতা এবং রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে এই পারম্পর্যের যাথার্থ্য কোথায়। স্পেন্সর সাহেবের যে তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনুপ্রাণিত হয়ে গানরচনায় নতুন মৌলিক রাস্তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন তার মূল বক্তব্যে বর্তমান লেখক পূর্ণ আস্থাবান। তিনি আরও মনে করেন যে উচ্চারিত শব্দগুলি, তা গানে হোক, দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক, বা নাটকীয় বাক্‌বিন্যাসে হোক, মানবের আন্তর ভাব-অনুযায়ী বিভিন্ন স্বরকে স্পর্শ করে চলবে। সুরের আরোহ অবরোহ গতি স্বাভাবিক ভাবে নানা অলঙ্করণে শোভিত হয়ে একটি সুসম সুরজগৎ তৈরী করে; ফলত, গীতশব্দগুলি ঋজু সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে একটি বিশিষ্টময়তায় উত্তীর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক রূপচিন্তার কাঠামো সম্ভবত এইভাবে পর্যায়গুলি অতিক্রম করে সার্থকতার দিকে এগিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে রাগরাগিণীগুলি আলাদাভাবে ততদিন চিহ্নিত হয়েছে যতদিন তাঁর শিক্ষানবীশীর কাল ছিল। সাংগীতিক চরিত্র গড়ে ওঠবার পর রবীন্দ্র-নাথ কোন সময়েই শুদ্ধ বা মিশ্র রাগ নিয়ে অথবা রাগমিশ্রণ নিয়ে কিম্বা তা থেকে স্বাধীনতা কতটা নিয়ে গানে সুর বসানো যায় ইত্যাদি চিন্তা করেন নি। সামগ্রিকভাবে যে রূপচিন্তা তার মধ্যে এসেছে তা একটি বিশিষ্ট স্থাপত্যের অবয়ব নিয়েই তার কাছে ধরা পড়েছে—সেখানে ইমন বেহাগ পূরবী নেই, অথবা নেই ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি বিশিষ্ট শৈলীর গান, অথবা নেই কীর্তন বাউল সারি গানের ঢং। আছে শুধু গান। এই সমগ্রতায় পৌঁছুতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তার নিজস্ব বিশিষ্টতার পথে এগুতে হয়েছে এবং তাতে পৌঁছুতে

গিয়ে যে সুর যে ছন্দ যে ঢং যে শৈলী তার আন্তর চেতনাকে স্পর্শ করেছে, তার পরিশীলিত নান্দনিক বোধকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছে তিনি তাকেই সরাসরি গ্রহণ করেছেন। সেজন্য তাঁর ব্যবহৃত রাগরাগিণী নিয়ে তাদের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার প্রশ্ন নিয়ে কূটতর্ক অবান্তর। এভাবে স্বর থেকে সংগতিতে পোঁছেছেন, সুরবৈচিত্র্যে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম ও সাহিত্যিকবিষয়ক বহু নিবন্ধে বারবার এমন উক্তি করেছেন যে প্রাণের চিহ্ন লীলাতে এবং লীলার স্ফুরণ বৈচিত্র্যে। এই বৈচিত্র্যধর্মিতা রবীন্দ্রজীবনদর্শনের মূলে। সুর নিয়ে, ছন্দ নিয়ে তিনি যে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার মূলেও বৈচিত্র্যের প্রতি তাঁর এই তীব্র আকর্ষণ।

৩

ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বর এবং ষড়্‌জ ও পঞ্চম বাদ দিয়ে বাকী পাঁচটি স্বরের বিকৃত স্বরগুলি নিয়ে বারোটি স্বর মনুষ্যকণ্ঠে কথা বলবার সময় বব্যহৃত হয়, কখনো একই স্বরে দাঁড়িয়ে, কখনো দু-তিনটি স্বরে ওঠানামা করে'। যে মুহূর্তে স্বর থেকে স্বরান্তরে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়, তখনই বুঝতে হবে মানবের স্থৈর্যে কোথাও ভাবান্তর ঘটেছে। সেই ভাবান্তরের প্রকাশ হিসেবে আপনাথেকেই কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় বিভিন্ন স্বরের সমাহারসূচক অথবা এক স্বর থেকে বিলম্বিত অথবা দ্রুত লয়ে অন্য স্বরে অনুবর্তন। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই একদিকে যেমন নাটকে অভিনেতার কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় তেমনি সংগীতেও, মাধুর্যরসের সঙ্গে মিলিত হলে, অনুরূপ স্বরসমষ্টি সাংগীতিক তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং স্বরসমষ্টি যদি একটি বিশেষ প্যাটার্ন ধরে শুরু করে' ছন্দোবদ্ধভাবে নির্ধারিত নিয়মে অগ্রসর হয় তবে ক্রমশ সংগীতের রসসৃষ্টি শ্রোতার মনে সঞ্জাত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য তাকে রাগসংগীতের বিধিনিয়মের থেকে এবং অবশেষে ব্যঞ্জনাসৃষ্টি থেকে পৃথক করেছে তা হলো স্বর থেকে স্বরান্তরে যাবার কৌশল। ধ্রুপদগানে স্বর থেকে স্বরান্তর-এর সময় মীড় আশ গমক ইত্যাদি অলঙ্কার বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। তাতে ধ্রুপদের একদিকে শান্তরস এবং অন্যদিকে গাম্ভীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খেয়াল অঙ্গের গানে তান যুক্ত বিস্তার এবং মীড় সহযোগে স্বর থেকে স্বরান্তরের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ধ্রুপদের অলঙ্করণ অবশ্যই খেয়ালে প্রযুক্ত হয়েছে, তবে আরও নতুন অলঙ্করণও ব্যবহার করা হয়েছে। এক একটি স্বরে বারবার ধাক্কা দিয়ে ঝট্‌কার পদ্ধতি বা চক্রাকার তান এবং সঙ্গে গীতশব্দ জুড়ে দিয়ে বোলতান এর আশ্রয় গ্রহণ করা, শব্দগুলিকে নানা ছন্দে ভেঙ্গে, শব্দের অক্ষর-গুলিকেও কখনো কখনো টুকরো টুকরো করে নানা ছন্দে বিস্তার করে খেয়াল গান ক্রমশঃ স্থায়ী থেকে অন্তরার দিকে এগিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের স্বর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাক, স্বর থেকে স্বরান্তরের কৌশল কোথায় পার্থক্য সূচিত করেছে বুঝতে পারলে তাঁর সংগীতের বৈশিষ্ট্যটুকুও ধরা যাবে, অনুভব করা যাবে, হয়ত পুরো ইমন বা বেহাগে সুর আরোপিত হলেও কেন গানটি শুনলে প্রথমেই রবীন্দ্রসংগীত মনে হয়, ইমন বা বেহাগ মনে পড়ে না। একথা সর্বজনগ্রাহ্য যে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গানের শৈলী দ্বারাই অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন, উচ্চ ঘরাণার খেয়াল গান বেশী হয়ত শোনেন নি, শুনলেও খেয়ালের গায়নভঙ্গিমা তাঁকে অনুরূপ আকৃষ্ট করেনি। ধ্রুপদ গানের চালের মধ্যে লয়ের বঙ্কিম-

গতি বিশেষ করে ধামার তালে যা পরিস্ফুট রবীন্দ্রনাথ তা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা করেননি, যদিও তাঁর রচিত ধামার-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, 'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে'—রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় গান বলে জানা যায়। কিন্তু ধামারের অনুরূপ বঙ্কিমগতি সচরাচর ব্যবহার না করলেও ছন্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একঘেয়েমি আনতে দেননি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহু গানে তিনি দুটি ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' কাহারবা এবং ষষ্ঠীতালে বাঁধা আছে। 'যেতে যেতে একলা পথে' ঝম্পক ও দাদরা 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ' একতাল ও চৌতালে ইত্যাদি। এ ছাড়া তালফেরতা আছে 'আনন্দধ্বনি জাগাও' চৌতাল ও তেওড়া ইত্যাদি। আছে বিধিবন্ধ ছন্দে গাঁথা আবার সেই গানের অন্তরার অংশে প্রায় গদ্যছন্দে আবৃত্তি করে যাওয়া।

ধ্রুপদের ব্যবহৃত সব তালই তিনি নিপুণভাবে গ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে চৌতাল বা তেওড়া। তেওড়ার ঝোঁক 'এ যে দোলা লাগে' তা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মেজাজের অনুকূল, কেননা অজস্র ভালো ভালো গান তিনি তেওড়ার ছন্দে বেঁধেছেন। ধ্রুপদের গানে ছন্দের কৌশল সুরের কাঠামোর চেয়ে কম জরুরী নয়। অন্যপক্ষে বলা যায় ধামার তিনি বেশী ব্যবহার না করলেও তেওড়ার ছন্দের প্রতি তাঁর অসীম মমত্ব। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তেওড়ার মৌলিক ছন্দ ও পর্ববিভাগ ধামার তাল থেকেই এসেছে যেমন—

ধামার :	ক ধে টে ধে টে	ধা ০	গ দি নে	দি নে তা ০
মাত্রা সংখ্যা :	৫	২	৩	৪
পর্বভাগ	=৩+২	২	৩	২+২

তেওড়া :	ধা দেন তা	তেটে কতা	গদি ঘেনে	ধা দেন তা	তেটে কতা গদি ঘেনে
পর্বভাগ	৩	২	২	৩	২　　২

অর্থাৎ প্রথম পাঁচ মাত্রাকে ৩+২ ও শেষ চার মাত্রাকে ২+২ এই পর্ববিভাগে ভাঙলেই আপনাথেকেই তেওড়ার ছন্দ এসে যায়। তবে প্রভেদ কোথায়! প্রভেদ এই যে ক ধে টে ধে টে র পর আকস্মিক দুমাত্রা এসে যাওয়ায় পাঁচমাত্রার পর ষষ্ঠমাত্রাতে, ধামার গাইবার সময়, একটি স্বাভাবিক ঝোঁক আসে এবং সেই ঝোঁকই আবার পর পর তিন এবং চার মাত্রার স্বাভাবিক গতিতে রূপান্তরিত হয়। ধামার তালের এই বঙ্কিমগতিই এর মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের কারণ। তেওড়ার ছন্দে এই বঙ্কিম গতিকেই নেওয়া হয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রিত ছন্দে। রবীন্দ্রনাথ এই পর্ববিভাগে যেন অন্তর্নিহিত ছন্দের দোলা লক্ষ্য করেছিলেন। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে' গানটি তেওড়ার ছন্দে একটি আদর্শ উদাহরণ। ছন্দের সঙ্গে সুরের বিকাশের একটি নিকট সম্পর্ক থাকায় ছন্দের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবে এসে যায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো কালের ধ্রুপদ বা ধামার গানে লয়ের মারামারি বা সম-এ এসে প্রচন্ড দাপটে গান থামানোর রীতিতে, বলাই বাহুল্য, সুরের মেজাজ বিনষ্ট হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে ছন্দের আন্দোলিত রূপকে সুরের অনুগামী করেছেন, কোথাও ছন্দকে উচ্চকণ্ঠ হতে দেননি একমাত্র নৃত্যের প্রয়োজন ছাড়া। 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' গানটি ষষ্ঠী তালে শুনলে স্বর ও সংগতিতে আশ্চর্য নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়, গানটি যখন নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হল তখনই তিনি কাহারবা তালে রূপ দেবার কথা ভেবেছেন। ধ্রুপদাভিত্তিক গানগুলির সুররচনায় তিনি স্বরগুলির স্বাধীনতার পর

বেশী জোর দিয়েছেন, যেমন 'তাহারি আরতি করে চন্দ্রতপন' গানটি। এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্রতিটি অক্ষরই একটি বিশিষ্ট স্বরে দাঁড়িয়ে আছে। স্বর থেকে স্বরান্তরে গিয়েছে এমন একটি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যে সুররীতিতে আপনাথেকেই একটি গাম্ভীর্যময় চরিত্র ফুটে উঠেছে। গানটি চৌতালে বাঁধা অর্থাৎ ১২ মাত্রার দ্বিমাত্রিক পর্ববিভাগে রচিত। রাগ বলে চিহ্নিত আছে বড়হংসসারঙ্গ। মূল একটি হিন্দিগান ভেঙে করার ফলে সুর-আরোপনে সুরকারের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে তা স্বরলিপি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়; এবং যেকথা পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ-রচিত ও সুর আরোপিত হলেও এই গান রবীন্দ্র-সংগীতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিওেয় চিহ্নিত হতে পারেনি। 'বাণী তব ধায়' গানটিতেও একই বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। অর্থাৎ ধ্রুপদ-ভিত্তিক গানে সুর আরোপনের সময় স্বর ও সংগতির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন যথাযথভাবে কিন্তু যে সুরবৈচিত্র্যের ফলে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে স্বাধীন সুরকার হিসেবে মর্যাদা পেয়েছেন, নানাদিক থেকে সুর লয় ভাব প্রভৃতিকে একমুখী সম্পূর্ণতায় নিয়ে গিয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনায় গানগুলিকে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন, ইংরেজীতে integration বললে যার অর্থ হয়ত আরো পরিষ্কার হয়, তা তখনও তাঁর অনায়ত্ত ছিল, অর্থাৎ সংগীতে রূপচিন্তা বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশ তখনও পাকা হয়নি, সুরের ঋজু ও স্থাপত্য-সৌন্দর্য বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি। পরবর্তী পর্যায়ে যখন তিনি খেয়াল এবং টপ্পা অঙ্গের গানের দিকে মনোযোগ দিলেন তখন সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক কাজ তিনি করতে পেরেছেন ছন্দকে পর্ববিভাগের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই রূপচিন্তা প্রসঙ্গে বলেছেন, পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাচার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য, তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশ রূপের বাহন। অর্থাৎ গীতশব্দগুলি যে রূপের বাহন তাই নয়, তাকে সুরের মহিমায় উত্তীর্ণ করেছেন তাও রূপ দেবার জন্য। তাই রূপ থেকে রূপে তাঁর গানগুলি বিচরণ করছে এবং যেখানে যেখানে তিনি অসামান্য সার্থকতা লাভ করেছেন সেখানে কতগুলি বৈশিষ্ট্য তিনি উদ্ভাবন করেছেন। উপরে উল্লিখিত ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্ত দৃষ্টি এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গানকে রক্ষা করার জন্য স্বরলিপির ব্যবহারিক প্রয়োজনে সব গানগুলিকেই হয়ত পর্ব-বিভাগে বাঁধা হয়েছে কিন্তু তাদের গীতরূপগুলি পর্ববিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'মরি লো মরি আমার বাঁশীতে ডেকেছে কে', 'দুঃখরাতে হে নাথ কে ডাকিলে', প্রভৃতি গান-গুলিতে স্বরবিস্তারে এমন একটি স্বাভাবিক স্বাধীনতা আছে এবং যে স্বাধীনতা গানগুলিকে সুরের দিক থেকে আশ্চর্য সংগতি দান করেছে যে পর্ববিভাগে ভাঙলে সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় বলে আমার ধারণা। প্রথম গানটি ত্রিমাত্রিক ছন্দে এবং দ্বিতীয় গানটি দুই। তিন অর্থাৎ ঝাঁপতালে বাঁধা সত্ত্বেও এদের সুরের কাঠামো ও আবেদনে এটা ঢালা মেজাজের আভাষ পাওয়া যায়। অতি বিলম্বিত লয়ের মধ্যমান তালে বাঁধা 'এ পরবাসে রবে কে হায়' 'অথবা হৃদয়বাসনা পূর্ণ হলো' ইত্যাদি গানের বেলাতেও সেই কথার পুনরুক্তি প্রয়োজন। এইসব গানে সুরের লীলাবৈচিত্র্য এমনই শ্বাসরোধকারী যে লয় এবং গতি তার একান্তই অনুবর্তী। দুটির চালে প্রাচীন বাংলা গানের পুরোপুরি ঢং বর্তেছে বলে মনে হয় যদিও 'এ পরবাসে' গানের ব্যবহৃত টপ্পার দানাগুলি পশ্চিমী ঢং অনুকরণ করেছে। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনতর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সূক্ষ্ম দানার টপ্পা রবীন্দ্রসংগীতের মেজাজের কাছাকাছি—'সুরের চিকণতা'র প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, অন্যপক্ষে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে 'শোরী মিঞা রচিত (মতান্তরে, শোরী হচ্ছে গোলাম নবী নামক ব্যক্তির

স্ত্রীর নাম। তিনি স্ত্রীর নামেই টপ্পার প্রচলন করেন বলে কথিত আছে, সুতরাং শোরীর টপ্পা বলাই বাঞ্ছনীয়, শোরী মিঞা না বলে) মূল তিনখানি গানের বাংলা রূপান্তর 'কে বসিলে আজি', 'হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল' 'বন্ধু রহো রহো সাথে'। কিন্তু শোরী মিঞা 'কৃত গানের এত গিট্‌কারী বা মুরকীযুক্ত বিস্তার...এগুলি নয়'। এই দুটি অভিমতই ভেবে দেখবার মত এবং কিছু কিছু সত্য, দুটি মত পরস্পরবিরোধী হলেও, এদের মধ্যে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যেমন তিনি সুরের চিকণতার কথা ভেবেছেন তেমনি অযথা গিট্‌কারী বা মুরকীযুক্ত সুরবিস্তার পছন্দ করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে যে রেকর্ড শোনবার সুযোগ হয়েছে আমাদের তা এমন সাক্ষ্য দেবে যে (অন্ধজনে দেহো আলো) সুরের চিকণতাকে তিনি যদিও যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন, তথাপি মোটা দানার তানযুক্ত বিস্তারের ও প্রাচীন বাংলা টপ্পার অসাধারণ অনুরাগী ছিলেন তিনি। 'অন্ধজনে দেহো আলো', এখানে 'লো'র পরে এবং 'মৃতজনে' শব্দটিতে 'নে'র পরে সুরভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যাক।

-মা গমা -পদা -ষপা | জ্ঞা -া -া -া -ঋ২ -সা -সঋা -জ্ঞমা

০ লো০ ০ ০ ০ | নে -০ ০ ০ -০ -০ -০ ০ ০ ০

রবীন্দ্রনাথ নিজের কণ্ঠস্বরের চিকণতার সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত থাকলেও এই গানটিতে স্বরক্ষেপণের সময় মোটেই চিকণ অথবা হাল্কা দানাযুক্ত টপ্পা বা তানের কাজ করেননি। 'তারে তুমি ডাকো ডাকো' এখানে প্রথম 'ডাকো' শব্দটিতে 'ডা' এবং 'কো' শব্দদুটির মধ্যে স্বরক্ষেপণ লক্ষ্য করুন। এখানে যে আবেগ ও স্বরের ওপর প্রচণ্ড ঝোঁক দেওয়া হয়েছে তাতে পশ্চিমী টপ্পার কারুকার্য চিহ্নিত নয়, বরং প্রাচীন বাংলা গানের ভাবাবেগমণ্ডিত স্বরক্ষেপণই কানে বাজতে থাকে।

ধ্রুপদের ছক থেকে ক্রমমুক্তি লাভ করে তিনি যদিও পুরোপুরি খেয়ালভঙ্গিম আশ্রয় করেননি, কিন্তু সুরের যে ঢালা বিস্তারে তাঁর রচিত গানগুলিকে অনুপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন তা একদিকে খেয়ালের স্বরবিস্তারের স্বাধীনতা ও অন্যদিকে কীর্তনের আখর-যুক্ত ভাব-অনুসৃতি রূপ লাভ করেছে। প্রত্যেকটি গানে সুররচনায় বিশেষ একটি প্যাটার্ণ তৈরী হয়েছে—যখন সে কথার ঐশ্বর্যকে ছাড়িয়ে অন্যতর ব্যঞ্জনায় প্রকাশময়। এখানে রাগসংগীতের ঐশ্বর্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের ঐশ্বর্য তুলনীয়। সুরের দিক থেকে যে ভাবসৃষ্টি তা অনেক গানে প্রথম থেকে শেষ অবধি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সুরের আরোহ গতি অবরোহ গতি ও সঞ্চারী গতিতেও বিশিষ্ট ক্রমপরম্পরা লক্ষণীয়। কীর্তনের আখরকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রেক্ষিতে কথার তান বললে অসত্যভাষণ হয় না এবং বহু গানে রবীন্দ্রনাথ অতি সুললিতভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন; 'মরি লো মরি আমায়' গানটি এর অতি সুন্দর উদাহরণ, একই সঙ্গে কীর্তনের ঢং ও খেয়ালের স্বাধীন সুরবিস্তার এক হয়ে মিশেছে, ছন্দে পর্ববিভাগ গায়কীতে সব সময় মানা হয়নি, শব্দগুলিকে কোথাও সুরের দিক হ্রস্ব করে আকস্মিকতায় ভরে দেওয়া হয়েছে, শব্দের অক্ষরগুলিকে খেয়ালের মত বোলতানযুক্ত বিস্তার করা হয়নি, শব্দের শেষের স্বরবর্ণের সঙ্গেই তান বা অন্য অলঙ্কার প্রযুক্ত করা হয়েছে। তাতে শব্দের ভাবার্থ যেমন একদিকে অক্ষুণ্ণ থেকেছে অপরদিকে সুরগুলি স্বাধীনভাবে অনায়াস গতি লাভ করেছে। মরি লো মরি শব্দগুলিতে ম, রি, লো, ম প্রত্যেকটি অক্ষরে এক একটি স্বতন্ত্র সুর যোজনা করা হয়েছে সা, নি, ধা, পা। তার পর পঞ্চম অক্ষর 'রি' তে অলঙ্কার যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এখানে ধ্রুপদ রীতি ও খেয়ালরীতির মিশ্রণ ঘটেছে। সুর আরোপনের এই সামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন

তাঁর অজস্র সংগীতে। এই রীতির সংগীতরচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগলো জোয়ার দুখের পারাবারে', এখানে সুরের প্রয়োজনে আরো একটি অলঙ্কার যুক্ত হয়েছে—টপ্পার দানা। এই গানে অবশ্য টপ্পার সূক্ষ্ম দানা ব্যবহার করা হয়েছে। সুরগুলি কোথাও গড়িয়ে কোথাও টানা মীড় ব্যবহারে কোথাও সঞ্চারী বিস্তারের গতিময়তায় অপরূপ লাবণ্য যুক্ত হয়েছে। এই সঙ্গে একটি বিষয় বিচার্য, যে-গানগুলিতে মূলত টপ্পা প্রধান অলঙ্কার যুক্ত সেখানে তানের ব্যবহার খুব সীমিত আবার যেখানে তান প্রধান সেখানে টপ্পার দানাযুক্ত স্বরপ্রয়োগে বাহুল্য নেই। ব্যতিক্রম নেই তা নয় 'এ পরবাসে রবে কে' গানটি অবশ্য লক্ষণীয় যেখানে মূলত টপ্পাপ্রধান অলঙ্কারযুক্ত হয়েও অজস্র তানও পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। 'এ' অক্ষরটির সঙ্গে তান যুক্ত হয়েছে আবার 'পরবাসে' শব্দটির 'বা' র সঙ্গে টপ্পার দানা ব্যবহার করা হয়েছে। এবং 'হায়' শব্দটিতে একই সঙ্গে টপ্পা ও তান যুক্ত হয়েছে। এ গানটির আবেদন আমার কাছে পূর্বে উল্লিখিত গানদুটির তুলনায় বেশী নয়, তবে রবীন্দ্রনাথ একসময় কী পরিমান নিষ্ঠার সঙ্গে স্বরসংগতি ও বৈচিত্র্যের পরীক্ষা করেছিলেন তা এর সুর আরোপনে বোঝা যায়। ঠুংরী চালের গান রবীন্দ্রনাথকে খুব বেশী প্রভাবান্বিত করেছে বলে জানা যায়না। 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' গানটি ঠুংরী চালের বলে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু যে অর্থে অতুলপ্রসাদের গান ঠুংরী চালের অনুপম উদাহরণ সে-অর্থে এ গানটি ঠুংরীপদবাচ্য নয়। ঠুংরী চালের গানে রাগের যে লঘু লীলায়িত প্রকাশ, গীতশব্দগুলির প্রতিটি অক্ষরে যে ছোট ছোট মুরকী, হালকা তানের প্রক্ষিপ্ত অনুরণন তা রবীন্দ্রসংগীতে নেই। রাগসংগীতের চারিটি বিভাগে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে যে দুটি বিভাগ অর্থাৎ ধ্রুপদ ও টপ্পা, রবীন্দ্রনাথ তাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই বাংলাদেশে ঊনিশ শতকের শেষের দিকে খেয়াল গানের সবিশেষ চর্চা ছিল না এবং ঠুংরী গানের চর্চা শুরু হয় বিশ শতকের গোড়ায় যখন রবীন্দ্রনাথের সংগীতচেতনা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ বাল্যকাল ও কৈশোরে যেসময় মানবমনের সৃষ্টিশীল গঠন ও (ফরমেটিভ্) বিকাশের যুগ তখনি তিনি বাংলাদেশে তৎকালে প্রচলিত ধ্রুপদ ও টপ্পার সঙ্গেই নিজের একাত্মতা অনুভব করেছেন। রাগসংগীতের ক্ষেত্রেও তিনি সহজে অনুপ্রাণিত হয়েছেন দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে।

৪

দেশজ ও লৌকিক গানের মধ্যে একদিকে পড়ে কীর্তন ও রামপ্রসাদী, অন্যদিকে বাউল ভাটিয়ালি সারি ইত্যাদি। কীর্তন ও রামপ্রসাদী গানের ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথকে কী পরিমাণ প্রভাবান্বিত করেছিল তা অজানা নয়, এমনকি রামপ্রসাদী গান সম্বন্ধে তাঁর এমন মন্তব্যও আছে, 'ভাগ্যে গানের সুর ভুলিয়া যাই, নইলে তো সমস্ত গানেরই রামপ্রসাদী সুর বাহির হইত।' কিন্তু যা আমাদের বিস্মিত করে তা হচ্ছে কীর্তন বা রামপ্রসাদী ঢং দুইকেই আত্মস্থ করে' তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গান বাঁধতে পেরেছিলেন। পূর্বেই বলেছি যে খেয়ালাঙ্গ সুরবিস্তারের কাঠামোতে কীর্তনের ঢং মিশিয়েছেন যেমন পরবর্তীকালে শচীন-দেববর্মনের কণ্ঠে গীত কিছু কিছু গানে আমরা রাগসংগীতের সঙ্গে খাঁটি লৌকিক ঢং-এর মিশ্রণ শুনেছি। খেয়াল ও কীর্তন যে এক হয়ে মিশতে পারে, স্বরবিস্তারে সংগতি আনা

সম্ভব এবং সর্বোপরি, তাতে যে একটি ভিন্ন আস্বাদন লাভ করা যায়, সুরবৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথই তার সার্থক পরীক্ষা করলেন। বাউল গানেরও পুরোপুরি দেশজ ঢং তিনি নেননি, তার মার্জিত রূপেই তিনি প্রকাশ করেছেন, 'নিশিদিন ভরসা রাখিস্' প্রভৃতি গান শুনলেই একথা বোঝা যাবে। সমস্ত দেশজ বা লৌকিক সংগীতের মধ্যে একটা অসংস্কৃত ভাব বজায় থাকে, এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই অসংস্কৃত রূপকে হুবহু কোথাও গ্রহণ করেন নি। তাঁর নিজস্ব রুচি ও সৌন্দর্যবোধকে যা পীড়া দেয় তা তিনি কখনোই স্বীকার করেন নি। বাউল গানে তারাগ্রামে উচ্চকিত কণ্ঠস্বরকে তিনি সব সময় প্রাধান্য দেন নি, কণ্ঠে যে ট্রেমেলো গায়করা প্রকাশ করেন, অতি নাটকীয়তায় মাঝে মাঝে শ্রোতাদের বিস্মিত করতে চান রবীন্দ্রনাথ তাও বর্জন করেছেন, কিন্তু যেখানে তার আধ্যাত্মিক রূপ সুরের মধ্যে অতল গাম্ভীর্য খুঁজেছে সেখানেই তিনি তাদের কাছে হাত পেতেছেন। ইদানীং কিছু কিছু রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট গায়কদের কণ্ঠে তার বাউল ঢং-এর গান শুনে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি বোধহয় তাদের গানের সুরের কাঠামো হুবহু নকল করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর প্রয়োগের বিস্তৃত ইতিহাস বিচার করে দেখলে জানা যাবে যে এটা তার সম্পূর্ণই অনভিপ্রেত ছিল। বাউল হোক বা কীর্তন হোক, ধ্রুপদ বা টপ্পা হোক কোন ঢং বা রীতিকেই তিনি হুবহু নকল করেন নি। নিজস্ব সংগীততত্ত্বের আলোকে তাকে পরিশীলিত করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এখানে। তিনি পরিশীলন ও পরিবেশন রীতিতে সর্বত্রই নিজস্ব অননুকরণীয় চিহ্ন রেখে গিয়েছেন। বাউল গানকে বাউল রাখেননি, তাকেও টেনে এনে রবীন্দ্রসংগীতে পরিণত করেছেন যেমন করেছেন খেয়াল-অঙ্গ গানগুলিতে। এবং চালের দিক থেকে একথা যেমন সত্য, রাগ এবং রাগমিশ্রণ পদ্ধতিতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। রাগ-প্রকাশের জন্য গান রচনা নয়, গানের জন্য রাগ অথবা কোন সুরকে ব্যবহার করাই ছিল তাঁর সুর আরোপের উদ্দেশ্য। স্বরলিপিগুলিতে দেখা যায় শুদ্ধ রাগ-এর উল্লেখ খুবই সামান্য, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মিশ্র রাগের পরিচিত। তার কারণও এখানেই যে ভৈরবী সুর দিতে দিতে বা কাফি সুরে আরম্ভ করে তাঁর মন ভাবলোকের অনুবর্তী হয়েছে তখন তিনি রাগের বন্ধন থেকে মুক্তি খুঁজে এমন এমন সুর তাতে মিশ্রণ করেছেন যা শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু তাঁর নান্দনিক চেতনাকে যা সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। সর্বত্রই তাই দেখি তার স্বকীয় প্রতিভা কার্যকরী হয়েছে—তাঁরই কথা, তাঁরই ঢং, তারই সুর, তাঁরই সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে, সব মিলিয়ে সে গান কোন বিশেষ চালের নয়, কোন বিশেষ রাগের লক্ষণাক্রান্ত নয়, সে কেবল রবীন্দ্রসংগীত, কেবলই গান, অজস্র বিচিত্র সৌন্দর্যের লীলাভূমি। 'কখন দিলে পরায়ে' গানটি এপ্রসঙ্গে বিচার করলে দেখা যাবে বিশেষ কোন ঢং বিশেষ কোন রাগ বিশেষ কোন রীতিতে ফেলা যায় না (পিলুবারোয়া উল্লিখিত আছে) অথচ এক অনাস্বাদিত রূপ রস বর্ণ সমস্ত গানটির সুরবিস্তারে ঘুরেফিরে লাবণ্য সঞ্জাত করেছে। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরপ্রয়োগ তার সংগতি এবং পরিশেষ বৈচিত্র্যের এই-ই প্রকৃত নিরিখ।

৫

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনায় ও সংগীতরচনার যুগ্মধারায় বরাবর একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন

করেছিলেন। যখন তাঁর মন সুরের জগতে বিচরণ করত তখন তিনি কাব্যচর্চা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতেন। সুরের জগতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মগত অবস্থায় থাকতেন যতদিন না তাঁর সুরের ভাণ্ডার সাময়িকভাবে নিঃশেষিত হোত। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রধর্মী প্রতিভার এ একটি আশ্চর্য স্বাক্ষর। অন্যান্য রচনার সময় একই সঙ্গে তাকে নানাবিধ কাজ করতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু সঙ্গীতরচনার সময় তিনি সম্পূর্ণ নিজের জগতে আশ্রয় নিতেন: সেসময় কাব্যচর্চা স্থগিত থাকতো, অন্যান্য জাগতিক ক্রিয়াকর্মে মনঃসংযোগ করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় সেসময় বাইরের কোন তাগিদই তাকে বিচলিত করতে পারেনি। সংগীতকে রবীন্দ্রনাথ সাধনার অত্যুচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখান থেকে দিবানিশি তিনি ব্রহ্মাস্বাদ লাভ করতে পারতেন। নিজের সঙ্গে নিজের এক নিবিড় তন্ময়তায় বিভোর থাকতেন। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে একাধিকবার এমন প্রসঙ্গ শুনেছি যে কোন সুর তাঁর কাছে এসে গেলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, যতক্ষণ না যোগ্য কোন শিষ্যকে তা শেখাতে পারতেন, তার মন শান্ত হতে জানত না, অসুস্থতার কথা ভাবতেন না, ঝড়বাদল গ্রাহ্য করতেন না, বোলপুরের প্রচণ্ড উত্তাপ মাথায় করে দিনেন্দ্রনাথকে ডাকাডাকি করতেন। এই সামান্য কাহিনী থেকেই জানা যাবে, সুররচনা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কী আত্মশুদ্ধির বিষয় ছিল। সুরের আবর্তেই তিনি অবগাহন করতেন সব সময়, তা বাইরে থেকে আরোপিত হত না। সুরবিস্তারের সময় গীতশব্দের ভাবরূপকে যথাযথ মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছেন। শব্দের অর্থ ও তার ব্যঞ্জনা যেমন কাব্যে প্রকাশ পায় তেমনি কাব্যের ব্যঞ্জনার পরও সুরের নিজস্ব ব্যঞ্জনাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। দূরে কাছে, উচ্চতা নীচতা, দুঃখ সুখ, শান্তি উত্তেজনা, বিরহ মিলন, অতীতের প্রতি আকর্ষণ, আত্মমগ্নতা, এবম্বিধ নানা ভাবরূপকে সব সময় বিভিন্ন সুরের প্রক্ষেপণ দ্বারা ধরবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ স্বরগুলি যখন পরস্পর সমাহার দ্বারা সুরের আবর্ত তৈরী করছে তখন সব সময় লক্ষ্য রেখেছেন সেই আবর্ত থেকে নানাবিধ ভাবরূপ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। 'আঁধারে একেলা ঘরে' গানটিতে 'মন মানে না', এক্ষেত্রে 'না' অক্ষরটির সুরযোজনা লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। প্রথমবার নীচু পর্যায়, প্রায় স্বগতোক্তির মত, দ্বিতীয়বার চড়া সুরে, যেন বিশ্বজনকে আমার মনের কথা জানাতে চাই। 'সজল সমীরে' এখানে সুরের যে দোলা ও মীড় তা মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় আবার 'ঝর ঝর নীরে'—ওই জায়গাটিতে ধীরে ধীরে সুরটি আস্তে উঠেছে—সমস্ত ভাবরূপটি শ্রোতার কাছে সহজেই পেঁৗছে যায়। 'পথ জানে না'—এখানে আবেগমিশ্রিত সুর, কোমল গান্ধার-এর ব্যবহারে সমস্ত বিষণ্ণতাটি ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে কোন শব্দের অক্ষর একটি বিশেষ সুরে অতর্কিতে দাঁড়িয়ে নাট্যরসসঞ্জাত করা, পাশাপাশি এক সুর থেকে অন্য সুরে মীড় দিয়ে সহজে গড়িয়ে যাওয়া, মা পা অথবা নি সা, সমস্ত মিলিয়ে স্বরপ্রয়োগের একটি অখণ্ড সংগতি লক্ষ্য করা যায়। 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানটিতে স্বরপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সকালবেলার সন্ধিপ্রকাশ রাগের মাধুর্য, কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবতের ধীর আন্দোলিত ব্যবহার, দাক্ষিণী ঢং-এর গমকযুক্ত তান প্রয়োগ, অথচ সুরের অনায়াস পদসঞ্চার, কোথাও স্বরগুলির আচমকা ওঠানামা সম্পদা, 'পূর্ণ হিয়া' এই জায়গাটিতে ছোট তানযুক্ত ক্ষিপ্রগতি বিস্তার সব মিলিয়ে গীতশব্দগুলির ভাবরূপের একটি অখণ্ড ব্যঞ্জনাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। একই রাগে কোমল গা শুদ্ধ না-র ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথও করেছেন 'কোথা যে উধাও হোল' গানটিতে, মিঞা কি মল্লার রাগের এটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোমল ঋ ও শুদ্ধ রা-র পাশাপাশি ব্যবহার

রাগসংগীতে সম্ভবত নেই। 'কালমৃগয়া'র 'সকলি ফুরালো স্বপন প্রায়' গানটিতে স্বরলিপি লক্ষণীয় :

ম	গা	ঋা	ঋা	-ঋা	-া
গা	হে	না	গা	o	ন্

এ ধরনের আশ্চর্য পরীক্ষা সুর নিয়ে তিনি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের সুরের এ্যাবস্ট্রাকশন কল্পনা করে সুরের ওপর গীতশব্দ বসিয়েছেন। পরবর্তী কালে গীত-শব্দগুলির অন্তর্নিহিত ভাবরূপকে প্রাধান্য দিয়ে নিজস্ব সুরের ভাবরূপের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন—abstract থেকে concrete-এ পেঁাছাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের কথা বলার মধ্যে ভাব-অনুযায়ী স্বরের যে স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে—যেমন কাউকে ডাকতে হলে চড়া পর্দায় ডাকি, প্রিয়তমের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের জন্য কোমল পর্দায় বলি ইত্যাদির ব্যঞ্জনার সঙ্গে সংগীতের আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ স্বর আ ঈ এ কার ইত্যাদির প্রলম্বিত আবৃত্তির অনুকারকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। 'কি' এবং 'কী' ক্ষেত্রবিশেষে স্বরের প্রক্ষেপণে পার্থক্য সূচিত করেছেন। হসন্ত শব্দ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন, ং অথবা ঙ অথবা ঙ্গ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যসূচক উচ্চারণ সম্পর্কে তীব্রভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। গীতশব্দ সম্পর্কে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি সুর ব্যবহারেও অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। সাত স্বর এবং বারো শ্রুতির দ্বারা মোটামুটিভাবে নিবন্ধ গায়ন-পদ্ধতি থেকেও তিনি এগিয়ে গিয়েছেন, অতিকোমল শ্রুতি ব্যবহার করেছেন বহু ক্ষেত্রে। সম্প্রতিকালে প্রকাশিত স্বরলিপিগুলি পর্যালোচনা করলেই এবিষয় পরিস্ফুট হবে। ঋষভ গান্ধার, বা ধৈবত নিষাদের প্রচলিত কোমল শ্রুতি ছাড়াও—হারমনিয়মে যা পাওয়া যায়—৩ ২ : ৩ ২ শ্রুতিগুলির পূর্ণ মর্যাদায় ব্যবহার করা হয়েছে বহু সময়। উদ্ধৃত অন্ধজনে দেহো আলো গানটির স্বর লক্ষণীয়।

উচ্চারণের স্বাভাবিক ঝোঁক অনুযায়ী যে চলমান ছন্দ সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে বেশীর ভাগ সময়ে সেই ছন্দেই গান বেঁধেছেন, কাব্যছন্দ ও গীতছন্দে একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করেছেন। তাতে সুবিধে হয়েছে এই গীতশব্দের ভাবরূপ কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। ছন্দ জিনিসটা, রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে, ভেতরকার অন্তঃসলিলা গতির মত প্রবাহিত হয়েছে, কোথাও কখনো মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে ওঠেনি। একই গানে কোথাও ছন্দ ছাড়া, কোথাও আবার অতিরিক্ত মাত্রা সচেতন যেমন 'প্রখর তপন তাপে' গানটিতে। সমস্ত পরিবর্তন অনুবর্তন, ছন্দের ক্ষেত্রে বা সুরের ক্ষেত্রে, তিনি করেছেন ভাবের স্বাভাবিকত্বর দিকে নজর রেখেই। সংগীতকে রবীন্দ্রনাথ মানবের সহজ ভাবসম্মত প্রকাশ বলেই মনে করেছেন আর সেজন্য কি ছন্দ কি সুরে, কি উচ্চারণে কি গায়নভঙ্গিতে সব সময়ই স্বাভাবিকত্বর পর সবচেয়ে জোর দিয়েছেন। সংগীতের জন্ম আবৃত্তির অনুকার থেকেই সম্ভবত, কিন্তু তবু আবৃত্তি সঙ্গীত নয়, এ তিনি জানতেন এবং জেনেই বহু আবৃত্তিমূলক কবিতাকে যখন সংগীতের পর্য্যায়ে ফেলে সুরারোপ করেছেন তখন তার নাটকীয় রসের দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন, তাতে খেয়াল বা কীর্তনের সুরবিস্তার প্রয়োগ করেন নি। আবৃত্তিতে যেটুকু নাটকীয়তা আছে তাই কোথাও কোথাও গীতশব্দগুলিতে সঞ্জাত করে স্বরপ্রয়োগে ব্যঞ্জনা ফোটাতে চেষ্টা করেছেন।

আরো ক'একটি বিষয়ের পর প্রশ্ন তোলা এই প্রসঙ্গে সমীচিন মনে করি।

ক। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি বিভিন্ন চালের গানকে তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছেন এটা যদি ভাবা যায় তাহলে দেখা যাবে মোটামুটি চার রকমে তিনি এই সব গীতপদ্ধতিকে গান বাঁধবার সময় কাজে লাগিয়েছেন।

১। কোথাও কোথাও পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন, অবিকৃতভাবে সেই চালের গান বেঁধেছেন।

২। কিছু কিছু গানে মূলত চালটি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অবিকৃত রূপে রাখেন নি।

৩। কোথাও সেই সেই গায়নপদ্ধতির অলঙ্করণগুলিকে ব্যবহার করেছেন এবং নিজস্ব স্বাধীনতা অনেক বেশী গ্রহণ করেছেন।

৪। কোন কোন গানে সেই চালের আভাষ মাত্র দিয়েছেন।

এভাবে বিশ্লেষণ করে এগোলে আমরা সুরের দিক থেকেও অনুরূপ বিচারে আসতে পারি যথা—

খ। রাগরাগিণীর ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ ঠিক একই পদ্ধতিতে এগিয়েছেন।

১। কোন কোন গানে অবিকৃতভাবে রাগসম্মত সুরের কাঠামো বসিয়েছেন।

২। কোথাও আবার দুটি বা তিনটি রাগের মিশ্রণ সঞ্জাত করেছেন।

৩। কোন গানে বহু রাগরাগিণীর মিশ্রণ আছে।

৪। আবার কোথাও রাগরাগিণীর সামান্য ছায়া আছে—সেসব গানে কখনোই মনে হবে না যে রাগসম্মত সুর কোথাও আরোপিত হয়েছে; অথচ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দরবারীর বা টোড়ীর কোমল গান্ধার, কোথাও বা বাহারের ণিপ জাতীয় স্বর-ক্ষেপণ আবার কোথাও বারোয়ার নিসারেজ্ঞা রোমাজ্ঞা প্রভৃতি স্বরসমষ্টির ব্যবহার।

বস্তুত তিনি ক্রমশই সংগীতের মুক্তির দিকেই এভাবে এগিয়েছেন, তার বাইরেকার বন্ধনকে স্বীকার করেন নি, গানের মধ্য দিয়ে মানবের অনন্ত প্রকাশের জন্যই শাস্ত্র, শাস্ত্রের জন্য গান নয়, একথা তিনি জানতেন। রাগের কাঠামো নিয়ে বিব্রত বোধ করেছেন, তাঁর আত্মার দিকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী হয়েছেন। মানব মনের অন্তর্নিহিত ভাবরূপ ও রহস্যময়তাকে প্রকাশ করবার জন্যই স্বর থেকে সংগতি বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এভাবেই প্রকাশময় হয়েছে।

এত কথার পরেও আরও কিছু কথা থাকে। গীতশব্দের ভাবরূপ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ স্বরপ্রয়োগে সংগতি ও বৈচিত্র্য সম্পাদন ছাড়াও আর একটি লক্ষণীয় বিষয়ের দিকে জোর দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি শব্দ তো বটেই এমন কি প্রত্যেক অক্ষর এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিগুলিকে যথাযথ স্বরপ্রয়োগ করে তাদের স্ব স্ব সুররূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ধরা যাক 'প্রখর তপন তাপে' গানটি। প্রত্যেকটি অক্ষর যেন ভিন্ন স্বরে স্বয়ংসম্পূর্ণ

I জ্ঞা রে সা | ণ্া স ম I মপা জ্ঞমা পমা | মপা । । I
প্র খ র ত প ন তা০০০০০· পে ০০

'তাপে' র ত+া এবং প+ে এই দুই স্থানেই স্বরধ্বনিতে এক স্থানে অলঙ্কার, অন্য স্থানে সুরের স্থিতি লক্ষ্য করা যাবে। অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনিকে যথাযথ সুরের মর্যাদা দান করেছেন। তিনি জানতেন, বাংলা গানের এবং বাংলাভাষার এই মাধুর্য স্বরধ্বনির 'পর অনেকাংশে নির্ভরশীল সে-কারণে ব্যঞ্জনান্ত স্বরধ্বনির স্বরবিন্যাস সম্বন্ধে

তিনি যথেষ্ট সচকিত ছিলেন। এভাবে তাঁর গান বিশ্লেষণ করলে এই সাধারণ সত্যটি প্রকাশিত হবে। যেসব গানে প্রচুর অলঙ্কার যুক্ত করেছেন, তান ব্যবহার করেছেন বা টপ্পা সংযুক্ত করেছেন, যেমন চিরসখা হে, এরা পরকে আপন করে, এ পরবাসে, নীলাঞ্জনছায়া ইত্যাদি গানের সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। তান-কে হিন্দুস্থানী সংগীতের রীতি অনুযায়ী যত্রতত্র ব্যবহার করেননি (আমার ব্যক্তিগত ধারণায় মনে হয়, হিন্দুস্থানী সংগীতের গায়নরীতিতে এটি একটি কুলক্ষণ—এ-বিষয়ে মার্জিত রূপ প্রয়োগ করার দিন এসেছে এবং রবীন্দ্রসংগীতের তানপ্রয়োগ পদ্ধতি মনে রাখলে অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী উপকৃত হবেন) শব্দকে যেখানে সেখানে ভাঙ্গেননি, তান প্রয়োগ যথাসম্ভব শব্দের শেষ অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আ বা এ স্বরধ্বনির সঙ্গে শ্রুতিমধুর হয় বলে সেভাবেই একে মর্যাদা দিয়েছেন।

সর্বশেষ বিচারে আমার মনে হয়েছে, যে-নান্দনিক ধারণা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সংগীত-সৃষ্টির পেছনে অনবরত কাজ করেছে তা হ'ল একটি বিস্ময়জনিত রসাভাষ। যখনি তিনি কোন গান বেঁধেছেন, বা সুর মনে গুনগুনিয়ে উঠেছে তখনি এক সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত সুরসঙ্গতি তাঁর কাছে যেন আপনি এসে ধরা দিয়েছে, সমস্ত জিনিষটাই একটা পরিপূর্ণ সুসজ্জিত শিল্পরূপে অসামান্য হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের সাধনা, নিরন্তর প্রয়াস, নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা, সুরের জগতে আত্মনিমগ্নতা ইত্যাদি স্তরের মধ্য দিয়ে সংগীতসৃষ্টির এক স্বাভাবিক দক্ষতা তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। সেই দক্ষতাই নান্দনিক বোধে পরিশীলিত হয়ে রসাভাষ-প্রযুক্ত হয়েছে। কৌশল নয় শিল্পধারণা, আঙ্গিক নয় রূপবর্ণনা, গীতরূপের সীমাবদ্ধতা নয় রসলোকে সমুত্তীর্ণ হওয়া, নিছক সুরসৃষ্টি নয়, সুরের অন্তর্নিহিত গভীরতায় ডুবে যাওয়া, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের আন্তর ভাবপ্রতিমা।

উপরোক্ত বিচারপদ্ধতির নিরিখে রবীন্দ্রনাথের রচিত নিম্নলিখিত গানটির স্বর সংগতি ও সুরবৈচিত্র্যের আলোচনা দেওয়া হল :

১। দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে—

উপরোক্ত গানটির স্বরলিপি খুব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার গানটির স্বরলিপি করতে গিয়ে কোন রাগ উল্লেখ করেননি, যদিও গীতবিতান সূচীতে সর্ফর্দা রাগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর "রবীন্দ্রসঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম" গ্রন্থেও উক্ত রাগের নাম দেওয়া হয়েছে, রাগচিহ্নিত গান বলে। এটিকে ভাঙ্গা গান বলে বিশেষ করে চিহ্নিত করা যায়, রঙ্গ রতি মাতিয়া মূল গান; আড়াঠেকায় তাল ঠিক করা আছে। বর্তমান স্বরলিপিতে তাল চিহ্নিত আছে ঝাঁপতালে ২।৩।২।৩; গীতবিতান সংকলনে 'পূজা' পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসের গ্রন্থ রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রসঙ্গে খেয়াল অঙ্গ গান বলে বর্ণিত হয়েছে। গানটির রচনাকাল সঠিক নির্ণীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের যে খাতাখানি সমীরচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে তাতে জানা যায় ১৩১০ সালে 'আনন্দ তুমি স্বামী' গানটি তিনি রচনা করেন এবং 'দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে' গানটি তার অব্যবহিত পূর্বেকার রচনা। এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্তমান লেখককে জানান : 'দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে' গানটি খুব পুরাতন। মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ৮ম খণ্ড 'গান' বইতে ১৩১০ সালে প্রথম গ্রন্থিত হয়। নৈবেদ্যর পরে। ১৩০৩ কাব্যগ্রন্থাবলীতে নাই। সুতরাং ১৩০৯-এ অনুমান। ১৩০৯ অগ্রহায়ণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু। এই তথ্যগুলির উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে ১৩১০

অগ্রহায়ণে স্ত্রীর বার্ষিকে হয়তো রচিয়া থাকিবেন। এ সবই অনুমান মাত্র।'

এই গানটি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়, যতদূর আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা বর্ণিত হ'ল। এবার সুরপ্রয়োগ সংগতি ও বৈচিত্র্য বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

গানটি গীতরচনা হিসেবে যে প্রাচীন এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের গানগুলির সঙ্গে মিল আছে তা একলহমায় ধরা পড়ে। এমনকি গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যর যুগের পূর্বেকার রচনা তাও রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীতধারার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা সহজেই বুঝবেন। গানটিতে তিনটি তুক্ আছে। স্থায়ী অন্তরা ও সঞ্চারী। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গান পছন্দ করতেন এবং ধ্রুপদ-ছকে বহু গান বেঁধেছেন বলে তাঁর রচিত গান-এ চারটি তুক্-এর অস্তিত্বই নজরে পরে বেশী। তিনটি তুক্-এর গান তার রচনায় বেশী নেই। রবীন্দ্রনাথ গানের পংক্তি নানাভাগে ভাগ করেছেন। শুধুমাত্র চার পংক্তি। ৮ পংক্তি ২।২।২।২ আবার ১০ পংক্তি ২।৩।২।৩; ৭ পংক্তিরও আছে ২.২।৩, ২।২।১।২। সেই হিসেবে ৬ পংক্তির গান খুব বেশী নেই। সুরপ্রয়োগের দিক থেকে স্থায়ী ও সঞ্চারী এবং অন্তরা ও আভোগে যে মিল লক্ষ্য করা যায়, এই গানটিতে সেই ধারার ব্যতিক্রম হয়েছে, কেননা আভোগ অংশ নেই বলেই স্থায়ীর সুর যা রেখেছেন, অন্তরা ও সঞ্চারী তার থেকে পৃথক হয়েছে। বরং অন্তরা ও সঞ্চারীর সুরের কাঠামোতে প্রভূত মিল লক্ষ্য করা যায়।

পুরো গানটির উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে—
জাগি হেরিনু তব প্রেমমুখছবি॥
হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি॥
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দগাথা,
আশা হৃদয়ে বহি নিত্য গাহে কবি॥

সর্ফর্দা বলে চিহ্নিত হয়েছে গানটি রাগলক্ষণ অনুযায়ী। সর্ফর্দা বর্তমান সময়ে আর বিশেষ প্রচলিত নেই বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের বালকবয়সে হয়তো এই রাগের চলন ছিল। পুঁথিতে এই রাগ সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাতে রাগের সঠিক রূপ ধরা সম্ভব নয়। আমি এই বিষয়ে দু'চারজন সঙ্গীতজ্ঞ ও রাগবিশেষজ্ঞর সঙ্গে কথা বলে আস্থায়ী ও গৎ শুনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন আস্থায়ী পাইনি যাতে এই রাগের একটি সবিশেষ রূপ মনের ভেতরে ধরা পড়ে। এই রাগের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে জানা যায় এটি বিলাবল অঙ্গের রাগ, এমনকি পন্ডিতরা বলে থাকেন, বিলাবলের প্রকারভেদ। রাগের নাম শুনে অনুমান করা সহজ যে প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত কোন রাগ নয়। আমীর খুসরো সম্ভবত এই রাগ ভারতবর্ষে প্রচলন করেছিলেন আরো দু'চারটি রাগের সঙ্গে সঙ্গে।

সর্ফর্দার আরোহন অবরোহন নিম্নরূপ—

সা, রগমা, ধ, প, নিধা, নির্সা, নধা পা মগা মরা সা দিবসকালে গেয়, ষড়্জ-পঞ্চম সংবাদ লক্ষ্যণীয় এবং গান্ধার ও ধৈবত রাগের মহত্ত্বসূচক। সংগীতগ্রন্থে আরো পাওয়া যায় যে আলৈয়া ইমন গোড় ও বেহাগ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি।

বিলাবলের প্রকারভেদ যে সব রাগগুলি তার মধ্যে আলৈয়া, দেবগিরি কুকুভ ইত্যাদি

বহুলপ্রচলিত। আরোহনে মধ্যম বর্জিত। তবে দেবগিরিতে মধা পধা স্বর ব্যবহৃত হয়, সেদিক থেকে সর্ফর্দার সঙ্গে সামান্য মিল আছে। মগ মরা আলৈয়ার অঙ্গ, গা রগা দেবগিরির অঙ্গ। গমপা, মপমগা রা সা বেহাগের অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু অবরোহনে যেখানে ধা ও রা অত্যন্ত দূর্বল ও না পা ও গা সা মীড় সহযোগে গীত হবে। সর্ফর্দা রাগে বেহাগের অঙ্গ সেজন্য প্রকট নয়।

বর্তমান গানটিতে সর্ফর্দার প্রচলিত রূপ কতটা রক্ষিত হয়েছে স্বর সমাহারের মধ্য দিয়ে তা আলোচনা করা যেতে পারে। সর্ফর্দাতে, বিলাবল অঙ্গ অনুযায়ী, মধ্যে মধ্যে কোমল ণি বক্রভাবে ব্যবহৃত হলেও কড়ি হ্মা কখনোই ব্যবহৃত হয় না। অথচ এই গানটিতে কড়ি হ্মা শুধু ব্যবহৃতই হয়নি, বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছে বারবার।

ক. পা -া | -হ্মপা ধণধা ধা
দুঃ o oo ooo খ

খ. রগমগা -রগা | মা পহ্মা -ধপহ্মপা
না oo oo থ কেo oooo

গ. হ্মপ -ধনা | -র্সর্রর্স -নর্সা ধা | -পা -া | -মা
প্রেo oo ooo oo ম o o o

ঘ. পা -া | পহ্মা পা -া |
ন o মo নে o

ঙ. হ্মপা -ধনা | -র্সর্রর্সা -নর্সা ধা | পা -া | মা
প্রাo oo ooo oo তে o o o

চ. (স্বরলিপি ঙ এর মত)
নিo oo | ooo oo ত্য o o পা

উপরোক্ত স্বরলিপি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কড়ি হ্মা থেকে তিন স্থানে গীতশব্দের সঙ্গে দীর্ঘ তান যুক্ত হয়েছে গ ঙ এবং চ তে, দুই স্থানে মুরকি তান ব্যবহৃত হয়েছে ক এবং খ তে এবং ঢিমে ছন্দে বিস্তার এর সময় একবার ব্যবহৃত হয়েছে ঘ তে। অনেক সময় বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য বা সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য খেয়াল গানের স্থায়ী বা অন্তরা অংশে এক বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য বা সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য খেয়াল গানের স্থায়ী বা অন্তরা অংশে এক-আধবার রাগবিরুদ্ধ স্বরের ব্যবহার হতে পারে, কিন্তু বারবার গানের বিভিন্ন অংশে অতি প্রয়োজনীয়ভাবে সেই স্বর ব্যবহৃত হলে তখন হয় সেই রাগ ভ্রষ্ট হয়ে যায় অথবা নতুন রাগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুন্দর উদাহরণ বিহাগড়া রাগ, যেখানে বেহাগ রাগে কোমল ণি অতি সুন্দরভাবে বারবার ব্যবহৃত হয়ে বেহাগ রাগের বৈশিষ্ট্য থেকে একটি পৃথক স্বাদ এনেছে ও চরিত্র গঠিত হয়েছে। বক্রভাবে কোমল ণি ব্যবহার করার জন্য অনেক সঙ্গীতজ্ঞ কেদারকে চাঁদনি কেদার বলেও অভিহিত করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সর্ফর্দা রাগে বেহাগ বা ইমন-এর আভাষ আছে এমন উক্তি করেছেন, যদিও এ মন্তব্যও তর্কাতীত নয়। কিন্তু কেদার রাগের আভাষ আছে এমন কথা

বলেননি। তাছাড়া স্বরভঙ্গিমা থেকেও কোথাও বোঝবার অবকাশ নেই যে এই রাগে কেদার রাগের কোন ইঙ্গিত আছে। গৌড় রাগ আমাদের পরিচিত নয়, তবে গৌড় মল্লারের অঙ্গ হিসাবে মল্লার অংশ বাদ দিলে সা, রগমা অঙ্গ গৌড়ের হওয়া স্বাভাবিক মনে হয়। কারণ গৌড় মল্লারের চলন সা রগমা গমা রপা ইত্যাদি, গমা রপা মল্লার অঙ্গ। সুতরাং অনুমান করা সঙ্গত যে সা রগমা গৌড় অঙ্গ হতে পারে। সে-কারণে সর্ফর্দা রাগে গৌড় অঙ্গ সামান্য লক্ষিত হয়ে থাকবে। কিন্তু কেদার অঙ্গ কোথাও পাওয়া যায় না, অথচ আলোচ্য গানটিতে একাধিক স্থানে কেদার অঙ্গ সুপরিস্ফুট। ষড়্‌জ স্বর থেকে সোজা মধ্যমে যাবার রীতিতে এবং পঞ্চমে স্থিতিলাভ করায় সহজেই কেদার রাগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে :

ছ. সা -া | সমা -গা মপা | পা

জা ০ গি০ ০ হেরি মু

এছাড়া পূর্বে উল্লিখিত গ ঙ চ অংশে স্বরলিপি দ্রষ্টব্য। ছ অংশে রূপটি পুরোপুরি কেদার রাগের। গায়নকালে কেদার রাগে শুধুমাত্র মা থেকে পা যেতে গা-এর সামান্য কণ্ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে গা স্বরে এক মাত্রা স্থিতি আছে। তাহলেও মোটামুটি রূপ ও চলন যে কেদার রাগের এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ ঙ চ অংশে অবরোহ গতিতে র্সা থেকে যেভাবে ধা পা হয়ে মধ্যমে স্থিতিলাভ করেছে এবং এক জায়গায় দীর্ঘ মীড় ও অন্যত্র হ্রস্ব মীড় প্রযুক্ত হয়েছে, তাতে কেদারের ছায়া স্পষ্টত ধরা পড়ে।

এপর্যন্ত গেল সর্ফর্দা থেকে পার্থক্যসূচক স্বরব্যবহারের আলোচনা। এবার সর্ফর্দা রাগের লক্ষণাক্রান্ত স্বর সমাহার লক্ষ্য করা যাক।

জ. পগা -পমা | মগা গমা -গমরা

রা০ ০০ তে০ হে০ ০০০

ঝ. রগমগা -রগা

না০০ ০০

মা -পা

মু ০

ঞ. -মপা -ধণধা | পমা গা -মা | -রা -া | -সা -া -া

০০ ০০০ খছ বি ০ ০ ০ ০ ০ ০

ট. মা -া | মগা -রগা

জা ০ গে০ ০০

ঠ. শুভ্র রবি : ঞর অনুরূপ

ড. আশা হৃদয়ে বহি: টএর অনুরূপ

ঢ. গাহে কবি: ঞর অনুরূপ

উপরোক্ত স্বরলিপি মালিকা সবই বিলাবল অঙ্গ অর্থাৎ সর্ফর্দার রূপ পাওয়া যাচ্ছে, যদিও ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থে সর্ফর্দার রাগরূপ বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল পাওয়া যায় না। আলৈয়া বিলাবলের সঙ্গে নানা স্থানে সাদৃশ্য অনেক বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেই আদি যুগেও, যখন রবীন্দ্রনাথ ভাঙ্গা গান রচনায় ব্যস্ত ছিলেন তখনও রাগরাগিণীর কঠিন বন্ধন তিনি

স্বীকার করেননি। সুরের অন্তর্নিহিত মাধুর্য তাঁকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি সেই মত গান বেঁধেছেন।

পুরো গানটির সুরপ্রয়োগ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মূল motif বা লক্ষণগুলি নিম্নলিখিত স্বরসমাহারে নিবন্ধ :

১। গমগা রগা

২। ক্ষপা ধনা র্সর্রর্সা নর্সা ধপা মা

৩। মপা ধণধা পমা গা মা রা সা

স্থায়ী অন্তরা ও সঞ্চারীর দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় অর্ধগুলির সুর আরোপন অনুরূপ, শুধু স্থায়ীতে দীর্ঘ মীড় ও অন্তরা ও সঞ্চারীতে হ্রস্ব মীড় ব্যবহৃত হয়েছে। গায়কীতে 'আনন্দগাথা' গীতশব্দগুলি 'বিশ্ব তব কোলে'র অনুরূপ যদিও স্বরলিপিতে সামান্য পার্থক্য আছে যথা :

অন্তরা　র্সা -ধা | না র্সা র্রা |
　　　　বি ০ শ্ব ত ব

সঞ্চারী　র্সা -ধা | না -র্সা নসর্রা |
　　　　আ ০ ন ন্ দ০০

উপরিউল্লিখিত আলোচনায় একথা পরিস্ফুট হবে যে বিভিন্ন স্থানে গীতশব্দগুলিতে সুরের অনুরূপ স্বরবিস্তারের ফলে সুর-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েও এমন একটি স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে যে গানটি একবার শুনলে সেই অনুরণন সহজে ভোলা যায় না। রাগের কাঠামোর যেমন স্বরসমাহারের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা পরিলক্ষিত হয়, উচ্চশ্রেণীর রবীন্দ্র-সংগীতগুলিতেও সেইরকম একটি বিশেষ ভঙ্গিমা লক্ষিত হয়েছে অথচ তা রাগসংগীত নয়। এবং রবীন্দ্রসংগীতে স্বর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এখানেই। স্বরগুলির গায়কীভঙ্গিতে প্রচলিত খেয়ালভঙ্গিম তান অনুযায়ী গভীর ও ঘন দানাযুক্ত তান দেওয়া হয় না—হাল্কা দানায় এর মাধুর্য ফুটে ওঠে। অথচ টপ্পার দানাতে কোন কোন গানে, বিশেষত প্রাচীন শৈলীর গানে (অন্ধজনে দেহো আলো লক্ষণীয়) মোটা দানার অথচ হাল্কা চালের টপ্পা ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য গানটিতে তিন জায়গায় গ ঙ চ অংশে তানের শেষে গায়কীর খাতিরে টপ্পা ব্যবহার করা চলে।

খেয়ালভঙ্গিম বলে "রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থে যে উল্লেখ আছে তার স্বপক্ষে যুক্তি এই যে যদিচ গানটি ঝাঁপতালে বাঁধা অর্থাৎ ধ্রুপদ খেয়াল দুইভাবেই গাওয়া চলে (ছন্দের বিচারে ঝাঁপতাল ধ্রুপদ চালের বেশী নিকট) তবুও অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে গাইলেই গানটির মাধুর্য বেশী ফুটে ওঠে। সেই অনিয়ন্ত্রিত ছন্দের জন্যই বিলম্বিত একতালের একটি মেজাজ পাওয়া যায়। বস্তুত ধ্রুপদ বা খেয়ালরীতির মূল পার্থক্য সূচিত হয়েছে ছন্দের প্রকৃতি অনুযায়ী। মূল হিন্দী গানের তাল আড়াঠেকায় গানটিকে বাঁধলে এর বিস্তার অংশে সুরের এই একনিষ্ঠ ও সমাহিত ভাব পাওয়া যেতনা বলেই মনে হয়।

বর্তমান প্রবন্ধে লেখকের কোন কোন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি প্রয়োজনীয়-বোধে সংযুক্ত করা হ'ল :

[১] "আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না।" —রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"

² যদুভট্টের শিক্ষাধীন অবস্থায় সবিশেষ চেষ্টা দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে মার্গসংগীত আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি নিয়মিতভাবে গান কখনো শেখেন নাই।

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রজীবনী"

³ "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে গান করিলেন। মধুর কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।" —নবীনচন্দ্র সেন "আমার জীবন"

⁴ একদিন আম্রা (তড়খড়ে) বলিয়াছিলেন, "তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। শুন নলিনী খোল গো আঁখি (ভৈরবী)—আন্নাকে নিয়ে রচিত।

⁵ "রবিঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন।

—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনকে কবি দীনেশচরণ বসুর চিঠি।

⁶ It is a June evening in a Cambridge garden, Mr. Bertrand Russell and myself sit there alone with Tagore. He sings to us some of his poems, the beautiful voice and the strange mode floating away on the gathering darkness. *Lowes Dickinson on Tagore.*

⁷ "আমরা যখন কথা বলি তখনও সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

⁸ "বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে গানের আরম্ভ।" —রবীন্দ্রনাথ

⁹ "এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি শুনি ছুঁই শুঁকি আস্বাদন করি।" —রবীন্দ্রনাথ

¹⁰ সংগীত ও গায়ক অভিন্ন। শব্দব্রহ্ম কথাটি কবির নিকট অনুভূত সত্য। কবির জগৎ সুরের জগৎ কথার জগৎ—শুধু রূপের জগৎ নহে। —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী"

¹¹ ১৯১৩-১৪ : কলিকাতা হইতে বোলপুর ফিরিয়া কবি কখনো থাকেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার দ্বিতলে কখনো সুরুলের বাড়ীতে। কবি সেখান হইতে প্রতিদিন অপরাহ্ণে শান্তিনিকেতন আসেন গরুর গাড়ী করিয়া। বেনুকুঞ্জের খড়ের ঘরে থাকেন দিনেন্দ্রনাথ, সেখানে সন্ধ্যায় গানের আসর জমে। 'গীতালির' নতুন গান যা যেদিন লেখা হয় কবি সন্ধ্যায় আসিয়া দিনেন্দ্রনাথকে তাহা শিখাইয়া যান। কবি সুর দিতে দিতে গান রচনা করিতেন; সমগ্র গানটির রূপ ও সুর যেমন স্পষ্ট হইল তাহা তাড়াতাড়ি শিখাইয়া ফেলিতে না পারিলেই পরে গানটির সুররূপ আর মনে আনা কঠিন হইত।...গানের সুর দেওয়া হইয়া গেলে সেটি কাহাকেও না দিতে পারিলে কবি বিব্রত হইয়া পড়িতেন।

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী"

১ থেকে ৬ পাদটীকা গায়ক রবীন্দ্রনাথের, ৭ থেকে ১০ পাদটীকা তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের, এবং ১১ পাদটীকা সুরকার রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয় বহন করে।

স্বপ্নের সেতু

মুনিচিরো তানিজাকি

দ্বিতীয় মা-র পূর্ব ইতিহাস জানবার পর থেকে আমার মনে প্রবল কৌতূহল ও এক বিচিত্র অনুভূতি জাগলো। স্বপ্নেও ভাবিনি তিনি গিওনেতে পেশাদারী রঙ্গনটী ছিলেন। সাধারণ পেশাদারী রঙ্গনটীদের চেয়ে তিনি অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রমোদভবনের সংশ্রব ত্যাগ করে ধনী গৃহবধূর জীবনযাপন করতে শুরু করেন। মনে হয় এই সময়ে তিনি মার্জিত নারীসুলভ গুণাবলী আয়ত্ত করেন। একদা নর্তকী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সারল্য ও মাধুর্য বজায় রেখেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্ট মার্জিত টান, তাঁর কোমল মৃদু বাচনভঙ্গী এ সবই কি পুরনো কিয়োটোর বনেদী ব্যবসায়ী ঘরের ঐতিহ্য বহন করে? মাত্র দু'তিন বছর গিওনেতে কাটালেও তাঁর বাচনভঙ্গীতে তার কোনো রকম অস্পষ্ট ছাপ আশা করা যায় না? তাঁর প্রথম স্বামী ও পরিবারের অন্যান্যরা কি সবসময়ই তাঁকে আচার-ব্যবহারে তালিম দিতেন? কে জানে!

বাবা যখন এত নিঃসঙ্গ ও বেদনাভারাক্রান্ত তখন এমনি একজন নারী যে তাঁকে আকৃষ্ট করবে এ অতি স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবেই বাবার মনে হয়েছিল তাঁর মৃতা স্ত্রীর যা কিছু সুন্দর মহৎ গুণ সব এই নারীর মধ্যে পাওয়া যাবে। তিনি এ-ও ভেবেছিলেন যে এই মা আমার মা হারানোর দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন। এখন বুঝতে পারছি বাবা এ সব নিয়ে কত ভেবেছেন, শুধু নিজের জন্য নয়—আমার জন্যেও। যদিও আমার সৎ মা বাবার মতে মত মিলিয়ে কামনা করে থাকেন যে আমার দুই ভিন্ন মা আমার মনের মধ্যে এক হয়ে যাক, তবু কি অসাধারণ চেষ্টার ফলেই না বাবা আমার দ্বিতীয় মাকে আমার মায়ের ছায়ায় মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আমি অনুভব করতাম যে অপর্যাপ্ত ভালবাসায় বাবা আমাকে ও আমার সৎ মাকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন তাই তাঁকে তাঁর মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে আরো গাঢ় অচ্ছেদ্য প্রেমে পূর্ণ করেছিল। আমার সৎ মায়ের পূর্ব জীবনরহস্য বাবার এত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারত। কিন্তু তা হলো না। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সৎ মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো গভীর হলো।

ওকেন চলে যাবার পর আর একজন ঝি কাজে যোগ দেয়। এখন সব শুদ্ধ পরিচারিকা-দের সংখ্যা হল চার। এর পরের বছর মাঘ মাসে জানতে পারি যে মা অন্তঃসত্ত্বা, বাবার সঙ্গে বিয়ের ঠিক এগারো বছর পরে। এর আগে মা কখনো সন্তানসম্ভবা হননি। এমন কি প্রথম বিবাহের সময়েও নয়। এত বছর পরে যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে এতে তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত অবাক হয়েছেন মনে হলো।

মা বলতেন, 'এই বয়সে আমার এই অবস্থা হলো—বড় লজ্জা করে।' কখনো বা বলতেন, 'ত্রিশ বছর পর প্রথম সন্তান জন্ম দেওয়া খুব কষ্টকর শুনেছি।' বাবা, মা দুজনেই তাঁদের সবটুকু অপত্যস্নেহ আমাকে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাতে আমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে তাঁরা হয়ত চিন্তিত হতেন। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এতদিন একমাত্র সন্তান থেকে এখন একজন ভাই কিংবা বোন পাওয়া যাবে এই আশায়

আমি কি উৎফুল্ল হয়েছিলাম তা বলে বোঝাতে পারব না। বাবা বোধহয় মাঝে মাঝে তাঁর সন্তানসম্ভবা প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর অশ্রুভস্মৃতি স্মরণ করে বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন। আমার সবচেয়ে অবাক লাগতো যে বাবা কিংবা কেউ এ প্রসঙ্গ কখনো উত্থাপন করতেন না। আমি আরো লক্ষ্য করতে শুরু করলাম যে এ প্রসঙ্গে কোন কথা উঠলেই তাঁরা দুজনে অস্বাভাবিক বিষণ্ণ হয়ে যেতেন।

আধো-ঠাট্টার ছলে মা বলতেন, 'আমার তো তাদাসুই আছে। আমার আর অন্য সন্তানে প্রয়োজন নেই। সন্তান ধারণ করবার পক্ষে আমার বয়স বড় বেশী।' তাঁকে এত ভাল করে জানি বলেই মনে হতো বেশী বয়সে সন্তান সম্ভাবনার সংকোচ ঢাকবার জন্য তাঁর পক্ষে এ-ধরনের কথা বলা প্রায় অসম্ভব।

আমি আপত্তি জানাতাম, 'তুমি এসব কি বলছ মা? এরকম বোকা বোকা কথা বলোনা।' কিন্তু মনে হতো বাবাও যেন তাঁর সঙ্গে সায় দিচ্ছেন।

যে ডাক্তার মা-কে দেখতেন তিনি বলেছিলেন মা-র হৃদয়যন্ত্র একটু দুর্বল, যদিও সব মিলিয়ে তাঁর শরীর খুব ভাল ও সমর্থ। ভয়ের কিছু নেই। সেই বছরই বৈশাখ মাসে মা একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন। আমাদের বাড়ীতে—যে ছয় মাদুরের ঘরে আমি থাকতাম —সেখানেই তাঁর সন্তান প্রসব হয়। শিশুটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বাবা যথাসময়ে নামকরণ করলেন। নাম দেওয়া হলো তাকেশি। বোধ করি প্রায় দু'সপ্তাহ পরে তাকেশিকে বাড়ীতে দেখতে না পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাই।

জিজ্ঞেস করি, 'বাবা তাকেশি কোথায়?' বাবা বলেন, 'ওকে পুষ্যি করে দেবার জন্য সিজুচিনোতে পাঠিয়ে দিয়েছি। একদিন তুমি সব বুঝতে পারবে। এখন আমাকে আর প্রশ্ন করোনা। আমি একাজ নিজে করিনি, যখন থেকে তোমার মা-র সন্তানসম্ভাবনার কথা জেনেছি তখন থেকে প্রতি রাত্রে আমরা দুজনে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। তোমার মা-ও এই চেয়েছিলেন, এমন কি আমার চাইতেও বেশী উৎসুক ছিলেন। হয়তো তোমাকে কিছু না বলে এতটা করা উচিত হয়নি। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিলো তোমাকে আগে থেকে বললে হয়তো ভালোর চাইতে মন্দই হবে।'

এক মুহূর্ত তাঁর দিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যভাবে তাকিয়ে রইলাম। মা আগের দিন বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। তিনি আমাদের দু'জনকে রেখে যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বললাম, 'মা কোথায়?'

বাবা যেন কিছুই জানেন না এমন ভাবে বললেন, 'বাগানের দিকে গিয়েছেন বোধহয়।'

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে খুঁজতে চলে গেলাম। মা সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিয়ে মাছদের রুটি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখে সেতু পার হয়ে পুকুরের অপর পাড়ে বীভৎস সাধু মূর্তিগুলোর পাশে রাখা চীনামাটির একটি ঢোলকের উপর বসলেন। ইশারায় আমায় ডেকে তাঁর মুখোমুখি আর একটি ঢোলকের ওপর বসতে বললেন।

আমি বললাম, 'বাবার সঙ্গে এখনি কথা হচ্ছিল, এসবের অর্থ কী?'

'তুমি এতে আশ্চর্য হয়েছো?' তাঁর কোমল সুগোল মুখে মৃদু হাসির টোল পড়ল। তাঁর দৃষ্টি প্রশান্ত, সে দৃষ্টিতে নবজাতক হারানো মায়ের বেদনার কোনো আভাস নেই।

জোর দিয়ে বলি, 'অবশ্যই আশ্চর্য হয়েছি।'

'আমি কি সব সময় বলিনি যে তাদাসুকে ছাড়া আমার কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই?' তাঁর শান্ত মুখভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। 'তোমার বাবা ও আমি ভেবে দেখেছি,

এতেই মঙ্গল হবে। আর একদিন এ সম্বন্ধে কথা হবে, কেমন।'

সেই রাত্রে আমি আমার নিজের মা-র ঘরে—যে ঘর মাকে আর নবজাত শিশুকে ছেড়ে দিয়েছিলাম—ফিরে পেলাম। শুয়ে শুয়ে যতই ভাবতে লাগলাম ততই সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো, ঘুম আসতে আসতে রাত ভোর হয়ে গেল।

আমি সিজুইচিনো (যেখানে তাকেশিকে পাঠানো হয়েছে) সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

ইচিহারানো প্রদেশের আধুনিক নাম সিজুইচিনো। কাহিনী আছে এখানে পৌরাণিক বীর রাইকো দুই ডাকাত সর্দারকে হত্যা করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই প্রদেশের একটি গ্রামকে ইচিহারানো বলা হয়। কুরামা পাহাড়ের দিকে যেতে বৈদ্যুতিক ট্রেনের স্থানীয় স্টেশনের নামও ইচিহারানো। যাই হোক, এদিকে বৈদ্যুতিক ট্রেনের রাস্তাও সম্প্রতি খোলা হয়েছে। আগের দিনে কিয়োটো থেকে সিজুইচিনো পর্যন্ত ছ-সাত মাইল রাস্তা রিক্‌শা করে যেতে হতো, অথবা গাড়ীতে মিয়াকে-হাচিমান অবধি গিয়ে তিন-চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে হতো। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ নোসে পরিবারের সঙ্গে কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আমার মনে হয় আমাদের কোনো এক পূর্ব-পুরুষকে ঐ পরিবারের একজন দুধ মা-র কাছে কিছুদিন রাখা হয়েছিল। এমন কি বাবার জীবিতকালেও নববর্ষ উৎসবে ও অন্যান্য উৎসবে নোসে পরিবারের কর্তা গিন্নী গাড়ী বোঝাই করে ফল তরকারী ভেট নিয়ে বৎসরের শ্রদ্ধা ও শুভকামনা জানাতে আমাদের বাড়ী আসতেন। তাদের কামো বেগুন ও সবুজ সয়াবীন আমাদের বাজারে পাওয়া যেত না। তাই তাদের ছোট ঠেলাগাড়ী নিয়ে আসতে দেখলেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। প্রায় প্রতি হেমন্তেই আমরা ছত্রাক তোলার সময় তাদের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে আসতুম। ছেলেবেলা থেকেই আমি ঐ অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম।

নোসে পরিবারের বসত বাড়ী থেকে পাহাড়ী রাস্তা কুরামা নদীর (কামো নদীর এও এক উৎপত্তিস্থল) ধার ঘেঁষে চলে গিয়েছে। এদিকটা কিয়োটো থেকে বেশ অনেকটা উঁচু। আরো ওপরে উঠলে আমরা দেখতে পাবো যে কিয়োটো সহর অনেক নীচে। কিংবদন্তী আছে যে প্রখ্যাত পণ্ডিত ফুজিওয়ারা সেইকা, সোগান ইয়েযুর এডোতে যাবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নাকি এখানে এসে অবসর জীবন যাপন করেন। পাহাড়ের ওপর যে গৃহে সেইকা বাস করতেন তা বহুদিনই বিলীন হয়ে গিয়েছে। কুরামা নদীর প্রশস্ত বাঁকের মধ্যে তা মিলিয়ে গেছে। নিকটেই ছড়ানো রয়েছে তাঁর অষ্ট নৈসর্গিক সৌন্দর্য যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'পাখীওড়া দীঘি' এবং 'উপাধান স্রোতস্বিনী গুহা'।

কাছাকাছি আরো একটি দেখবার জিনিস রয়েছে, ফুদারাকু মন্দির। সাধারণ লোকেরা যাকে কোমাচি মন্দির বলে জানে। কথিত আছে ওনো নো কোমাচি আর তার নিপীড়িত প্রেমিককে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছে। রাজধানীর ওপর সচিত্র পুস্তিকা অনুযায়ী সম্রাট গো সিরাকাওয়া তাঁর বিখ্যাত 'ওহারা' যাত্রার পথে এই মন্দির দর্শন করেছিলেন। একথা হেইকে কাহিনীতেও বর্ণিত রয়েছে। কোমাচিকে নিয়ে রচিত একটি 'নো' নাটকে বলা হয়েছে, বহু বৎসর পূর্বে কোনো ব্যক্তি ইচিহারানো দিয়ে যাবার সময় পথের দুধারে লম্বা লম্বা শুশুকি গাছের ঝাড়ের ভেতর থেকে যেন কার কণ্ঠে শুনতে পান—

যখন শরতের স্নিগ্ধ বাতাসে
দৃষ্টিহীনা কোমাচির বেদনার্ত কান্না উদ্বেলিত হয়

হায়, বেতসের বিজন বনে তার লাবণ্যময়
মুখখানি আজ কোথায়?

এই কবিতা স্মরণ করে এক ধর্মযাজক কোমাচির আত্মার শান্তির জন্য ইচিহারানোতে প্রার্থনা করবেন বলে স্থির করেছিলেন। এক পুরনো ছবিতে দেখেছিলাম একটি করোটি—যা মৃতা কোমাচির বলে অনুমান করে নেওয়া যায়—যার চোখের গর্তের মধ্য থেকে শুশুকি গাছ বেরিয়েছে। কোমাচি মন্দিরে এক খণ্ড পাথরে—যা বিলাপ পাথর বলে অভিহিত—পূর্ব উদ্ধৃত কবিতাটি খোদাই করা রয়েছে। আমার বাল্যকালে দেখেছি এই অনুর্বর ভূমিখণ্ড সারি সারি শুশুকি গাছের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তাকেশি সম্পর্কে এই বিচিত্র সংবাদ পাওয়ার কয়েকদিন পরেই আমি স্থির করলাম গোপনে সিজুইচিনোতে গিয়ে নোসে পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। অবশ্য তাকেশিকে নোসে পরিবারের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবার কোন সঙ্কল্প আমার ছিলো না। নিজের দায়িত্বে এ কাজ করবার মত লোক আমি নই। মায়ের সঙ্গহারা দূরে নির্বাসিত ছোট ভাইয়ের জন্য আমার মন ভীষণ খারাপ করছিলো। ভাবলাম সে ভাল আছে কিনা দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারব। পরে বাবা মা-কে ভাইটিকে ফিরিয়ে আনার কথা বিবেচনা করে দেখতে বলব। তাঁরা যদি আমার কথা না শোনেন তা' হলে আমিই তাকে দেখতে যাব—এতে আর কিছু না হোক তাকেশির সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হবে না। একদিন না একদিন বাবা মা আমার মনের কথা বুঝতে পারবেন।

ভোরবেলা রওনা হয়ে দুপুরের কিছু আগেই আমি নোসেদের বাড়ী পেঁাছলাম। নোসে এবং তাঁর স্ত্রী একটু আগে ক্ষেত থেকে ফিরেছে। তাকেশির কথা জিজ্ঞেস করাতে তারা একটু হকচকিয়ে গেলো। বলল, 'তাকেশি ওখানে নেই।'

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, 'এখানে নেই? তবে সে কোথায়?'

পরস্পরের দিকে বিব্রত দৃষ্টি মেলে ঢোক গিলতে লাগলো নোসে দম্পতি। আমি যখন বার বার প্রশ্ন করতে লাগলাম তখন নোসে পত্নী কেঁদে বললো, 'আমরা তাকে কিছু দূরে অন্য এক পরিবারের কাছে রেখেছি।' তারা আমাকে বুঝিয়ে বললো যে তাদের বাড়ীতে ছোট শিশুর দুধ-মা হওয়ার মত কেউ নেই এবং আমার বাবা মা তাকেশিকে আরো দূরে সরিয়ে দিতে চান। সেইজন্য তাকেশিকে তারা পুরনো ও নির্ভরযোগ্য এক বন্ধু দম্পতির কাছে রেখেছে। আমি সেই 'কিছু দূরে' জায়গাটি কোথায় জানতে চাওয়ায় নোসে আরো বিব্রত বোধ করতে লাগলো।

সে বললো, 'তোমার বাবা সবই জানেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস কোরো। আমার পক্ষে তোমাকে এর চেয়ে কিছু বেশী বলা শোভা পায় না।' সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীও সুর ধরলো, 'তোমার বাবা মা বলেছেন তুমি যদি কখনো এ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও আমরা যেন তোমাকে কিছু না বলি।' কিন্তু শেষ অবধি তাদের কাছ থেকে খবরটা বের করতে পেরেছিলাম। জায়গাটি হচ্ছে সোরিয়ু বলে একটি গ্রাম।

পল্লী-গীতিতে একটি লাইন আছে: 'দূরে কিয়োটো ছাড়িয়ে ওহারা ও সোরিয়ুর পথে।' "গ্রাম্য পাঠশালা" নামে কাবুকি নাটকে এক ছত্রে পাওয়া যায়: 'তাদের শাসনকর্তার শিশু সন্তানকে সোরিয়ু গ্রামে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' কিন্তু এই সোরিয়ু সিজুইচিনো থেকে ওহারার পথে এবুমি গিরিসংকট পার হয়ে যেতে হয়। যে সোরিয়ুর কথা নোসে এবং তার স্ত্রী বলেছে তা আরো দূরে এবং সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন তাম্বা প্রদেশের এক পাহাড়ীয়া

গ্রাম। সেখানে যেতে হলে সিজুইচিনো থেকে দ্বিতীয় স্টেশন কিবুনে অবধি বৈদ্যুতিক ট্রেনে যেতে হয়। তারপর সেরিয়ু গিরিসংকট পার হয়ে তাম্বা পোঁছনো যায়। এই গিরিসংকট অতি দুর্গম এবং এবুমি গিরিসংকটের চেয়ে দ্বিগুণ উঁচু। এ ছাড়া কিবুনে থেকে সেরিয়ু এই পাঁচ মাইল পথে বসতির চিহ্নমাত্র নেই।

কেন বাবা মা আমার ছোট্ট ভাইকে এমন জায়গায় নির্বাসন দিলেন? নাটকের সেরিয়ু 'পাহাড়ের কোলে গ্রাম' (যেখানে শাসনকর্তার ছেলেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল) কিয়োটো থেকে এত দূরে নয়। তাকেশিকে কেন তাম্বা পর্বতের গভীরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে? ইচ্ছা হচ্ছিলো আজই এই মুহূর্তে বেড়িয়ে পড়ি তাকেশিকে খুঁজতে। কিন্তু আমি শুধু গ্রামের নামই জানি। তাকে খুঁজে বার করতে হলে গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে সন্ধান করতে হবে। যাই হোক তখন আর কিবুনে গিয়ে সেই বন্ধুর গিরিসংকট পার হবার সময় আমার নেই। তখনকার মতো নিরস্ত হয়ে ভগ্নোৎসাহ ও বিষণ্ণ মনে সেই একই পথে বাড়ী ফিরে এলাম।

এরপর তিন-চার দিন পর্যন্ত বাবা মা-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন আড়ষ্ট হয়ে রইল। এমনকি রাত্রে খাবার সময়ও আমাদের কদাচিৎ কথা হয়েছে। আমার সিজুইচিনো যাওয়ার খবর তাঁরা নোসে পরিবারেরর কাছ থেকে জেনেছিলেন কিনা জানি না। আমিও আর সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিনি।

মা তাঁর বুকে দুগ্ধস্ফীতি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রায়ই তিনি নির্জনে দুধ নিঃসারণ যন্ত্র নিয়ে চা-ঘরে আশ্রয় নিতেন। কখনো চা-ঘরের নির্জনতায় দুধ নিঃসারণ যন্ত্র দিয়ে বুকের দুধের চাপ কমিয়ে নিতেন। এই সময় বাবার স্বাস্থ্যও ভাল যাচ্ছিল না। তিনি প্রতিদিনই ঢাকা বারান্দায় চীনে কাগজের মন্ডের বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোতেন। এই সময় তাঁর জ্বরভাবও হতো। আমি প্রায়ই তাঁকে থার্মোমিটার মুখে দিতে দেখতাম।

আমি স্থির করেছিলাম যত শিগগির পারি একবার সেরিয়ুতে যাব। ভাবছিলাম কি ছুতো করে রাতটা বাড়ীর বাইরে কাটানো যায়! এক অলস দুপুরে—তখন বোধ করি বসন্তের শেষ, দাদামহাশয়ের অতি প্রিয় ও গর্বের রেশম গাছটি ফুলে ছেয়ে গেছে—ভাবলাম রেশম তরুশিবিরে বসে আজ কিছু পড়ব। একখানা উপন্যাস হাতে নিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে ফুলে ভরা গাছটি পেরিয়ে আমি তখন সবে শিবিরের সিঁড়িতে পা দিয়েছি, দেখি মা সামনেই একখানা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে তাঁর দুগ্ধভারাক্রান্ত স্তন দু'টি উন্মুক্ত করে দুধ বের করছেন। আমি ভেবেছিলাম মা চা ঘরের নির্জনে বসেই তাঁর বক্ষের চাপ নিঃসারিত করেন। কল্পনাও করিনি তাঁকে এ অবস্থায় ঘরের বারান্দায় দেখব। শিথিল ভঙ্গীতে ঝুঁকে বসেছিলেন, খোলো কিমনোর ভেতর দিয়ে নিরাবরণ স্তনযুগল আমার দৃষ্টিপথে সম্পূর্ণ উন্মোচিত। চমকে চলে যাবার জন্য আমি পেছন ফিরলাম। কিন্তু তাঁর প্রতি-দিনকার স্বাভাবিক শান্ত স্বরে মা আমায় ডেকে বললেন, 'তাদাসু যেওনা।'

বললাম 'আমি পরে আসব। তোমাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা ছিল না।'

তিনি বললেন, 'চা ঘরের গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছে, তাই ভাবলাম এইখানে বাইরেই বসি। তুমি কি এখানে বসে পড়তে চাও?

ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আবার বললাম, 'আমি পরে আসবো।' কিন্তু তিনি আবার আমাকে ফিরে যেতে নিরস্ত করলেন।

'তোমাকে যেতে হবে না, আমার এখনি শেষ হবে। যেখানে আছ সেখানেই থাক।'

তারপরেই বললেন, 'আমার স্তন দুটি এত দুধে ভরে গেছে যে যন্ত্রণা হচ্ছে।'

কোন উত্তর দিলাম না। তিনি বলেই চললেন, 'মনে আছে তোমার? বারো-তেরো বৎসর বয়সে তুমি আমার বুকের দুধ খাবার কত চেষ্টা করতে। তুমি মন খারাপ করতে কারণ এক ফোঁটা দুধও আসত না তখন।

মা তাঁর বাঁ স্তনের বোঁটার মুখ থেকে দুধ নিঃসারক যন্ত্র সরিয়ে এনে ডান দিকে ধরলেন। কাঁচের যন্ত্রের মধ্যে তাঁর স্তন স্ফীত হয়ে ওঠে, আর ছোট ছোট অসংখ্য ধারায় স্তনের বোঁটার মুখ থেকে ছিট্‌কে দুধ পড়তে থাকে। একটি গ্লাসে মা দুধটা ঢেলে আমার সামনে তুলে ধরেন খাবার জন্য।

তিনি বলেন, 'মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম কোনো একদিন আমি সন্তান ধারণ করব, তখন তোমার জন্য অপর্যাপ্ত দুধ থাকবে।'

প্রায় সামলে নিয়ে আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু কি উত্তর দেব বুঝতে পারছিলাম না।

'তোমার মায়ের দুধের স্বাদ কেমন তা মনে আছে?'

আমি চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ি।

তিনি গেলাসভরা দুধ আমার দিকে তুলে ধরে বলেন, 'একটু চেখে দেখো. এসো, খেয়ে দেখোই না।'।

পরমুহূর্তে, আমি কি করছি বুঝবার আগেই আমার হাত গেলাসের দিকে চলে যায়, আর আমি সেই মিষ্টি তরল দুধ এক চুমুকে খেয়ে ফেলি।

'কেমন লাগল? মনে পড়ছে কি মায়ের দুধের স্বাদ? চার বছর বয়স অবধি তুমি তোমার মার বুকের দুধ খেতে।'

আমার বিমাতার পক্ষে 'তোমার মা' বলে নিজেকে বাবার প্রথমা স্ত্রী থেকে পৃথক করে ভাবা বড়ই অদ্ভুত।

'ভাবছি, তুমি বুকের দুধ খাওয়া ভুলে গেছ কিনা।' মা বলে চলেন, 'ইচ্ছে হলে চেষ্টা করে দেখতে পার।' একটি স্তন হাত দিয়ে ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'চেষ্টা করে দেখই না।'

আমি তাঁর সামনে ঘন হয়ে বসে পড়ি, আমাদের একের জানু অপরকে ছুঁয়ে থাকে। হাত বাড়িয়ে তাঁর স্তনের বোঁটাটি ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরি। প্রথমে দুধ কিছুতেই আসতে চায় না, আমি চুষেই চলি। আমার জিভ আবার তাঁর স্তন্য পান করবার পুরনো কৌশল ফিরে পায়। এখন আমি তাঁর থেকে বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা, তাই মাথা হেলিয়ে তাঁর বুকে মুখ গুঁজে লোভীর মত স্তন পান করতে থাকি। প্রবল বেগে দুধ এসে আমার মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

আদুরে ও আধ আধ স্বরে আমি নিজে থেকেই মা, মা বলে ডাকতে থাকি।

মনে হয় প্রায় আধ ঘণ্টা মা আর আমি পরস্পরকে জড়িয়ে ছিলাম। অবশেষে মা বললেন, 'আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে, কি বল?' তিনি স্তানের বোঁটাটি আমার মুখ থেকে সরিয়ে নেন। কোনও কথা না বলে আমি তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বারান্দা থেকে এক লাফ দিয়ে বাগানের মধ্যে দৌড়ে চলে গেলাম।

দুপুরের তাঁর এই ব্যবহারের কি অর্থ? আমি জানি তিনি আগের থেকে কিছু ভেবে স্থির করেন নি। কারণ সেদিন সেই পরিত্যক্ত চা শিবিরে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়েছিল।

এই অতর্কিত সাক্ষাৎকার কি তাঁকে আমাকে অপ্রস্তুত করবার প্রেরণা যুগিয়েছিল? এই হঠাৎ দেখা হওয়াতে তিনি হয়তো মুহূর্তের খেয়ালের কাছে হার মেনে নিয়েছিলেন। অথচ তাঁর ধীর অনুত্তেজিত ভাব দেখে মনে হচ্ছিল না যে তিনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। মার স্থির শান্ত ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল না যে সাধারণ ঘটনার বাইরে কিছু ঘটেছে। হয়তো কেউ সেখানে হঠাৎ এসে পড়লেও তিনি তেমনি অবিচল থাকতেন। হয়তো আমি বড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে বালকই মনে করেন। মার মনের অবস্থা আমার কাছে এক রহস্য। আমার নিজের আচরণও সেই রকম অদ্ভুত। যে মুহূর্তে অতর্কিতে তাঁর স্তনযুগল আমার চোখের সামনে অনাবৃত হল, সেই মুহূর্তেই আমি ফিরে গেলাম আমার বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের জগতে, ফিরে গেলাম সেই পুরনো স্মৃতির তলে যা বহু বছর ধরে আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে। মা আমাকে বুকের দুধ খাইয়ে ভুলিয়ে নিয়েছিলেন বলেই শেষ অবধি এই পাগলামি করে বসলাম। অনুশোচনার গ্লানিতে দীর্ণ হয়ে ভাবছিলাম কী করে আমি এমন উন্মাদের মত ব্যবহার করতে পারলাম। আমি একা একা পুকুরের চার পাশে অস্থির পদচালনা করে চললাম। নিজের কাজের জন্য অনুশোচনা করছি, নিজেকে নিপীড়ন করেছি মনে মনে, আবার সেই কাজই করতে চেয়েছি শুধু একবার নয় বার বার। আমি নিশ্চিত জানি যে আবার যদি আমি সেই অবস্থায় পড়ি, আবার যদি আমাকে ভুলিয়ে নেন মা তবে তাঁকে বাধা দেবার মতো কোনো মানসিক শক্তি আমার থাকবে না।

এরপর চা-শিবির থেকে আমি দূরে দূরে থাকতাম। মা হয়তো আমার মনোভাব বুঝতে পেরেই শুধু চা ঘর ব্যবহার করতেন। বহুকাল ধরে সেরিয়ু গিয়ে তাকেশিকে দেখে আসবার যে তীব্র বাসনা মনে মনে পোষণ করছিলাম তাও যেন স্তিমিত হয়ে এলো। এ কী বাবার ইচ্ছে না মার ইচ্ছে? আমি যতদূর বুঝতে পেরেছিলাম খুব সম্ভবত আমার সৎ মা-ই আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ স্থির করেছিলেন যে তাঁর নিজের সন্তানকে আমাদের মধ্যে রাখবেন না। বোধ হয় মার এই বিবেকবোধে বাবার সমর্থন ছিল। নিঃসন্দেহে বাবার প্রথমা স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসা এখনও প্রবল। তিনি হয়তো মনে করেছেন যে তাঁর পক্ষে প্রথমা স্ত্রীজাত সন্তান ছাড়া অন্য কোনো সন্তানের পিতা হওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। মনে হয় এই কারণেই আমার বিমাতা নিজের সন্তানকে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এই ত্যাগ বাবার প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগই প্রকাশ করে। আমার প্রতিও কি তিনি তাঁর সন্তানের চেয়েও অনুরক্ত ছিলেন না? মনে হয় বিশেষ কোনো কারণবশতঃ তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার কাছে তাঁরা এই কথা গোপন করেছিলেন কেন? এতটুকু আভাসেও তাঁদের এই অভিপ্রায় আমার কাছে ব্যক্ত করেন নি। তাকেশির বর্তমান ঠিকানা তাঁরা আমার কাছে এমন গোপন করেছিলেন কেন?

আগেই বলেছি বাবার স্বাস্থ্য খারাপের দিকে যাচ্ছিল। মনে হয় ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন। গত বছরের শেষের দিক থেকে তাঁকে বিবর্ণ ও পান্ডুর দেখাচ্ছিল, তিনি চোখে পড়বার মত রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও কদাচিৎ কাশতেন অথবা গলা পরিষ্কার করতেন, তবু মনে হয় তাঁর অল্প অল্প জ্বর হত। আমি ভেবেছিলাম বাবা হয়তো কোনো রকম বুকের দোষে কষ্ট পাচ্ছেন। আমাদের পারিবারিক ডাক্তারের নাম কাটো। ইমাডেগাওয়াতে তেরামাচির ওপর তাঁর অফিস। অসুখের প্রথম অবস্থায় বাবা কখনো ডাক্তারকে বাড়ীতে ডাকতেন না। 'আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি' বলে তিনি ট্রামে বাসে চেপে ডাক্তার কাটোর কাছে যেতেন। চা-শিবিরের ঘটনার পরে আমি টের পেলাম যে

তিনি কোথায় যান।

একদিন জিজ্ঞেস করি, 'বাবা, তোমার শরীর কি খারাপ?'

তিনি অস্পষ্ট উত্তর দেন, 'বিশেষ কিছুই নয়।'

আমি বললাম, 'তবে তুমি ডাক্তার কাটোর প্রেসক্রপশন এনেছো কেন?'

তিনি বললেন, 'কিছুই গুরুতর নয়, মূত্রত্যাগের সময় একটু কষ্ট হয় এই যা।'

'তবে বোধহয় মূত্রাশয়ে স্ফীতি হয়েছে।'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, সেরকমই একটা কিছু।'

অবশেষে স্পষ্ট ধরা পড়ল যে বাবাকে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করতে হয়। দেখাই যাচ্ছিল যে তিনি ক্রমাগত মূত্রবেগ নিঃসারণ করতে যান। তাঁর গায়ের রং ফিকে হয়ে এলো, খাওয়ার ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেলো। এতই ক্লিষ্ট ও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিলেন যে সেই গ্রীষ্ম এবং বর্ষার পরে দিনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি বিশ্রাম করতেন। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যায় তিনি পুকুরের পাশে আমাদের সঙ্গে নৈশভোজ করতে আসতেন। ধীরে ধীরে বাবা নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। মনে হতো মা ও আমার জন্যই যেন তিনি এই চেষ্টাটুকু করছেন।

আমার কেমন সন্দেহ হতো, রোগের ব্যাপারে বাবা যেন আমাদের এড়িয়ে যেতে চাইতেন। এমনকি ডাক্তার কাটোর কাছে নিয়মিত যাওয়াও আমাদের কাছে গোপন করতেন। একদিন আমি নিজেই ডাক্তার কাটোর অফিসে গেলাম এবং বাবার অসুখের সম্বন্ধে জানতে চাইলাম, 'বাবা বলেন তাঁর মূত্রাশয়স্ফীতি হয়েছে, সত্যিই কি বাবার রোগটা তাই?'

ডাক্তার কাটো উত্তর দেন, 'সত্যিই তাঁর স্ফীত মূত্রাশয়। কিন্তু তিনি কি এর বেশী কিছু তোমাকে বলেন নি?' ডাক্তার কাটোকে একটু অবাক দেখায়।

'আপনি তো জানেন বাবা কেমন আত্মসংবৃত চাপা প্রকৃতির লোক। তিনি নিজের রোগের কথা বলা পছন্দ করেন না।'

ডাক্তার কাটো বললেন, 'আমি তো বড় মুশকিলে পড়লাম। আমি অবশ্য তোমার বাবাকে স্পষ্ট কিছু বলিনি, কিন্তু তাঁকে বুঝতে দিয়েছি যে তাঁর অবস্থা গুরুতর। মনে হয় তোমার মা বাবা দুজনেই মন্দের জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি বুঝতে পারছি না কেন তাঁরা তোমার কাছে একথা লুকিয়ে রেখেছেন। হয়তো তাঁরা তোমাকে অযথা দুঃখ দিতে চান না। আমার মতে তোমার কাছে সত্য গোপন করা বিচক্ষণতার লক্ষণ নয়। কারণ তোমাকে খুব চিন্তিত ও বিচলিত দেখাচ্ছে। তোমাদের পরিবারকে আমি বহু বছর ধরে জানি। তোমার দাদু আমার রোগী ছিলেন। সুতরাং তোমাকে জানাবার ভার আমি নিজে গ্রহণ করলে কোনো আপত্তি হবে না।' একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমার বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু তুমি বোধহয় এতক্ষণে বুঝেছো যে তোমার বাবার অবস্থা মোটেই আশাজনক নয়।' এরপর তিনি আমায় সব খুলে বললেন।

গত শরৎকালে বাবা তাঁর স্বাস্থ্যের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, এবং ডাক্তার কাটোর কাছে পরীক্ষা করাবার জন্য যান। বাবা নানাবিধ উপসর্গের কথা বলেন—জ্বরভাব, মূত্রে রক্তের আভাস, মূত্রত্যাগের পরেই যন্ত্রণা, তলপেটে চাপ বোধ। কাটো পরীক্ষা করে তখনি ধরতে পারেন যে দুটো মূত্রনালীই স্ফীত হয়েছে—অতি গুরুতর অবস্থা। তিনি বাবাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূত্রবিজ্ঞান বিভাগে বিশেষ রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষার জন্য যেতে বলেন। বারবার অনুরোধ করবার পর অবশেষে বাবা ডাক্তার কাটোর পরিচয়পত্র নিয়ে পরীক্ষার জন্য যানই

দুদিন পরে ডাক্তার কাটো তাঁর ডাক্তার বন্ধুর কাছে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারলেন,

তিনি যা ভয় করেছিলেন তাই,—সব রকম পরীক্ষাতেই স্পষ্ট ধরা পড়েছে যে বাবার দুটো মূত্রথলিই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, এবং তার অবস্থাও মারাত্মক। যদি শুধু একটি থলি আক্রান্ত হতো তবে সেটি কেটে বাদ দিলে তিনি বোধহয় রক্ষা পেতেন। এমন অবস্থাও আশঙ্কাজনক। শতকরা ৪০ ভাগ রুগীও বাঁচে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাবার দুটি মূত্রথলি রোগাক্রান্ত, এক্ষেত্রে কোনো কিছুই করা যাবে না। যদিও তখন পর্যন্ত তাঁকে দেখে বোঝা যেতো না যে তিনি এত অসুস্থ। শিগ্‌গিরই তাঁকে একেবারে শয্যাশায়ী হতে হবে। তিনি বড়জোর আর এক বছর কি দু'বছর বাঁচতে পারেন।

ডাক্তার কাটো তখন তাঁকে সোজা না বলে ঘুরিয়ে সাবধান করে দেন, 'এসব জিনিস তাচ্ছিল্য করবার নয়। এখন থেকে সপ্তাহে একদিন কি দুদিন আমি নিজে গিয়ে আপনাকে দেখে আসব। বর্তমানে আপনার বাড়ীতে যতটা সম্ভব বিশ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন।' তিনি আরো বললেন, 'এখন থেকে আমি আপনাকে স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করব। বর্তমান অবস্থায় নিঃশ্বাস দ্বারা সংক্রামিত হবার ভয় নেই। অতএব আপনার পরিবারের অন্যান্যদের সম্বন্ধে চিন্তা করবেন না। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে সাবধানে থাকতে হবে।'

বাবা প্রশ্ন করেন, 'এ কি কোনো রকমের ক্ষয় রোগ?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু এ রোগ ফুসফুসের যক্ষ্মা নয়।'

'এটা তাহলে কি?'

'রোগজীবাণু মূত্রথলিকে আক্রমণ করেছে। মূত্রথলি যখন দুটি তখন অত ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি।'

ডাক্তার কাটো সেই মুহূর্তে বাবাকে এইভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন, এবং বাবাও শান্তভাবে তাঁর আদেশ মেনে নিয়েছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, 'আমি রোগের গুরুত্ব বুঝেছি। আপনি যা বলবেন তাই করব। তবে আমি হাঁটতে ভালবাসি। যতদিন আমি চলেফিরে বেড়াতে পারব ততদিন আমিই আপনার অফিসে আসব।'

বাবা ডাক্তার কাটোর কাছে যাওয়া বজায় রাখলেন। স্পষ্টই বোঝা যচ্ছিল যে তিনি ডাক্তারকে বাড়ীতে আনতে চান না। বেশীর ভাগ সময় তিনি একাই যেতেন। কখনো কখনো মা সঙ্গে যেতেন। যদিও ডাক্তার কাটো মাকে তাঁর স্বামীর অবস্থা সম্পূর্ণ জানানো উচিত মনে করেছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁকে সব খুলে বলবার সুযোগ তিনি পাননি।

একদিন বাবা ডাক্তার কাটোকে অবাক করে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তার আমি আর কতদিন আছি?'

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন?'

বাবা ম্লান হেসে বললেন, 'আমার কাছে লুকোবার প্রয়োজন নেই। এ সম্বন্ধে প্রথম থেকেই আমার মন বলছিলো।'

ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু, কেন?'

'জানি না, আপনি হয়তো বলবেন সহজাত বোধ। এই বোধ আমার আছে। কি আর করা যায় ডাক্তার? আমি জানি কি এর পরিণতি। সুতরাং আমাকে সত্যি কথাটা বলবেন?'

বাবার চরিত্র সম্বন্ধে ডাক্তার কাটো সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তাই তাঁর কথাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাবা চিরদিনই তীক্ষ্ণ-বীক্ষণশক্তিসম্পন্ন। সম্ভবত বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার ধরন দেখে তাঁর রোগের অবস্থা এবং গুরুত্ব আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। ডাক্তার কাটো ভেবেছিলেন যে বাবা যদি এতই প্রস্তুত তখন তাঁকে সব জানিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। অথচ বাবার প্রশ্নকে না এড়িয়ে ডাক্তার কাটো তাঁর ভয়কে স্বীকৃতি দিলেন।

এই কথাই ডাক্তার কাটো আমায় বলেছিলেন। তারপর, তিনি আমাকে সতর্ক করে আরো বললেন যে প্রায়ই শেষ অবস্থায় এই রোগ ফুসফুসে ছড়িয়ে যায়। কাজেই কেবল মাত্র আমার মা নন, আমাদের সকলকেই সাবধান হতে হবে।

এবার এই কাহিনীর যে অংশে এসেছি তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর।

আমি নেহাতই পরীক্ষামূলকভাবে কাহিনীর নামকরণ করেছি--"স্বপ্নের সেতু"। যতই কাঁচা ও অপেশাদারীভাবে লেখা হোক না, কাহিনীটি আমি উপন্যাসের রীতিতেই রচনা করেছি কিন্তু যা কিছু আমি লিখেছি তা সবই ঘটেছে, এতটুকু মিথ্যাভাষণ এতে নেই। তবু, আজ যদি কেউ প্রশ্ন করে, কেন এই কাহিনী লিখতে শুরু করলাম, কোনো উত্তর দিতে পারব না। লোকে আমার লেখা পড়বে এরকম কোনো বাসনা নিয়ে লিখতে শুরু করিনি। অন্ততঃ আমার জীবিতকালে কেউ এই লেখা দেখে—এ আমার ইচ্ছে নয়। আমার মৃত্যুর পর এই রচনা কারো হাতে পড়লে ক্ষতি নেই। যদি এ কাহিনী বিস্মরণের আড়ালে হারিয়ে যায় তাতেও মনে কোনো খেদ রাখব না। লেখবার জন্যই লেখনী ধরা, কারণ আমি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে একটির পর একটি অতীত ঘটনা স্মরণ করে আনন্দ পেয়েছি। অবশ্য, আমি যা কিছু লিখেছি তা অবিকৃত সত্য। নিজেকে আমি সামান্যতম বিকৃতি বা মিথ্যাভাষ করতে দেই নি। কিন্তু সত্যালাপেরও একটা সীমা আছে এবং সেই সীমারেখা পার হওয়া অনুচিত। আর সেই কারণেই আমি যদিও অসত্য লিখিনি তবু সম্পূর্ণ সত্যও প্রকাশ করিনি। যা কিছু অলিখিত রয়েছে তা সম্ভবত বাবা, মা এবং আমার নিজের প্রতি বিবেচনা করেই করা হয়েছে। কেউ যদি বলেন সব কিছু প্রকাশ না করা মিথ্যা, তা হবে তাঁর স্বরচিত ব্যাখ্যা। আমি সে কথা অস্বীকার করবার কোনো চেষ্টা করব না।

বাবার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার কাটো আমাকে যা বলেছিলেন তা আমার কাছে এক দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়েছিল। গত শরৎকালে যদি বাবা তাঁর এই দুর্ভাগ্যের কথা জেনে থাকেন তাহলে তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর, মার ৩০ আর আমায় বয়স ১৮ বৎসর। ৩০ বছর বয়সে মাকে ৪।৫ বছর কমই দেখাতো। লোকে তাঁকে আমার বোন বলে মনে করত। ওকেন বনের ভেতর মন্দিরের পথে যেতে যেতে আমাকে মার পূর্বজীবনের যা যা বলেছিল তা হঠাৎ মনে পড়লো। ওকেন বলেছিল, 'তুমি তোমার বাবাকে এ কথা জানতে দিও না।' সে কি বাবার বিনানুমতিতে একাজ করেছিলো? হয়তো আমার নিজের মা ও সৎ মায়ের যোগসূত্র ছিন্ন করতে চাইবার বিশেষ কোনো কারণ ছিল বাবার। দুই মা আমার মনে নিবিড়বন্ধনে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

এ ছাড়া রেশমতরু-শিবিরে যা ঘটেছিল তাও আমি ভেবে দেখেছি। সে ঘটনার সঙ্গে সম্ভবতঃ বাবার কিছুটা সম্পর্ক ছিল। এ প্রায় অসম্ভব যে বাবার অনুমতি ছাড়া মা অমন নির্লজ্জভাবে আমাকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করবেন। বস্তুতঃ এই ঘটনার পরে বেশ কয়েক সপ্তাহ আমি চা শিবির থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু মার স্তন্যপান করতে সেখানে একবারের চাইতে বেশী বারই গিয়েছিলাম। সে সময় বাবা কখনো বাইরে কখনো

বাড়ীতে থাকতেন। মার গতিবিধি তাঁর অজ্ঞাত অথবা মা তাঁর কাছে একথা গোপন করেছেন এও ভাবা যায় না। আর বেশীদিন বাঁচবেন না জেনেই হয়তো বাবা মার এবং আমার মধ্যে এক গভীর অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যেন মা ভাবেন তাঁর জীবনে বাবার জায়গা আমি নেব। এইটুকু মাত্র বলতে পারি মাও কোনো আপত্তি জানান নি। যাই হোক তাকেশিকে সোরিয়ুতে পাঠানোর ব্যাখ্যা এই যুক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। মনে হতে পারে বাবা মার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভ্রান্ত, আমি কল্পনা করে লিখছি। কিন্তু বাবা মৃত্যুশয্যায় যা বলে গিয়েছিলেন তা আমার ধারণাকে অভ্রান্ত প্রমাণ করে।

বাবার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে একথা মা প্রথম কবে জানতে পারলেন তা আমি জানি না। সম্ভবতঃ বাবা নিজে জানবার সঙ্গে সঙ্গে মাকে জানান। কিন্তু সেদিন দুপুরে চা ঘরে তিনি যে 'তোমার মা' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন তা কি কেবল কথার কথা মাত্র না তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ব্যবহার? মনে হয় মে মাসে তাকেশির জন্মের আগেই বাবা মাকে তাঁর রোগের কথা জানিয়েছিলেন। কোন দিনই বাবা আর মা-র মধ্যে এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয় নি, কিন্তু রোগের পূর্বাভাস পেয়ে হয়ত তাঁরা এক মানসিক প্রস্তুতিতে পেঁাছিয়েছিলেন। জেনেই তাঁরা তাকেশিকে অন্যত্র প্রতিপালনের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার বাবার কাছ থেকে আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কায় মাকে কখনো নিরুৎসাহ বা বিষণ্ণ দেখিনি। নিজের মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করা মার স্বভাববিরুদ্ধ তবু সেই অনুপম সুন্দর নির্বিকার মুখে অন্তর্লীন বেদনার ক্ষণিক ছায়াও কি পড়বে না? তিনি নিজেকে সংবরণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তা যেন আমি দেখতে না পাই, তা ভেবেই কি মা জোর করে চোখের জল রুদ্ধ করে রাখতেন?

যখনি মার চোখে চোখ পড়েছে, দেখেছি তাঁর চোখ নির্মল অশ্রুহীন। আজ পর্যন্ত আমি বুঝি নি মার এই বাহ্যিক স্থৈর্যের আড়ালে ছিল কোন জটিল মানসিকতা। বাবার অন্তিম মুহূর্তে পেঁাছাবার আগে পর্যন্ত মা কখনো তাঁর আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চাইতেন না।

ভাদ্র মাসে বাবার বিছানা থেকে ওঠবার শক্তিটুকুও চলে গেলো। তাঁর সমস্ত শরীর ফুলে গিয়েছিল। বাবাকে দেখতে ডাক্তার প্রায় রোজই আসতেন। বাবা ক্রমশঃই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। উঠে বসে খাবার ইচ্ছেও আর রইল না, সেই সময় মা কদাচিৎ বাবার রোগশয্যা ছেড়ে যেতেন।

ডাক্তার কাটো মাকে বললেন, 'রুগীর সেবার জন্য সেবিকা নিযুক্ত করা উচিত।'

মা উত্তর দিলেন, 'ওঁর সেবা আমি নিজেই করব।' মা অন্য কাউকে বাবাকে স্পর্শও করতে দিতেন না। বাবারও তাই ইচ্ছে ছিল। যদিও বাবা একসঙ্গে দু'এক গ্রাসের বেশী খেতে পারতেন না, তবু তাঁর প্রতিবারের প্রত্যেকটি পথ্য সযত্নে আয়োজন করতেন মা। যে সুখাদ্য-গুলি যেমন সামুদ্রিক মাছ বা মিঠে মাছ ইত্যাদি বাবা ভালবাসতেন মা তাই রান্না করিয়ে বাবাকে পরিবেশন করতেন। ক্রমশঃই বাবার ঘন ঘন মূত্রত্যাগের প্রয়োজন হত বলে মাকে সব সময় বাবার শয্যাপার্শ্বে প্রস্তুত থাকতে হতো। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বাবার শয্যাক্ষতের যন্ত্রণা শুরু হল। মা বারবার বাবার সমস্ত শরীর সুরাসারমিশ্রিত লোশন দিয়ে ধুয়ে দিতেন। এসব কাজ তিনি নিজের হাতেই করতেন। বাবার সেবার প্রয়োজনে মার কাছে কোন কষ্টই অসহনীয় মনে হতো না। অন্য কেউ বাবার শুশ্রূষা করতে আসলে তিনি বিরক্ত হতেন। একমাত্র মায়ের সেবায় বাবা কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী এত

উত্তেজিত অবস্থায় থাকতো যে এতটুকু শব্দে বিরক্তি বোধ করতেন। শেষে বাগানের জলচাকীর শব্দও তাঁর সহ্য হত না। জলচাকী চালানো তাই বন্ধ করে দিতে হলো। শেষ অবস্থায় প্রয়োজন হলে বাবা মা ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজন তাঁকে দেখতে আসতেন। বাবা এসব পছন্দ করতেন না। মা দিনরাত বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন আমাদের পুরনো ধাত্রী ওকেন এসে সেবার কাজে মার স্থান গ্রহণ করতো। ওকেন এই সময় আমাদের সাহায্য করবার জন্য আবার ফিরে এসেছিলো। আমি মার অদ্ভুত কর্মকুশলতা ও সহনশীলতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

একদিন আশ্বিনের শেষে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির পর, অগভীর স্রোতস্বিনীর জল যখন দুইকূল ছাপিয়ে আমাদের বাগানের পুকুরে উপচে পড়ে তার সব জল ঘোলা করে দিয়েছিল, সেই সময় মার এবং আমার বাবার শয্যাপার্শ্বে ডাক পড়লো। বাবা সোজা হয়ে শুয়েছিলেন, তাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিতে বললেন যাতে সহজেই আমাদের মুখ দেখতে পান। আমাকে তাঁর খুব কাছে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'কাছে এসো তাদাসু, তোমার মা যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুনতে পাবেন।' কথা বলবার সময় বাবা একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন যেন আমার দৃষ্টির গভীরে কি অন্বেষণ করছেন।

'আমার আর বেশী সময় নেই' তিনি বলে চললেন, 'কিন্তু এই তো অবশ্যম্ভাবী এবং আমি আমার ভাগ্যকে মেনেও নিয়েছি। আমি অন্য এক জগতে চলে যাব যেখানে তোমার মা আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। কত বছর পরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবো এ কথা ভেবে আনন্দিত হচ্ছি। কেবল তোমার বিমাতার চিন্তাই আমাকে ব্যথিত করছে। দীর্ঘজীবন তাঁর সামনে রয়েছে, কিন্তু আমি যখন চলে যাব, তখন তাঁর নির্ভর করবার একমাত্র তুমিই থাকবে। তাই ওঁকে ভালবেসে যত্ন করো। সবাই বলে দেখতে তুমি আমার মতো। আমিও তাই মনে করি। যত তুমি বড় হবে তোমাকে তত আরো আমার মতো দেখাবে। তুমি যদি তাঁর পাশে থাকো, তিনি মনে করবেন আমিই রয়েছি। আমার ঐকান্তিক বাসনা তাঁর জীবনে আমার স্থান নেওয়াই যেন তোমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয় এবং এই প্রচেষ্টাই যেন তোমার জীবনের অন্যতম সম্পদ হয়।'

বাবা কখনো আমার চোখের গভীরে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাননি। অনুভব করলাম সেই দৃষ্টির অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি না, তবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যতক্ষণ না সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে সক্ষম হলেন ততক্ষণ থেমে থেমে বাবা বলতে লাগলেন, 'ওঁকে সুখী করবার জন্য তোমাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু নিজের সুখের পরিবর্তে মার সুখের জন্যই হবে এ বিবাহ। বিয়ে করবে এমন একজনকে যে মাকে সুখী করবার কাজে তোমাকে সাহায্য করবে। আমি কাজিকাওয়ার মেয়ের কথা ভাবছিলাম...'

কাজীকাওয়া বহু বছর আমাদের বাগানে নিয়মিত মালীর কাজ করত। কাজী-কাওয়ার সঙ্গে আমাদের ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ ঘটে কারণ সে ও তার সাহায্যকারীরা সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন আমাদের বাগানে কাজ করে। তার মেয়ে সোয়াকোকেও আমরা চিনি। যখন সোয়াকো উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী তখন থেকেই সে প্রতি বছর আয়োই উৎসবের দিনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো।

সোয়াকোর গায়ের রং উজ্জ্বল, মুখ লম্বাটে পুরনো ধাঁচের, তরমুজের বীচির মতো। এই ধরনের মুখ উকিয়োই কাঠের কুলকের প্রতিকৃতিতে দেখা যায়। আমার মনে হয় কিছু লোক তাকে সুন্দরীই বলবে। লেখাপড়া শেষ করবার পর সে আরো বেশী করে মুখে রং

মাখতে শুরু করলো। আমি ভাবতাম যে মেয়ের নির্মল শুভ্র ত্বক তার আবার রং মাখবার কি প্রয়োজন? গত বছরের আগের বছর নিদাঘ উৎসবের সময় কামো নদীর ধারে বহ্যুৎসব দেখে ফিরবার পথে সোয়াকো আমাদের বাড়ী এসেছিল। খুব গরম লাগছে বলায় আমরা তাকে আমাদের এখানে স্নান সেরে নিতে বলি। স্নান শেষ করে সে যখন আমার পাশ দিয়ে চলে গেলো, লক্ষ্য করলাম তার মুখের চামড়ায় অল্প অল্প দাগ। এ থেকে বোঝা যায় সে কেন মুখে রং ব্যবহার করে। এরপরে তাকে অনেক দিন দেখিনি। দিন দশেক আগে সে আর কাজিকাওয়া বাবাকে দেখতে এসেছিলো। তাদের উপস্থিতি আমার কাছে খুব বিরক্তিকর মনে হলো। যে বাবা কারো সঙ্গে দেখা করতে চান না, তিনি এদের তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। এমন কি কুড়ি মিনিটের ওপর তাদের সঙ্গে কাটালেন। কিছু একটা ঘটছে তখুনি বুঝতে পেরেছিলাম। সুতরাং তিনি যে এরকম একটা কিছু বলবেন তা আমি আন্দাজ করেছিলাম।

বাবা বলতে লাগলেন, 'তুমি নিশ্চয় মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কিছুই জান।' এরপর মেয়েটি দেখতে কেমন এবং কি ভাবে মানুষ হয়েছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। কিন্তু এসব কথা আমার কাছে নতুন নয় কারণ বহু বছর এর কথা আমি শুনে আস্‌ছি। মেয়েটির বয়স উনিশ, ১৯০৬ সালে জন্ম, আমারই সমবয়সী। সোয়াকো বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাময়ী, তিন বছর আগে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে অত্যন্ত ভালভাবে পাশ করে বেরিয়েছে। এরপর থেকে সে একটা না একটা কিছু লিখছেই যা তাকে প্রায় সর্বগুণান্বিতা করে তুলছে। মালীর মেয়ের কাছ থেকে এ আশা করা যায় না। যে কোনো মালী পরিবারের বধূ হবার সব প্রয়োজনীয় গুণ তার ছিল। কেবল তার জন্ম ১৯০৬ সালে, যা পুরাতন বর্ষ-পঞ্জী মতে আগ্নেয় যোটক বৎসর। কুসংস্কার বলে,—এই বছরে যে কন্যার জন্ম সে অত্যন্ত কলহপ্রিয়া হয়। ফলে এখন পর্যন্ত তার কোন ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসেনি।

এ সবই আমার জানা ছিল। বাবা আমাকে সোয়াকোকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে অনুরোধ করে তাঁর কথা শেষ করলেন। তিনি আরো বললেন যে কন্যা ও কন্যার বাবা-মা সকলেই এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করবে। 'তুমি যদি এই প্রস্তাবে রাজী হও তবেই সব সুন্দরভাবে সমাধা হয়। কিন্তু তোমাকে আরো একটি অনুরোধ আমি করব। যদি তোমার সন্তান হয় তবে তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিও। তোমার মা যেমন তাঁর সন্তানকে তোমারি জন্য অন্যত্র পাঠিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে সোয়াকো বা তার বাবা মাকে বলবার প্রয়োজন নেই। সময়মত তাদের বললেই হবে। যত শীঘ্র তুমি বিবাহ করো ততই মঙ্গল। শোকের নির্দিষ্ট সময় পার হলেই শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে। এ মুহূর্তে আমি উপযুক্ত ঘটকের কথা ভাবতে পারছি না। তুমি ও তোমার মা কাজিকাওয়ার সঙ্গে আলোচনা করে একজন ঘটক নিযুক্ত করো।'

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবার পর বাবা চোখ বুজলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বোধ হল তিনি যেন পরম নিশ্চিন্ত হলেন যে আমি তাঁর সব ইচ্ছাই পূরণ করব। মা ও আমি তাঁকে ধীরে ধীরে সোজা করে শুইয়ে দিলাম।

পরদিন থেকে বিষাক্ত মূত্ররোগের সব লক্ষণ প্রকাশ পেল। খাওয়া বন্ধ হলো, চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল, মাঝে মাঝে প্রলাপোক্তি করছিলেন। এরপর আরো তিনদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্যে কেবল আমার মায়ের নাম 'চিনু' কথাটাই আমরা ধরতে পারতাম। আর বারে বারে তিনি উচ্চারণ করতেন "স্বপ্নের সেতু"। এই আমার

বাবার শেষ উচ্চারিত কথা।

ভাদ্র মাসে ওকেন আমাদের সাহায্য করতে গ্রাম থেকে এসেছিল। বৌদ্ধমতে সপ্ত দিবসের প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই সে নিজের বাড়ী ফিরে গেল। যে সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বহু বছর দেখা হয়নি তাঁরা ৩৫ দিনের আর ৪৯ দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আমাদের গৃহে সমবেত হলেন। তবে যত দিন যেতে লাগলো ততই তাঁদের সংখ্যা ক্ষীণ হতে লাগলো। শত দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন মাত্র দু'তিন জন।

পরের বসন্তে আমি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হলাম। আমার অমিশুক বাবার মৃত্যুর পর যে স্বল্প সংখ্যক বন্ধুবান্ধব "হিরণের নীড়ে" যাতায়াত করতেন তাঁরাও ক্বচিৎ দর্শন দিতেন। অবশেষে কেবল সোয়াকো ও তার বাবা মা-ই সপ্তাহে একবার করে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসত। মা সারাদিন বাবার স্মৃতিফলকের সামনে পুজো আর প্রার্থনায় কাটাতেন। কখনোবা চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন হলে তিনি আমার মা-র কোটো বার করে বাজাতেন। আমাদের বাড়ী এতই নিঃশব্দ ও নির্জন মনে হতো যে মা আবার বাঁশের জলচাকী চালু করতে বললেন। কাজিকাওয়া এক টুকরো সবুজ বাঁশ কেটে চাকী চালু করলো। আমি আবার সেই অতিপ্রিয়, অতিপরিচিত খট্ খট্ শব্দ শুনতে লাগলাম।

গত বৎসর বাবাকে নিপুণভাবে সেবা করবার ক্লান্তি মা অতি নিঃশব্দে বহন করেছেন। এমন কি বাবার মৃত্যুর পর অনেকদিন ধরে বৌদ্ধ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকালেও তিনি সংহতচিত্তে আপন মহিমায় অতিথিদের অভ্যর্থনা করেছেন। আগের মতই সুডৌল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখাতো তাঁকে। কিন্তু হালে তাঁর শরীরে অবসাদের চিহ্ন দেখা দিচ্ছিলো। মাঝে মাঝে ঝিদের কাউকে দিয়ে তিনি মালিশ করাতেন। সোয়াকো থাকলে সে মালিশ করে দিতে চাইতো।

সবে রেশম গাছে ফুল ফুটতে শুরু করেছে, এমনি সময় একদিন আমি মা-কে ও সোয়াকোকে চা ঘরে দেখতে পাবো জেনেই সেখানে উপস্থিত হলাম। মা তাঁর অভ্যস্ত স্থানে দুটি তাকিয়া পেতে শুয়ে আছেন। সোয়াকো জোরে জোরে তাঁর হাত মালিশ করছে।

আমি মা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সোয়াকো বেশ ভালই মালিশ করে না?'

'ও চমৎকার মালিশ করতে পারে। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কাউকে তো আমি জানি না। ওর মালিশ ঘুমের আবেশ এনে দেয়। আমি তো প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ি— কি যে মোহময় স্পর্শানুভূতি।'

'সোয়াকো জানে কি ভাবে নিজের হাতকে ব্যবহার করতে হয়। তুমি কি কখনো মালিশ করা শিখেছো?'

সোয়াকো উত্তর দেয়, 'না, না শিখিনি কখনো। আমি শুধু বাবা মাকে প্রতিদিন মালিশ করে দিতাম।'

মা বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ও যে পেশাদার মালিশ-কারিয়েদেরও লজ্জা দেবে এ আর আশ্চর্যের কি? তাদাসু, ওকে একবার তোমাকে মালিশ করে দিতে দিও।'

'আমার মালিশের দরকার নেই। তবে আমি ওর ছাত্র হব মালিশ করা শিখবার জন্য।'

মা প্রশ্ন করেন, 'তুমি কেন শিখতে যাবে?'

'তাহলে আমিই তোমাকে মালিশ করে দিতে পারবো। এটুকু আমার জেনে রাখা উচিত।'

'কিন্তু তোমার হাত যা শক্ত—'

'যদিও আমি পুরুষ কিন্তু আমার হাত শক্ত নয়, তাই নয় কি সোয়াকো? একবার আমার হাত ধরে দেখ না!'

'দেখি, দেখি', সোয়াকো আমার আঙ্গুলগুলো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হাত বুলিয়ে বলে,—'বাঃ। তোমার তো বেশ নরম হাত! তোমাকে দিয়ে খুব ভালো মালিশ হবে।'

'কারণ আমি কখনো বেশী খেলাধুলো করিনি।'

'একবার মালিশের কৌশল শিখতে পারলে তুমি খুব চমৎকার মালিশ করতে পারবে।'

এরপর কয়েক সপ্তাহ আমি সোয়াকোর কাছে মালিশ করার নানারকম কায়দা-কৌশল শিখলাম, আর মা-র ওপর তা' অভ্যেস করলাম। মাঝে মাঝে তাঁর এত শুড়শুড়ি লাগতো যে উচ্চস্বরে হেসে ফেলতেন মালিশ করার সময়।

ভাদ্র মাসে আমরা তিনজন পুকুর পাড়ে বসে শীতল শান্ত সন্ধ্যা উপভোগ করতাম। আমিও বাবার মতো কয়েক বোতল বিয়ার জলচাকীর নলের নীচে রেখে দিতাম। বেশী উপরোধ করলে মা-ও কয়েক প্লাস খেতেন। কিন্তু সোয়াকো সব সময়ই প্রত্যাখ্যান করতো।

মা তাঁর নিরাবরণ পা দুটি পুকুরের জলে ডুবিয়ে বলতেন, 'সোয়াকো, তোমার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখা উচিত, দেখবে কি ভালো লাগে!'

সোয়াকো কিন্তু তার কোমরঘেরা ভারী রেশমের কোমরবন্ধ-বাঁধা নিয়মমাফিক পোশাক পরে শান্ত হয়ে বসে থাকতো আর বলতো, 'আপনার পা দুখানি কি সুন্দর! এর পাশে আমার কুৎসিত পা বার করা অসম্ভব।'

আমার মনে হতো সোয়াকো যেন বড্ড চাপা প্রকৃতির। যে মানুষটি কালে ওর শাশুড়ী হবেন তাঁর কাছে ও আর একটু খোলা, আর একটু ঘনিষ্ঠ হতে পারতো। ওকে বড় বেশী উৎকণ্ঠিত, সব ব্যাপারে অতি আগ্রহান্বিত মনে হতো। প্রায়ই ওর কথার মধ্যে কোথায় যেন কপটতার আভাস পেতাম। এমন কি আমার সঙ্গে ওর ব্যবহারও একজন শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে আশ্চর্য রকম সেকেলে। হয়তো বিয়ের পর ও বদলে যাবে। তবু এই মুহূর্তে ওর আর আমার সম্পর্ক যেন প্রভু ভৃত্যের পর্যায়ে। হয়তো ওর চরিত্রের এই দিকটা বাবাকে মুগ্ধ করেছিল। মা-র দৃঢ় ও অনমনীয় চরিত্রের পাশে সোয়াকাকে অত্যন্ত নম্র ও সংকুচিত মনে হতো। সে তো আমাদের এই ছোট পরিবারের তৃতীয় প্রাণী হতে চলেছে, তারপক্ষে সে যেন কেমন অসম্পূর্ণ।

রেশমী ফুল ঝরে যাবার মাস দুয়েক পরে সবে মার্টল ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে আর গাছে গাছে কলা পেকেছে, ততদিনে আমি মালিশে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছি। প্রায়ই মা-কে মালিশ করিয়ে নেবার জন্য চা ঘরে আসতে অনুরোধ জানাতাম।

মা বলতেন, 'তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন দাও কয়েক মিনিটের জন্য।'

সোয়াকো উপস্থিত না থাকলে স্বভাবতই আমি তার পরিবর্তে মালিশ করতাম। তাছাড়া সে যখন আমাদের সঙ্গে থাকতো তখনও তাকে সরিয়ে দিয়ে বলতাম, 'আমাকে একটু মালিশ করতে দাও, তুমি শুধু দেখ ঠিক হচ্ছে কিনা!'

মা-র স্তনপান করবার কথা কিছুতেই আমি ভুলতে পারছিলাম না। তাই এখন আমার একমাত্র আনন্দ মা-কে মালিশ করা। এই সময় সোয়াকো তার বিদেশী কায়দায় চুল বাঁধা ছেড়ে চুড়ো করে প্রাচীন সিমাডা প্রথায় চুল বাঁধতে শুরু করল। এই রীতিতে চুল বাঁধায় তার ওকিয়োই ধাঁচের মুখখানি সুন্দর দেখাতো। সোয়াকো মনে হয়, বাবার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে বৌদ্ধ উপাসনা হবে তার জন্য তৈরী হচ্ছিল। মা নিজেও এই

বিশেষ দিনের জন্য জামাকাপড় তৈরী করাতে দিয়েছিলেন। মা-র নতুন পোশাকের মধ্যে প্রথা অনুযায়ী একটি গাঢ় বেগুনী ছাপা রেশমী পোশাক, যার নিম্নাংশে হলিহক ফুলের নকশা আর কোমরের কাছে মোটা বুনুনির শুভ্র রেশমী কোমরবন্ধে সাতটি শরতের ফুলের ছাপ ছিলো।

বার্ষিক শ্রাদ্ধের কাজ হায়কুমামবেন মন্দিরে সম্পন্ন হল। মন্দিরের নিজস্ব অভ্যর্থনা ঘরে খাওয়া-দাওয়া হলো। মা ও আমি দুজনেই লক্ষ্য করলাম যে আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের ব্যবহার কি রকম যেন নিস্পৃহ দূর দূর। কেউ কেউ সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়েই বিদায় নিলেন, আমাদের সঙ্গে বসে খাবার জন্যও অপেক্ষা করলেন না। বাবা এক পূর্বতন রঙ্গনটীকে বিয়ে করবার পর থেকেই আত্মীয়স্বজনেরা এক অদ্ভুত শত্রুতা ও অবজ্ঞার চোখে আমাদের দেখতে শুরু করেছিলেন। মালীর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির হওয়ায় তাঁদের এই মনোভাব আরো বেড়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে যে তাঁরা আলোচনা করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবু আমি তাঁদের কাছ থেকে এতটা অসভ্যতা ও অশিষ্টাচার প্রত্যাশা করিনি। মা তাঁর সহজাত আত্মমহিমায় সব কিছুই মানিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সোয়াকো বেচারী এত সযত্ন পরিশ্রমে অনুষ্ঠান অনুযায়ী সাজ পোশাক করেছিল, এই ব্যবহারে ও মনমরা হয়ে পড়লো। ওর জন্য আমার খুব খারাপ লাগছিল।

মা-কে বললাম, 'আমি ভাবছি আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ অবধি কি হবে? তোমার কি মনে হয় এঁরা আসবেন আমার বিয়েতে?'

'তুমি ভাবছ কেন? তুমি তো ওদের স্বার্থে বিয়ে করছ না। তুমি সোয়াকো এবং আমি এই বিয়েতে সুখী হলেই যথেষ্ট নয় কি?'

আমার বিয়ের ব্যাপারে মা-কে নিরুদ্বিগ্ন মনে হলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করলাম যে আমাদের প্রতি আত্মীয়দের বিরূপতা যতটা আশঙ্কা করেছিলাম তার চাইতে আরো গভীর এবং তিক্ত।

বাবার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ওকেন নাগাহামা এসেছিল। কাজের পরে ও কয়েকদিন আমাদের কাছে থেকে গেল। যাবার দিন সকালে ওকেন আমাকে মন্দিরের ধারে বনের ভেতর ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে বললো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওকেন, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জানি কি বলতে চাও, আমার বিয়ে সম্বন্ধে কিছু, তাই না?'

'কেবল সে কথা নয়।'

'তাহলে বল, আরো কি বলতে চাও।'

'তুমি কিন্তু রাগ করো না তাদাসু।'

'না আমি রাগ করবো না। বলে ফেল কি বলতে চাও।'

'তুমি কারো না কারো কাছ থেকে শুনবেই। সুতরাং প্রথমে আমার কাছ থেকে শোনাই ভাল।' এই বলে ধীরে ধীরে ও আমাকে সব কথা বলল।

এ কথা সত্যি যে আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা আমার আসন্ন বিবাহের বিরোধী ছিলো। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাদের বিরূপতার এই একমাত্র কারণ নয়। মালী কাজিকাওয়ার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধের চেয়ে মা ও আমি তাদের অনেক বেশি সমালোচনার বিষয়। স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে হলে বলতে হয় যে তারা বিশ্বাস করতো যে আমরা অবৈধ সংগমে লিপ্ত।

ওকেন বলেছিল তাদের ধারণা বাবা বেঁচে থাকতেই আমরা এই ব্যভিচার শুরু করি। কখনো সুস্থ হবেন না জেনেই তিনি এই অনাচার সহ্য করেছেন। এমন কি এতে তিনি সায়ও দিয়েছিলেন। কেউ কেউ আরো একটু বাড়িয়ে প্রশ্ন করেছে যে কার সন্তানকে তাম্বাতে লুকিয়ে ফেলা হল। বলতে চেয়েছে যে তাকেশি বাবার সন্তান নয়, আমার সন্তান।

এই আত্মীয়েরা যারা বছরের পর বছর আমাদের এড়িয়ে চলেছে তারা আমাদের সম্পর্কে কি এমন কথা শুনেছে যে এরকম উৎকট গুজব রটালো! ওকেন বলল, আমাদের চারপাশের প্রতিবেশীরা বহুদিন থেকে আমাদের সম্বন্ধে এই ধরনের গল্প করতেন আর গুজব রটাতেন। বোধ হয় তারা সবাই খবর রাখত যে মা ও আমি নিভৃতে চা ঘরে সময় কাটাতাম। এই কারণে মনে হয় গুজব প্রথম থেকেই রটতে সুরু হয়।

আমাদের আত্মীয়স্বজনদের ধারণা আমার মৃত্যুপথযাত্রী বাবা যে সোয়াকোর সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক করেছিলেন তার অন্যতম কারণ তার মত অবস্থার একটি মেয়ে এই প্রস্তাবে অরাজী হবে না। বিয়ে করে আমার বাইরের মুখোস বজায় রাখতে হবে। সোয়াকোর সঙ্গে আমার বিয়ের সবচেয়ে লজ্জাকর কারণ আমার বাবা নাকি চেয়েছিলেন নামমাত্র বিয়ে করে বিমাতার সঙ্গে আমার অবৈধ সম্পর্ক বজায় রাখা। কাজিকাওয়া এসব জানত। সোয়াকো তার বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ মত দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য তাদের দু'জনেরই (আত্মীয়দের মতে) আমাদের সম্পত্তির উপর নজর ছিল। এই ব্যাপারে প্রথমে বাবার তারপর মা, আমার, কাজিকাওয়া ও সোয়াকোর কতটা অংশ রয়েছে তা চিন্তা করে আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করেছিল।

আমাকে সাবধান করে ওকেন বলল, 'লোকেরা কানাকানি করে এ আমরা সবাই জানি কিন্তু এরা এমন নিকৃষ্ট ধরনের কুৎসাও রটনা করতে পারে।' এই বলে ওকেন চোখের কোণ দিয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

উত্তর দিলাম, 'ওরা যা বলে বলুক। এরকম কুৎসা কিছুদিন পরে লোকে ভুলে যায়।'

বিদায় নেবার সময় ওকেন দ্বিধান্বিতভাবে বলল, 'দেখ, হয়তো সামনের মাসে বিয়েতে আত্মীয়েরা আসতেও পারেন।'

এর পরের ঘটনাগুলো খুঁটিয়ে বলার মত উৎসাহ আমার নেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়ত উচিত।

আমাদের বিয়ের উৎসব অগ্রহায়ণের শেষে এক শুভদিনে সম্পন্ন হয়েছিল। মা-কে খুশী করবার জন্য আমি সকাল বেলার পোশাক না পরে বাবার কালো রেশমের কিমনো পরেছিলাম। অনুষ্ঠানে খুব অল্পসংখ্যক আত্মীয়স্বজনেরা যোগ দিয়েছিলেন। এমন কি মায়ের আত্মীয়স্বজনরাও আসেন নি। কাজিকাওয়া পরিবারের সম্পর্কিত লোকেরাই বিশেষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। ডাক্তার কাটো ও তাঁর গৃহিণী সস্নেহ হৃদয়তার সঙ্গে এ বিয়েতে মধ্যস্থতা করেছিলেন। বহুদিন থেকেই ডাক্তার কাটো 'নো' নাট্য চর্চা করছিলেন। খুশী মনে "টাকাসাগো" থেকে চিরাচরিত প্রথামত আবৃত্তি করে তিনি সকলকে খুশী করলেন। তাঁর গল্প শুনতে শুনতে আমার মন কোথায় কত দূরে চলে গেল।

বিয়ের পরেও আমার ও মা-র প্রতি সোয়াকোর কোনো বিশেষ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। আমরা কয়েকদিন নারা এবং ইসেতে মধুচন্দ্রিমা কাটিয়ে এলাম। সব সময় আমি সন্তানসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করতাম। এই ব্যাপারে কখনো

অবহেলা করিনি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো মা তাঁর নববিবাহিত ছেলে বউ-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে গেছেন। বাবার মৃত্যুর পরেও মা বারো মাদুর ঘরেই শুতেন। সোয়াকো আসবার পরে মা সে ঘরেই রয়ে গেলেন। সোয়াকো আর আমি আমার ছোট্ট ছয় মাদুর ঘরে শুতাম। আমাদের মনে হতো এটাই উচিত কারণ আমি তখনও পরনির্ভর এবং পড়াশুনো করছি। সেই একই কারণে মা তখনও সংসারের হিসাবপত্র দেখাশুনো করতেন।

মা-র দিনগুলো চিন্তাভাবনাহীন পরম আলস্যে কাটছিল। মা 'কোনো' রীতির অক্ষর আঁকা অভ্যাস করে, প্রাচীন জাপানী সাহিত্য পড়ে, কোটো বাজিয়ে অথবা বাগানে বেড়িয়ে সময় কাটাতেন। দিনে অথবা রাত্রিতে যখন তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন আমাদের খবর দিতেন মালিশ করবার জন্য। দিনের বেলা মা চা ঘরে মালিশ করাতেন। কিন্তু রাত্রে সোয়াকোকে নিজের শোবার ঘরে ডেকে নিতেন। কখনো কখনো আমরা থিয়েটারে যেতাম কখনোবা বেড়াতে। মা কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন, বিশেষ করে সোয়াকোর খরচ সম্বন্ধে। বেচারী সোয়াকোকে খাওয়া দাওয়ার খরচ নিয়ে খুব চিন্তায় পড়তে হতো। দিনে দিনে মা-কে আরো উজ্জ্বল ও যৌবনোচ্ছ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি এত গোলগাল হয়ে উঠছিলেন যে তাঁর দ্বিতীয় চিবুকের আভাস দেখা দিয়েছিলো, মনে হতো বাবা চলে গিয়ে তাঁর সব চিন্তার অবসান হয়েছে।

এই ভাবেই আমাদের জীবনযাত্রা চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'বছরের পড়া শেষ হলো। এই সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের এক রাত্রে ১১টার সময় শুতে যাবার একটু পরেই সোয়াকো এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালো।

মা-র শোবার ঘরের দিকে আমাকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তোমার মা-র সাংঘাতিক কিছু হয়েছে।' চীৎকার করে আমি ডাকতে থাকি, 'মা, কী হয়েছে?' কোনো উত্তর নেই, মুখ নীচু করে মা উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন, দু'হাতে বালিশ আঁকড়ে ধরেছেন। ক্ষীণ গোঙানির আওয়াজ আসছে।

'তোমাকে দেখাচ্ছি কি করে এই অবস্থা হলো' বলে সোয়াকো খাটের মাথার দিকের মেঝে থেকে গোল পাখাখানা তুলে দেখালো মস্ত বড় একটা থ্যাঁতলানো বিছে। সোয়াকো বলল যে মা মালিশ করে দিতে বলাতে সে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মালিশ করছিল। মা উপুর হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছিল। সোয়াকো পা থেকে শুরু করে হাঁটু অবধি মালিশ করে দিচ্ছিল। হঠাৎ মা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন, তাঁর দু' পা বেঁকে যেতে লাগল। সোয়াকো ভয় পেয়ে তাকিয়ে দেখে একটা বিছে মা-র বুকের ওপর হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি হেঁটে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাছের পাখা দিয়ে ঝেড়ে বিছেটাকে মাটিতে ফেলে থেঁতলে দিল। সোয়াকো হিমশীতল সাদা মুখে বলে যায়, 'আমি যদি একটু লক্ষ্য করতাম! কিন্তু মালিশ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম।'

তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এসে মা-কে একটার পর একটা ইনজেকশন দিলেন। কিন্তু তাঁর যন্ত্রণা বেড়েই চলল। মুখের পাণ্ডুরতা, শ্বাসকষ্ট, ক্ষীণ নাড়ি সবই বলে দিচ্ছিল তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ডাক্তার কাটো মা-র পাশেই বসে রইলেন, তাঁকে বাঁচাবার জন্য অপরিসীম চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভোর বেলায় অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। কিছু পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ডাক্তার কাটো বললেন, 'এ নিশ্চয় মানসিক আঘাত।'

সোয়াকো চীৎকার করে কেঁদে বলতে লাগলো, 'আমারই দোষ, আমারই দোষ।'

এক তীব্র বেদনা, হতাশা আর ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষারোপ করা গৌরবের কাজ নয়। তবু সর্বক্ষণ একটি সন্দেহকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না।

দাদামহাশয় প্রায় চল্লিশ বছর আগে "হিরণের নীড়" তৈরী করিয়েছিলেন। এই বাড়ী এখন দেখতে সুন্দর হয়েছে, পুরনো হয়ে কাঠের এমন এক রং ধরেছে যা জাপানী পদ্ধতিতে তৈরী বাড়ীর সম্পূর্ণ উপযোগী। দাদামশায়ের আমলে এই বৈশিষ্ট্য ছিল না। যত পুরনো হবে তত এর সাটিন কোমল উজ্জ্বলতাও চলে যাবে। "হিরণের নীড়ে" সবচেয়ে পুরনো হচ্ছে চা ঘর, যা দাদামশায় কিনেছিলেন। বাল্যকালে দেখেছি চায়ের ঘরটি বিছে, কেন্নো ইত্যাদি পোকামাকড়ে ভরা। এরপরে অবশ্য এই ঘরে এবং প্রধান বসত বাড়ীতে প্রায়ই বিছে দেখা যেত। মা যে বারান্দায় শুতেন সেখানে বিছের আনাগোনা কিছু আশ্চর্যের নয়। মা হয়তো প্রায়ই তাঁর ঘরে বিছে দেখেছেন। সোয়াকো হয়তো তাঁকে মালিশ করবার সময় দেখেও থাকবে। তাই ভাবি মা-র মৃত্যু কি সম্পূর্ণ দুর্ঘটনা, কে জানে? কেউ কি বিছে এই কাজে লাগাবার জন্য কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারে না? হয়তো, এ এক মর্মান্তিক ঠাট্টা, বিছের কামড় যে এত গুরুতর হতে পারে তা হয়তো বুঝতেই পারেনি। কেউ কি মা-র দুর্বল হৃৎযন্ত্রের কথাও ভেবেছিল? ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেলেও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে ওখানে ইচ্ছে করে বিছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

এমনও হতে পারে যে বিছেটা হঠাৎ মা-র গায়ে এসে পড়েছিল। অতি সহজেই মা ঘুমিয়ে পড়তেন। মালিশ করবার সময় তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতেন এবং জোরে মালিশ করা তিনি পছন্দ করতেন না। আমাদের মৃদুহাতে মালিশ করতে বলতেন যাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। ঘুম না ভাঙিয়ে তাঁর গায়ে কোন পোকামাকড় ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। কাছে গিয়ে দেখলাম মা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। কিন্তু সোয়াকো বলছে মা চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সোয়াকো মা-র পা মালিশ করতে করতে মুখ তুলে চেয়ে প্রথমেই মা-র বুকের ওপর বিছেটা দেখতে পেয়েছিল। মা তো নগ্ন হয়ে শুয়ে ছিলেন না। তাঁর গায়ে কিমনো ছিল। কি অদ্ভুত! সোয়াকো কি করে পোকাটা দেখতে পেল! কারণ পোকাটা তো কিমনোর ভেতরেই অদৃশ্য থাকবে। সোয়াকো হয়তো জানতো ওখানে বিছেটা রয়েছে।

সবই আমার অনুমান, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু ধারণাটি এমন গভীরভাবে আমার মনে গেঁথে গেছে এবং এমন মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে যে সব ঘটনাটি লিখে ফেলবার চেষ্টা করেছি। স্থির করেছি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন লেখাটি সযতনে গোপনে রাখব।

এরপর আরো তিন বছর কেটে গেছে। দু'বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরোবার পরেই বাবা যে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ছিলেন সেই ব্যাঙ্কে আমাকে কেরানীর চাকরি দেওয়া হয়। গত বসন্তে ব্যক্তিগত কারণে সোয়াকোর সঙ্গে আমি বিবাহ বিচ্ছেদ করেছি। সোয়াকোর বাবার বাড়ী থেকে বিশ্রী ধরনের শর্ত উপস্থিত করেছিল, শেষ অবধি আমাকে তা মেনেও নিতে হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটি এত জটিল ও অপ্রীতিকর যে সে সম্বন্ধে কোন কিছু লেখার ইচ্ছা আমার নেই। যে সময় আমি বিবাহবিচ্ছেদের উদ্যোগ করছিলাম, সেই সময় "হিরণের নীড়"ও বিক্রী করে দিই। এই বাড়ীর সঙ্গে এত সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে! এরপর আমি হনেন মন্দিরের কাছে ছোট একটি বাড়ী তৈরী করালাম, এবং তাকেশিকেও নিজের কাছে আনিয়ে নিলাম। আমার কাছে আসতে তাকেশির এবং তার

পালক পিতামাতার প্রচুর আপত্তি ছিল। আমার ধাত্রী ওকেন তখন নাগাহামাতে অবসর জীবন যাপন করছিল, তাকে অনুরোধ করলাম অন্তত কয়েক বছর আমাদের কাছে থেকে তাকেশিকে দেখাশুনা করবার জন্য। চৌষট্টি বছর বয়স হলেও সে কর্মঠ এবং শিশুদের পরিচর্যার কাজে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিল। ওকেন তার অবসর জীবনের মায়া কাটিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করতে লাগলো। তাকেশির বয়স তখন ছয়। প্রথমে সে আমাদের সঙ্গে থাকতে অস্বস্তিবোধ করত। এখন আমরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। সামনের বছর থেকে ও স্কুলে যাবে। আমার সবচেয়ে আনন্দ যে তাকেশি একেবারে মা-র মতো দেখতে। সে মা-র শান্ত উদার নির্মল চরিত্রের অধিকারী।

আমার আবার বিয়ে করবার কোনো প্রবৃত্তি নেই। যতদিন বেঁচে থাকি তাকেশিকে নিয়ে কাটাতে চাই। মা-র সঙ্গে আমার ও-ই একমাত্র যোগসূত্র। আমি নিজের মা-কে হারাই শিশুকালে, একটু বড় হয়ে বাবা, তারপর আমার এই মা-কে হারালাম। তাই যতদিন না তাকেশি বড় হয় ততদিন বেঁচে থাকতে চাই। যে নিঃসঙ্গতা আমি ভোগ করেছি তা' থেকে তাকেশিকে রক্ষা করতে চাই।—ওটোকুমি তাদাসু

১৫ই জুলাই, ১৯৩১ (মা-র মৃত্যুবার্ষিকী দিবস)

অনুবাদ : সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

বাংলা দেশ, land made for poetry, সমালোচনা বিভাগে সমান গৌরবের অধিকারী নয়। বিচার, বিতর্ক ও বহু উল্লেখ্য ক্ষেত্রে মতবিরোধ বাঙালীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, অথচ নিপুণ, গ্রহণযোগ্য, উদার বিশ্লেষণ নির্ধারণে তৎপরতার অভাব হামেশাই চোখে পড়ে। সমালোচনার আসরে সচরাচর নিন্দুক অথবা নির্বোধ সমর্থকগোষ্ঠীরাই সরব। 'আধুনিক' কুরুক্ষেত্র বা 'আধুনিকতাকে' কেন্দ্র করে কুরুক্ষেত্র তারই নব্য সংস্করণ। ঔদার্য বা 'ডায়ালগে'র বিশেষ চিহ্ন সেখানে নেই। রবীন্দ্র-সমালোচনার বিস্তীর্ণ ও বহুজনকর্ষিত ক্ষেত্রে এই অভাবের নিদর্শন সবচেয়ে বেশি প্রকট। সপক্ষে বা বিপক্ষে, এর বেশির ভাগই সমালোচনা নয়, মোহিতলালের ভাষায় সুখালোচনা।

অবশ্য সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। 'অন্তরে অন্তরে প্রবাসী', আবু সয়ীদ আইয়ুব, সেই চতুর্দশবয়স্ক কিশোর, উর্দু তর্জমার সাহায্যে গীতাঞ্জলির সঙ্গে যার প্রথম পরিচয়, সহৃদয় রসিক এই ব্যতিক্রমের উদাহরণ। রচনা প্রকাশে মিতাচার সত্ত্বেও বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের জগতে আইয়ুবের স্থান অগ্রগণ্যদের মধ্যেই নির্দিষ্ট। এককালীন বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই। আজ হয়তো তিনি আর আগের মতন 'আধুনিক' বা 'প্রগতিবাদী' নন, অথবা বলা যেতে পারে সুস্থ ও শাশ্বত মূল্যবোধে বিশ্বাসী আইয়ুবের বর্তমান কাব্যপরিক্রমা ঐতিহ্য এবং 'আধুনিকতা'র অন্যান্য বৈভবেও আস্থা রাখে। কিন্তু এই আস্থা বা প্রতীতির হেতু কোথায়? বিশ্বাস এবং বিচারের পটভূমিকাই বা কি? তত্ত্বালোচনার তেমন অবকাশ আমাদের অবশ্য নেই, যদিও আইয়ুবের একথা অবিদিত নয় যে সৎ সমালোচকের পক্ষে তাত্ত্বিক বিচারের দায় এড়ানো কঠিন। বর্তমান বইয়ের* আলোচনা যে সামগ্রিক নয় সেকথা আইয়ুব জানিয়েছেন, কয়েকটি ইঙ্গিত ও উদাহরণেই তা সীমাবদ্ধ, এবং অজস্র বা অনর্গল ভাষণে তিনি কখনই অভ্যস্ত নন, যদিও তাঁর স্বল্পভাষণ বাগবহুল ও বিচারহীন প্রবন্ধকারদের লজ্জা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বক্তব্যের দার্ঢ্য ও সূক্ষ্ম মনন তাঁর সহজাত। সকলে তাঁর প্রতিটি বক্তব্য বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হবেন না, আইয়ুবও তা আশা করেন না। তবে সাধারণভাবে তাঁর বক্তব্য ও বিচার প্রায় অকাট্য এবং স্বল্পসংখ্যক হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ছাড়া প্রায় সকলেই তাঁর টীকার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন।

আইয়ুবের অন্যান্য রচনার মত এরও একটি নিজস্ব পদ্ধতি বা বক্তব্যের ধারা রয়েছে। বইটি মোটামুটি তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ: প্রথমটিতে 'আধুনিকতা'র যে বিশেষ সংজ্ঞাটির উপর অ-রাবীন্দ্রিক বা রবীন্দ্রবিরোধীদের আশ্চর্য অভিনিবেশ তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ও বিচার পাওয়া যাবে। কারণ এই প্রতীকি বা অমঙ্গল 'অশুভ' ধারাটিই বাংলা কাব্য সাহিত্যে অধিকতর পরিচিত ও মনে হয় অধুনালালিত। দ্বিতীয় পর্বে 'আধুনিকতা'র পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রকাব্যের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা। একাধিক গবেষকের জন্য অসংখ্য ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ তাঁর এই ভাবদীপ্ত পরিশীলিত টীকা। আলোচনার তৃতীয় পর্বে, অধিকতর ব্যাখ্যার সন্ধানে, তিনি আবার 'আধুনিক' তত্ত্ব বিচারে বসেছেন। 'শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্য-

* আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব। ভারবি। কলিকাতা ১২। মূল্য আট টাকা।

নীতি', 'কবিতার ভাষা' এবং 'অন্তিম পর্বের দুটি কবিতা'-র তত্ত্বসম্বন্ধ ব্যাখ্যায় 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথে'-র কাব্যপরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে।

যদিও 'আধুনিকতা'র মাত্র দুটি লক্ষণই আইয়ুব বেছে নিয়েছেন—কিন্তু কেন?—সমগ্র বইটিতে তিনি একাধিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছেন, দু-একটি বিষয়ে সমস্যা হয়তো আরো জটিল হয়েছে। 'আধুনিকতা'র যে দুটি লক্ষণ আইয়ুব বেছে নিয়েছেন তারা যে আলোচনার কেন্দ্রস্থলে সন্দেহ নেই। তারা হোলো : (১) কাব্যে দেহাত্মবাদ, অর্থাৎ বক্তব্য বর্জনের পথে কাব্যের মুক্তি, শব্দপ্রধান স্বয়ংসম্পূর্ণতা (মালার্মের মহাবাক্য স্মরণীয়) ও সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার পাল্লা দেবার প্রয়াস বা প্রহসন*; (২) 'আধুনিক' লেখকদের মধ্যে অশুভ বা অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য, যার প্রবক্তা হিসাবে 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের সম্রাট, সত্য দেবতা', বোদলেয়ারকে নেওয়া হয়ে থাকে। এই দুটি পরস্পরনির্ভর মূলসূত্র বা সিদ্ধান্ত, ফর্ম ও কনটেন্টের মিলনভূমিতে আধুনিকতার বীজ নিহিত। আইয়ুব দ্বিতীয় ধারাটি, অর্থাৎ অমঙ্গলভিত্তিক তত্ত্বটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব ও আবশ্যক। কাব্যের রূপদেহের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অক্ষমতার (অবিশ্বাস্য) দোহাই দিয়ে সে কাজ থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। এর ফলে আলোচনা কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু এই ব্যাপারটি বাদ দিলে পর তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা জীবনবোধ ও সাহিত্যবিচারের একটি সাধুসম্মত দিগনির্দেশ, আধুনিক অথচ 'আধুনিক' নয়। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে—কেবল কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, উপন্যাসে নাটকেও সে নব্য তরঙ্গের ঢেউ লেগেছে—আধুনিকতার প্রকোপ কিছুটা কমলে আশ্বস্ত বোধ করা যেতো। অন্যথা যে 'আঁধার আলোর অধিক' তাকেই ধ্রুবতারা স্বীকার করতে হয়। ভুলতে বসি 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা। মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা।'

অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক কবি। সেই কারণে রোম্যান্টিকতার অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করলে আইয়ুবের বক্তব্য আরো শক্তিশালী হতে পারতো। যাই হোক, তাঁদের আত্যন্তিক ও নির্বিচার বিদ্রোহের ফলে 'আধুনিকে'র দল কি ভিন্ন কোটিতে হাজির হননি? অর্থাৎ তাঁদের রোম্যান্টিক-বিমুখতাও এক ধরনের রোম্যান্টিকতা। এক কথায়, উলটপুরাণ। অন্যত্র, আইয়ুব ব্যাপারটির এই সরস ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিয়েছেন : 'আধুনিকেরা বিশ্বাস করেন লৌকিক ব্যাপারে চেতনা ও চরিত্র ওলট-পালট হয়ে গেলে লোকোত্তর জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন খুলে যায়।' প্রতিক্রিয়ার তীব্র 'ওলট-পালটে' 'আধুনিকে'র দল, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে, বেশ কিছু চিরায়ত মানব ও শিল্প সত্যকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বসেছেন। ফলে এক সংকীর্ণ, অসুস্থ জীবনবোধ তাঁদের একমাত্র উপাস্য ও উপজীব্য পরিণত হয়েছে। এরই প্রেমে তাঁরা কলংকভাগী। আইয়ুব বলছেন : 'আমার সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে যে রোম্যান্টিকতার মোহ থেকে মুক্তিলাভের ঐকান্তিক সাধনায় আধুনিক কবিরা এমন কিছু থেকে নিজের মনকে বিমুক্ত করেছেন যাতে কবির চিরন্তন ও অব্যর্থ পরিচয়।' তাই, যুগধর্মের প্রতি মমত্বশূন্য না হয়েও এই শ্রেণীর 'আধুনিক'দের বিচার, ব্যবহার, সাহিত্যরীতি অনুমোদন করা কঠিন। মালার্মে এবং সার্ত্র হেন গুণবানের দলও আদতে ফাঁকা আওয়াজ করেছেন মাত্র, চতুরালির সাহায্যে শূন্যগর্ভতার জয়ধ্বনি করেছেন। এই রীতি বা দৃষ্টিভঙ্গীকে অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব—শিল্পের সে স্বাধীনতা আছে—কিন্তু

* প্রতীকবাদী কাব্যের তুলনায় রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গীতিক আবেদন সহস্রগুণ অধিক একথা বলে দিতে হবে না আশা করি।

মহৎ সাহিত্য? আইয়ুব সরাসরি উত্তর দিয়েছেন : 'না'। সেদিক দিয়ে মহত্ত্ব ও maturity-র সঙ্গে 'আধুনিকতা'র বা মডার্ন মর্বিডিটির অহিনকুল সম্পর্ক হওয়া ছাড়া উপায় কি?

ঘটনা হিসাবে যা পাওয়া যাচ্ছে তা সংক্ষেপে এই। রমণীয় প্রকৃতির (belle nature), রাবীন্দ্রিক 'সুন্দর ভুবনে'র পরিবর্তে আজ দেখা যাবে সেই পুষ্পিত সমারোহ, যা একান্তই নব্য যুগের পাপের ফুল, *Les Fleurs du Mal*। নূতন পূজার উপচার, খৃষ্টীয় ধর্মের পরিভাষায় যাকে বলতে পারি black mass। কিন্তু এহেন নব্য বন্দনা, কাব্যরীতি ও নন্দনতত্ত্ব, যেমন আইয়ুব বলেছেন, এও কি এক ধরনের ভাববিলাস নয়? এই বিপরীত পথ বেয়েই—অন্তত *Axel's Castle*-এর আন্তর্জাতিক বাসিন্দাদের কাছে—বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এলো, কাব্যের সামাজিক, নৈতিক দায়িত্বের অবসানে,* বক্তব্যের শৃঙ্খল মোচন হয়ে আবির্ভূতা হলেন 'বিশুদ্ধ কাব্য'। স্বয়ম্ভু নিরর্থক কাব্যের ঘোষণা করলেন আধুনিক, মুখ্যতঃ ফরাসী কবির দল। ভ্যালেরি—মোটেই সদগুরু নন, বলেছেন আইয়ুব—ঘোষণা করলেন : শিল্পবস্তু মাত্রেই অকেজো (useless)। টীকাকারের দল জানালেন : Uselessness and valuelessness are not the same thing! মার্কিন কবি তারই সূত্র রচনা করেছেন :

> A poem must not mean
> But be.

অস্তিবাদের অকৃত্রিম কাব্যিক ম্যানিফেস্টো। "...আধুনিক কবিরা, বুঝিয়ে বলার ভয়ে কি নিজেকে স্ফিংস-এর মতো অনধিগম্য ক'রে তুলছেন না" (পৃঃ ২৩৭)? 'আধুনিকরা' কিন্তু সনাতনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি, যদিও সে সাধনার, সে আরাধনার বীর্য ও তপস্যার দিকটি তাঁরা বুঝতে চাননি বা পারেননি। যথা দ্রষ্টা (voyeur) হবার বাসনায় ঋষিবালক (manqué) রাব্যাঁ সর্ববিধ নৈতিক, মানসিক, ইন্দ্রিয়জ জীবনের বন্ধনমুক্তির বিপজ্জনক নির্দেশ দিলেন : les déreglement de tous les sens. সচেতন অবস্থায় তাঁর যে দশাপ্রাপ্তি ঘটলো তার সঠিক বর্ণনা কবির জবানবন্দীতেই শোনা ভাল : পাতালে এক ঋতু। এক কেন, সম্বৎসর বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাব্যাঁর পাতাল আজ একাধিক কবির স্থায়ী ঠিকানা, যার যেথা দেশ, অনেকের পক্ষে নিষ্ক্রমণের দ্বারও বুঝিবা রুদ্ধ : No exit.

* লাওনেল ট্রিলিং "আধুনিক" সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে "an overwhelming consciousness of evil" -এর উল্লেখ করে প্রবন্ধের শেষে টমাস মান প্রসঙ্গে তিনিই আবার একথা জানিয়েছেন যে "The author of *The Magic Mountain* once said that all his works could be understood as an effort to free himself from the middle class." এই দৃষ্টিভঙ্গীর চূড়ান্ত দশার তিনি বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : "The end is not merely freedom from the middle class but freedom from society itself." "আধুনিক" অর্থে সমাজবিরোধী বা সমাজ-বহির্গত হতেই হবে এ-রায় মেনে নেবার দায় আমাদের নাও থাকতে পারে। যদিও স্টিফেন স্পেন্ডরও সেই একই তত্ত্ব প্রচার করেছেন। তাঁর মতে "আধুনিক" সাহিত্যে "The 'creative element' has been the amazing release of individual vision without any allegiance to society.. the completely anti-social role of modern writers." মার্কিন শিক্ষাক্ষেত্রে "প্রগতি"র প্রকোপের কথা স্মরণীয়। ঐতিহ্যবাদী সমালোচকের ভাষায় : "We have witnessed something never before seen in the form of a systematic attempt to undermine a society's traditions and beliefs through the educational establishment which is usually employed to maintain them. There has been an extraordinary occurrence, a virtual educational *coup d'etat* carried out by a specially inclined minority." Richard M. Weaver: *Visions of Order*, p. 114.

আরো সাবধানী, পরিশ্রমী এবং পাণ্ডিত্য সাধক মালার্মে ঘোষণা করলেন আকাশের মৃত্যু। সত্যি, কি অদ্ভুত ও অনাধুনিক, সীমিত এই 'আধুনিক' দৃষ্টির বহর। তুলনা করুন রবীন্দ্রনাথের প্রবীণ প্রজ্ঞা ও অনুভব :

মোর চেতনায়
আদি সমুদ্রের ভাষা ওংকারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।

অন্য এক ভারতীয় কবির ভাষায় একে বলতে পারি : The upward look was alien to their eyes. আর তাই নিয়ে অবক্ষয়ের মুখপাত্র, ও তাঁদের বঙ্গীয় সংস্করণের আত্মতৃপ্তি ও উন্নাসিকতার কি ঘটা! তথাকথিত প্রতীকি কাব্য আদতে একটি বিরাট ধাপ্পা, ইংরাজিতে যাকে বলে Sphinx without a secret. ঐতিহ্য ও তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রতীক সৃষ্টির আশা দুরাশা। যদৃচ্ছার পথে আর যাই হোক cosmic correspondence লাভ করা যায় না। রাবঁার A noir, E blanc, I rouge, Q vert, O bleu এক কথায় এ্যাবসার্ড। এ নিয়মের নড়চড় নেই। যদৃচ্ছার তামাকও খাবো আবার প্রতীকের দুদুও খাবো এ হয় না। কিন্তু আধুনিকতার সম্মোহন জাল এতই বিস্তৃত যে মালার্মের অল্প-সংখ্যক অথচ প্রভাবশালী কবিতাবলীর পক্ষে মারিত্যাঁ হেন ঐতিহ্যবাদীকে পর্যন্ত সপ্রশংস সুরে বলতে শোনা গিয়েছে যে এ হোলো সেই শিল্পকলা যাতে প্রতিফলিত হয়েছে—শূন্যতা। নিষ্কাম কবিকর্মের যোগ্য ব্যাখ্যা। প্লেটো যে কেন তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা হতে কবিসম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করেছিলেন তার সপক্ষে এই আধুনিক নজিরের জন্য মালার্মে মারিত্যাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

এইভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করার পর—পাঠককে বলে দেবার প্রয়োজন নেই যে উপরোক্ত মন্তব্যের শ্লেষের অংশটুকুর জন্য আইয়ুব দায়ী নন—অমঙ্গল ও অশুভভাবনাকে কেন্দ্র করে তাঁর রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা সমাপ্ত করেছেন। আইয়ুব যেভাবে বিষয়টি উপস্থিত করেছেন তার ফলে রবীন্দ্রনাথ যে আদ্যন্ত এই সমস্যার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন সেকথা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রবিমুখ বা বিরোধী 'আধুনিকে'র দল হয় রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি নয় অন্য রীতিতে রচিত কাব্যের মর্মোদ্ধারে অসমর্থ। উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ ধর্মবোধ ছিল, কিন্তু আদতে সে ধর্ম কবির ধর্ম, স্থাণু বা মতুয়ার, সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। যখনই তিনি প্রচলিত ধর্মবোধের, আস্তিক্যের সুরে সুর মেলাতে গিয়েছেন, অধিকাংশ সময় দুর্বল কবিতা জন্মগ্রহণ করেছে। দুঃখের বিষয়, যেমন আইয়ুব লক্ষ্য না করে পারেননি, অদ্যাবধি বহু পাঠক গীতাঞ্জলি-নৈবেদ্য-গীতালি ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থকে রবীন্দ্র-জীবনবেদের প্রমাণ মনে করতে অভ্যস্ত। অবাক হবার কারণ নেই যে অনেকের এই ধারণা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ সহজ ভক্তির কবি। এই জনপ্রিয় ভ্রান্তির অবসান ঘটানো সমালোচকের কর্তব্য। সেই কর্তব্য আইয়ুব সফলতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশেষ দুর্বলতা বা পলায়ন-পরায়ণতার প্রতি তর্জনী নির্দেশ করতে আইয়ুব দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ অভিমতও স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে অন্যায় ও অমঙ্গলের সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু অবহিত ছিলেন, 'আধুনিক'দের তুলনায় ঢের বেশি। কদর্যতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে রবীন্দ্রনাথ—আধুনিক কাব্যশাস্ত্রীদের মত যাই হোক না কেন—মহাপাপ করেননি।

আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর একটি প্রধান পার্থক্য হয়তো এই যে 'নিবিড় তিমিরে' তিনি সম্পূর্ণ দিশাহারা হননি, অর্থাৎ 'আধুনিক' হবার যোগ্যতা অর্জন করেননি। 'রাত্রির তপস্যা' যে নূতন প্রভাতকে নিয়ে আসবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এবং 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো'কে তিনি পাপ বলে বর্ণনা করেছেন জীবনের শেষ ভাগেও। এবং যেহেতু 'আমি কবি... এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে' সেই কারণেই কি রবীন্দ্রনাথ অনাধুনিক? সন্দেহ না করে উপায় থাকে না যে তাঁর প্রত্যয় ও পূর্ণ দৃষ্টির প্রতি আকাঙ্ক্ষার ফলেই 'আধুনিক'দের হাতে এই রবীন্দ্রনিপীড়ন, আধুনিকতার যূপকাষ্ঠে রবীন্দ্রোৎসর্গের আয়োজন চলছে। কিন্তু এর জন্যও যে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সেই বীর্যহীনতা দুঃখকর ও হাস্যকর। বিবর্ণ ও হতভাগ্য যুগের বাসিন্দা আধুনিক কবিদের সমস্যা ও দুর্দশা, এমনকি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিকতা ও আশ্চর্য কৃতিত্ব অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। আর্তি, শূন্যতাবোধ, সবই সত্য, জীবনের এই দিকগুলি আজ আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু একমাত্র এ জাতীয় অবস্থা বা অনুভূতিই সৎ বা সত্য, এ মতবাদ বা উপদেশ মেনে নেওয়া যে চরম অবিমৃষ্যকারিতা– ভদ্র ভাষায় সেই কথাই আইয়ুব বোঝাতে চেয়েছেন। মৃদু অথচ মোক্ষমভাবে আইয়ুব 'আধুনিক'দের অসঙ্গতি ও আতিশয্যের দিকটি তুলে ধরেছেন যদিও অমঙ্গলবোধের বিস্তৃত আলোচনা তিনি তেমন করেননি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন কথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, যেমন আধুনিক মহলে প্রায়ই শোনা যায়, যে তিনি চিরদিন একই অনাধুনিক বা অবাস্তব জীবনদর্শন বা অভিজ্ঞতার স্তুতিবন্দনা করে গিয়েছেন। অর্থাৎ এ-যুগের নিরিখে তিনি বলতে গেলে বাতিল, passé. এ-অভিযোগ এমনই অযৌক্তিক ও অত্যুক্তি যে আইয়ুব অবধি সজোর প্রতিবাদ না করে পারেননি। রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনার সাহায্যে তিনি এই উদ্ভট অভিযোগ অনায়াসে খন্ডন করেছেন। অভিযোগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনবহিত ছিলেন না। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় তিনি এর প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য শিল্পীর পক্ষে এহেন সচেতন সপক্ষাচরণে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কবিতার মাধ্যমেই, যেখানে অভিজ্ঞতার নিজস্ব, জীবন্ত স্বাক্ষর, সেকাজ যথোচিতভাবে হতে পারে। সংক্ষেপে, রবীন্দ্রকাব্যের সাহায্যেই একথা স্পষ্ট হয় যে রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই অশুভ ও অমঙ্গল বিষয়ে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ বা উদাসীন ছিলেন না।

কিন্তু অন্যান্য সমস্যা রয়ে গেল। এইরকম একটি সমস্যা, মনে হয়, আইয়ুবের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। কবির শেষ দিককার রচনায় অপরাধী ভাবের স্বীকৃতি, প্রচ্ছন্ন বা সরাসরি। দুটি বিপরীত রীতির সাহায্যে—বিনম্র অথবা ভর্ৎসনার সুরে—এদের প্রকাশকে সহজ করে নিতে চেয়েছেন কবি। অপরকে ভর্ৎসনার উত্তেজিত সুরের আইয়ুব উচিত কারণেই নিন্দা করেছেন, যদিও অপরাধী ভাবটি তিনি ততটা লক্ষ্য করেননি, অন্ততঃ সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেননি। (এটি একটি 'আধুনিক' সুর, যদিও রবীন্দ্রনাথের 'টোন' কখনই আধুনিক নয়।)

সংশয় ও বেদনার ভাষা রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত নয়। জীবনের শেষ ভাগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে: 'রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান'। তার মতন আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত লেখক ইতিহাসে বিরল। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পুরোনো চিঠিতে তাঁর অকপট বিবৃতি পাওয়া যাবে, এটিকে আইয়ুব উদ্ধৃত করলে পারতেন। তাঁর প্রথম দিককার রচনা, 'সিন্ধুতরঙ্গে', তিনি স্পষ্টই বিশ্ববিধানকে প্রশ্ন করেছেন, যদিও অল্পকাল পরেই 'দুই দেবতার' উল্লেখে প্রশ্নের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। (তুলনীয় হপকিন্সের

'দ্য রেক্ অব দয়েৎসলানট্'?)

ব্যক্তিগতভাবে গীতাঞ্জলির প্রতি এক রহস্যজনক আকর্ষণ অনুভব করলেও আইয়ুবের কাছে রবীন্দ্রকাব্যের বা জীবনের এই পর্যায়টি আদতে এক ধরনের ভাববিলাস বলে ঠেকেছে : 'সুগভীর কিন্তু সুমধুর'। কিন্তু গীতাঞ্জলি কি সত্যি ধর্মীয় কাব্য? (রোম্যান্টিক 'ব্রাত্য' মানস কেন ধর্মীয় মানসের সমতুল্য বিবেচিত হতে পারে না বাওরা সেকথা ব্যাখ্যা করেছেন।) ভক্তিরসাশ্রিত এই কাব্যের প্রতি তাঁর মতন ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় অনধিকারীর আকর্ষণের হেতু কিন্তু আইয়ুব নিজেকে ও আমাদের বোঝাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। 'স্রষ্টা, বিধাতা ও ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা যদিচ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু আমি কোনো অর্থেই জড়বাদী নই,' এ 'ভাববাদী' বিবৃতিতে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। আশা করা যাক একদিন এ 'কেন'-রও উত্তর পাওয়া যাবে।

তুমি-আমির, প্রভু-ভক্তের এই লীলাময় জগৎ থেকে বলাকার জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে শোনা যাবে আগামী দিনের অধীর আগ্রহ ও সূচনা : 'বন্দরের কাল হোলো শেষ'। সামনে প্রসারিত নূতন অজানা যাত্রাপথ। বোদলেয়ারী voyage ব্যতিরেকে অন্যান্য পথজিজ্ঞাসাও তো থাকতে পারে। কোথাও-কোথাও আবার যেন কর্মজীবনের প্রতি এক উদ্দীপনা ও আনুগত্য লক্ষ্য করা যাবে। যদিও এর দ্বারা রবীন্দ্রকাব্যে মহৎ কবিতা অল্পই সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ দেখতে গিয়ে আইয়ুব বলেছেন : 'কর্মপ্রেরণা কোনো কবির, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো কবির—যিনি আধুনিক ও বৈদিক উভয় অর্থে কবি—মূল প্রেরণা হতে পারে না।' 'এবার ফিরাও মোরে'-র কর্মযজ্ঞে সুপরিচিত আহ্বান ('তবে উঠে এস, কবি......') আইয়ুব উপদেশমালার নামান্তর মনে করেন। গীতা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা কিছুটা নিজস্ব। কিন্তু "দ্য ডিভাইন কমেডি" রচনার তাৎপর্য সম্পর্কে দান্তের অভিমত সম্পর্কে তিনি কি বলবেন? এক চিঠিতে দান্তে বলছেন : 'The whole work was undertaken not for a speculative but a *practical* ends....(italics mine).' অশ্বঘোষও সেই একই কথা বলেছেন। অথবা রিলকের Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert ? ' অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আইয়ুব ঠিকই বলেছেন যে যখন দ্বন্দ্বের, সংশয়ের দোলায় তিনি আন্দোলিত তখনই তাঁর রচনার আন্তরিকতা ও উৎকর্ষ লক্ষণীয় (পৃঃ ১২৩-২৫)*। বিচার করতে বা বিবৃতি দিতে বসলেই রবীন্দ্রকাব্যের সমূহ ক্ষতি ঘটে।

এবার কিন্তু, রবীন্দ্রকাব্যের পরবর্তী অধ্যায়ে, কিছুকালের জন্য একটি নূতন সুর প্রাধান্য লাভ করেছে : সে হোলো ঈশ্বরের রুদ্ররূপ। আইয়ুব একে এক নূতন co-ordinate আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রদর্শন শ্রদ্ধেয় বটে, কিন্তু কবির খণ্ড কাব্যে, দার্শনিকতার বিচারে তারা যতই অসম্পূর্ণ বা সমস্যাসংকুল হোক না কেন, তাঁর মর্মসত্য ধ্বনিত হয়েছে আরো তীব্র তালে এবং তারা আরও সৎ, 'আধুনিক' পরিভাষায় বলতে পারি genuine। আইয়ুব অবশ্য নির্দ্বন্দ্ব অথবা প্রজ্ঞাবান, বিকল্পে দার্শনিকতার বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত, কাব্যে ততটা বিশ্বাসী নন, যদিচ যোগীরা যে অভিজ্ঞতার বা প্রেরণার দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে, "সেই অনাসক্ত অনন্ত অক্ষয় দৃষ্টি"কে ধারণ করতে সক্ষম সেকথা তিনি স্বীকার করেছেন এবং পক্ষান্তরে 'গ্রেসে'র কথাও উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৭১)। লক্ষণীয় হার্বার্ট রীডের মতন

*An absence of spiritual complacence may also well be the very nature of poetic sensibility—Herbert Read.

'অবিশ্বাসী'ও কবিতাকে কৃপার সমতুল্য বলেছেন : Poetry is an act of grace। কিন্তু, রুচি, স্বভাব ও মানবসম্ভাবনায় বিশ্বাসের তারতম্যের কথা বাদ দিলে এই দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা-উদ্ভূত কবিতা, যেহেতু 'আধুনিক' কবিরা বা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে অধরাকে করায়ত্ত করেন নি, যদিও তার প্রতি রবীন্দ্রকবি এক তীব্র অতৃপ্ত আবেগ অনুভব করেছেন শেষ পর্বের রচনায়, কি সেই কারণেই নাকচ হয়ে যাবে? অর্থবহ মন্ত্র কাব্যের কোনো নজিরই কি প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যে নেই? ভারতীয় ধারায় আদি কাব্য তো তাই-ই। বলতে গেলে 'আধুনিকে'র দলও তারই এক ক্ষয়িষ্ণু, বামাচারী শাখা কখনো বা শত্রুভাবেণ ভাবিত অঘোরী সম্প্রদায়। 'If a way to the better there be, is exactly a full look at the worst.'

ঝঞ্ঝাসংকুল যাত্রার কথা বলাকায় বারংবার শোনা গেলেও—'তুফানের মাঝখানে/নূতন সমুদ্রতীর-পানে/দিতে হবে পাড়ি'—সেই যাত্রার সূচনা দেখা দিল রবীন্দ্রকাব্যের অন্তিম পর্বে, এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। 'প্রান্তিক'-এ অসুস্থতাকে আশ্রয় করে, 'অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়', দেখা দিলো এক নূতন কাব্যদিগন্ত। এই চিরপথিকের চিরযাত্রায় শেষ ক্ষণটি অবধি বিরতি—বা সান্ত্বনার—লেশমাত্র নেই। আশ্চর্যের কথা, সভ্যতার ক্রান্তির, অসুস্থতা ও অন্তর্দাহের কালেই রবীন্দ্রকাব্য অন্তর্দৃষ্টির, 'দুর্জয় চেতনা'র বীর্যে সমৃদ্ধ, বেগবান, ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের সমতুল্য হয়ে উঠলো। আজ শোনা যাবে আর এক সুর : রুদ্রের প্রসন্ন মুখের জন্য প্রার্থনা। হয়তো সে বেদনার ধন, অর্জিত সিদ্ধি তাঁকে এড়িয়ে গেছে, হয়তো অসীম নৈরাশ্য, বিস্ময় ও ব্যর্থতায় অবসিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ ঝংকার, কিন্তু নানা অভিজ্ঞতায় বৃত ও টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাব্যদেহের যে বিস্ময়কর ব্যাপ্তি ও রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ সার্থক করতে পেরেছিলেন, 'আধুনিক' কবির দলে তাঁকে যথাযথ সম্মান দিতে পারলে নিজেরাই উপকৃত হতে পারতেন। অবস্থাগতিকে হয়তো তা সম্ভব হয় নি। কবিদের কথা বাদ দিলে, সাধারণ পাঠকের মনেও রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য সম্পর্কে ঔদাসীন্য সহজেই চোখে পড়ে। দুঃখের বিষয় অন্তিম পর্বেও কবি স্বয়ং দুর্বল, অনৈতিহাসিক পশ্চাদপসরণে মোটেই অপটু ছিলেন না : যেমন, কৈশোরের প্রিয়া কবিকে চিরকিশোর করে রেখেছে, কোকিলের গান বা মৃদু যূথীগন্ধ তাঁকে সহজেই উন্মনা করতে পারে। সহজ সমাধানের এই রীতিটি আইয়ুবের চোখে প্রশংসনীয় ঠেকে নি। এ জাতীয় সমাধানে আইয়ুব 'সত্যসন্ধানী' দৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করেছেন। আইয়ুব বলছেন : 'মানুষের কানে মানুষের সুরই যদি বেসুর বাজে তবে প্রকৃতির বসন্তবাহার কি তাকে শেষ সান্ত্বনা দিতে পারবে?...ফুল্ল অশোক শাখায় বসে কোকিল যত বিমল সুরেই ডাকুক, তার 'গভীর রমণীয়' সুরব্যঞ্জনা কবিকে বলতে পারে 'তুমি আমার প্রিয়', কিন্তু এ-আশ্বাস দিতে পারে না যে, মানববিভীষিকার পরপারে বিশ্বের আদিতে ও অন্তে পরম শান্তি বিরাজমান। এমনতর কবিকল্পনা ছোট অর্থে সুন্দর হতে পারে কিন্তু কোনো মহৎ অর্থে নয়, কারণ তাতে জগতের কঠিন সত্যকে একটু মোলায়েম করে নেওয়ার দুর্বলতা প্রকাশ পায় (পৃঃ ১৩৮, ১৪১)।' আইয়ুব হয়তো বলতে চাইছেন—অন্যভাবে অলডাস হাকস্‌লি 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইন্ দ্য ট্রপিকস্' প্রবন্ধে যে কথা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন—যে আজকের কবির পক্ষে প্রকৃতির কবি হওয়া অসম্ভব, সে পথে আত্ম- বা সত্যজিজ্ঞাসার অবসান ঘটেছে। কাম্যুর নজির সত্ত্বেও একথা মেনে নেওয়া কঠিন। কবিচিত্তে বিস্ময়বোধের অসাড়তায় (পৃঃ ১৬) আইয়ুব দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আধুনিকদের অন্যতম অগ্রজের এই বিবৃতি কি তাঁকে আশ্বস্ত করবে না?

And for all this, nature is never spent;
There lives the dearest freshness deep down things;
And though the last lights of the black West went
Oh, morning, at the brown bark eastward, springs—
Because the Holy Ghost over the bent
World broods with warm breast and with oh! bright wings.

হয়তো আরো আশ্বস্ত বোধ করবেন 'বীট' সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপাত্রের এই জবানবন্দীতে

and I am waiting
for the lost music to sound again
in the Lost Continent
in a new rebirth of wonder.*

আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে তথা বিজ্ঞানের আধিপত্যের ফলে আমরা প্রকৃতিকে প্রয়োগ করতে শিখেছি, চিনতে শিখি নি। তার প্রমাণ জীবনের প্রতি পদে, আধুনিক ব্যাধিও হয়তো তারই ফলশ্রুতি। এই প্রসঙ্গে টেকনলজি সম্পর্কে ম্যাকস্ ফ্রিশের বর্ণনা স্মরণীয়: 'Technology. . .the knack of arranging the world so that we don't have to experience it' প্রকৃতিকে আমি বড় ডরাই, এক আধুনিক কবি-বন্ধু একদা আমাকে জানিয়েছিলেন। একটু মুখোমুখি হবার চেষ্টা করুন না কেন? আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আসল কথা, প্রকৃতির প্রকারভেদ আছে, সংস্কৃতকে অনুসরণ করে সহজেই তার দু'টি বা তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে। বিদেশী সাহিত্যেও natura naturans ও natura naturata-র পার্থক্য আইয়ুবের অজানা নয়। প্রকৃতি, পুরুষ ও ইতিহাসের সমন্বয়ে রচিত হবে যে সমৃদ্ধ, সম্যক কাব্য, 'reading the text of the without from within'- নবযুগ হয়তো তারই অপেক্ষা করছে। 'আধুনিক' অনাচার হয়তো তারই নঙর্থক সূচনা। গভীর ও বিস্তীর্ণ চৈতন্যের সাহায্যেই আধুনিকতার শাপমোচন সম্ভব। প্রধানতঃ রমণীয়তার কবি হলেও রবীন্দ্রনাথের শেষ দিককার লেখায় যে নির্মম, নির্মোহ প্রকৃতি-

* আপাতউদ্ভট ও পরিহাসচ্ছলে হলেও e. e. cummings কি লেখেন নি?

i thank you God for most this amazing
day: for the leaping greenly spirit of trees
and a blue true dream of sky; and for everything
which is natural which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today,
and this is the sun's birthday, this is the birth
day of life and love and wings; and of the gay
great happening illimitably earth)

how should testeing touching hearing seeing
breathing any—lifted from the no
of all nothing—lunar merely being
doubt unimaginable you?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

বন্দনা শোনা গিয়েছে তা যেমনই বিস্ময়কর, mature, তেমনই আশাপ্রদ। জ্যোতিষ্কের তুলনাটিতে আইয়ুব নিজেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন :

সে যে তার আপন অন্তরের পথ,
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে চিরস্বচ্ছ।

অতলান্ত প্রকৃতির, তার সাত মহলার, সপ্ত তন্ত্রীর কতটুকুই বা সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ধরা পড়েছে? 'শুধু করি অনুভব চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন।' 'আধুনিক'রা যাই বলুন না কেন, প্রকৃতির হাত থেকে অত সহজে নিষ্কৃতি নেই।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন নানা জিজ্ঞাসা, সমস্যা, বেদনা ও আর্তির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। শেষ মুহূর্ত অবধি তাঁর পরীক্ষা, আত্মসমীক্ষা শেষ হয়নি। আর তাই বুঝি ক্ষত-বিক্ষত, কলঙ্কলাঞ্ছিত কবিতায় নেমেছে অসামান্য ব্যাপ্তি, নিরাভরণ মহিমা, নিষ্করুণ বিবৃতি :

মানুষের ক্ষুদ্র দেহ
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম!
সৃষ্টি ও প্রলয়-সভাতলে
তার বাহিরসপাত্র
কী লাগিয়া মেগে যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন
এ দেহের কৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।

এ-কথা অন্তিম পর্বের কাব্যদেহ সম্পর্কে সমান সত্য।

এই পরীক্ষাই কবির শেষ, 'অক্ষয় পুরস্কার'। ছোট্ট কথা 'কেন'-র সাহায্যে এর একটি চমৎকার নিদর্শন আইয়ুব বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পেশ করেছেন (পৃঃ ১৪৭-৫৪)। অর্বাচীনদের নিরস্ত করার পক্ষে এই একটি উদাহরণ যথেষ্ট।

কিন্তু বিশ্ববিধান সম্পর্কে কবিচিত্তে প্রশ্নের তীব্রতা সত্ত্বেও ধর্মীয় প্রসঙ্গে দু'টি নূতন ভাব বা প্রতীক লক্ষ্য করা যাচ্ছে : প্রথমটি হোলো মনের মানুষ, যদিও রবীন্দ্রনাথকে বাউলদের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা চলে না। এ ছাড়া চিরমানব, বিশ্বমানব, মহামানব এই জাতীয় সংজ্ঞাও তিনি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় প্রতীকটি হোলো : শিব, নটরাজ, ভৈরব, মহাকাল। একে কি কবিকল্পনায় তান্ত্রিক বীরভূমের অন্তিম অবদান বলবো? এই দ্বিতীয় উপাস্য বা উপমাকে কি রবীন্দ্রনাথের মৌল প্রতীক বা radical metaphor বলতে পারি? না, শেষ পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ সূর্যোপাসক? এবং এই দুটি আদর্শ বা প্রতীক : মনের মানুষ এবং শিব, কতদূর ও কিভাবে একীভূত হয়েছে তাও ভেবে দেখা দরকার।

প্রতীক প্রসঙ্গে 'শিশুতীর্থে'র অসামান্য ও বিরাট পটভূমিকা অধিকাংশ পাঠককে অভিভূত করেছে, আইয়ুব তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু কবিতাটির শেষার্ধে বা চূড়ান্ত মুহূর্তটিতে মিশ্র রাখালিয়া সুরের প্রাধান্য—হয়তো কবিতা শেষ পর্যন্ত রাখালিয়া ও ঐন্দ্রজালিক হতে বাধ্য—এবং তার ফলে সমাধানের সরলতা অনেককেই, মনে হয় আমাদের সমালোচককেও, এড়িয়ে গিয়েছে। মাতৃবন্দনা সৃষ্টির বীজমন্ত্র, কিন্তু নবজাতকের এহেন প্রয়াসহীন আবির্ভাবে চিত্রকল্পটি মধুর হলেও মহৎ হয়েছে কি? তুলনা করুন রোগশয্যায়,

পাঁচ নম্বর লেখাটি ও তার তাপদগ্ধ ঔজ্জ্বল্য :

> মানবের দুর্জয় চেতনার, দেহদুঃখ-হোমানলে
> যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
> জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
> তার কি তুলনা কোথা আছে?

তবুও, আইয়ুবের সাক্ষ্য সত্ত্বেও, এই উদ্দীপ্ত প্রশ্নের তীব্রতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আদৌ নির্মোহ বা 'নির্মম' হওয়া সম্ভব ছিল কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ থেকে যায় (পৃঃ ১৬১)। শেষ বয়সে তাঁকে 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' বলতে শোনা গিয়েছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার বা স্বভাবের সামগ্রিক সত্য পরিচয় এর মধ্যে নাও থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে শেষ সপ্তক বাইশ নম্বর কবিতাটির মধ্যে 'বুড়ো আমি'-র সঙ্গে পৃথক হবার ইচ্ছাকে একই 'নির্মম' মনোভঙ্গীর প্রকাশ হিসাবে দেখতে চেয়ে আইয়ুব কি কিছুটা সরলীকরণের সাহায্য নেন নি? এই সাময়িক ইচ্ছা, বিশ্লেষণ বা ভাষা হয়তো কোনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয়বাহী নয়, বরং কিছুটা প্রায়-পরিহাসমিশ্রিত, 'জেন'-ঘেঁষা আলগা ধ্যানের মতন। শেষের দিকে কবি নিজেই বলছেন : 'উপরের তলায় বসে দেখব ওকে...দেখা যেমন করে পুতুলনাচ দেখে; হাসব মনে মনে।' 'মৃদু পরশ' রবীন্দ্রকবির এই প্রথম নয়। 'দ্বিধাবিভক্ত মূল্যবোধের' কালেও, কাল ও কালাতীতের বিপরীত আকর্ষণের কালেও রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা মুহূর্তগুলি'-ই কামনা করেছেন। তপস্যা বা তপস্যার কঠোরতা তাঁর কাম্য বা স্বভাবের অনুকূল নয়, রবীন্দ্রনাথ সেকথা সবিশেষ জানতেন।

'শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি' বিষয়টির জন্য আইয়ুব একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় ছেড়ে দিয়েছেন। এ-বিষয়ে অভিমত স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে, যদিও আলোচনার মারফত এর কোনো দীর্ঘস্থায়ী মীমাংসা হয়তো সম্ভব নয়। 'আধুনিক' কালে, স্বীকার করতেই হবে, নীতির প্রশ্ন আশ্চর্য জটিলতা অর্জন করছে এবং কোনো রকম একপেশে মতামত, সমাধান বা প্রাচীন ঐতিহ্য যথেষ্ট নয়। আজকের open-ended (বাংলা কি হবে?) সমাজে প্রত্যয়ের স্থিরতা, 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' ও কালোপযোগী সমন্বয় সমতুল্য নাও হতে পারে। আইয়ুবের বক্তব্য অবশ্য দ্বিধাহীন, পরিষ্কার, সুস্থ জীবনবোধের উপর তার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অপরপক্ষ তাকে স্বীকার করবেন বা যথেষ্ট মনে করবেন এমন কথা কে বলতে পারে, বিশেষ করে আইয়ুবের যখন জানা আছে যে, 'মানসিক স্বাস্থ্যের চাইতে মানসিক ব্যাধিকেই মূল্যবান মনে করা হয় ইদানীং' (পৃঃ ২২)। সাধারণ পাঠক অবশ্য সহজেই আইয়ুবের সঙ্গে একমত হবেন যে ঘৃণা বা প্রত্যাখ্যান প্রসূত কোনো অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গী, কুৎসিতের প্রতি আসক্তি কখনই মহৎ সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না, যেমন পারে না ফলিত সাহিত্য যা পার্টি বা রাষ্ট্রব্যবস্থার সেবক, উপায় মাত্র।

কর্ম ও ধ্যানের দুরপনেয় ব্যবধান স্বীকার করে—এই স্বীকৃতির পিছনে কিন্তু সমূহ বিপদের আশঙ্কা—আইয়ুব রবীন্দ্রনাথকে যেন কিছুটা সহজ নিষ্কৃতি দিয়েছেন যা হয়তো তাঁর প্রাপ্য ছিল না। এবং কিছুটা এই কারণেই, যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, অন্তিম পর্বে রবীন্দ্রকাব্য ও মানসে অপরাধী ভাবটিকে (sense of guilt) তিনি তেমন লক্ষ্য করেননি। নবজাতকের সেই কবিতাটিতে—আইয়ুব যাকে কিছুটা অনুমোদনের সুরে উদ্ধৃত করেছেন (পৃ ২০০-২০১)—কবি যখন দস্যুভীতা রমণীর রক্ষার্থে 'উত্তরী ফেলি বর্ম' পরার প্রস্তাব করেন তখন তা কি প্রায় হাস্যকর, প্যারডির মত শোনায় না? এই প্রসঙ্গে 'এবার ফিরাও

মোরে'-র কর্মী পুরুষকে আহবান করা নিয়ে আইয়ুবের কঠিন মন্তব্য স্মরণীয়। আমার মতে 'এবার ফিরাও মোরে'-র এই অংশটি ('কবি, তবে উঠে এস...') নবজাতকের কবিতাটির তুলনায় অনেক বেশি serious ও dignified। কবিসত্তায় কর্ম ও ভাবজীবনের এই বিরোধ রোমান্টিক কাব্যে সুপরিচিত। একটি উদাহরণ থেকেই তা বোঝা যাবে। 'Sleep and Poetry' কবিতাটিতে দশ বছর সুখভোগের—'O for ten years, that I may overwhelm|Myself in poesy'—পর কবি কি করতে চাইছেন?

> And can I ever bid these joys farewell?
> Yes, I must leave then for a nobler life
> Where I may find the agonies, the strife
> Of human hearts.

"Hyperion"-এ দেবমন্দিরের পুজারিনী কবিকে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন কি অসীম মূল্যে সুন্দরের পাদপীঠতলে, মানবমহিমা, দেবতার আশীর্বাদ অর্জন করতে হয়, এ স্বপ্ন বা ধ্যান নয়, কর্মও বটে। এর দায় থেকে মহৎ কবির মুক্তি নেই, যুবক কীটস অল্প বয়সেই সে অভিজ্ঞান লাভ করেছিলেন :

> If thou canst not ascend
> These steps, die on the marble where thou art. . . .
> None can usurp this height, returned the shade,
> But those to whom the miseries of world
> Are misery, and will not let them rest.
> All else, who find a haven in the world
> Where they may thoughtless sleep away their days,
> If by chance into this fane they come,
> Rot on the pavement where thou rotted'st half.

পরবর্তী অধ্যায়টিতে—'কাব্যের ভাষা'—শাব্দিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, বাচার্থ অপেক্ষা ব্যঞ্জনার প্রতি অভিনিবেশকে আইয়ুব বিপদসংকেত বলে মনে করেন। আধুনিক সাহিত্যরথীদের প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে তিনি তাকে সরাসরি নাকচ করেছেন এই বলে, 'সেকালের তান্ত্রিকদের যেমন ছিল শব-সাধনা, আজকের কবিদের তেমন আছে শব্দ-সাধনা, এটাই তাঁদের আদি, অকৃত্রিম ও অন্তিম সাধনা।'

সাম্প্রতিক যুগের বৈচিত্র্য—ও পরস্পরবিরোধ—আইয়ুবের চোখ এড়ায়নি। যেমন লজিক্যাল পজিটিভিজমের ফলে কবিতার নির্বাসন বা ব্ল্যাক আউট হবার কথা। অথচ একে কেন্দ্র করেই কাব্যাকাশে দেখা দিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ : বাকের পরিবর্তে কাকলি (পৃঃ ৩৭)। নাকের বদলে নরুন!

শেষের অধ্যায়টির প্রথমার্ধে আইয়ুব কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা—নবজাতক, 'প্রশ্ন'—সম্পর্কে মত বিনিময় করেছেন। শঙ্খের ধারণা অনুযায়ী কবিতার কয়েকটি পঙক্তি গদ্যগন্ধী, সুতরাং বিশুদ্ধ কাব্যবিচারে রসোত্তীর্ণ নয়। পঙক্তি ক'টি উদ্ধৃত করে আইয়ুব বলছেন : 'আর যা-ই হোক, এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধ গদ্য নয়।' কিন্তু শঙ্খ কি বলতে পারেন না এই পঙক্তিটি বিশুদ্ধ গদ্য বা বিশুদ্ধ পদ্য কিছুই নয়? প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বগতোক্তি বা ধ্যান—প্রাচীন আলংকারিক যাকে

বলেছেন ধ্যানালম্ব, দেনিস দ্য রুজম' তাকেই বলেছেন trap for meditation—সেই চির-জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে : কে তুমি? আইয়ুব মনে করেন এই "শেষ প্রশ্নে"র লক্ষ্য একজন ব্যক্তিবিশেষ: তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। "কেননা এ-প্রশ্ন সমগ্র বিশ্বসত্তাকে করার কোনো মানে হয় না। করা যায় ব্যক্তিবিশেষকে; ব্যক্তিবিশেষকেই করা হয়েছে কবিতাটিতে। সে-ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃঃ ২৪৫)।" কিন্তু কবিতাটিকে এইভাবে ব্যক্তিবিশেষের আত্মজীবনীর সঙ্গে যুক্ত করে দেখার প্রয়োজন কোথায়? তার ফলে কি অর্থ ও ব্যঞ্জনা উভয় ক্ষেত্রে আমাদের অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে না? শিল্পের সাধারণীকরণ ব্যাহত হবে না? সংক্ষেপে, রবীন্দ্রনাথের 'তুমি' তুমি-ও। তুমি, আমি, সবাই। কবি সেই বিশ্বজনীন মানবরহস্যের, Mystery of Man-এর বাহক বা নিমিত্তমাত্র, চ্যানেল। এবং তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রবীন্দ্রকাব্য যদি রবীন্দ্রজীবনীরই হেরফের হয় তাহলে তো শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের একমাত্র সহায় ও শেষ সম্বল।

সূর্যের কলঙ্কের মতই আইয়ুবের একটি উক্তি আমাদের বিস্ময়ের কারণ ঘটিয়েছে। উক্তিটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়। Ode to a Nightingale কবিতাটিতে 'forlorn' এই শব্দটিকে আইয়ুব 'কর্কশ' (পৃঃ ১৩৬) আখ্যা দিয়েছেন। একথা সত্য ঐ শব্দের আঘাত কবিকে স্বপ্নপ্রয়াণ বা 'wings of poesy' থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। কিন্তু শব্দটি অসামান্য বিষণ্ণতার প্রতীক বলেই আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থের মুখবন্ধে আইয়ুব সবিনয়ে নিবেদন করেছেন যে তাঁর বর্তমান আলোচনা আধুনিকতা বা আধুনিক সাহিত্যের বিস্তৃত বা প্রামাণ্য আলোচনা নয়। সত্য বলতে কি 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথে'র এই পুনর্বিচার এক মৌল জীবনজিজ্ঞাসার উপলক্ষ্য মাত্র। এবং সুস্থ জীবনের যে আদর্শ আইয়ুব মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করেছেন—যার সঙ্গে বর্তমান লেখক একমত—তা হয়তো কাব্যবিচারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেই জীবনাদর্শের সপক্ষেই—"the rediscovery of a coherent view of life, the conditions of effective communication"—বিশ্লেষণ আরো কিছু দূর টেনে যাওয়া চলতো।* 'আধুনিকতা'র বা নব্য মানসিকতার পিছনেও একাধিক তত্ত্ব সক্রিয়। এবং 'আধুনিকতা'র এহেন সার্বিক তুচ্ছতা ও আত্মহনন, কদর্যবিলাসের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও সহজে সম্ভব। তাছাড়া এই 'আধুনিক' গোষ্ঠীও কতদূর সমগোত্রীয় তাও বিচার্য। বোদলেয়ার, মালার্মে ও রাবঁ্যর বিশ্ববীক্ষা, কাব্যরীতি বা কবিতার রূপ ও রীতি এক মিল বলা চলে না। *L'art pur* ও *la conception moderne* সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতীকিবাদ বুর্জোয়া আত্মতৃপ্তির প্রতিশোধক বটে, কিন্তু তার স্বকীয় কৃতিত্ব সত্ত্বেও আদতে এটি এক জীবনবিমুখ পলায়নী সদ্‌চ্ছারই নামান্তর। প্রতীকের সদর্থ বা সত্য বীর্য, চিরায়ত ব্যঞ্জনাকে এই শৈলীপ্রধান চাতুরী, নঙর্থকতায় বা নারকীয় অধিবেশনে বসে আয়ত্ত করা কঠিন। আদতে এই আন্দোলন Romantic Agony-র শেষ দশা। রোম্যান্টিকদের জীবনদর্শন বা vision-এর দায় ছিল, এঁরা সেদিক দিয়েও মুক্ত। "এ কী অকৃতজ্ঞতার...প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে, বিকারের রোগীসম?" অশুভ ও অমঙ্গল? তাঁর সঙ্গেও অধিকাংশ আধুনিক কবিরা বিশেষ বোঝাপড়া না করে—সে বীর্য তাঁদের কোথায়?—তাকে

* "But this world is not willing to realize how it has lost its belief or to face what it must accept in order to regain faith in an order of goods." Richard M. Weaver, *Ideas Have Consequences,* Foreword

একটি স্নায়বিক, উন্নাসিক বা নাটকীয় ফ্যাশনে পরিণত করেছেন।

> দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
> মানবেরে দেখি সবে নিরুপায়,
> ভাবিয়া না পাই মনে,
> সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।
> আপনারি মূঢ়তায়, আপনারি রিপুর প্রশ্রয়ে
> এ দুঃখের মূল জানি,
> সে জানায় আশ্বাস না পাই।
> এ কথা যখন জানি,
> মানবচিত্তের সাধনায়
> গূঢ় হয়ে আছে সে সত্যের রূপ
> সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত,
> তখন বুঝিতে পারি,
> আপন আত্মায় যারা
> ফলবান করে তারে
> তারাই চরম লক্ষ্য মানবসৃষ্টির;
> একমাত্র তারা আছে, আর কেহ নাই;
> আর যারা সবে
> মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন—
> দুঃখ তাহাদের সত্য নহে,
> সুখ তাহাদের বিড়ম্বনা,
> তাহাদের ক্ষতব্যথা দারুণ আকৃতি ধরে
> প্রতি ক্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়,
> ইতিহাসে চিহ্ন নাহি রাখে।

স্মরণ করুন দান্তেকে। এই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী বা আন্দোলনকে heresy বলাই যুক্তিযুক্ত। প্রথম দিকে প্রতীকবাদী কাব্যের খপ্পরে না পড়লে এলিয়ট সে সহজ সত্যটি আবিষ্কার করতে পারতেন।

কাব্যদেহ সম্পর্কে আলোচনায় আইয়ুব বিরত থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তার কথা বাদ দিলেও মালার্মীয় মহাভাষ্য মোটেই শেষ কথা নয়। প্রাচীন স্ফোটবাদে সে অধরা তত্ত্ব আরো গভীর সুরে ব্যক্ত হয়েছে। বাকের শক্তি, তার বিভিন্ন ভূমি ও প্রস্থান, শব্দের, ছন্দের ও প্রতীকের কালজয়ী স্থিতি সম্পর্কে অর্বাচীনদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতা ক্ষমার্হ, কিন্তু তাকেই কাব্যের পরাকাষ্ঠা বলে মেনে নেবার দায় আমাদের নেই। আধুনিক পিচ্ছিল পথে শেষ হওয়া ছাড়া—জোসেফ উড ক্রাচ যাকে guideposts to perdition আখ্যা দিয়েছেন—আর কোনো রকমের হওয়া হয়তো নেই।

সংক্ষেপে মূল্যবোধ (value) ও অস্তিত্বের (being) যে সমস্যা জীবনের মর্মমূলে,[১]

---

[১] All great poetry is concerned with the true stature of things; also it is a vindication of a valuable and meaningful world." Erich Heller, *The Disinherited Mind*, 'The Hazard of Modern poetry', p. 268.

যা মানবীয় দশার (human condition) আর এক নাম, আধুনিকদের সম্মানার্থে তাকে অস্বীকার করার যৌক্তিকতা নেই। আশার কথা 'আধুনিকে'রাও তো চিরকাল 'আধুনিক' থাকবেন না। Adieu, je vais voir l'ombre que tu devins, এবং এ'রা আদৌ আধুনিক কিনা নূতন পরিপ্রেক্ষিতে একদিন সে-বিচারও হয়তো হবে। অবশ্য যাঁরা 'আধুনিকতা'র সাধনায় শহীদ[১] হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: Il faut être absolument moedrne, তাদের স্বখাত সলিলে যেতে দেওয়াই ভাল। তরঙ্গ রোধিবে কে?

মোট কথা : প্রয়োজনবোধে চিহ্নিত সীমার মধ্যে আইয়ুবের বক্তব্য ও আলোচনা অধিকাংশ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সুস্থ ও শাশ্বত মূল্যবোধের এই রুচিবান, হার্দিক ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা যদি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'বিতৃষ্ণা ও বিবমিষার ধারাটিকে অন্য দিকে প্রবাহিত করতে ও অবক্ষয়ের সোচ্চার অনুচরবৃন্দদের কিঞ্চিৎ আত্ম-জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তাহলে সমাজ ও সাহিত্যের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে। এখানেই আধুনিক বা রবীন্দ্রসম্পর্কিত বিতর্ক নীরব হবে এমন নয়। অনাচার, অতিচার সত্ত্বেও ত্রুটি কেবল এক তরফের নয় : Quelle âme est sans défauts? আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কালপ্রবাহ চলবেই। তথাপি যদিও 'নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে (আমদানি করা) আদি পাপের ডগমা যুক্ত হলে যোগফলটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়' (পৃঃ ২০৫), আধুনিক হবার মূঢ় আগ্রহে অগ্রজদের নস্যাৎ করার* বা 'বিদেশী ধরনে কাশি'র প্রয়োজনটা কোথায়? আইয়ুবের ভাষায়, 'একেলে হবার জন্য সর্বস্বান্ত হতে আমার মন নয় রাজী' (পৃঃ ২০৩)। নিধন যদি যেতেই হয় তার জন্য তো স্বধর্মই শ্রেয়।

শিশিরকুমার ঘোষ

---

[১] যাদের সম্বন্ধে এক বিদেশী সমালোচক চমৎকারভাবে বলেছেন : 'those who prefer perdition'.

* রবীন্দ্রনাথের বেদনার্দ্র সতর্কবাণী স্মরণীয় :

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুভয়ে যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে ["আধুনিক"] রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

স মা লো চ না

Modern Arabic Short Stories. Selected and Translated *By* Denys Johnson-Davies. Oxford University Press. London. 25*s.*

দিনযাপন রুক্ষ কঠিন বিপজ্জনক হলেও দূর অতীতে আরবদের মজলিশি মেজাজের বীজ ছিল তাদের পারিপার্শ্বিককে। দিগন্তছোঁয়া বালির বিস্তার পার হয়ে এসে রাত্রিতে আগুন ঘিরে বসে পরস্পরকে বড় ঘনিষ্ঠ, খুব কাছের মানুষ মনে হওয়া সঙ্গত। তখন মুখে মুখে ক্লান্তিহর মনোরঞ্জনের কাহিনী। সেই মজলিশি গল্পগুলো অনেক কারুকাজ ও রঙের গয়না পরে প্রাচীনতম আরবী কাব্যের শরীর তৈরি করেছিল। সেই কাব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাচীন কাহিনীগুলিকে বার বার নানাভাবে বিস্তারিত করা হয়েছে। পরে জীবনের কেন্দ্র মরুভূমি থেকে নগরে, ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির স্বতন্ত্র এলাকা থেকে সাম্রাজ্যে স্থানান্তরিত হল। তখন এল আরব্য রজনীর কাহিনীগুলির জন্মলগ্ন। এগুলির লক্ষ্য ছিল সাধারণের মনোরঞ্জন। আগে নগরের বাজারে ভিড়করা মানুষের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিল, তারপর সম্ভবত দশ শতক থেকে লেখা শুরু হয়ে বাড়তে বাড়তে উনিশ শতকের আরম্ভে পুরোপুরি ছাপা হয়ে গেল। হয়ত মনে হয়েছিল, এগুলি তাদেরই আনন্দ দেবে যাদের পরিশীলিত রুচির অভাব। শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এবং গোঁড়া ধার্মিকরা তাই এগুলিকে ধ্রুপদী আরবী সাহিত্যের মর্যাদা দিতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না।

উনিশ শতকে এই চেহারা বদলে গেল। য়ুরোপের রাজনীতি ও অর্থনীতির দুই বলিষ্ঠ বাহু আরবদেশকে জড়িয়ে ধরলে পশ্চিমী সাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস ও ছোটগল্প, বেশ কয়েকটা বন্ধ দরজা খুলে দিল। বিদেশে অথবা মিশন স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ যাঁদের হল তাঁরা মূল থেকে ফরাসী, ইংরেজি, ইতালীয়, জার্মান ও রুশ গল্পউপন্যাসের স্বাদ পেলেন। সাধারণ পাঠকদের অনেকে সেই স্বাদ নিলেন অনুবাদ থেকে। সবে এই বিশ শতকে আরবের লেখকরা সার্থক মৌলিক গল্পউপন্যাস রচনায় মন দিলেন।

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এই তথ্যটুকু জেনে নিয়ে আলোচ্য সংকলনগ্রন্থের গল্পগুলি পড়লে চমকে উঠতে হয়। এত অল্প সময়ে এমন সার্থকতা সত্যিই চমক লাগায়। মনে পড়ে, সাম্প্রতিক কালে আরবে নতুন জীবনের জোয়ার এসেছে, য়ুরোপের রাজনৈতিক শক্তির তৈরি দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়েছে, মিশর লেবানন সিরিয়া ইরাকে অবাধে প্রবাহিত মুক্তির হাওয়ায় নিজের ঘরের দিকে ফিরে তাকাবার সময় এসেছে। আরবী সাহিত্যের এই পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে জায়দনে, মনফলুতি, মাজিনি, খলিল জিবরান, রায়হানি, তাহা হোসেনের মতো লেখকদের সাধনায়। একালের আরবী সাহিত্যে ডিকেন্স, ওয়েলস, মম, ভিকটর হুগো, আনাতোল ফ্রাঁস, মপাসাঁ, মান, কাফকা, তলস্তয়, চেকভ এবং সম্প্রতি জয়েস, কামু, সার্ত্রে, স্টাইনবেক, হেমিংওয়ের প্রভাবকে আর কেউ অনুকৃতি বলতে পারেন না, বলতে হয় সার্থক আত্মীকরণ।

গত দুই-তিন দশকেই যে আরবী ছোটগল্প সাবালক হয়ে উঠেছে, এই সংকলনের

কুড়িটি গল্প তার প্রমাণ। গল্পগুলি নানা মেজাজের, করুণ, গম্ভীর, হালকা, বুদ্ধিদীপ্ত, কল্পনাবিলাসী, কখনো বা বীভৎস। বর্তমান আরবের সমাজজীবনের নানা দিকে গল্পগুলি বিচিত্র আলোকপাত করে। গল্পগুলির লেখকরা সবাই একালের, কয়েকজন অতি তরুণ, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। গল্পগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার অধিকার ডেনিস জনসন-ডেভিসের অবশ্যই আছে। আরব জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। মূলের সৌন্দর্য অনুবাদে হয়ত অনেকটাই মেলে না, তথাপি তাঁর অনুবাদের পাঠযোগ্যতা তৃপ্তি দেয়।

কয়েকটি গল্প আমার ভাল লেগেছে। যেমন ওয়ালিদ ইখলাসীর 'মরা বিকেল'। তিন পাতার এই ছোটগল্পটি একটি আশ্চর্য সুন্দর গীতিকবিতার মতো। গল্পটিতে রয়েছে এক বৃদ্ধা, তিরিশ বছর বয়েসের লেখক, একটি গল্পপিপাসু ছোট মেয়ে, একটা মরা মাছি, আসন্ন সন্ধ্যায় আকাশে অজস্র বিন্দুর মতো দূরগামী বাবুই পাখি, আর এই সব ছাপিয়ে সময়চেতনা যা একটা দেওয়ালঘড়ির ধ্বনিতরঙ্গে রূপায়িত। জীবন ও মৃত্যুর মতো বড় জিনিসকে এত ছোট পাত্রে এমন অনায়াসে ধরবার শিল্পকর্ম সব সময় চোখে পড়ে না। ফওয়াদ তেকেরলির 'নিভন্ত আলো' গল্পটির বীভৎসতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন গল্পকে স্মরণ করায়। যেন মনে হয়, সব থেকে বীভৎস জন্তুর নাম মানুষ। মনের ওপর গল্পটির আঘাত অনেক দিন থেকে যায়। রূপকল্প শুধু প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ না করে, শিল্পোন্নত নগরসভ্যতা থেকে সংগ্রহ করার প্রবণতা আধুনিক সাহিত্যকর্মের একটি লক্ষণ। মহাকাশযানে অন্য গ্রহে অথবা চাঁদে যাবার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সঙ্গে লায়লা বালাবাকীর একটি গল্পে দাম্পত্য প্রেমের একটি গ্রন্থি সম্পৃক্ত। এর মধ্যে হয়ত চমক দেবার কিশোরোচিত ঝোঁক রয়েছে। তথাপি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিষয়টি বেশ নতুন।

এমন একটি সংকলনগ্রন্থের খুবই প্রয়োজন ছিল।

সুধাংশু ঘোষ

Revolution in the Revolution. *By* Regis Debray. Penguin. London. *3s. 6d.*

অপরিবর্তন জীবনের ধর্ম নয়। পরিবর্তনশীল এ পৃথিবী, মানবজীবনও। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের বিরামহীন প্রচেষ্টা পরিবর্তনের। এর অনপনেয় স্বাক্ষর বহন করছে মানবসভ্যতার ইতিহাস। আজও সে প্রয়াস অপ্রতিহত। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের আমূল রূপান্তরের জন্য গভীর আকৃতি পৃথিবীর সর্বত্রই দৃশ্যমান। 'ব্ল্যাকপাওয়ার' আন্দোলন, '২২ মার্চ কমিটি', 'জেঙ্গাকুরেন' বলিভিয়ার গেরিলা যোদ্ধা সকলেই পরিবর্তনের পূজারী। তা ভাল অথবা মন্দের জন্য, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

মোট কথা, পরিবর্তন সবাই চায়। ব্যক্তিজীবনকে সুন্দরতর করতে, সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করতে আগ্রহী সকলেই। মতবিরোধের এখানে কোন অবকাশ নেই। আছে অন্যত্র। তা হচ্ছে, পরিবর্তন কোন পথে? মত এখানে বহু, পথ ততোধিক। মার্কস দেবে নির্দেশ এক পথের, গান্ধী ভিন্ন পথের। উভয়ের পথই বিপ্লবের, যদিও এতে আপত্তি জানাতে পারে মার্কস-শিষ্য। কিন্তু সত্যের কোন প্রকারান্তর হবে না তাতে। বাস্তবকে যদি কেউ অস্বীকার করতে চায় তাকে নিবৃত্ত না করাই শ্রেয়।

অবশ্য স্বীকার করতে হয়, বিংশ শতাব্দীতে সর্বাত্মক পরিবর্তনের সফল প্রচেষ্টা হয়েছে রুশ ও চীনে। সমকালীন ইতিহাসে সশস্ত্র বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল এ দুই দেশ। উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবের তত্ত্ব ও সংগঠন নির্ধারিত হয়েছে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে। একে অস্বীকার করবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই, বিরুদ্ধ সমালোচকদের অভিমত যাই হোক না কেন।

পরবর্তীকালে অবস্থা পালটে গেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে বিশ্বাসভঙ্গের, মার্কসীয় চিন্তারাজ্যে ব্যাভিচারের। আর উভয়েই সযত্নে বপন করেছে মার্কসবাদের পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার বীজ।

সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে কিউবা, তথা লাতিন আমেরিকায়। একথা সত্য যে কাস্ত্রো অথবা গুয়েভারা আপাতদৃষ্টিতে মার্কসীয় দর্শনের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু এর প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁরা পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে একেবারেই নারাজ। তাঁরা পিকিং অথবা মস্কোর ছাপমারা বিপ্লবের প্রচলিত নকশা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁদের বিপ্লবের পথ স্থির হবে কিউবার জাতীয় জীবনের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যের অভিজ্ঞতার অন্ধ অনুকরণ তাঁরা করবেন না। তাঁরা গ্রহণ করবেন না মার্কসবাদের রুশ অথবা চীনী ভাষা।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক রেজি দেব্রে জাতে ফরাসী, পেশায় দার্শনিক। সুদূর বলিভিয়ায় ৩০ বছর কারাদণ্ডের পূর্বে তিনি ছিলেন হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। অবশ্য বৈপ্লবিক রাজনীতি-প্রীতি তাঁকে কিউবার বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করেছে। বিশেষ করে কাস্ত্রো ও গুয়েভারার সঙ্গে। ফলে এঁদের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ব্যাপক ও গভীর।

দেব্রের বক্তব্য, রুশ-চীন রচিত নিয়মের নিগড়বাঁধা বৈপ্লবিক চিন্তারাজ্যে বিপ্লব এনেছেন কাস্ত্রো ও গুয়েভারা। ব্যবহারিক মার্কসবাদের বনিয়াদ নিয়ে এঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। এঁদের চিন্তাধারা পূর্বোক্তদের অনেকগুলি মৌল সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। মার্কসবাদের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী তত্ত্ব ও পার্টি বিপ্লবের অপরিহার্য হাতিয়ার। সুসম্বদ্ধ তত্ত্বের বনিয়াদে গঠিত পার্টিই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে, অন্যথায় সার্থক বিপ্লব বা শোষিতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সম্ভব নয়। এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত কাস্ত্রো ও গুয়েভারার।

তাঁদের অভিমত, প্রথমে গেরিলা ফৌজ ও বিপ্লব, তত্ত্ব ও পার্টি পরে। এরা জন্ম নেবে সংগ্রামের পথে। লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের পথনির্দেশ দেবে কে? এর জবাবে কাস্ত্রো বলছেন, The people, the revolutionaries, with or without a party.. guerrilla force is the party in embryo. শুধু তাই নয়। কাস্ত্রোর রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণ করে দেব্রে বলছেন, Fidel Castro says simply that there is no revolution without a vanguard; that this vanguard is not necessarily the Marxist-Leninist Party; and that those who want to make the revolution have the right and the duty to constitute themselves a vanguard, independently of these parties...There is, then, no metaphysical equation in which Vanguard=Marxist-Leninist party.

বীজ আগে, না বৃক্ষ আগে—এ অধিবিদ্যক বিতর্কে আর যেই সামিল হোক, কাস্ত্রো নন। বিশেষ কোন দেশের যদি ধারণা হয়ে থাকে যে মার্কসবাদের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা অথবা

বিপ্লবের যথোচিত ব্যাখ্যায় একমাত্র তাদেরই স্বত্বাধিকার, তা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। মার্কসবাদ একটা বিশ্বাস নয়, না তা যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে। কাস্ত্রোর মতে, we don't belong to any sect, we don't belong to an international Masonic order; we don't belong to any church...There is no exclusive ownership of the revolution.

বিশ্বাসীর কানে এ কথা ঈশ্বরনিন্দা, সন্দেহ নেই। হয়েছেও তাই। গোঁড়া মার্কসবাদীরা ওদের হেরেটিক বলে অভিযুক্ত করেছে। তাতে অবশ্য ওঁরা কণামাত্র বিচলিত নন। বরঞ্চ পাল্টা অভিযোগ এনেছেন কাস্ত্রো, I am accused of heresy. It is said that I am a heretic within the camp of Marxism-Leninism. Hmm ! It is amusing that so-called Marxist organizations, which fight like cats and dogs in their dispute over possession of revolutionary truth, accuse us of wanting to apply the Cuban formula mechanically. They reproach us with a lack of understanding of the Party's role; they reproach us as heretics within the camp of Marxism-Leninism.'

কাস্ত্রো ও গুয়েভারার রাজনৈতিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেব্রের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে অবান্তর বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। বিশেষতঃ একথা যদি স্বীকৃত না হয় যে মানুষের মৌল মূল্যবোধ, তার সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা অনন্তকালের জন্য এক শাশ্বত অনুশাসনে আবদ্ধ। স্পষ্টত প্রতীয়মানের পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে হয়, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর আদর্শ ও লক্ষ্য অভিন্ন—বন্ধনমুক্তি : রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক। কিন্তু এর অর্থ এ নয়, সিদ্ধিলাভের পথটাও অভিন্ন। তা নয়। নয় বলেই দেব্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। রুশ অথবা চীনের নকশা যেমন কিউবার নিকট অবান্তর, শেষোক্তের মুক্তি-সাধনের ফরমুলাটাও তেমনি অন্যত্র অপ্রযোজ্য। স্মরণ রাখা উচিত, মার্কসবাদ সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তার এক বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি, অনড়, অক্ষয় ধর্মীয় বিধান নয়। পরিবর্তন, সংশোধন এবং প্রয়োজনে, পরিবর্জন একে করা যেতে পারে। এর অস্বীকৃতি ভাবের ঘরে চুরির নামান্তর।

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

যদিও সন্ধ্যা—মণীশ ঘটক। এষণা। বহরমপুর। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

যতদূর জানি, মণীশ ঘটক একটি কাব্যগ্রন্থ বার করেছিলেন এর আগে, এবং সেটাও শুনতে পাই বেশ কয়েক দশক আগে, যার মধ্যে এমন যে বাংলা দেশ সেখানেও কবিতার বাহ্যিক ও আত্মিক রূপ এত বদলেছে যে তাকে চেনা দুষ্কর; তবু—কম কথা ?—বাংলা কবিতায় উৎসাহী এমন জীবিত বাঙালী আজো আবিষ্কার করার আছে, যিনি মণীশ ঘটকের নাম শোনেন নি। অবশ্য ইতিমধ্যে নানান পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখে গেছেন, বেশি না লিখলেও মধ্যে মধ্যে লিখেছেন-লিখছেন, কিন্তু সেটা তাঁর ইমেজটাকে জীইয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট হত না যদি

তিনি মণীশ ঘটক না হতেন। এবং তাঁর সেই পরিচয়টা শুধু যে-কোনো একটা পরিচিত নামেরই নয়, ইমেজটা যে-কোনো ইমেজ নয়—এক সম্ভ্রান্ত কবি, স্বতন্ত্র, এই মণীশ ঘটক।

কোথায় স্বতন্ত্র বা কেন সম্ভ্রান্ত, সেটা দেখানোর জন্য ব্যাপারটাকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করা যাক। তর্কের খাতিরে না হ'য় ধ'রেই নেওয়া গেল যে হ্যাঁ, এমন একজন বাঙালীকে খুঁজে বার করলাম যিনি কাব্যোৎসাহী হ'য়েও মণীশ ঘটকের নাম শোনেননি ও যাঁকে এই "যদিও সন্ধ্যা" হ'তে বেছে বেছে চারটি কবিতার কিছু কিছু অংশ প'ড়ে শোনালাম। প্রথমে পড়লাম—

আজ যারে ভালোবাসো প্রিয়া,
তাহারে বাসিয়ো ভালো, যেন কপটতা কালো মলিন না করে তব হিয়া।
সে যেন আমার সম, না হয় প্রথমতম, প্রিয়তম তাহারে করিয়া
আমারে বুঝিতে দিয়ো মনে,
কাল রজনীতে ঝড় রজনীগন্ধার পর, ব'য়ে গেছে আমারি জীবনে॥

('কাল রজনীতে ঝড় হ'য়ে গেছে')

পরে শোনালাম—

ক্বচিৎ কখনো থেমে থেমে যায় কালের চাকা,
যে যা করছিলে ঠিক সেই ঠাটে রইলে আঁকা।
বন্ধু মরেছে, সান্ত্বনা তার স্ত্রীকে দিচ্ছিলে
আত্তি দেখিয়ে বুকে পিঠে হাত বুলোচ্ছিলে
হাতটা হঠাৎ জায়গা বিশেষে রইল থেমে
সদ্যবিধবা শোকাবেগ ভুলে উঠল ঘেমে।

('সে লোহুর স্বাদ নোনা')

এবার আমার শ্রোতাটির কপালেও ঘামের বিন্দু হয়তো জাগতে দেখব, কিন্তু তাঁকে তো অবসর দেওয়া চলে না, তাই সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কবিতাটির অংশ আরম্ভ ক'রে দিলাম—

প্রভঞ্জন হার মানে। গোঙায় নিষ্ফল রোষে
বিদ্যুৎগর্ভ বারিবাহ। সুতীক্ষ্ন ফলকাঘাতে
দীর্ণ করে দিগঙ্গন লক্ষজিহ্ব শাণিত বিজলী।
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু আত্মঘাতী পরিক্রমা শেষে
অন্তরীক্ষে হয় অন্তর্ধান। এত রঙ্গ, কে সে দেখেছে?
একটি বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে।

('একটি বিশাল গাছ')

এবং সব শেষে—

দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, মচ্ছবে,
যে কোনো মওকায়
এরা লুটের বেসাতি ক'রে যায়
শত্রুমিত্র যখনই যে ভূ'য়ে লোটায়
এরা তাদের রক্ত মাংস হাড়
চিবোয়, চোষে—

* * * *

দোস্ত স্যাঙাৎ ভাইসব
এদের চিনে রেখো,
চরম বোঝাপড়ার দিন আসছে
সেদিন যেন এরা পিছলে না যায়।

('এদের চিনে রেখো')

টীকা নিষ্প্রয়োজন, তাই এ-অনুমান হয়তো মিথ্যা হবে না যে শ্রোতাটি তখন ব'লে বসবেন, এ-চারটি কবিতা একটি কবির নয়, চারটি বিভিন্ন কবির রচনা : প্রথমটি যৌবনাক্রান্ত ঢুলুঢুলু নয়ন করিয়া-খাইয়া-ওলা এক পুরাকালের রোমান্টিকের (মানছি, এটি ১৯২৩-এ লেখা), দ্বিতীয়টি কথা বলতে জানে এমন এক শুদ্ধ ফচকে অর্বাচীনের (তখন ৫৬ বছরের অর্বাচীন, যখন কবিতাটি লেখা—কিন্তু সেটা ব'লে শ্রোতার ভুল না হয় নাই ভাঙালাম), তৃতীয়টি কাব্যের ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে বিশ্বাসী কারুর, এবং চতুর্থটি যাঁর, তিনি তো নিঃসন্দেহে লাল সেলাম করেন, হয়তো পকেটে পটকাও রাখেন, মিছিলে বেরোন, পোস্টার মারেন।

যখন এত বৎসরের ব্যবধানে শুধু দ্বিতীয় একটি কাব্যগ্রন্থ এভাবে বার করতে হচ্ছে, এবং সেটিও একটি চটী সংকলন ১৯২৩ হ'তে ১৯৬৭-তে লেখা কবিতার (আরো একটি কথা, শুনতে পাই কবি স্বয়ং সম্পূর্ণ সুখী নন কবিতার বর্তমান নির্বাচনের ব্যাপারে), তখন তার মধ্যে আঙ্গিক ও বক্তব্যের অন্তত আপাত একটি বিভিন্নতা লক্ষ্য না করাটাই অস্বাভাবিক—এমন কি তাতে যদি একই লোককে কখনো কখনো একাধিক ব'লে সন্দেহ জাগে, সেটাও মারাত্মক পাপ তেমন নয়। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তেও যে-কোনো মানুষ—এবং সৃষ্টিশীল মানুষ তো আরো বিশেষত—একটি একক নয়, যা তাকে জাগায় এবং যাতে সে জাগতে পারে, তার অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী নাম থাকতে পারে; অর্থাৎ সে-মানুষটা সব সময় একই সঙ্গে অনেক জিনিস। তার ওপর ব্যবধানটা যদি হয় এমনি ক'রে এক অর্ধ শতাব্দীর কাছাকাছি—এবং কী এক অর্ধ শতাব্দী এই, ভারতের পক্ষেও, বাংলা-দেশের পক্ষেও—তখন তার সেই অনেকত্ব তো আরো অজস্রগুণে বিপুল হ'য়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। মানুষ থেমে থাকে না, মণীশ ঘটকও থেমে থাকেননি।

তবু তা সত্ত্বেও বলব, আমাদের আনুমানিক শ্রোতাটির সঙ্গে আমি একমত হব না। তাঁর প্রথম মুশকিল হয়েছে এই যে তিনি মণীশ ঘটক মানুষটিকে চেনেন না, চিনলে বুঝতেন, এই "যদিও সন্ধ্যা"-তেও (কারণ বয়সটা কিছু কম হয়নি) লোকটির প্রাণশক্তি কত উচ্ছল (এক সত্যিকারের 'যুবনাশ্ব' তিনি, আজো), নিছক শারীরিক অর্থেও কী পুরুষোচিত কাঠামোটি তাঁর ('আধুনিক' কবিদের সঙ্গে তাঁর কোনো মিলই নেই, তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার নিয়তি থেকেও তিনি দুর্ধর্ষভাবে নিজেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন), অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীরকম হুংকার তিনি ছেড়ে উঠতে পারেন, একই সঙ্গে ভালোবাসতে পারেন কত প্রচণ্ডভাবে, মানবসুলভ ছ্যাবলামির উদ্দাম সৌন্দর্যে জাগতে পারেন বন্ধুদের কাছে, প্রয়োজন হ'লে শিশুর মত কোমলও হ'তে জানেন, অথবা চোখে আনতে পারেন ধ্যানীর গাম্ভীর্যের দ্যুতি। ধ্রুপদের আলাপ ও পরে ধামারের বোল একদিকে, অন্যদিকে টপ্পা-ঠুংরী, এমন কি হাফ-আখড়াই ও কখনো কখনো শ্লেষাত্মক খিস্তি-খেউড়—এই সবগুলো যেন একসঙ্গে চলতে পারে তাঁতে, মিলে-মিশে, সবই যুগোপযোগী এক ভাষণ-ভঙ্গীর সুস্বাদু মাধ্যমে, ও তাতে সর্বত্র প্রতিফলিত মুখ্যাত একটি সংস্কৃতিদীপ্ত মানস।

এমন স্বাতন্ত্র্য বাংলায় আজ অন্য কবির নেই।

অবশ্য এটা নিশ্চয়ই কিছু গ্রাহ্য প্রতিপাদ্য নয় যে কোনো কবিতার সম্যক অনুধাবনের জন্য তার কবিকেও ব্যক্তিগতভাবে চিনতেই হবে। তাই আমাদের শ্রোতাটির দ্বিতীয় মুশকিলটির কথাও বলি : যে-যে কবিতার অংশবিশেষ তিনি শুনলেন, তার মধ্যে অপঠিত ব'লেই উহ্য র'য়ে গেল কবির মানবধর্মী আর্তি, যা শুধু ঐ প্রত্যেকটি কবিতারই (আমাদের উল্লিখিত ব্যক্তিগত প্রেমের প্রথম কবিতাটি না হয় বাদই দিলাম এ-প্রসঙ্গ হ'তে—কিন্তু সেখানেও বলব, ব্যক্তিগত প্রেমেও কিছু কম ধ্বনিত নয় নির্বিশেষ মানবাত্মার সর্বজনীন সর্বকালীন আর্তি) কোনো না কোনো স্থানে বিদ্যমান নয়, তাতে আলোচ্য কবির সমগ্র কাব্য-সাধনারও একটি মুখ্য দিগদর্শন, এমন কি সেইটেই তাঁর বহুমুখিতাকে এক ক'রে মেলানোর সবচেয়ে বড় সুর। এবং তারই কল্যাণে তিনি বেঁচে গেছেন আজকের কবিতার বহু ভুয়ো বাঁদরামি হ'তে—যেমন প্রতীকবাদ বা পাশ্চাত্ত্য পাপবাদ, ইত্যাদি--এবং দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের ভাবে ক্রমশই আরো বেশি ক'রে আজ লিখছেন—

অনিবার্য যে ধ্বংস এবারে রক্ত আখরে জ্বলছে লেখা
কংস এখনো দুই চোখ মেলে দেখে নাও শেষ বারের দেখা।
আত্মম্ভরী মদগরিমায়
অন্ধের মতো তুমি অসহায়
পরিণতি পথে প্রারব্ধ ধায়, পরিণামী হায় তুমিও একা॥
('জন্মাষ্টমী')

তবে সব থেকে অনন্য (এবং সে-কারণে অনেকটা প্রিয়ও) তিনি ঐ খিস্তি-খেউড়ের ব্যাপারেই। এ-প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। কবিতাটি সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য এই যে এটি লেখা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বছরে, একেবারে রবীন্দ্রনাথের জন্মমাসেই, এবং যখন মণীশ ঘটকের নিজেরই বয়স ৬০। অন্য বক্তব্য, কবিতাটির সুর যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় তিনি কারুর থেকে কিছু কম যান না—শুধু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে আজকের বাংলাদেশে যে এক নপুংসক ন্যক্কারজনক গদগদ ভাবাপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে, তার সমর্থন তিনি নিশ্চয় করেন না, নইলে বাঁধিয়ে রাখার মত এই কবিতাটি লিখতে পারতেন না—

ধরোনি রেসের বাজি ওড়াওনি 'রাম্',
প্রড্যুস করোনি ফ্লপ সিনেমার ছবি,
খিড়কির দোর দিয়ে আনোনি ইনাম
উৎপাত বাড়াও নিকো 'উৎপলশ্রী' লভি।

গুগ্‌লি বাম্পার নিয়ে ঘামাওনি মাথা
'থ্রী হান্‌ড্রেড' ক্লাবে কভু হওনি মেম্বর,
ডাক্তার আছিলে বটে, ছিল না চেম্বর,
জোড়া বলীবর্দ জুড়ে ঘোরাওনি জাঁতা।

ফুচ্‌কা খাওনি ব'সে সদর রাস্তায়,
একটানে কলকের ফাটাওনি নল,

নেতা হ'য়ে দেখাওনি খইনির বল,
বিলিতি প্লিলার টুকে ঝাড়োনি শস্তায়।
করোনি অনেক কিছু—ফর্দে কাজ নাই,
মানে মানে স'রে গেছ, বেঁচে গেছ তাই॥
('রবীন্দ্রনাথ')

বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে তো বটেই, অন্যান্য অবিসংবাদিত কারণেও মণীশ ঘটক শ্রদ্ধেয় কবি, তবু যে তাঁর প্রসঙ্গে এমন অগম্ভীর সুরে আলোচনা চালাতে পারলাম, তার কারণ শুধু এই যে তিনি নিজেই তাঁর স্বাভাবিক গুণে তাঁর সামনে আমাদের সহজ হ'তে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে যেন দূরত্বটা কম, সে-বোধের জ্ঞানে আমি আনন্দিত। তবে গম্ভীর শ্রদ্ধার ভাবেও জাগবই, যখন সম্মুখীন হই তাঁর অন্য ধরনের রচনার, যেমন—

জীবন ছড়ানো ছিল মুঠো মুঠো রোদে
ঘাসে ফুলে ঝড়ে জলে
সে-ছবি কে নিলো মুছে? তার প্রতিরোধে
কি করেছো? যাও ব'লে॥
('কি করেছো, যাও ব'লে')

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমার কাল আমার দেশ—সুধীরচন্দ্র সরকার। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স। কলিকাতা ১২। মূল্যে ছয় টাকা।

সাজসজ্জা করে, প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, উপযোগী মেক-আপ নিয়ে, সংলাপ কণ্ঠস্থ করে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন পাত্রপাত্রী। তাঁরা পরিবেশন করেন নাটক। কিন্তু এর পিছনে প্রস্তুতিপর্ব নামক একটা মস্ত ঘটনা থাকে। আসল নাটকের চেয়ে সেটি কম চিত্তাকর্ষক নয়। মনে হয়, নাটক হয় রঙ্গমঞ্চে, কিন্তু আসল ড্রামা যেটা সেটা কিন্তু ঘটে নেপথ্যেই—লোকচোখের আড়ালে। সে ড্রামা দেখার ভাগ্য আমাদের খুব কমই ঘটে। সাজঘরটাই হচ্ছে সেই ড্রামার মঞ্চ। সেখানে দর্শক নেই, তাই ঘটাও নেই; সেখানে যা আছে তা কেবলই ঘটনা।

একজনকে রাজা সাজার জন্যে কতটা সাজা ভোগ করতে হয় তার প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে এই সাজঘর। এক-এক সময় মনে হয়, ব্যাপারটাকে উল্টে দিলে কেমন হত—সাজঘরটিকে যদি টেনে এনে বসানো হত প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে! ড্রামা তাহলে জমত মন্দ না। অথচ তা কখনো হয় না। তা হয় না বলেই ঐ সাজঘরের প্রতি আমাদের এমন কৌতূহল।

মানুষের জীবনই নাকি একটা নাটক। তা যদি হয় তাহলে মানুষের জীবনেও সাজ-ঘর আছে। কিন্তু সব মানুষের উপর আমাদের মনের টান তেমন প্রবল নয়। সংসারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ; তার উপর, যাঁরা বিশেষ কোনো কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের জীবনের নেপথ্যকাহিনী শোনার লালসাই আমাদের প্রবল।

আমাদের দেশের বিশেষ-একটা কালের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে সুধীরচন্দ্র সরকার

একটা বড়-রকম কাজ করে গেলেন। তিনি আমাদের যে কেবল কৌতূহলই মিটিয়ে গেলেন, এমন নয়। যেসব কথা হাওয়ায় হারিয়ে যেতে পারত, তিনি অক্ষরে তা বন্দী করে রেখে গেলেন। আমরা যেন সাজঘরের কাহিনীও জেনে ফেললাম।

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরিণত বয়সে সুধীরচন্দ্র সরকার লোকান্তরিত হন। গ্রন্থাকারে তাঁর এই স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। এতে বাংলা-দেশের দিক্‌পাল সাহিত্যিকদের অন্তরঙ্গ কথা অনেক আছে, সুধীরচন্দ্র তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এইসব কাহিনী জানা সম্ভব হয়েছে, এবং তিনি সাহিত্যপ্রাণ সেইজন্যে সেসব কাহিনী এমন সহজ সরল ও অনাড়ম্বর ভাবে তিনি পরিবেশন করতে পেরেছেন।

১৮৯২ সালে সুধীরচন্দ্রের জন্ম। বিদ্যানুরাগী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় শিশুকাল থেকেই একটি সাহিত্যিক পরিবেশ তিনি প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। পিতাও লেখক ছিলেন, যদিও তিনি ইংরেজিভাষায় লিখতেন, এবং যা লিখতেন সেসব আইনসংক্রান্ত বই।

আলোচ্য বইটিকে ইতিহাসও বলা যায়, এর মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান আছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকের স্বদেশী আন্দোলনের কথা, এবং সেইসূত্রে শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন-চন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখের প্রসংগ এ বইতে যেমন আছে, তেমনি ফুটবল-ক্রিকেটে দেশী খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের কথাও আছে। সুধীরচন্দ্রের চাক্ষুষ দেখা ঘটনার এইসব বিবরণ পাঠকদের আকৃষ্ট করবেই। কিন্তু ঐসব ঘটনার উল্লেখের জন্য এ বইয়ের দাম নয়। ওসব কাহিনী জানার উপায় হয়তো অন্যত্রেও আছে।

১৯০৮-০৯ সালের কথা। সুধীরচন্দ্রের বয়স তখন ষোলো-সতেরো। সেই সময়ে "ভারতী" পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। "ভারতী"র সম্পাদিকা তখন স্বর্ণকুমারী দেবী। সুধীরচন্দ্রের লেখা পেয়ে স্বর্ণকুমারী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, এবং অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন। এর আগেও অবশ্য লক্ষ্মীবিলাস প্রেস-প্রকাশিত "প্রবাহিণী" মাসিক-পত্রে তাঁর লেখা বেরিয়েছে এবং তজ্জন্য দক্ষিণাও তিনি পেয়েছেন, কিন্তু "ভারতী"তে তাঁর রচনা প্রকাশের পরই, সুধীরচন্দ্র লিখছেন, 'শুরু হল আমার সাহিত্যজীবন।'

সাহিত্যজীবন তাঁর আরম্ভ হয়েছিল বলেই তিনি সেই সময় থেকে অনেক পত্রপত্রিকার এবং অনেক সাহিত্যিকের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং সেইজন্যেই সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত অনেক অজ্ঞাতপূর্ণ কথা জানার সুযোগ আমাদের ঘটেছে। "জাহ্নবী" "যমুনা"—এসব তো এখন প্রায় বিস্মৃত নাম, কিন্তু এককালে এসব পত্রিকার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ অনেক সাহিত্যিককে লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির প্রসঙ্গে অনেক কথা আমরা জানতে পারি।

"যমুনা" পত্রিকার সঙ্গে তখন সুধীরচন্দ্রের বেশ অন্তরঙ্গতা। এই পত্রিকায় তখন শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছে। কিন্তু লেখার কিস্তি এসে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় পত্রিকাটি প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। এই ব্যাপার নিয়ে সকলে বেশ চিন্তিত। পত্রিকাটির সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল। এই বিষয়ে সুধীরচন্দ্র লিখছেন—

'এই নিয়ে আমরা একটু উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি। আমাদের কে-যেন বলে

উঠল, শরৎবাবু নিশ্চয়ই চরিত্রহীন, তাই "চরিত্রহীন" লেখা পাঠাতে দেরি করছেন। কথাটা খুব হাল্কাভাবে ঠাট্টাচ্ছলে বলা হয়েছিল—কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘরের দরজাটি খুলে একজন প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আবার একটা কুকুর। সাধারণ জামা-কাপড় পরা শীর্ণকায়, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটি। ঘরে ঢুকতেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে চাই?

তিনি বললেন, ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

তাঁকে বলা হল যে, তিনি তো এখন নেই, সন্ধ্যাবেলায় আসবেন, তখন এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন, তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাব। অনেক দূরদেশ থেকে আসছি কিনা। একটু থেমে আবার বললেন, আর একটা কথা—শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন নন, তিনি ঠিক সময়েই লেখা দেবেন।

হঠাৎ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁকে ওকালতি করতে শুনে প্রেমাঙ্কুর বলে উঠল, শরৎচন্দ্র ঠিক সময়ে লেখা দেবেন কিনা সে খবর আপনি জানলেন কি ক'রে?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আমারই নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একে বলা যায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এরকম অনেক বিবরণ এই বইতে আছে।

১৯১৩ সালের একটি দিনের কথাও বলেছেন সুধীরচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আনন্দে অধীর হয়ে সুধীরচন্দ্র চললেন কবি-সন্দর্শনে সদলবলে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায় ইত্যাদি তাঁদের দলে। ভোরবেলা অতিথিভবন থেকে কবির কুটিরে গিয়ে তাঁরা উঠলেন। আশ্রমের কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে নিজের রচনা পড়ে শোনাচ্ছেন কবি। 'বাইরে তখনও অন্ধকার, দূর দিগন্তে ঊষার অবগুণ্ঠন-উন্মোচনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাথার উপরে শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছে। ঘর অন্ধকার। মধ্যে একটি সেজ-বাতির নীচে বসে গুরুদেব তাঁর উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠে কবিতা পাঠ ক'রে চলেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি মনের মধ্যে চিরকাল সঞ্চয় ক'রে রাখার মত।'

সুধীরচন্দ্র আড্ডা বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। যমুনার আড্ডা, এবং সবশেষে এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স-এর আড্ডা। 'আড্ডা দেওয়াটা একটা নেশাবিশেষ। আড্ডা দিতে বসলে সময়ের জ্ঞান থাকে না এবং সময়ে সময়ে পয়সারও না।'

এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধ'রে তিনি পর পর সর্বশ্রেণীর ও সব-বয়সের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পেরেছেন সেটা তাঁর আড্ডাপ্রিয়তার জন্যেই। আড্ডা জিনিসটা ভালো কি খারাপ সে বিচার সুধীরচন্দ্রও করতে চাননি, আমরাও চাইনে। কিন্তু এটা যে একটা দরকারি জিনিস, সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। অনেক দরকারি জিনিসের মত আড্ডাও এখন দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে, মনে হয়, পরবর্তীকালে এরকম অন্তরঙ্গ কাহিনী লেখার সুযোগ আর বোধ হয় কারও হবে না।

"ভারতী"র আসরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রধান আড্ডাধারী। সে সময়ে পত্রিকার দপ্তর ঘিরেই জমে উঠত আড্ডা, মিলিত কবি-সাহিত্যিকেরা। এতে অনেক কাজ নিশ্চয়ই হত, কেবল সময়ের অপচয়ই হত না। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে সুধীরচন্দ্র ছোটদের মাসিক পত্রিকা "মৌচাক" প্রকাশ আরম্ভ করেন, এই পত্রিকাটির নামকরণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ, এবং প্রথম সংখ্যায় 'মৌচাক' শীর্ষক কবিতা লিখে দেন—

ঝরছে রে মৌচাকের মধু
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়

এসব সংবাদ হাওয়াতেই হারিয়ে যেত, কিন্তু সুধীরচন্দ্র তা ধ'রে রেখেছেন তাঁর বইতে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এখন স্বনামধন্য সাহিত্যিক। কিন্তু প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে বা পাঠকমহলে পরিচয় লাভের জন্য তাঁকেও চেষ্টা করতে হয়েছে। 'আলাপের পর তারাশঙ্কর আমায় তাঁর প্রথম "চৈতালী ঘূর্ণি" এক কপি দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, এইটি তাঁর প্রথম বই, নিজেই এর মুদ্রণব্যয় বহন করেছেন। যেহেতু তিনি নতুন লেখক, দেশের পাঠক-সাধারণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এখনও তেমন হয়নি, সেইজন্য আমার দোকানে পুস্তক বিক্রয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিতে।' সে ব্যবস্থা অবশ্য হয়েছিল।

এইভাবে তিনি সাহিত্যিকবর্গের সংস্পর্শে এসেছেন। সুধীরচন্দ্র আত্মজীবনী রচনা করেননি, নিজের কথা যতটা সম্ভব কম বলে বাংলা সাহিত্যের, বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার ও বাংলার সাহিত্যিকদের কথাই বলেছেন সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের সঙ্গে।

বুদ্ধদেব বসুর দিদিমা যে তাঁর এই নাতির লেখা ছাপার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন এক সময়ে, উদয়শংকর যে নারীবেশে মঞ্চে অবতীর্ণ হন—এরকম মজার কথাও আছে এ বইতে। '১৯২৭-২৮ সালে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে একটি নৃত্য-প্রদর্শনীতে প্রথম উদয়শঙ্কর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন এক নর্তকীরূপে।'

বিদেশ ভ্রমণেও সুধীরচন্দ্র গিয়েছিলেন বছর কয়েক আগে। সে দেশের কথাও তিনি আপনাদের জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের বাইরে এই বোধহয় তিনি প্রথম যান, অবশ্য ব্রহ্মদেশে তিনি গিয়েছিলেন অনেক আগেই।

মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতে জানতেন, বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করে তিনি বহুবিধ মানুষ দেখেছেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেকে জারিত করে নিতে পেরেছেন। দেশভ্রমণের দ্বারা মনের পরিধি বাড়ে, মনের উদারতাও। সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সুধীরচন্দ্র নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি। তাঁর দেশ এবং তাঁর কাল তাই একটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিদ্যমান। সকলের প্রতি তাই তাঁর সমান দৃষ্টি ও সহজ দৃষ্টি—

> আমার জীবনী যে কোনোদিন লিখতে হতে পারে একথা কোনোদিন ভাবিনি। ভাবলে হয়তো মাল-মশলা সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা করতাম। আমার জীবনে কোনো উত্তেজনা নেই, কোনো উপন্যাসের নায়কের মত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই। এক চেয়ারে বসে আছি আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। সে চেয়ার পেরেক মারতে মারতে বেঁকে গেছে। চারিদিক শুধু বই দিয়ে ঘেরা। নতুন আর পুরনো সব বইয়ের মাপে আমি যেন হারিয়ে যাই।

কোনো মাল-মশলা তিনি সংগ্রহ করে রাখেননি, এটা হয়তো ভালোই হয়েছে। সব উপকরণ ব্যবহার করলে বইটি তথ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারত, এতটা অন্তরঙ্গ হয়তো হত না।

> ছোট ছোট ছেলেরা আসে—তাদের কাঁচ হাতের লেখা নিয়ে "মৌচাক"-এ ছাপাতে। তার কিছুদিন পরেই শুনি তারা বিরাট সাহিত্যিক হয়েছে, কেউ রবীন্দ্র-পুরস্কার পাচ্ছে, কেউ ডক্টরেট হচ্ছে, কেউ বৈজ্ঞানিক হচ্ছে; কেউ-বা নেতা হচ্ছে।...গর্বে আনন্দে আমার বুকও তত ভরে উঠছে।

সুশীল রায়

Zuka. Quarterly. Oxford University Press. Nairobi. Kaneaya.

বর্ণমাহাত্ম্যে যতখানি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি একই দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ দিনের শরিক বলে, আফ্রিকা সম্পর্কে ভারতবাসীর আগ্রহ এবং শ্রদ্ধা অনেক কালের। এদেশ থেকে বিদেশী শাসন রাজনৈতিকভাবে অবসিত হবার পর, একে একে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা অর্জন, আমাদের মধ্যে আনন্দ, স্পষ্টতই গৌরবের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই মানসিকতা যে শুধুমাত্র মানবতা-বোধপ্রসূত তা নয়। এর মধ্যে আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত এক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের বিরল সম্মান বোধ করেছিলাম। সেই সঙ্গে অরণ্য-গভীর আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল আরো বাড়ল।

ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একত্রে লড়াই আমরা করেছি, এবং অধুনা, তা যেখানেই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইংলন্ডে অথবা অন্য আর কোনো দেশে—বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধেও আমরা সম্মিলিতভাবে সোচ্চার।

আমাদের এই অভেদ্য মানসিকতা আমাদের আরো আগ্রহী করে তুলেছে অন্ধকার অরণ্যের অতীত সূর্যের আলো দেখতে। সম্প্রতি নাইরোবি থেকে *Zuka* নামে ইংরেজী একটি সাহিত্য-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই পত্রিকাটি আধুনিক সাহিত্যরসিক ও সংস্কৃতিবান নতুন আফ্রিকার জীবনের একটি জানালা। এর মধ্য দিয়ে এখন দৃষ্টি অনেকখানি প্রসারিত করা সম্ভব, জানা সম্ভব আফ্রিকার সাহিত্যকর্মের এক প্রতিচিত্র। আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প এবং কবিতাগুলি আঙ্গিক ও ভাষায় প্রশংসনীয়।

আফ্রিকার তরুণ লেখক ও কবিদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই পত্রিকাটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ইয়োরোপে যে শিল্পবিপ্লবের শুরু, বিজ্ঞানের প্রগতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। সেই নতুন জাগরণের দিনে ইয়োরোপের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের চিন্তাধারা, বিশেষ করে বিজ্ঞানে বিশ্বাস, পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতির সম্বন্ধে নতুন সন্দেহ ও বিচারের মনোবৃত্তিতে প্রকাশ পেল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তনকে যুগান্তকারী বললে অত্যুক্তি হবে না। সাক্ষাৎ বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদেই ইংরেজ শাসকদের মধ্যে অধিকাংশ সেদিন এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে যে দূরপ্রসারী বিপ্লবে সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য বদলে যাবে, তাদের মধ্যে অনেকেই তা কল্পনাও করতে পারেনি। মেকলে অবশ্য ভবিষ্যতের কথাও ভেবেছিলেন কিন্তু তাঁর চোখেও এ যুগান্তকারী বিপ্লবের ফলাফল স্পষ্টভাবে ধরা দেয়নি। তিনি ভেবেছিলেন যে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষের বিচারশক্তি বাড়বে এবং কালক্রমে পাশ্চাত্য আদর্শ এ দেশের প্রাচীন জীবনাদর্শকে বদলে দেবে। ভারতবাসীদের মধ্যেও অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মেকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁরাও বলেছেন যে প্রাচ্যের সমস্ত জ্ঞানসাধনাকে যদি একদিকে রাখা যায় আর অন্যদিকে এক আলমারি ইংরেজি বই, তবে মানুষের কল্যাণের হিসাবে সেই এক আলমারি ইংরেজি বইয়েরই ওজন হবে বেশী। সেদিন মেকলে অথবা তাঁর সমসাময়িক ইংরেজ বা ভারতবাসী কেউ বোঝেননি যে ভারতবর্ষে যে প্রক্রিয়ার শুরু হল, তাকে ভারতীয় মানসকে ইয়োরোপীয় ধাঁচে ফেলবার চেষ্টা মনে করলে ভুল হবে। ইয়োরোপিয় মানসের সংস্পর্শে ভারতীয় মানসের পুনরুজ্জীবন বললেই তার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যাবে, এবং সেই পুনরুজ্জীবনের ফলে ভারতবর্ষে যে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি, বর্তমান জগতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়ের পক্ষেই তা সমান মূল্যবান।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ইয়োরোপের আবির্ভাবে এদেশে যে সমস্ত নতুন ভাবনাচিন্তার প্রবর্তন হল, ভারতবর্ষের কাছে তারা ষোল আনা বিদেশী বা নতুন বলে প্রতিভাত হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে গ্রীক চিন্তাধারার সঙ্গে এ দেশের

প্রথম পরিচয়, পরে মুসলীম রাজত্বের যুগে প্রায় আটশো বছর ধরে গ্রীকদর্শনের প্রভাব আরবী এবং ফারসীর মাধ্যমে এদেশে এসেছে। তাই ইয়োরোপ যখন সেই চিন্তাধারাকেই পাশ্চাত্যভঙ্গীতে নতুন করে এদেশে নিয়ে এল, তাকে গ্রহণ করতে ভারতবর্ষ খুব দ্বিধাবোধ করেনি। একথা মনে রাখাও প্রয়োজন যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও বহু বিভিন্ন প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। গ্রীক এবং ইহুদি ঐতিহ্যের উপাদানগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতায় এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আলাদা করে বিচার করাও বহুক্ষেত্রে কঠিন। ইহুদি এবং আরব সংস্কৃতি সমধর্মী, একই পরিপ্রেক্ষিতে একই সাথে তারাও গড়ে উঠেছে। গ্রীক দর্শনের পুনরাবিষ্কারেও আরবদের দান অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে ইয়োরোপে যখন দর্শনচর্চা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, সে যুগে আরব মনীষীরা প্লেটো আরিস্টটলের গভীর অধ্যয়ন করেছেন। ইয়োরোপীয় মানসে আরব প্রভাব যে কী গভীর ভাবে কাজ করেছে, কিছুদিন পূর্বে দান্তের ডিভিনিয়া কমেডিয়ার আলোচনায় তা নতুন করে ধরা পড়েছে। আসীন নামক এক পণ্ডিতের মতে দান্তের কাব্যগ্রন্থ খৃষ্টীয় ধর্মকাব্যের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু প্রধানত মুসলীম চিন্তাধারার প্রভাবেই দান্তে এ কাব্যরচনা করেছিলেন। আসীনের এ সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু দান্তের জীবনদৃষ্টিতে যে ইসলামের প্রভাবের পরিচয় মেলে একথা স্বীকার করতেই হবে। আরব সভ্যতাও বহির্প্রভাবমুক্ত নয়, পূর্বে আমরা দেখেছি যে ভারতীয় চিন্তাধারা, গ্রীকদর্শন, পারশিক সংস্কৃতি এবং রোমীয় ন্যায়দৃষ্টির পরিচয় তার মধ্যে মেলে। কাজেই ইয়োরোপ ভারতবর্ষে যে জীবনদৃষ্টি ও বিচারভঙ্গী নিয়ে এল, তাদের সমাবেশ ও প্রকাশ যতই নূতন হোক না কেন, তার মধ্যে বহু উপাদান ভারতবর্ষেরই দেওয়া। নূতন ও পুরাতনের এ বিচিত্র আহ্বানে ভারতবর্ষের আত্মা সাড়া দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। তবু এ নবজাগরণের ফলে পুরাতন জীবনদৃষ্টিতে যে বিপ্লবী পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিল, তার ফলে পুরোনো পরিচিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান একে একে লুপ্ত হতে বসল।

এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনে খৃষ্টীয় শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রথম যে সব খৃষ্টীয় মিশন এদেশে এসেছিল, তার অধিকাংশ সঙ্ঘের লক্ষ্য ছিল এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার। সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে অনেকে এদেশের ভাষা শিখতে সুরু করেন। বহুক্ষেত্রে আধুনিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ এই সমস্ত খৃষ্টীয় মিশনারীরাই রচনা করেছিলেন। ধর্মপ্রচারে বহুক্ষেত্রে তাঁরা সফল হননি। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা এদেশের শিক্ষিত সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন। বহুক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠায় তাঁরাই অগ্রণী। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে সেদিন এমনিতেই এদেশে পাশ্চাত্য প্রভাব বাড়ছিল, শিক্ষার মাধ্যমে সে প্রভাব আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের মনে তাঁরা যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার ফলে কখনো হয়তো বাড়াবাড়ি হয়েছে, কিন্তু সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাও বোধহয় অনিবার্য ছিল। পাশ্চাত্য আদর্শের টানে "নব্যবাঙালী" সেদিন তার ভারতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতেও দ্বিধা করেনি, জোর করে বিলিতি আচার অনুষ্ঠানকে এদেশে চাপাতে চেয়েছে, এমন বাড়াবাড়ি করেছে যে আজ সেসব কথা মনে করলেও হাসি পায়।

অন্ধ অনুকরণের যুগ কিন্তু বেশী দিন রইল না। মানুষের স্বভাবই এই যে নতুনকে নিয়ে কিছুদিন মাতামাতি করে, পরে নিজেই নতুন পুরাতনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ইয়োরোপিয় সভ্যতার বিজয় অভিযানে ভারতীয় মানুষ প্রথমে অভিভূত হয়েছিল বটে কিন্তু প্রথম পরিচয় ও পরাজয়ের বিস্ময় কাটাবার পরেই পুরাতন চিন্তাধারা আবার

সতেজ হয়ে উঠল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, পশ্চিমের প্লাবনে তা একেবারে ভেসে যাবে, একথা মনে করাই ভুল। ইয়োরোপিয় বিভিন্ন শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক আড়ম্বরের পেছনে যে অন্তরের দৈন্য, তার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং আস্থা আরো সহজে ফিরে এল। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে অন্ধবিশ্বাসের ফলে যে সব বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল, তা স্বভাবতই বন্ধ হয়ে গেল। ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের ফলে ইয়োরোপিয় সংস্কৃতির দোষগুলিও আর অজানা রইল না। ভারতবাসী দেখল যে ভারতীয় সমাজে যেমন নানারকমের গলদ, ইয়োরোপিয় সমাজেও ঠিক তেমনি নানা ধরনের গ্লানি। অন্যপক্ষে ইয়োরোপিয় বহু মনীষী প্রাচ্য সভ্যতার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে নতুনভাবে তার গুণগান শুরু করলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারতীয় পূজারীদের সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার ইয়োরোপিয় গুণগ্রাহীদের মোকাবিলায় একটা মস্ত বড় লাভ হল যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটির তুলনামূলক মূল্যায়নের সুযোগ দেখা দিল। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন সংস্কৃতির অধ্যয়নের ফলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন অনেকেরই মনে হল যে মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধে বেশী পার্থক্য নেই, পার্থক্য আচারে বিচারে অনুষ্ঠানে, এবং প্রায় সর্বত্রই এ সমস্ত পার্থক্য ইতিহাস ও ভৌগোলিক কারণে গড়ে উঠেছে। প্রথম পরিচয়ের পরে ভারতবর্ষে যে ধরনের অন্ধ পাশ্চাত্যপূজা দেখা দিয়েছিল, গভীরতর পরিচয়ের ফলে তার বদলে দোষগুণের বিচার করে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একটি সংযত শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠল।

ইয়োরোপিয় সংস্কৃতি এবং আদর্শের প্রতি যে অন্ধ মোহ, তা কয়েক দশকের মধ্যেই দূর হ'ল বটে, কিন্তু তার ফলে ভারতীয় সমাজজীবনে একটি নিদারুণ ছেদ পড়ে গেল। ইয়োরোপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে পুরাতন জীবনদৃষ্টি ও আদর্শ নিয়ে যে সন্দেহ ও প্রশ্ন জেগেছে, সেটা মোটেই ক্ষতি নয়, তাতে ভারতীয় সমাজের লাভই হয়েছে। আদর্শ সংঘাতের ফলে পুরোনো অনেক প্রচলিত বিশ্বাস যে প্রাণহীন, বহু সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান যে কালক্রমে বর্তমান জগতের পক্ষে অনুপযোগী, এ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। ক্ষতি সেখানে নয়, ক্ষতি এইখানে যে এই নূতন মূল্যায়নের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজজীবন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। পূর্বেও নবাগত প্রভাবের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি বহুবার বদলিয়েছে কিন্তু সে বদল ধারাবাহিক ও মন্থর বলে সমগ্র সমাজ তার সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করতে পেরেছে। ইসলামের প্রভাবে নাগরিক জীবনে ও গ্রামজীবনে খানিকটা প্রভেদ এসেছিল একথা সত্য কিন্তু সেকালের শহরকে বৃহত্তর গ্রামসমষ্টি মনে করলে খুব ভুল হবে না। তা ছাড়া, যেটুকু পার্থক্য নগর ও গ্রামের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, ভারতবাসী সর্ব ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের বেলাই তা এক ধরনের। ইয়োরোপের সংঘাতে এবার যে পরিবর্তন এল, তা কিন্তু ভারতীয় সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলল। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র অংশ এ নতুন আহ্বানকে সাদরে বরণ করে নিল। তাদের মধ্যে অনেকে ইয়োরোপিয় হবার সাধনায় এভাবে মেতে গেলেন যে পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁরা ভারতবর্ষের মাটিতে নতুন ইয়োরোপ গঠনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন বটে কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের বিরাট অংশ অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল, ইয়োরোপ এবং তার প্রভাবকে আমলে আনতে চাইল না।

মেকলের অনুসৃত শিক্ষানীতি ভারতীয় সমাজের দ্বৈতীকরণের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের চিরাচরিত শিক্ষানীতিকে অগ্রাহ্য করে ভারতীয় অর্থনীতি বা রাজনীতির

প্রয়োজনের বিচার না করেই এ নতুন শিক্ষাধারার প্রবর্তন হল। বহু শতাব্দীর বিবর্তনে ভারতবর্ষে যে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, ভারতের গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজের প্রায় সমস্ত দাবীই তাতে মিটত। গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ হয় না, প্রশাসনিক জটিলতাও বেশী দেখা দেয় না। প্রচলিত শিক্ষাধারায় এ সমস্ত প্রয়োজনেরও স্বীকৃতি ছিল। বিভিন্ন দেশে সেকালে যে ধরনের শিক্ষার ধারা, তার তুলনায় ভারতবর্ষের শিক্ষাধারাকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বা পশ্চাদমুখী মনে করবারও বিশেষ কোন কারণ ছিল না। নবাগত ইংরেজ শাসকদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু প্রশ্নটির এভাবে বিচার করেননি। ভারতীয় প্রয়োজনের চেয়ে বিদেশী শাসকমণ্ডলীর প্রয়োজনের কথাই তাঁরা বেশী ভেবেছেন। এ দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে কি ভাবে ব্যবহার করা যায়, কি ভাবে এ দেশের অর্থ-নীতিকে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের কাজে ব্যবহার করা যায়; এটাই ছিল তাঁদের প্রধান ভাবনা। হঠাৎ ধনী হওয়ার স্বপ্নও তাঁরা অনেকেই দেখেছেন, তাই ভারতের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি এ দেশের অধিকাংশ মানুষের দাবী মেটালেও নতুন এবং বহুক্ষেত্রে অসহিষ্ণু শাসক-গোষ্ঠীর দাবী মেটাতে পারেনি।

বাণিজ্যের আকর্ষণেই ইংরেজ প্রথম এদেশে আসে। ঘটনাক্রমে দেশের শাসনভার তাদের হাতে এসে পড়ল বটে কিন্তু তবু বহুদিন ধরে প্রধানত বণিকের মানদণ্ডেই তারা এদেশের সমস্ত সমস্যার বিচার করেছে। কি করলে বাণিজ্যের সুবিধা হবে একথা বিবেচনা করেই বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে. ফলে শাসকের যে কর্তব্য, বহুক্ষেত্রে তার লঙ্ঘন দেখা যায়। মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী ইংরেজ এবং দেশের বিরাট জনসাধারণের মধ্যে যোগস্থাপন করতে পারে এ ধরনের একটি শ্রেণীর প্রয়োজন স্বভাবতই দেখা দেয়। বাণিজ্যই হোক অথবা শাসনকর্মই হোক, দুয়ের জন্যই এ ধরনের দালাল বা দোভাষী দরকার। রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ইংরেজ সরকারই করত, কিন্তু শাসনের দৈনন্দিন ব্যাপারে সেই সমস্ত নীতির প্রয়োগ ও রূপায়ণ এদেশবাসীর সাহায্য ভিন্ন হতে পারে না। তারই ফলে যে শ্রেণীর উদ্ভব হল, সাধারণ ভাবে তাদের কেরানী বলা চলে। ইংরেজের সওদাগরী অফিসেই হোক অথবা আইন আদালতেই হোক, ইংরেজ নির্ধারিত মূলনীতির রূপায়ণের জন্য একটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজি ভাষায় খানিকটা দখল না থাকলে একাজ করা সম্ভব নয়। তাই শাসকশ্রেণীর স্বার্থে শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তন হল। ব্যক্তিত্বের বিকাশের বদলে ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি হয়ে দাঁড়াল শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

বিদেশী ভাষাশিক্ষার উপর অস্বাভাবিক জোর দেওয়ায় শিক্ষার আদর্শ এবং মান যে ব্যাহত হবে, এটা অপরিহার্য। ফিরোজশাহের আমলে কারিগরী শিক্ষার সামান্য ব্যবস্থা হয়েছিল বটে কিন্তু ব্যাপকভাবে টেকনিকী বা কারিগরী শিক্ষার প্রচলন এদেশে কোনদিনই ছিল না। বস্তুতপক্ষে, এ ধরনের শিল্পশিক্ষাকে বহুদিন শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। জাত ব্যবসায়ের মাধ্যমে পুরুষানুক্রমে শিল্পশিক্ষা বৃত্তি হিসেবে চলে এসেছে, বোধহয় আমেরিকাতেই তার প্রথম ব্যতিক্রম। সেদেশেই প্রথম এ ধরনের শিক্ষাকে আবার শিক্ষার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। ইংরেজ এদেশে শিল্প-উদ্যোগের প্রসার চায়নি, চেয়েছে এদেশে থেকে কাঁচামাল নিয়ে ইংলণ্ড থেকে তৈরী মাল এদেশে রপ্তানি। তাই এ দেশের শিল্প-ব্যবস্থায়ও ভাঙন এল, এবং ইংলণ্ডের আদর্শে এদেশে যে শিক্ষাধারার প্রবর্তন হল, তাতে শিক্ষা দিনদিন অধিক পরিমাণে পুঁথিনির্ভর ও শ্রমবিমুখ হতে লাগল। এককালে ভারতীয় শিল্পীদের করকৌশল সমস্ত পৃথিবীর মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, বর্তমান যুগে

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে করকৌশলের একান্ত অভাব লক্ষণীয়।

কেবলমাত্র সাক্ষরতার উপর জোর দেওয়ার ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের অর্থনৈতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। চাষের কাজে বা ছোটখাট শিল্প বা ব্যবসায়ে ইংরেজি জানবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ইংরেজিভাষায় পারদর্শিতা থাকলে সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরি পাওয়া অনেকদিন পর্যন্ত সহজ ছিল বলে যারাই শিক্ষালাভ করেছে, এই সমস্ত চাকরির দিকে ঝুঁকেছে। চাষ করতে হলে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। শিল্প-উদ্যোগও শ্রমসাপেক্ষ, তা ছাড়া কৃষিই হোক, অথবা শিল্প-উদ্যোগ বা বাণিজ্য হোক, তার মধ্যে আয়ের খানিকটা অনিশ্চয়তা আছে। অফিসে চাকরি করলে পরিশ্রমও কম, আর এসব ঝামেলাও নেই। তাই শিক্ষিতদের মধ্যে এক বিরাট অংশ যে চাকরির দিকে—তা সেই সরকারী দফতরেই হোক আর সওদাগরী অফিসেই হোক—ঝুঁকে পড়বে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, দেশের শতকরা সত্তর জন লোক কৃষিকার্যের দৌলতে জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু আজো ভারতবর্ষের কৃষি-সমাজের এক বিরাট অংশ নিরক্ষর। স্বাধীনতার পরে, এবং বিশেষ করে গত দশ বৎসরে হাওয়ার একটু বদল দেখা দিয়েছে কিন্তু আজো বহুক্ষেত্রে চাষীর ছেলে যেদিন স্কুলকলেজে ভর্তি হয়, সেদিন বাপদাদার পেশার প্রতি তার মনে একটা বিরাগ এসে যায়। একবার কলেজে ঢুকতে পারলে আর কজন ফিরে গিয়ে লাঙল ধরতে চায়? আজকাল উচ্চশিক্ষিত কৃষিজীবী দুয়েকজনের সাক্ষাৎ হয়তো কালেভদ্রে মিলবে কিন্তু শিক্ষালাভের ফলে কৃষিকর্ম বর্জনের রেওয়াজ আজো লুপ্ত হয়নি।

শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির বিচ্ছেদের ফলে দেশের দারিদ্র্য আরো বেড়ে গেছে। তার চেয়েও বড় বিপদ এই যে নতুন একটা বিভাগের ভিত্তি তার ফলে রচিত হচ্ছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরোধের ফলে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি, সেকথা সবাই মানে। ইংরেজিভাষায় ব্যুৎপত্তির উপর বেশী জোর দেওয়ায় বৃটিশ আমলে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তাও সমান মারাত্মক। এ প্রসঙ্গে শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিভাগ করা বোধ হয় ঠিক নয়। তার চেয়ে সাক্ষর ও নিরক্ষরের পার্থক্য বললেই এ প্রভেদের রূপ স্পষ্ট হবে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে কথক যাত্রা ধর্ম-সভার মাধ্যমে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও সংস্কৃতির বহু উপাদান মৌখিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই এ ধরনের লোকাচারের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। স্মৃতি-শক্তির চর্চা চিরদিনই এদেশে হয়েছে এবং বেদজ্ঞ পুঁথিপুস্তকের সাহায্য না নিয়ে, হাফেজ ফাজেল আবৃত্তির ভিত্তিতে বেদ উপনিষদ কোরানের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অক্ষরনিরপেক্ষ এ শিক্ষাপদ্ধতি স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রয়োজন মিটিয়েছে। বৃটিশ আমলেও তার কার্যকারিতা একেবারে লুপ্ত হয়নি। কিন্তু ইংরেজ আমলে যে শিক্ষাপদ্ধতির এদেশে প্রবর্তন হল, তার প্রভাবে দেশের পুরাতন শিক্ষাধারা প্রায় ভেঙে পড়ল। পূর্বেই বলেছি যে এ নতুন শিক্ষাপ্রণালী প্রথমদিকে যেভাবে অর্থকরী সার্থকতার সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল, তার ফলে দেশের বহু মানুষ এ শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ল। শুধু তাই নয়। মিশনারীদের কল্যাণে এ শিক্ষাপদ্ধতি গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র দেশের উপর যে প্রভাব বিস্তার করল, পূর্বের কোন শিক্ষাপদ্ধতির বেলা তা হয়নি। বহুদিন ধরে এ শিক্ষাধারা ভারতীয় ঐতিহ্যকে একেবারে অস্বীকার করেছে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক

জীবনকে ইংরেজের অর্থনীতির অন্যতম বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। স্বাধীনতা-লাভের পরে আজ সে সঙ্কট আর নেই। কিন্তু ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ যে ভাবে দেশের জনসাধারণ থেকে আজো বিচ্ছিন্ন, তাতে ভারতবর্ষের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষিতসমাজ পৃথিবীর আধুনিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু সেই পরিচয় দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পেঁৗছে না দিলে তার প্রভাব সমগ্র সমাজ-জীবনে কল্যাণকর হয়ে দেখা দেবে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় করতে হবে বলে যে দাবী প্রায়ই শোনা যায়, উপরে উল্লিখিত বিচ্ছেদ দূরই তার মর্মকথা।

নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচার বিশ্বাস বহুক্ষেত্রে ইয়োরোপের আদর্শে গড়ে উঠেছে। ইংরেজ শাসক অথবা বণিকের সংস্পর্শেই এ শ্রেণী প্রায় দেড়শো বছর নিজেদের জীবিকা অর্জন করেছে। বাণিজ্যের দিকে কিন্তু তবু তারা ঝোঁকেনি, কারণ বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস এ প্রবাদ যেমন সত্য, বাণিজ্যের ফলাফলে অনিশ্চয়তা আছে এ কথা সমান সত্য। সে তুলনায় বাঁধা-বেতনের চাকরি শিক্ষিতসমাজের কাছে লোভনীয় মনে হয়েছে। বেতন সবসময়ে বেশী না হলেও দেশের জনসাধারণের তুলনায় চাকুরিয়া সম্প্রদায় যে ভাগ্যবান, একথাও অস্বীকার করা চলে না। চাকরিজীবী যে সম্প্রদায় গড়ে উঠল, চরিত্রে অথবা বুদ্ধিতে বিশেষ উৎকর্ষ না দেখিয়েও তারা সমাজে একটা সম্মানের স্থান অধিকার করে বসল। আজো সরকারী চাকুরের মর্যাদা একেবারে লোপ পায়নি, আজো জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় তারা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা আরাম উপভোগ করে।

প্রধানত ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেই চাকুরে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এ ধরনের ব্যুৎপত্তি লাভ খুব কঠিন ব্যাপার নয়, তাই কয়েক দশকের মধ্যেই চাকরির তুলনায় উমেদারের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেল। গত একশো বছর ইংরেজি ভাষা তাই ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রসারণ সত্যই বিস্ময়কর। অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় তাদের সংখ্যা বর্ধনে নানা সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, এখানে তার কেবল একটির উল্লেখ করছি। ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির জন্য প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠল। এই নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিশিল্পবাণিজ্যে মন দেয়নি, একমাত্র চাকরিকেই জীবিকা অর্জনের উপায় ভেবেছে। শিক্ষিতের সংখ্যা যে হারে বাড়তে লাগল, চাকরির সংখ্যা সে হারে বাড়েনি, বাড়তে পারে না। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা, ধর্ম অথবা প্রদেশের ভিত্তিতে যে ঈর্ষা ও মনোমালিন্য, চাকরির তুলনায় উমেদারের অসমঞ্জস সংখ্যা বৃদ্ধি তার অন্যতম প্রধান কারণ।

আর একটি বিপদের বিষয়ে ইঙ্গিত পূর্বেই করেছি। ইংরেজির উপর অস্বাভাবিক ঝোঁক বহুদিন দেওয়া হয়েছিল বলে শিক্ষিত সম্প্রদায় এদেশের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বসেছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনের প্রভাব বাড়ে। গ্রাম থেকে শহরে আসার এক অর্থ পুরাতন জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ। শহরে ইংরেজি শিক্ষার প্রবল প্রভাব এ বিচ্ছেদকে আরো তীব্র করে তুলেছে। গ্রামীণ কৃষক ও নগরবাসী চাকুরের মধ্যে বিভাগ বেড়েই চলেছিল, শহর এবং গ্রামের মধ্যে যে স্বাভাবিক আদানপ্রদান, তা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে, তাতে গ্রামের দারিদ্র্য আরো তীব্র হয়েছে কিন্তু শহরের সমৃদ্ধি বাড়েনি। পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ শিথিল হওয়ায় মানসিক লেনদেনও কমে এসেছে। বহুক্ষেত্রে শহুরে সাক্ষর ও গ্রামবাসী নিরক্ষর মানুষ বাহ্যত এক ভাষা ব্যবহার করলেও

তাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

নবশিক্ষিতেরও তাতে লাভ হয়নি। দেশের সমগ্র সংস্কৃতিকে স্বীকার করেই শিক্ষিত সম্প্রদায় নতুন কিছু দেবার কথা ভাবতে পারে। পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত নবশিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার বাণীও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না। না দিলে নেওয়া যায় না, আবার না নিলে দেওয়া যায় না। মধ্যবিত্তশ্রেণী সব দেশেই বিভক্ত, সরব ও প্রতিবাদধর্মী। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তশ্রেণীর এ লক্ষণগুলি যে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ যে এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজের মাটিতে শিকড় নেই বলে সেখান থেকে প্রাণ আহরণ করতে পারে না। গভীর সমাজচেতনা ইংরেজ আমলের পূর্বে এ দেশের সমাজকে বহু বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ঐতিহাসিক যে সমস্ত সংকট ভারতবর্ষ অতিক্রম করেছে, তার শক্তির উৎসও এইখানেই মিলবে। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে কৃষকসমাজে আজো সেই সমাজচেতনার কিছু কিছু পরিচয় মেলে। তারা নিরক্ষর, বর্তমান জগতের অনেক তথ্য তাদের অজানা, পুরোনো অনেক সংস্কার তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সুস্থ সমাজবুদ্ধি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। শুধু বাঁচিয়ে রাখেনি, জাতির দুর্দিনে তাদের মধ্যে যে সুস্থবুদ্ধি এবং সামাজিক সংহতির পরিচয় মেলে, শহুরে শিক্ষিত বা সত্যিকার অর্থে অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তা নেই। এ সমস্ত গুণের ফলে তারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু কেবলমাত্র সমাজবোধের ভিত্তিতে বর্তমানের পৃথিবীর বিচিত্র ও বহুমুখী দাবী মেটানো সম্ভব নয় বলে ভারতীয় সমাজ আজো অন্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

একদিকে ভারতবর্ষের বিরাট জনসমুদ্র, মাটির সঙ্গে নিবিড় যোগের ফলে তাদের মধ্যে বিরাট শক্তির সম্ভাবনা কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তাদের প্রকাশশক্তি ক্ষীণ, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন নূতন কাজে হাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। অন্যদিকে স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ঔৎসুক্য এবং কৌতূহলের অভাব নেই কিন্তু মাটির সঙ্গে যোগ নেই বলে প্রাণশক্তিতে তারা দুর্বল। তারা এদিক-ওদিক ভেসে বেড়ায়, ক্ষণিক উৎসাহে মেতে ওঠে, চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে কিন্তু বিরাট জনতার সঙ্গে যোগ নেই বলে তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে না। প্রগতি তারা চায় কিন্তু প্রগতি সাধনের জন্য যে শক্তি ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা নেই বলে তাদের প্রয়াস বেশী দূর এগোয় না। জনতা এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ স্থাপিত হলে উভয়েরই লাভ, একে অন্যের দুর্বলতা পরিপূরণ করে ভারতীয় সমাজজীবনে নতুন উৎকর্ষ এনে দেবে। ইংরেজ আমলে এবং আংশিকভাবে আজো প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে সে যোগসূত্র স্থাপনের বদলে মুষ্টিমেয় সাক্ষর সম্প্রদায় ও বিরাট নিরক্ষর জনতার মধ্যে এ শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবধান আরো ব্যাপক করে তুলেছে।

ইংরেজ শাসন এবং বিশেষ করে তার ধনতান্ত্রিক শোষণের ফলে ভারতবর্ষে এক নতুন জাতীয়তাবোধের সূচনা হল। প্রথম যখন ইয়োরোপের লোক এদেশে আসে, সেদিন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ভাস্বর এবং বহু বিষয়ে এদেশের মানুষ ইয়োরোপের তুলনায় এগিয়ে ছিল। সেদিন বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষী ইয়োরোপের লোক ভারতবাসী শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সেদিন বহু মানবিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। বণিকের মানদণ্ড যেদিন অকস্মাৎ শাসকের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হল, সেদিন এ মানবিক সম্বন্ধেরও অবসান ঘটল।

যারা উপযাচক হয়ে এসেছিল, তারাই যখন হঠাৎ ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়াল, তখন তাদের মধ্যে অনেকেই মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। ইংলন্ডের জীবনেও তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে, তথাকথিত "নবাব"দের নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে সাময়িকপত্রে ব্যঙ্গবিদ্রূপের অনেক পরিচয় মেলে। ইংলন্ডের রাজনৈতিক জীবনও তাতে দূষিত হয়ে পড়ে, অনেক প্রখ্যাত লোকও প্রকাশ্যভাবে অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জনে লজ্জা বোধ করেনি। ক্লাইভ তো সদম্ভে বলেছিলেন যে আরো অন্যায় যে করিনি, তাতে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্ময় বোধ করছি। এ সমস্ত ঘটনার ফলে ইংরেজ ভারতবর্ষকে লুটের ভাণ্ডার এবং ভারতবাসী ইংরেজকে বিদেশাগত দস্যু বলে ভাবতে শুরু করল। বহু বৎসর পাশাপাশি একত্র বসবাস করেও তাদের মধ্যে মনের মিল হল না। প্রথমদিকে যখন যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বাধ্য হয়ে ইংরেজকে একটানা এদেশে বহুদিন বাস করতে হত, তখন তবু যেটুকু পরিচয় ঘটেছিল, যাতায়াতের সুবিধা যত বাড়তে লাগল, যোগাযোগের সুযোগ তত কমতে শুরু করল। পালের জাহাজের বদলে স্টীমার, উত্তমাশা অন্তরীপের বদলে সুয়েজখাল দিয়ে আসবার পথ ইংলন্ডকে ভারতবর্ষের যত কাছে নিয়ে আসল, মানসিক স্তরে ভারতবাসী এবং ইংরেজের দূরত্ব তত বাড়তে লাগল। ইংরেজ এদেশেই ছোট বিলাত সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে জীবনকে সীমিত করে ফেলল। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পরে ইংরেজ সব ভারতবাসীকে যুগপৎ ভয় এবং ঘৃণা করতে শুরু করল। ভারতবাসীর মনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বস্তুতপক্ষে ইংরেজ যত এদেশের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়িয়ে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করবার চেষ্টা করেছে, ততই তাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

প্রথম যে সব ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনেপ্রাণে ভারতীয় হবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হিন্দু স্টুয়ার্টের নাম স্বভাবতই মনে আসে। ইংরেজদের এ অনুরাগের উল্টোদিকে ভারতবাসীর ইয়োরোপীয় সবকিছুর জন্য অহেতুকী শ্রদ্ধারও বহু পরিচয় সেদিন মেলে। ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় হবার পরে ইংরেজের মধ্যে যখন স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের জাত্যভিমান উগ্র হয়ে উঠল, সেদিন স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অশনে বসনে ইংরেজ সেদিন নিজের স্বাতন্ত্র্য জাহির করেছে। ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে তার জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। শক্তিসামর্থ্যে অর্থে-সম্পদে ইয়োরোপীয় সভ্যতার উৎকর্ষ অস্বীকার করতে না পেরে ভারতবাসী তাকে জড়সভ্যতা বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে, বলেছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি বস্তুবাদী নয়, আত্মার উৎকর্ষণ তার একমাত্র লক্ষ্য। ইংরেজের জাত্যভিমান যত প্রবল হয়ে উঠেছে, ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদও ততই শক্তি সঞ্চয় করেছে।

ইংরেজের জাতীয়তাবোধ এবং সংস্কৃতি পৃথিবীতে অতুলনীয়, ইংরেজ যত জোরে একথা প্রচার করেছে, ভারতবাসী তত জোরে বলেছে যে ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনা নেই এবং ভারত-বাসীরা জাতীয়তাবোধে কারু চেয়ে হীন নয়। রাজনৈতিক পরাধীনতার অর্থনৈতিক ফলাফল সেদিন খুব স্পষ্টভাবে বেশী লোকের চোখে ধরা দেয়নি, কিন্তু ইংরেজের দম্ভের প্রত্যুত্তরে ভারতবাসীদের মধ্যেও স্বজাতিপ্রীতি দানা বাঁধতে শুরু করে। ইয়োরোপের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মোহে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে একেবারে বর্জন করতে চেয়েছিল। এখন তার প্রতিক্রিয়ায় যা-কিছু পুরোনো তাই শ্রেষ্ঠ, যা-কিছু নতুন তাই বর্জনীয় এই ধরনের মনোবৃত্তি দেখা দিল। ফলে বহুক্ষেত্রে ভারতীয় মানসের নবজীবনলাভের পরিবর্তে পুরাতনের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাই প্রবল হয়ে উঠল, জাতীয়তার

দোহাই দিয়ে পুরোনো দিনের কুসংস্কারগুলি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের "গোরা"য় এই দুই ধারার—নবজীবনের সাধনা ও পুরাতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—চমৎকার পরিচয় মেলে, কিন্তু "গোরা" রচনার পরে অর্ধ শতাব্দীর বেশী কেটে গেছে, তবু এ দুই ধারার প্রবাহ আজো ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরে সক্রিয়। রাজনীতি, ধর্ম ও সামাজিক কুসংস্কারের যে জগাখিচুড়ি আজো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু লোকের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদের এ বিকৃতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রভাবেই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের পত্তন একথা যেমন নিঃসন্দেহ, জাতীয়তাবোধ বিকাশের ফলে পাশ্চাত্যকে বর্জন করবার প্রবৃত্তি দেখা দিল, একথাও সমান সত্য। প্রথম সংস্পর্শের দিনে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে নতুন নতুন বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে প্রতীচ্যের অনেক শুভ প্রচেষ্টাও আজ কেবলমাত্র পশ্চিমী বলেই অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে আজ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, এই জাত্যভিমানী প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তাকে বোঝা যায়। ফলে দেশ ও সমাজের বহু মৌলিক সমস্যার প্রতি আজ লক্ষ্য নেই, আজ কেবলমাত্র বাইরের তুচ্ছ লক্ষণ নিয়েই অযথা সংগ্রাম ও সংঘর্ষ।

কথাটা প্রথমে হয়তো আশ্চর্য শোনাবে কিন্তু ধনতন্ত্রের অনিবার্য প্রসারে যখন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তারই প্রতিক্রিয়ায় শাসক এবং শাসিত উভয়ের মধ্যেই জাতীয়তাবোধ এবং জাত্যভিমান প্রবল হয়ে ওঠে। সামাজিক উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত মৌলিক আধার, সেই সমস্ত আধারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেই ধনতন্ত্রের বিকাশ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির লক্ষ্য ব্যক্তিগত লাভ, তাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতিতে সামাজিক প্রয়োজন বা উপযোগিতার চেয়ে ব্যক্তিগত লাভলোকসানের হিসাবই বড় হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়ে, লাভের সম্ভাবনাও তত বেশী, তাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতিতে শিল্প-উদ্যোগের আয়তন নিরন্তর বাড়তে থাকে এবং অবশেষে মনোপলি বা একাধিপত্যের লক্ষণ দেখা দেয়। সে একাধিপত্য দেশের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীময় নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে এবং তারই ফলে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সেইসব দেশেই আবার তৈরী মাল হিসাবে তাদের রপ্তানি করাই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষ্য ছিল। কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরী মাল বিক্রির যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে, সেইজন্যই সে-সব দেশের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ধনতন্ত্রের এ মূলনীতির খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। আজ রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপিত না করেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রভাবের দ্বারা এ ধরনের শোষণ সম্ভব এবং পূর্ব ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ, বিশেষ করে চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী এবং পোলান্ডের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে আজ কোন কোন ক্ষেত্রে শোষিত দেশে কাঁচামাল পাঠিয়ে সস্তা দরে তৈরী মাল আমদানি করেই শোষকদেশের বেশী লাভ। তাই ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ উভয়েরই প্রকৃতি অনেকটা বদলিয়েছে, কিন্তু যেমন পূর্বে তেমনি আজো এ শোষণের ফলে যে অতিরিক্ত মুনাফা, তার অধিকাংশ প্রভাবশালী দেশের শাসকশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বদেশের অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ সমাজের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার জন্য তাই শাসকশ্রেণী জাতির গরিমা এবং রাষ্ট্রের বিরাট শক্তি ও সাফল্যের কথা জোর গলায় প্রচার করে। তারই ফলে এই শতকের প্রথমার্ধে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদ ও নেশন স্টেটের অন্ধপূজা দেখা দিয়েছিল। জাতীয়তার উপরে বেশী জোর দেওয়ার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বিভেদগুলি খানিকটা

চাপা পড়ে যায়, অন্ততপক্ষে বিদেশীর চোখে জাতির ঐক্য বড় হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য কেবল জাতীয়তাবাদের ফাঁকা বুলিতে সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় না। শোষকদেশের শাসক-শ্রেণী তাদের লাভের খানিকটা অংশ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে বাধ্য হয়। জাতীয় ঐক্যের দোহাই এবং সমস্ত সমাজের মধ্যে লভ্যাংশের বিতরণ—এ দুটি কাজই ইংরেজ যে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে, অন্য বহু দেশই তা পারেনি। সেজন্যই সংখ্যায় হীন হয়েও প্রায় দুশো বৎসর ইংরেজ পৃথিবীর উপর আধিপত্য করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের এ দুমুখো নীতি যে অবস্থার সৃষ্টি করল, তার ফলে মানুষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় খুলে গেল।

আদিকাল থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐক্যসাধনার ধারা সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতে সে ঐক্যসাধনার ফলে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সমবায়ে জাতিভেদভিত্তিক এক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এদেশে গড়ে উঠেছিল। সে যুগের সমাজদৃষ্টি বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক এবং জাতি ও ভাষাগত পার্থক্যকে অতিক্রম করেছে। রাজনৈতিক একতা স্থাপনের সাধনাও বারবার হয়েছে কিন্তু দেশের বিরাট আয়তন ও চলাচলের আধুনিক বাহনের অভাবে রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার চেষ্টা স্থায়ী সার্থকতা পায়নি। সমস্ত প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বাধা সত্ত্বেও কিন্তু রাষ্ট্রচেতনার পরিচয় সাহিত্যে সমাজে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বারবার ফুটে উঠেছে। রামায়ণে মহাভারতে অথবা রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞে রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনাবোধ সুস্পষ্ট। কালিদাসের মেঘদূত-রঘুবংশেও ভারতীয় ঐক্যবোধ অপরূপ কাব্যরূপ পেয়েছে। চলাচলের অসুবিধা একদিকে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনে বাধা দিয়েছে, অন্যদিকে তৎকালীন গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে নানাভাবে সহায়তা করেছে। রাষ্ট্রীয় একতার অভাব ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে গ্রামনির্ভরতার ফলে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এদেশের সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন ভারতে যে ধরনের গ্রামতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, সে ধরনের স্বায়ত্তশাসনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুব বেশী মেলে না। ভাষা ও সাহিত্যে, আচার ও ধর্মবিশ্বাসে, শিল্পকলা ও দর্শনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে না।

এদিকে ওদিকে সামান্য হেরফের হলেও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা সেই একই খাতে বয়ে চলেছে। রাজনৈতিক ঐক্যসাধনার চেষ্টা পূর্বের মত তখনো হয়েছে, পূর্বের মত তখনো সে চেষ্টার ফলে স্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়নি। পূর্বে জাতিভেদের ভিত্তিতে সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ, তার খানিকটা অদলবদল হয়ে নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণীর সূচনা হলেও পুরোনো কাঠামো মোটামুটি বজায় রয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহারে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষার ফলে ঐক্যের অনেক নতুন সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, নতুন নতুন শক্তির অভ্যুদয়ে ভাষা, আচার-ব্যবহার, অশন-ভূষণে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ধর্ম ও দর্শনদৃষ্টিতে নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করবার জন্য নতুন বিচার ও নতুন সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছে, এবং ফলে ভারতীয় জনমানসের মধ্যে এক নূতন চেতনার সূত্রপাতে সমগ্র সমাজে নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত কথা স্বীকার করেও বলতে হয় যে, ভারতীয় ঐক্যসাধনা মধ্যযুগেও সম্পূর্ণ হয়নি। বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠল, তার ফলে সামঞ্জস্য সাধিত হল বটে. কিন্তু সমন্বয়সাধনে ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার যে রূপান্তর ঘটত, তা হয়নি।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংগঠন এদেশকে অনিবার্যভাবে

ঐক্যসন্ধানী করে গড়ে তুলেছে। প্রকৃতির নির্দেশে এ ভূখণ্ড একদেশ। আদিকাল থেকে ভারত-বর্ষের ইতিহাস সেই নির্দেশকে সমাজে, সংস্কারে এবং রাষ্ট্ররূপে মূর্ত করবার প্রয়াস। যখনই এদেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছে, দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং বহির্জগতে ভারতবর্ষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশকে বহু স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করবার চেষ্টাও বারবার হয়েছে, কিন্তু সে চেষ্টায় ভারতবর্ষের আত্মা সাড়া দেয়নি বলে সে সমস্ত বিভাজনী-শক্তিও বারবার পরাজিত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমানার বাইরে ভারতীয় রাজশক্তি-বিস্তারের চেষ্টাও অনেক সম্রাট করেছেন কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টাও বেশীদিন টেঁকেনি। ঘড়ির পেন্ডুলাম যেমন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দোদুল্যমান, ভারতীয় ইতিহাসের ধারাও দুটি বিপরীত তটভূমিতে ঘাত প্রতিঘাত করে সামনে বয়ে চলেছে। কখনো ভারতবর্ষ বহু খণ্ড রাজ্যে শতবিভক্ত হয়ে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতের মধ্যে ঐক্যকে প্রায় ভুলে গিয়েছে, কখনো ঐক্যের সাধনা ভারতবর্ষের নৈসর্গিক সীমানা অতিক্রম করে বহির্ভারতকেও ভারত-বর্ষের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে। দুটি প্রচেষ্টার কোনটিই স্থায়ী হতে পারেনি। শত-খণ্ডিত ভারতবর্ষে মানুষ শান্তি বা স্বস্তি পায়নি। বৃহত্তর ভারতের পরিকল্পনাও বারম্বার ব্যর্থ হয়েছে। ভূগোল এবং ইতিহাসের শক্তি যখন একযোগে কাজ করেছে, কেবলমাত্র তখনই ভারতবর্ষ আত্মস্থ হয়ে শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছে।

ভূগোল এবং ইতিহাসের ভিত্তিতে ঐক্যের যে দাবী, পূর্বেকার যুগে সে দাবী স্থায়ী-ভাবে মেটানো হয়নি। তখনকার দিনে যোগাযোগের ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ ও অনিশ্চিত ছিল বলে ভারতবর্ষের মতন বিরাট ভূখণ্ডে বিভিন্ন অঞ্চলের সম্বন্ধ যে শিথিল হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ ছিল না, বরং লোকচলাচল ও ভাবের আদানপ্রদানের এত অব্যবস্থা সত্ত্বেও যে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক একতা এত সুদূরপ্রসারী, তাতেই বিস্মিত হতে হয়। আজ বিজ্ঞানের দৌলতে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ আয়ত্তের মধ্যে এনেছে। রেলগাড়ির মাধ্যমে দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মানুষের চলাচল তো সহজ হয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকমের মালপত্র পাঠানো আজ ব্যবসাবাণিজ্যে দৈনন্দিন ব্যাপার। অনেকের মতে রেল-লাইনের লৌহবন্ধনীতে সমস্ত দেশ এক আবেষ্টনের মধ্যে বাঁধা। রেলগাড়ির পরে এল মোটর। যেখানে রেলগাড়ি পৌঁছতে পারে না, মোটরবাস সে সমস্ত পল্লী অঞ্চলে পাহাড়ে মরুভূমিতে বর্তমান যুগের বার্তা নিয়ে আসে। গত কুড়ি পঁচিশ বৎসরে চলাচলের এ সমস্ত ব্যবস্থায় আরো যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এরোপ্লেন যখন প্রথম এদেশে এল, তখনো কে ভেবেছে যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার পায়ে হেঁটে যেতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই কলকাতা থেকে বোম্বাই বা দিল্লী থেকে মাদ্রাজ পৌঁছতে সম্ভব হবে? ডাকের চিঠি আজ ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো প্রান্তে একদিনে পৌঁছয়, টেলিগ্রাফ কয়েক ঘণ্টায় পৃথিবীর যে কোন দেশের খবর নিয়ে আসে, টেলিফোন রেডিওর মাধ্যমে একমুহূর্তে দূরদূরান্তরের দেশবিদেশের সঙ্গে দূর গ্রামবাসীরও যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

বিজ্ঞানের অনন্যসাধারণ প্রগতির ফলে চলাচল এবং যোগাযোগের এই সমস্ত আধুনিক বাহন ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথমবার স্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। এই সম্ভাবনার সবটা কৃতিত্ব ইংরেজকে দিলে ভুল হবে। ইংরেজ আমলেই চলাচল-যোগাযোগের এ সমস্ত নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হল একথা সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে এ সমস্ত যোগসূত্র আবিষ্কৃত না হলে পূর্বেকার বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মতন

বৃটিশ সাম্রাজ্যও দেশের বিরাট আয়তন এবং বিপুল জনসংখ্যার চাপে আপনাআপনি ভেঙে পড়ত। প্রকৃতিকে স্ববশে আনতে পেরেছিল বলে ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষকে এক কেন্দ্র থেকে শাসন করেছে। শুধু তাই নয়, যোগাযোগ-চলাচলের ব্যবস্থার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষের দূরত্ব কমে এসেছে। ফলে স্বদেশের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ যত নিবিড় হয়েছে, এদেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে কমেছে। এই যন্ত্রশক্তির ক্রীড়ায় ইংরেজ ভারতবর্ষকে কোনদিন আপন করে নিতে পারেনি কিন্তু বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষে কেন্দ্রভিত্তিক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করেছে। রাজশক্তির পরিধির মধ্যেই রাজার ফরমান বলবৎ, একথা পুরাকালের মতন আজও সত্য। বর্তমানে রাজশক্তির যে প্রসার, পুরাকালে সেকেন্দার সাহ বা চেঙ্গিস খাঁও তার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি। পূর্বে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দূর দেশকেও জয় করা যেতো, সেকেন্দারের বিজয়বাহিনী মেসেডনিয়া থেকে যাত্রা করে সিন্ধুনদীর তটে পেঁছেছিল। বর্তমান যুগে কেবল জয়যাত্রা নয়, সুদূর বিদেশকেও শাসন করা সম্ভব। প্রতিদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা আজকের দিনে রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যক্রম। বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের প্রগতিতে চলাচল এবং যোগাযোগের বর্তমান যে বিস্ময়কর প্রগতি, তাতে সমগ্র ভারতবর্ষকে একরাষ্ট্রশাসনের মধ্যে আনা কেবল শুধু সম্ভব নয়, দেশরক্ষা ও দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনও বটে। ঐক্যের আবেদন তাই আজ রাষ্ট্ররূপ পাওয়ার জন্য আগ্রহী। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ যে আধুনিক যুগেই প্রবল হয়ে উঠেছে, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য এইখানেই মিলবে।

ভৌগোলিক দেশভিত্তিক জাতীয়তাবোধ বর্তমান যুগেই প্রথম বিকাশ লাভ করে। মধ্যযুগে বা প্রাচীন যুগে এ মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে না, ভারতবর্ষেও সে সময় জাতীয়তাবোধের প্রকাশ স্পষ্ট হয়নি। ধর্ম, সমাজ বা সংস্কৃতির বন্ধনই তখন প্রবল ছিল। ভারতবর্ষের বিরাট আয়তন ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির একটি সামান্য রূপ গড়ে উঠেছিল কিন্তু তখনকার দিনে জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। সেকালে চলাচলের যে ব্যবস্থা, তাতে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু শাসনচালনার কথা ভাবাও কঠিন। এই পরিস্থিতিতে ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাবে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। ইয়োরোপের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ধনতন্ত্র ও নেশন স্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্র একই সঙ্গে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে জাতীয় রাষ্ট্র ছিল না বলেই সেদিন এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়নি, আজো ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের সম্ভাবনা ভবিষ্যতের মধ্যেই নিহিত।

ইয়োরোপের সংস্পর্শে এদেশে জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে ভারতীয় মানসেরও রূপান্তর ঘটেছে। এ ধরনের মৌলিক পরিবর্তনে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারের ভিত্তি টলে যায় এবং সে রূপান্তর তরুণসমাজের মধ্যেই বেশী প্রবলভাবে দেখা যায়। ভারতীয় যুবকসম্প্রদায় এবং বিশেষ করে ছাত্রসমাজের মধ্যে আজ যে আলোড়ন, তার কারণ এখানেই মিলবে। বাইরের পৃথিবীর চিন্তাভাবনার ঘাতপ্রতিঘাত তাদের মনেই প্রথম ধ্বনিত হয়। যৌবনের সংবেদনশীল মনোবৃত্তি এ সমস্ত নতুন প্রভাবকে যত সহজে গ্রহণ করতে পারে, বয়স বাড়বার পরে দেহমনে যে জড়তা আসে তার ফলে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ তা পারে না। কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠেনি বলে যুবকসম্প্রদায় এ সমস্ত প্রভাবকে খোলা-মনে বিচার করতে পারে, পদে পদে লাভলোকসানের হিসাব করতে বসে না। ছাত্রজীবনে সমাজের

বন্ধনও অনেকটা শিথিল, সমাজের বহু বাধা-নিষেধকে কিশোরসম্প্রদায় বিনা দ্বিধায় অতিক্রম করে। যৌবনের উদ্যম ও ভবিষ্যদ্‌মুখী মনোবৃত্তি নিয়ে তারা যখন ইয়োরোপের বিরাট প্রগতি ও ঐশ্বর্যের কথা পড়ে, তাদের মনে হয় যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের ফলেই ইয়োরোপের মানুষ সমস্ত পৃথিবীতে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। স্বভাবতই তারা ভেবেছে যে ভারতবর্ষে যেদিন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হবে, সেদিন তাদের সামনেও সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। এই আদর্শের টানেই হাজার হাজার যুবকযুবতী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিল। সেদিন তারা লাভলোকসানের হিসাব করেনি, অকুণ্ঠভাবে দেশের কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতার পরে অনেক স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে, বারবার আশাভঙ্গ হয়েছে বলেই সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, বর্তমান রাষ্ট্র-আদর্শ এবং পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এত প্রবল বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ।

ইয়োরোপের প্রভাবে এদেশে গণতান্ত্রিক মনোভাবও সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেশে পূর্বে গণতন্ত্র ছিল না একথা বলা ভুল। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে গ্রামকেন্দ্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, সেখানে প্রজাতন্ত্রের অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে জাতিভেদপ্রথার যখন প্রথম পত্তন হয়, বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের গণতান্ত্রিক উপায় হিসাবেই তার প্রথম আবির্ভাব। সমাজে সকল বৃত্তিরই প্রয়োজন আছে। তাই বৃত্তির উপর জোর দেওয়ায় ব্যক্তি বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্ণাশ্রমের প্রথম যুগে ব্যক্তির পক্ষে বৃত্তি বদলে সমাজে উচ্চতর স্থান লাভও সম্ভব ছিল। দুর্ভাগ্যবশত বর্ণাশ্রমের এ গণতান্ত্রিক রূপ বেশীদিন টেঁকেনি। বোধহয় টেঁকা সম্ভবও ছিল না। বৃত্তির বদলে জন্মের ভিত্তিতে যেদিন সমাজে ব্যক্তির মূল্যায়ন শুরু হল, সেদিন বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদপ্রথা গণতান্ত্রিক বিকাশের বদলে সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতীকে পরিণত হল। প্রাচীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে জাতিভেদের তীব্রতা খানিকটা কমেছিল কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শিক্ষায় জাতিভেদ লুপ্ত হয়নি। তবু ভারতবর্ষের সমাজে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাবে জাতিভেদের বন্ধন অনেকখানি শিথিল হয়।

সমস্ত মানুষ ভাই ভাই—একথার উপর জোর দিয়ে ইসলাম যেভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক ঐক্যকে শক্তিশালী করতে চেয়েছে, অন্য কোন ধর্মমত বা সমাজদৃষ্টিতে বোধহয় তার তুলনা মেলে না। ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবে এদেশের জনমানসে তাই প্রবল আলোড়ন এল। উত্তর ভারতের সর্বত্র হিন্দু সমাজ-সংগঠনে পরিবর্তন শুরু হল, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তার ফলে সমাজে যে পরিবর্তন, তাতে এদেশের ইতিহাসের প্রকৃতি বদলে গেল। বৌদ্ধ মতবাদের ফলে সমাজমানসে পূর্বেই যে পরিবর্তন এসেছিল সে কথা স্মরণ না রাখলে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রভাবের বাইরে এ দূর সীমান্ত অঞ্চলে ইসলামের এ ব্যাপক বিস্তার বিস্ময়কর মনে হতে বাধ্য।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান ভারতবর্ষে মেলে কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক যুগের পূর্বে এ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের অভাব ভিন্নও ভারতীয় মানসের সংগঠন তার অন্যতম কারণ। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার চেয়ে প্রত্যয়ের দিকে ভারতীয় মনোবৃত্তির ঝোঁক বেশী, বিশেষকে অতিক্রম করে তা নিরন্তর সামান্যকে খোঁজে। প্রত্যয়ধর্মী সামান্যের প্রতি এ আগ্রহের ফলে ভারতীয়

চিন্তাধারায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের প্রতি অবহেলা স্পষ্ট। ভারতবর্ষের ধর্মভাবনা, ভারতীয় শিল্পকলা এবং ভারতীয় দর্শনে ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নেই, ব্যক্তি ব্রহ্মের ক্ষণিক প্রকাশ এবং ব্রহ্ম অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়। ব্রহ্মের তাই কোন গ্লানি বা অপূর্ণতা নেই, এবং ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপে কোন অপূর্ণতা বা গ্লানির স্থান নেই, ব্রহ্মকেন্দ্রিক এ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সমাজে ব্যক্তির যে লাঞ্ছনা, ভারতবর্ষ তাকে দেখেও দেখেনি, বহুক্ষেত্রে কেবলমাত্র মায়া বা লীলা বলে অস্বীকার করতে চেয়েছে। মানুষের মহিমা স্বীকার করেও ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে বারবার অপমান করেছে, সে অপমানকে রূঢ় সত্য বলে স্বীকার করতে চায়নি। ভারতীয় চিত্রশিল্পে তাই তরুলতা, জীবজন্তু সবই সামান্যধর্মী। বৃক্ষকে শিল্পী রূপ দিয়েছেন কিন্তু তমাল তাল বা বটবৃক্ষের স্বাতন্ত্র্যে যে ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা, তার পরিচয় এ চিত্রশিল্পে নেই বললেই চলে। মানুষকেও এ চিত্রশিল্পে তাই সামান্য রূপেই মেলে। প্রত্যেক ব্যক্তির যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দোষে গুণে রূপে অরূপে মিলে প্রত্যেকটি মানুষের যে অদ্বিতীয় সত্তা, তার পরিচয় এ প্রাচীন চিত্রশৈলীতে নেই বললেই চলে। ইয়োরোপে দেশে দেশে হজরত ঈসা বা যীশুখৃষ্ট সে দেশেরই মানুষ। কিন্তু ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণ কোন বিশেষ অঞ্চল বা যুগের রক্তমাংসের মানব-মানবী নন, তাঁরা চিরকালের সর্বদেশের প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতীক। ইসলামের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল এবং তার ফলে বৈষ্ণব-কবিতায় প্রেমের যে অপূর্ব প্রকাশ তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কিন্তু প্রাক-ইসলামিক যুগে সামান্যের সার্বিকতায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রায় মুছে গিয়েছে। ভারতীয় দর্শনেও এই একই মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে, সামান্যের অভিব্যক্তি বা দৃষ্টান্ত হিসাবেই বিশেষের অস্তিত্ব। এক কথায় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী সার্বিকের মোহে বিশেষকে বারবার উপেক্ষা করেছে।

ব্যক্তি বা বিশেষের প্রতি যে অবজ্ঞা, তার ফলে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে এত দেরি হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি যে দশমিক-গণিত, ভারতবর্ষেই তা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতপক্ষে সংখ্যার যে পরিকল্পনা ভারতবর্ষ দিয়েছে, তার সাহায্য না পেলে বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব হ'ত না। ইউনানে বা রোমে যে গণিত, সেখানে অক্ষর দিয়ে সংখ্যার নির্দেশ। দশ বলতে সেখানে X লিখতে হয়, পঞ্চাশ বলতে L, হাজার বলতে M। কিন্তু এ ধরনের অক্ষরভিত্তিক গণিত বেশী দূর এগুতে পারে না। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। MDCXLIV দিয়ে যদি XCVII গুণ করতে কেউ চায়, তো গলদঘর্ম হয়ে যাবে কিন্তু ১৬৪৪কে ৯৭ দিয়ে গুণ করতে স্কুলের ছেলেও পারে। গণিতে জ্যামিতিতে ভারতীয় মানস অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছিল। তারও কারণ যে গণিতে জ্যামিতিতে বিশেষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। অনেক দার্শনিকের মতে গণিত সামান্য-চিন্তার পরাকাষ্ঠা। বিজ্ঞানে কিন্তু কেবল সামান্য নিয়ে চলে না, পদে পদে সামান্যকে বিশেষের মধ্যে মূর্ত করতে হয়। অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষী এ দেশে বহু জন্মেছেন এবং তাঁরা যেসব সত্য আবিষ্কার করেছেন, সেগুলিও অনন্যসাধারণ। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক মৌলসত্যের আভাসও বারবার ধরা দিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন কালে বা মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের বিকাশের কোন ইতিহাস নেই। বিশেষের প্রতি অবজ্ঞাই যে তার প্রধান কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ঠিক সেই কারণেই এ দেশে গণতন্ত্রেরও বিকাশ হয়নি, কারণ ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিই গণতন্ত্রের মর্মকথা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন বাস্তবের স্বরূপ সম্বন্ধে বহু নিগূঢ় সত্য

আবিষ্কার করেও এ দেশে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রসার হয়নি, রাজনীতির ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি গণতন্ত্রের বহু উপাদান আয়ত্ত করেও এ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রভাবনা বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। এদেশে রাজনীতির বিচারে গণতন্ত্রের যে পরিচয়, তা কেবলমাত্র গ্রামীণ ক্ষেত্রেই সীমিত। তারও কারণ কাছে। গ্রাম্যজীবনের স্বল্প পরিসরে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত এবং তার ফলে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রত্যয়ধর্মী রাষ্ট্রভাবনার সামান্য রূপ লঙ্ঘন করে বিশেষ বা ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে। যেখানে এ ধরনের প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অভাব, সেখানে কলেবরহীন ভাবনার মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের বিরাট পরিধির মধ্যে বিভিন্নধর্মী দর্শনভাবনা, সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্ররূপের সহ-অবস্থানে বিস্মিত হবার কারণ নেই। গ্রামে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে মানুষ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ গেঁথেছে। অঞ্চল বা সমগ্র দেশের বিশালতর ক্ষেত্রে এ ধরনের মানবিক সম্বন্ধের অবকাশ ছিল না বলে সেখানে গণতন্ত্রের স্থান নেই, সেখানে স্বৈরাচারী নরপতি নিজের নিজের ইচ্ছামত রাজ্য ভাঙাগড়ার খেলায় মত্ত। রাজায় রাজায় সংঘর্ষ লেগেছে, রাজা মহারাজ হতে চেয়েছে, মহারাজের লক্ষ্য সাম্রাজ্য স্থাপন এবং সম্রাট সর্বভৌম রাজচক্রবর্তীর মর্যাদা লাভের জন্য সমগ্র দেশকে করায়ত্ত করার জনা উন্মুখ। একদিকে সাম্রাজ্যবিস্তারের সাধনা, অন্যদিকে সে যুগে চলাচল-যাতায়াতের নানা বাধার দরুন কোন একটি কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশশাসন মানুষের ক্ষমতার বাইরে। ফলে আঞ্চলিক স্বাধীনতা কোনদিন ব্যাহত হয়নি, কিন্তু আঞ্চলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতিও মেলেনি। রাজশক্তির দুর্বলতার জন্যই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য, এবং যখনি রাজা পেরেছে, বিভিন্ন অঞ্চলকে সাক্ষাৎভাবে পদানত করবার প্রয়াস করেছে। বহুবার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নিজেদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে কিন্তু জনমত যতই প্রবল হোক না কেন, সংহত সামরিক শক্তির কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে।

ইয়োরোপের আবির্ভাবে পরিস্থিতির যুগান্তকারী পরিবর্তন হ'ল। ইয়োরোপ ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে বড় করেছে, রাজামহারাজার খেয়াল-খুশির উপর নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেনি, তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য ভারতীয় মানসে পূর্বে কোনদিন প্রবলভাবে দেখা যায়নি, রাজাকে ভূস্বামী বলে, শক্তির প্রতীক মনে করে রাজার প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ঢেলে দিয়েছে। ইয়োরোপে বিচার করে রাজাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে, ইয়োরোপবাসীর ভক্তি দেশ বা রাষ্ট্রের প্রতি, রাজার জন্য নয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরাগের ফলে গণতন্ত্রের যে সম্ভাবনা দেখা দিল, বিজ্ঞানের প্রগতিতে প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তে এনে সে সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠল। প্রকৃতির উপর মানুষের বিজয়ের প্রথম প্রকাশে চলাচল-যাতায়াতের যে সৌকর্য, তার ফলে সমগ্র দেশের মধ্যে একই ভাবনাচিন্তার প্রসার এই প্রথমবার সম্ভব হল। গণতন্ত্রের যে সাধনা, এতদিনে তার উপযুক্ত বাহনও জুটল। প্রথম যুগে রেলগাড়ির মারফত এবং পরে বাস-লরির মাধ্যমে এক নতুন সাম্য ও ঐক্যের বাণী দেশময় গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে হাওয়াই জাহাজ, রেডিও, টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তির প্রসারে ঐক্যের সে সম্ভাবনা দেশকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের কল্যাণে বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছে।

[ক্রমশঃ]

'অনন্ত গোধূলিময় নদী'

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রিয়নাথ সেনের কবিতা থেকে এই নিবন্ধের শিরোনাম গৃহীত হলো। উনিশ শতকের গোধূলিতে বাংলা কবিতায় যাঁরা সঞ্চারী সুর সংযোজন করেছিলেন প্রিয়নাথ সেন তাঁদের মধ্যে একজন। কবিতা লিখতে গিয়ে অতিরিক্ত মূল্যবোধের দরকার আছে কিনা, এই প্রশ্নে তাঁকেও দুর্ভাবিত হতে হয়েছিল।

য়ুরোপীয় নন্দনদিগন্তে যখন 'স্বনির্ভর শিল্প' (l'art pour l'art) এবং বাস্তবতার সংঘাত বেধেছে, প্রিয়নাথ সেই দ্বৈরথের দায়ভাগ বহন করতে চেয়েছিলেন। যাঁকে দূর থেকে মনে হয় অপীড়িত রসগ্রাহীমাত্র, তিনি যে ঐ উত্তেজিত সময়ের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন সেটাই পরম বিস্ময়ের। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের প্রথম মুহূর্তে টলস্টয়ের What is art (১৮৯৮) প্রসঙ্গে বন্ধু প্রিয়নাথকে লিখেছেন : 'সকালবেলায় Tolstoy-এর বইখানা দেখছিলুম ওর সঙ্গে মতে মিলিনে কিন্তু খুব suggestive... তুমি রস্কিনে যে তর্ক তুলেচ এতেও তর্কটা তাই—তবে অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। সৌন্দর্য ও আর্ট সম্বন্ধে ইস্তক নাগাদ যত মতামতের সৃষ্টি হয়েছে টলস্টোয়া তার একটা চুম্বক দিয়ে তার উপরে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেচেন।' বলা বাহুল্য, ঐ গ্রন্থ রাশিয়ার বাইরে অন্যত্র যে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল, ভারতবর্ষে ততোটা নয়। তার কারণ টলস্টয়-বর্ণিত শ্রেয়োসংবিৎ আমাদের পরিচিত। শিল্প ইন্দ্রিয়তোষ নয়, সকল সময়ের মানুষের সম্মেলক অনুভবের সংঘমিত্রা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে এর সঙ্গে এসে মিশেছিল পরাক্রান্ত উদ্দেশ্যবাদ। বিহারীলাল বা দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ যাত্রা সম্ভব ছিলো না। অক্ষয় বড়াল যখন লিরিকের সংজ্ঞা দিলেন 'নিটোল শিশিরকণা, বন্ধুরা মেদিনী'—সেই মুহূর্তে বিখ্যাত আশাবাদ নির্বাপিত হয়ে এসেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মানবতাবোধের মহাযান যখন শেষার্ধে ব্যক্তিহৃদয়ের হীনযানে পর্যবসিত হলো তখনই যথার্থ নবপর্যায়ী লিরিকের জন্ম। প্রিয়নাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেনের মতোই, এই দোটানার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিখেছিলেন

১. রসোদ্ভাবনেই কবির মর্যাদা, কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। বস্তুসমাধানে কবির কৃতকার্যতা থাকিতে না পারে, তাহাতে আসিয়া যায় না।

২. ললিতকলার অধিকারের সীমা নাই। সমস্ত মানবজীবনই ইহার ক্ষেত্র। বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই ললিতকলার বিষয়ীভূত হইতে পারে। যখনই যাহা তুমি সুন্দর করিয়া মানবের চক্ষে ধরিবে, তখনই তুমি ললিতকলার সৃষ্টি করিলে। সৌন্দর্যের জন্যই ললিতকলা, ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ।

দুটি উক্তি পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু দুয়েরই অভীপ্সা একমুখী। সাহিত্যে তত্ত্বের দৌরাত্ম্য অবান্তর, কিন্তু সাহিত্য যদি মানবপ্রসঙ্গ থেকে বিবিক্ত হয় তার ফল শুভংকর হবে না। প্রিয়নাথ সেনের একটি সনেট এই নন্দনচিন্তার নিদর্শন হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে :

চিরদিন চির সেই হাহাকার ধ্বনি,
গভীর নিশীথে জাগে করুণ ক্রন্দন,

জীবনে জীবিত সদা জীবের রোদন,
শতঘায়ে প্রতিদিন মূর্ছিত ধরণী;
কেন রে কিসের তরে আকাশ অবনী
বহে এই চিরন্তন দুখের কল্লোল
মরুময় শুষ্ক কণ্ঠে আধ উতরোল,
আশাহীন, ভাষাহীন অশ্রুর কাহিনী?

দেখিয়া এ জীবনের অনন্ত রোদন,
ব্যথিত কাতর ক্লিষ্ট পীড়িত সখারে,
সাধ যায় গড়ে তুলি বিপুল জীবন
দাঁড়াই হিমাদ্রি-সম দুঃখের সংসারে।
কেড়ে লই মানবের অসীম বেদন,
একা বুঝি, একা যুঝি দুরন্ত পাথারে। ('অনন্ত রোদন')

এই চতুর্দশপদীর একটি চরণও কপট ভাষণ নয়। এবং একথাও বলা আমার অভিপ্রেত নয় যে, অকপট অভিপ্রায় একে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন' এরকম নিস্বনিত মন্ত্র এখানে নেই, কিন্তু বিরলদৃষ্ট সরলতার সৌন্দর্য আছে।

অর্জিত এই সারল্যে বন্দ হয়ে কবি সারাজীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন বললে ভুল হবে। ব্যক্তি ও বিশ্বকে স্বমীমাংসিত মৈত্রীসূত্রে তিনি বিবৃত করতে পারছিলেন না বলেই তাঁকে বলতে হয়েছিল :

যে চৈতন্যস্রোত,
লোক হতে লোকান্তরে, দেবতা মানবে,
পশুপক্ষী লতাগুল্মে, ব্যাপ্ত অহরহ,
সে অখিল জীবনের নিস্তব্ধ স্পন্দন,
আমার এ হৃদয়ের দুরু দুরু সহ,
এক ছন্দে সমতালে, করিছে কম্পন।
অসীম অতলে তব নিশি-পারাবার,
আমি আর বিশ্বপ্রাণ—একা—একাকার। ('নিশীথিনী')

অচলিত থেকে মানসী পর্যন্ত রবীন্দ্রকবিতায় যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল প্রিয়নাথ সেনের কবিতায় তার সঙ্গে স্পষ্ট সমমর্মিতা আছে :

কোথাকার বিশ্ব এই,　　কোন মহা নভ শিরে
কোন দীপ্ত গ্রহ উপগ্রহ?
মাংসল-পরশপূর্ণ　　কোন মহাপ্রাণ বায়ু
অসীম বিরাট মহীরূহ?
এ কিরে কাহার মায়া!　　সম্মুখে কালের স্রোত!
ভয়াল—প্রখর—ঊর্মিহীন—
বিরাট বিশ্বের মূর্তি　　অসীম হৃদয়ে তার
ফুটিছে—নিবিছে চিরদিন—
('একটি তারকার প্রতি')

তুই কি রে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
হারাইলি জগতেরে তোর?
অনন্ত আকাশ-'পরি ছুটিস রে হাহা করি
আলোড়িয়া অন্ধকার ঘোর।
তাই কি রে থেকে থেকে নাম ধরে ডেকে ডেকে
জগতেরে করিল আহ্বান।
শুনি আজি তোর স্বর শিহরিত কলেবর
কাঁদিয়া উঠিছে কার প্রাণ। ('আর্তস্বর', প্রভাতসংগীত)

দার্শনিক কবির নৈর্ব্যক্তিকতার বদলে এখানে আছে সত্যকে স্বাভিমানের আদলে ঢেলে সাজাবার প্রয়াস। সৌন্দর্য বিষয়েও যে তিনি পূর্বসংস্কারমুক্ত তার উদাহরণ ভিক্তর য়ুগো থেকে এই তর্জমা :

বনে সুপ্ত দীর্ঘিকায় মানবের মনে
দুটি বস্তু এককালে পড়ে যে নয়নে
নীরব—নিথরজল ছায়ায় প্রকাশ
মেঘ আর রৌদ্রমাখা বিস্তীর্ণ আকাশ—
আর সেই জলাধার ভয়াল-আঁধার
চলে ফেরে সরীসৃপ তলে তলে যার।

এখানে মনের একধরনের প্রতীপসাম্য (ambivalence) প্রকাশ পেয়েছে যা তাঁকে অল্প-সময়ের জন্যই ধরে রেখেছিল। এবং যদিও তিনি জীবন ও কবিতায় 'সুস্থৎসম্মিতা' রীতি প্রয়োগ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেনের গৃহমেদুর তৃপ্তি তাঁর ছিল না। আপাতনম্রতা সত্ত্বেও প্রেমের কবিতায় তাঁর সংরাগ জ্বালাময়, এবং এখন পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক :

আমার গীতগুলি মৃদুল মধুময়,
কানন 'পরে তব ছুটিত শত শত,
থাকিত পক্ষ যদি পাখির পক্ষ মতো।

উড়িত ঝলমল গৃহেরে ঘেরি তব,
সুখের আলো যেথা জ্বলিছে শত শত,
থাকিত পক্ষ যদি দেবের পক্ষ মতো।

তোমার আশেপাশে কমলারূপে বেশে;
ফিরিত নিশিদিশি জনম শত শত
থাকিত পক্ষ যদি প্রেমের পক্ষ মতো। ('আমার গীতগুলি')

তিন স্তবকে পর্যাপ্ত এই কবিতার প্রতিটি ধ্রুবপদে এক-একটি নতুন অনুষঙ্গ এসেছে, সাতমাত্রার ছন্দ ভেঙে গিয়ে বেড়ে গেছে। আধুনিক কবি হয়তো ঐখানে ছন্দকে মসৃণ করতে পারতেন, কিন্তু উদ্ধৃত কবিতায় ব্যক্ত গ্লানিসুন্দর শুভেচ্ছার মূল্য কম নয়।

সমালোচক এডমান্ড গস্ প্রিয়নাথ সেনের ইংরেজি সনেটের সঙ্গে গ্যেটের ইংরেজি কবিতার তুলনা করেছিলেন। কথাটি প্রশংসাচ্ছলে উচ্চারিত হলেও আলোচ্য কবির বাংলা

কবিতায় রূপদক্ষতার অভাব স্পষ্ট। ওমর খৈয়ামের রুবাই তর্জমা করতে গিয়েও তাঁর লক্ষ্য থাকে নিরুক্তিপ্রবণতার দিকে, কোনোক্রমে স্তবকের চতুঃসীমা রক্ষা ছাড়া গূঢ়তর দায়িত্ব-নির্বাহের কথা মনে থাকে না। ফলে আত্মমুগ্ধ বাক্‌রীতি পরিণত হয় প্রাজ্ঞ সদুক্তিতে :

যার প্রাণে জাগিয়াছে আলোক প্রেমের—
মস্‌জিদের যাত্রী হোক—অথবা মঠের—
প্রেমের দপ্তরে যার নাম আছে লেখা
রাখে না স্বর্গের আশা—ভীতি নরকের।

মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বন্ধুর রচনা কেটেছেঁটে শিল্পিত করেছেন। লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে দরকার হলে যেমন নির্মম হতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথও প্রিয়নাথপ্রসঙ্গে : 'তোমার কবিতাটি বেশ লাগল—কিন্তু গোড়ার দুই stanzaর মিলগুলো চলনসই হয়নি বলে বিশেষ আপত্তি। সংশোধন করা কাজটা নিরতিশয় দুরূহ—তবু আমি মিলগুলোকে উদ্ধার করবার জন্যে একটু-আধটু উলট-পালট করেছি—এর উপরে তুমিও একবার হাত বুললেই হয়ে যাবে। এই ছোট কবিতার মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের যে সঙ্গীতটুকু আছে আশা করি সেটা নষ্ট করিনি।' "প্রদীপ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক 'কতদিন' কবিতাটির পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য অধিকাংশ কবিতা পড়লে বোঝা যায় 'দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গীতটুকু' রাখার জন্য আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা বারংবার বিলম্বিত লয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-প্রিয়নাথের পত্রধারার মধ্য থেকে গ্যোটে-শিলারের মতো নতুন কোনো শিল্প-প্রস্থান সূচিত হয়নি, সত্য। কিন্তু চিঠির মধ্য থেকে ফুটে উঠেছে কবিতা। প্রিয়নাথ সেনের কবিতা, তাঁর গদ্যের মতোই, সতীর্থকে নিবেদিত, অথবা সতীর্থের কাছে উন্মুক্ত উৎকণ্ঠার মতো। রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যুপহার' কবিতার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে তাঁর সম্ভাষণ 'যে মদিরা পান-তরে প্রাণ তৃষ্ণাতুর/কোথা তাহা? কোথা জ্বলন্তযৌবনা তব/মোহিনী প্রতিভা কবি' নিশ্চয় স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। এবং ঐ উচ্চারণের শেষেই 'কাল তোমার জন্মতিথি—সুদীর্ঘ জীবন এবং সর্বাঙ্গীণ সুখ কামনা করিয়া বিদায় লই' নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে কবিতা তাঁর মতো প্রতীকবেত্তার কাছেও কোনো সাঙ্কেতিক পারমিতা ছিল না।

তাঁর সনেট যে বন্ধুকে উৎসর্গিত তার কারণ হিসেবে তিনি ফরাসি প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবিতায় নানা দিক থেকে বিষম প্রভাব এসে মিশেছিল, কিন্তু সমস্ত অর্জনের শেষেও রয়ে গিয়েছিল অজ্ঞাত স্বভাবের সহজাত অঙ্গীকার। অধীত বিদ্যার পরে সত্তা খোঁজে মোহিনী অবিদ্যার প্রসাদ। উনিশ শতকে বিদ্যার্থীর লক্ষ্য ছিল আশা-ভরসার পরিবেশ রচনা—অতঃপর যার প্রয়োজন কমে এসেছিল এবং লেস্‌লি স্টিফেনের 'Nothing is less poetical than optimism' উক্তিটির যাথার্থ্য স্বীকৃত হয়েছিল। সভ্যতার বহিরঙ্গ আয়োজন ও তার অভিঘাত থেকে মুক্ত অন্তরাত্মার যে-প্রদোষচর্যা ঐ শতকের শেষভাগ থেকে আমাদের শতকে এসে পোঁচেছে প্রিয়নাথের রচনা সেই সংক্রান্তির অন্তঃসাক্ষ্য

দিবার প্রচণ্ড আলো আমার লাগে না ভালো
আমি চাই নিমীলিত প্রচ্ছন্ন গোধূলি—
তোর ও সুদূর ধারা নভ-মাঝে পথহারা
চিরসন্ধ্যাসম রাজে হৃদয় আকুলি'।

মথুরার ফ্ল্যাট মিউজিঅম

অমিয়ভূষণ মজুমদার

স্থান : নাটকের নামে যা বর্ণিত।

কাল : যে কোন এক বৈকাল ও সন্ধ্যা এবং
পরের দিনের সকাল ও দুপুর।

পাত্রপাত্রী :

মথুরা : জনৈকা পুলিশ অফিসারের বিধবা। বয়স হয়তো পঁয়তাল্লিশ কিন্তু যত্নরক্ষিত ব'লে চল্লিশের বেশি মনে হয় না। পরনে ফিতে-পাড় শাড়ি, কিন্তু হাল্কা রঙের ব্লাউজ। মাথায় বেশ চুল। রিক্তবলয় প্রকোষ্ঠ, কিন্তু গলায় চিকচিকে সোনার হার, কানে মুক্তাফুল।

সুমিতা : মথুরার পরিচারিকা। ঝি নয়, বরং সহচরী। সরকারের খাতায় মথুরার পুত্র বিমানের আয়া। পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল পোশাক। হাতে সোনার মোটা বালা। নাকটা একটু বেশি উঁচু। চুল এলোখোঁপায় জড়ানো। বয়স পঁয়ত্রিশ।

শোভনা : মথুরার ননদিনী। বয়স সুমিতা ও মথুরার মাঝামাঝি। একেবারে শেষ ফ্যাশনের পোশাক। কানের বড় সবুজ দুলজোড়া, পরনের ছাপা ভয়েল খুব স্পষ্ট। হাতে বড় চেহারার ভ্যানিটি ব্যাগ। সুউচ্চ ঢাউস খোঁপা।

মটুক সিং : মথুরা যে গাড়ি ব্যবহার করে তার ড্রাইভার। অবসর-প্রাপ্তির কাছে বয়স এসেছে এমন কনস্টেবল। মাথায় ছোট ছোট ছাঁটা চুল। গোঁফজোড়া বড় এবং এমন সাদা চুল—কাশের তুলি মনে হয়। জামাটা খাকি শার্ট যা প্যান্টের উপরে ঝুলানো, প্যান্টটা আধময়লা সাদা। পায়ের নিউকাট বুট কেটে তৈরী এমন সন্দেহ হয়।

বিমান : মথুরার ছেলে। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক। বয়স পঁচিশ। য়ুরোপীয় পোশাক। মাথায় অবিন্যস্ত শ্যাম্পু-করা চুল। উনিশ থেকে চব্বিশ দেশান্তরে কাটিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে। বিপ্লব-প্রবণ।

প্রথম দৃশ্য

দর্শকের বাঁ-দিকে সামনে মথুরার শোবার ঘরের ফ্রেঞ্চ উইনডো—কাঁচের বড় বড় পাল্লা ও আগুন রঙের পর্দায় আধ-ঢাকা। ঘরের ডান-দিকে দরজা দিয়ে দর্শকের মুখোমুখি যেন বসবার ঘর। প্রকৃতপক্ষে যাতায়াতের পথ। কিন্তু বেশ চওড়া বলে বাড়তি ঘরের মর্যাদা পায়। মঞ্চের ডানদিকে পিছিয়ে প্রকৃত বসবার ঘর। মঞ্চের উপরে তার দরজা এবং জানলা। দরজা দিয়ে ভিতরের অনেকটা চোখে পড়ে। এই ঘরের জানলার বাঁয়ে নেপথ্য অর্থাৎ বাইরে থেকে ফ্ল্যাটে ঢুকবার আর্চওয়ে। ডান উইংসে রান্নাঘর স্নানের ঘর প্রভৃতির ছোট দরজাগুলি। দৃশ্যান্তরের প্রয়োজনে সেটটাকে ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে।

মথুরার শোবার ঘরের আধ-ঢাকা জানলা দিয়ে তার পালঙ্ক, এবং একটা বইয়ের র্যাকের খানিকটা চোখে পড়ছে। পথের মধ্যে একটা কালো রঙের টেবিলের সামনে-পিছনে খান-কয়েক চেয়ার। বসবার ঘরের জানলা ও ফ্ল্যাটে ঢুকবার আর্চওয়ের মাঝামাঝি দেয়ালে একটা বড় মাপের ফটো; টুপি ও য়ুনিফর্মে বোঝা যায় উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের। বসবার ঘরের ভিতরে টেবিলের একটা কোণ, একখানা চেয়ার এবং দেয়ালে বাসি ফুলের মালা ঝোলানো

একখানা বড় ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবিটা একটা স্ট্যান্ডে যেন কেউ আঁকছিলো।

এক বিকাল। তার যেন রঙ আছে, সে রঙ ধূসর কিন্তু বিষণ্ন নয়।

নীচের রাস্তায় কোথাও একবার ট্রামের গোঙানি শোনা গেলো।

সুমিতা রান্নাঘর থেকে প্যাসেজে এসে মধুরার শোবার ঘরের দরজার দিকে চাইলো। হাতের ঝাড়ন দিয়ে টেবিলটাকে একটু ঝেড়ে, চেয়ারগুলোকে একটু সিধে করে আবার রান্নাঘরে চলে গেলো।

মধুরার শোবার ঘরের ফ্রেঞ্চ উইনডোর পিছনে মধুরা এবং শোভনাকে দেখা গেলো। যেন তারা ঘরের অন্যত্র থেকে এগিয়ে এলো।

শোভনা। [পর্দা সরিয়ে নীচের দিকে চেয়ে] এদিকেও বড় রাস্তা দেখছি। তাহলে দুটি রাস্তার জোড়ের কোণটার উপরে এই ফ্ল্যাট। ইন্‌ট্রেস্টিং! [হাতঘড়ি দেখলো]

মধুরা। তোমার তো এই প্রথম এখানে।...... চলো বসি।

শোভনা। [হাসিমুখে কপট আগ্রহে] স্কিউজ মি। [আবার ঘড়ি দেখে] খোকন এখন বেরোবে তার ক্লাবে। তুমি জানো তো? —এবারের সেমিফাইন্যালিস্টদের দীপেতন —হ্যাঁ, সেই, আমাদের খোকনই। আর তাছাড়া, আধ ঘণ্টার মধ্যে উনি মানে মিস্টার লাহাড়ি অর্থাৎ খোকনদের বাবা ফিরবেন। তুমি কখনও লাহাড়িকে মিট্ করোনি। দেখতে আমার সেকেন্ড চয়েস বরং ভালোই। যদিও খোকনের বাবা মধু রায়কে তোমাদের সকলেরই ভালো লেগেছিলো।

মধুরা। কতদিন পরে, আর এখানে তো একেবারে প্রথম। চলো একটু চা খাই অন্তত। এসো। [শোবার ঘর থেকে প্যাসেজে এসে মধুরা একটা চেয়ার টেনে দিলো]

শোভনা। [বসতে বসতে] বেশ, শুধু চা, আর দেরি যেন না হয়।

মধুরা। না। তুমি বসো। আমি দেখছি।

[মধুরা রান্নাঘরে গেলো। শোভনা ফ্ল্যাটের দরজার উপরের ফটোটা লক্ষ্য করে সেদিকে উঠে গেলো। সে ফটোটাকে ভালো করে দেখছে এমন সময়ে মধুরা ফিরে এলো।]

মধুরা। কতদিন পরে! তাই নয়? জল হয়েছে চায়ের।

শোভনা। [ফটো দেখে ফিরতে ফিরতে] তাই বলো। আমি একটু অবাকই হয়েছিলুম। এই তো।

মধুরা। [হাসিমুখে] কি এমন?

শোভনা। ও ঘরে গলায় মালা ঝুলানো ছবি দেখে—কে ও যার গলায় মালা?

মধুরা। জগন্নাথ।

শোভনা। ও! আশ্চর্য! মনে হবে সেই এ ফ্ল্যাটের স্বামী লোকটি। ভাবছিলুম, হতেও পারে অনেকদিন পরে, কিন্তু তাই বলে নিজের দাদাকে চিনতে পারবো না? তোমার ঝি-ই হয়তো ঘর গোছায়, কিন্তু তুমিও তো দেখতে পাও। ফুলের মালা জগন্নাথের ফটোর গলায়! আজ বাসি বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার দাদার ফটোতে প্রথম দেয়া হয়েছিলো, আর তারপর শুকিয়ে গেলে খুলে নিয়ে অন্য ফটোতে দেয়া হয়েছে। কি আশ্চর্য, ওই জগন্নাথ! [সুমিতা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করলো।]

মধুরা। [তার আড়ালে যেতে পেরে] এনেছো। [প্যাটিসের রেকাব এগিয়ে দিয়ে, টি পটে চিনি দুধ মিশিয়ে দিতে দিতে] ভাগ্যিস আমাদের ফ্ল্যাট বদলানোর আগে এসেছিলে। [সুমিতা চলে গেলো]

শোভনা। [চা টেনে নিয়ে] তা এখন তোমার ফ্ল্যাট বদলাতেই হয়। ছেলে এসেছে তো। আর তোমার বিমানের এবার বোধহয় পঁচিশ হলো।

মধুরা। তা হলো।

শোভনা। বিয়ে থা দেবে তো, নাকি? আমার দাদার তো ওই একমাত্র বংশধর।

মধুরা। তোমার পিতৃবংশেরও। তোমরাই দেখেশুনে দাও।

শোভনা। তোমার যখন ইচ্ছা আছে তখন অসুবিধা হবে না। তোমার ওই বসবার ঘর দেখ—বিশ বছর ধরে অমন করে সাজিয়ে রাখা সাধারণ কথা নয়। মিউজিয়াম যেন। অবশ্য সে সবই আমার দাদার স্মৃতি। কিন্তু [হেসে] তা হলেও এ অবস্থায় মানে পুরনো জিনিসের মধ্যে অনবরত থাকলে কমপ্লেক্স জন্মায়। সেই গল্প জানো তো—কোন কোন মা ছেলের বিয়ে দিতে চায় না।

মধুরা। সে আবার কি? [হেসে] বেটা-বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া?

শোভনা। না। [চা শেষ করলো]

মধুরা। [হাসিমুখে] এরই মধ্যে হলো? আমার তো মনে হয় মিস্টার লাহাড়ি এই দ্রুতগতির তাল সামলাতেই নাজেহাল।

শোভনা। সে একদিন এসে দেখো। তাতে তোমার একা একা থাকার অভ্যাসও কমবে। দেখো আমার সেকেন্ড চয়েস মানে আমার মিলির বাবা মিস্টার লাহাড়িকে। অবশ্য আমি আমার দীপ্তেনের বাবা মধু রায়কে এখন যাচ্ছেতাই মনে করি না। [সুমিতা চায়ের সরঞ্জাম সরাতে এলো]

শোভনা। [উঠে দাঁড়িয়ে] চলি। তা তুমিই বোধহয় ঘরটর গোছাও। জগন্নাথ না কে, তার ছবিতে মালা দেখছি। অথচ দাদার সিগারেট কেসটার গায়ে ধুলো দেখলুম।

[মধুরা হেসে ব্যাপারটাকে ঢাকলো। শোভনা তার ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বেশ স্মার্ট দ্রুতগতিতে ফ্ল্যাটের আর্চওয়ের দিকে এগিয়ে গেলো। মধুরা দু-এক পা এগোলো।]

শোভনা। চলি তাহলে। [হাসিমুখে নিষ্ক্রান্ত হলো]

সুমিতা ট্রেতে সব গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো।

মধুরা প্যাসেজের মাঝখানে নিরালম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ডাইনে বসবার ঘরে ঢুকলো। জগন্নাথের ছবির সামনে দাঁড়ালো। যেন অবাক হয়ে দেখছে। টেবিলের কোণটায় ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখলো। টেবিলটা ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেলো।

মঞ্চ জনশূন্য

ক্রমে বরং আলোর অভাব হলো। ধূসর রঙ কয়েক শেড্ বাড়লো। কোথায় একটা দেয়াল-ঘড়ির শব্দ হলো। তারপর বালতিতে কলের জল পড়ার শব্দ।

হঠাৎ রাস্তা থেকে ট্রামের ঘট্‌ঘটাং শব্দ ভেসে এলো।

মধুরা বসবার ঘর থেকে ধীরে ধীরে এসে প্যাসেজে চেয়ারে বসলো। দুহাত গালের নীচে ভাঁজ করে রাখলো।

সুমিতা রান্নাঘর থেকে প্যাসেজ পার হয়ে মধুরার শোবার ঘরে গিয়ে কিছু একটা এনে মধুরার সামনে দাঁড়ালো।

মধুরা। কি? ও, স্মেলিং সল্ট? [ফ্যাকাসে হেসে] না, লাগবে না। কিন্তু কি করে বুঝলি দরকার হতে পারে?

সুমিতা। সেই একবার বাড়িওয়ালার সঙ্গে তর্কের পর—মনে পড়ছে সেবার তুমি আনতে বলেছিলে। তোমার মুখ দেখে মনে হলো লাগবে।

মধুরা। বোস। সে কতদিন আগে! তোর এমন মনে থাকে।

সুমিতা। এঁরা কি বিদেশে থাকেন? তুমি বলেছিলে বটে একবার চিরিমিরিতে কে আছেন তোমার।

মধুরা। না, এই শহরেই।

সুমিতা। বাব্বা, বিশ বছরে এই প্রথম দেখলুম।

মধুরা। তোর ভুল হচ্ছে না? আর একবার সেই যে—না ঠিকই বলছিস্।

সুমিতা। আমি হলে এই বিশ বছর বাদে চিনতেও পারতুম না। তুমি কিন্তু দেখবামাত্রই এসো এসো বলে অভ্যর্থনা করলে। যেন সপ্তাহে একবার অন্তত যাওয়া আসা। [যতি]

মধুরা। এখন কি কাজ আছে?

সুমিতা। দইটা ভালো জমেনি। দেখবো।

মধুরা। সেলাই-ঝাঁপি নিয়ে আয়।

সুমিতা। সে কি? এখন? মাথা ধরবে না?

মধুরা। এই ক'দিনেই তোর অভ্যাস সেরে গেলো? [হাসলো]

[সুমিতা মধুরার শোবার ঘরে গেলো। মধুরা কিছুক্ষণ আর্চওয়ের পাশে ফটোটার দিকে চেয়ে রইলো। এদিক ওদিক চেয়ে রান্নাঘরের দেয়ালে ঝুল-ঝাড়ন দেখতে পেয়ে নিয়ে এলো। ফটোর গায়ের মাকড়সার ঝুল সরিয়ে দিলো। সুমিতা শোবার ঘর থেকে সেলাই-ঝুড়ি নিয়ে ফিরলো।]

সুমিতা। আমাদের খোকন বাড়িতে থাকলে তোমাকে সেলাই-ঝুড়ি নিয়ে বসতে দিতো না এখন।

মধুরা। তাই বলে এখন কিছু বুনলে মাথা ধরবে বলাটাও ঠিক হয়নি তোর। এরকম সময়ে সেলাই নিয়ে আমরা অভ্যস্ত ছিলুম। বিশ বছরের অভ্যাস। বিমান বাড়ি থাকলে, অবশ্য, আজ তা করতুম না।

সুমিতা। প্রায় সাতমাস দেশে ফেরা হলো বিমানের, তাই না? [মধুরা সেলাই-ঝাঁপি থেকে উল কাঁটা তুলে নিলো।]

মধুরা। এরা কথা বলতে পারে না—নতুবা আমাদের অকৃতজ্ঞ বলতো। ভালোই মানাবে এটা খোকনকে, তাই নয়। আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিলো না কি খোকন—যখন স্কুলে, কলেজে এবং তারপর বিদেশে? আর তেমনি আলোই, দেখ, এখন। মাথা ধরবে কেন? এই উল আর কাঁটা।

সুমিতা। আসছি।

[সে বোধহয় রান্নাঘরে দই তদারক করতে গেলো। মধুরা উল বুনছে। সুমিতা রান্নাঘর থেকে একটা নীচু মোড়া নিয়ে এসে মধুরার পায়ের কাছে রাখলো। মোড়ায় বসে সেও সেলাই তুলে নিলো মধুরার ঝুড়ি থেকেই]

সুমিতা। এটাও তোমাকে মানাবে দেখো। [আধবোনা জামাটার ডিজাইন মেলে ধরলো]...কিন্তু ইনি বিশ বছরে একবার খোঁজ নেননি। এখন যখন আমাদের বিমান ফ্ল্যাট বদলাতে চলেছে এলেনই বা কেন? আর অমন কট্ কট্ করে না বললে নয়?

মধুরা। [একটু ভেবে] প্রায় বিশ বছর হলো, সুমি, আমার সঙ্গে তোমার এই ফ্ল্যাটে থাকা। মাসোয়ারা, ফ্ল্যাটভাড়া আর গাড়ির সঙ্গে তোমাকেও পাঠিয়েছিলো ডিপার্টমেন্ট। আঠারো বছরের মেয়ে—কি? না আয়া। তারপর আমাকে চিনতে কি তোমার বাকি আছে? কথায় বলে নিজের লেডি ডাক্তারের কাছে কিছু গোপন থাকে না। তোমার কাছেই আমার কি গোপন আছে? ননদ যে—

সুমিতা। সেই গল্প নাকি? দেওরের মেয়ে আছে? আমাদের বিমানকে মনে ধরেছে?

মধুরা। [সেলাইটাকে কোলে বিছিয়ে নিয়ে] কোন উদ্দেশ্যই না থাকতে পারে। ননদকে কেন ননদ বলে গোলাপ না বলে, তাই বল। তেমন ননদের অমন কট্‌কট্ করে কথা বলার অধিকার কেন তাই বা কে বলবে? [সেলাইয়ের একটা মোড় ঘুরিয়ে, হেসে] তার চাইতে দুইয়ের গল্পও ভালো।

সুমিতা। দই কি ঠাট্টার জিনিস?
মধুরা। আদৌ না। আমি বরং অনেক সময়ে ভাবি ভালো দুধ, ভালো দই আর এই মাখন সমেত দুধ বিমানের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, নতুবা ঠোঁট দুটোতে অমন রঙের আভাস থাকে না। এটা ঠিক একটা সুন্দর গাছে ফুল ফুটে ওঠার মতো। কেমন, ভালো দেখায় না আমাদের বিমানকে? সোজা সতেজ যার ত্বক ফেটে কুঁড়ি বেরুবে এমন একটা গাছই যেন। আর সে তো আমারই তৈরি। তা ছাড়া...
সুমিতা। কি তা ছাড়া?
মধুরা। আমরা একাই ওকে গড়ে তুলিনি? সব রকমের আত্মীয় বলতেই তো আমি। দিদি, ছোটবোন, কাজিন। এমনকি—তখন তোমার হাসি পেয়ে থাকবে আমিও খুব গম্ভীর থাকতে পারিনি, পাঞ্জাবি পায়-জামা পরতুম যখন; কিন্তু বিমান খুব খুশী হতো, তার চোখে তা ধরা দিতো। ফ্ল্যাটে একজন পুরুষ চেহারার কেউ আছে তা যেন ভালো লেগেছিলো। ভেবে দেখো, বলেছিলো, তোমায় যদি বাবা বলি। আর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলুম, তা বলো, এখনই বলো। আর তার কিছুদিন পরে, তখন খোকনের বয়স আট, ন বছর হবে, তাই নয়, একদিন সে বললো, মামণি, এখন থেকে তোমায় যদি পুটু বলি। পুটু হয়তো পাড়ারই কোন ছোট্ট মেয়ে, যাকে খেলার সঙ্গিনী পেলে ওর ভালো লাগতো, কিন্তু কোন কারণে তা পায়নি। সেই থেকেই আমাকে পুটু বলে থাকে তা হয়তো বিমানের মনে নেই। একা একা থাকলে এমন হয়। আমি একে অস্বাভাবিক মনে করিনে।
সুমিতা। অনেক দিন হলো আমারও এই ফ্ল্যাটে। যখন এলুম বিমান তখন পাঁচ বছরের। আর তারও আগে ওকে নিয়ে তোমার একা পাঁচ বছর কেটেছে ফ্ল্যাটে।
মধুরা। সে সব দিনের কথা—বিমানের ছ মাসের থেকেই আয়া ছিলো। নেপালী আয়া রাখা হতো তখন। তারপর ডিপার্ট-মেন্ট একদিন তোমাকে পাঠালো। আর তারপরে এই বিশ বছরে ডিপার্টমেন্টের অ্যালাউন্স নিলেও তুমি আর আয়া থাকলে না। তা ছাড়া। ননদ আর গোলাপ এক নয়।
সুমিতা। কি তা ছাড়া?
মধুরা। ওটা ভুলই।
সুমিতা। কি? ভুলই?
মধুরা। ওই জগন্নাথের ছবিতে মালা দেয়ার ব্যাপার।
সুমিতা। ভেবেছিলুম হয়তো জগন্নাথের জন্ম-তারিখ কিম্বা মৃত্যু-তিথি।
মধুরা। তেমন কিছু নয়।
সুমিতা। কিন্তু বাজার থেকে ফুল আনতে বলেছিলে।
মধুরা। তেমন কিছু নয়। সাধারণভাবে মনে হয়ে থাকবে। কিম্বা মালা গাঁথার পর কোন একটা ছবিতে তা দেয়ার কথা মনে হয়েছিলো। চেয়ে দেখ টেবিল-চেয়ার টানাটানি না করে ও ফটোটায় (দরজার উপরের ফটোটাকে ইঙ্গিত করে) মালা ঝুলানো যায় না। অন্যদিকে দেখ (বসবার ঘরের ছবিটাকে ইঙ্গিত করে) জগন্নাথের ছবিটা নিচে, প্রায় টেবিলের গা ছুঁয়ে। মেঝেতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে মালা দেয়া যায়। আর এখন টেবিল-চেয়ার টানাটানি করলে পিঠে ব্যথা হয়।

[যতি। সুমিতা মধুরার সেলাইএর দিকে নামানো মুখের দিকে চেয়ে দেখে আবার সেলাইএ মন দিলো। কিন্তু মঞ্চে আলো আরও খানিকটা কমে গেলো।]

মধুরা। (বিষণ্ণ হাসিতে) আর তা ছাড়া জগন্নাথের ও ছবিটারও বয়স পঁচিশ হয়েছে এ ফ্ল্যাটে। আর এ ফটোটাও তা-ই। বলতে পারো তার আগে দু-এক বছর এই

ফটোর মানুষটা এ ফ্ল্যাটে ছিল, জগন্নাথ যা কোনদিনই থাকতে পারেনি—তা যাকগে বিমান ফ্ল্যাট বদলালে এ সবই বদলাবে।

সুমিতা। অবিশ্যি আমার হয়তো দোষ হয়েছে। (ভেবে) দোষই হয়েছে। সিগারেট কেসটায় ধুলো থাকতে পারে। আগের মতো রোজ দুপুরে নিয়মমতো বসবার ঘরে আমরা বসি কি—আমাদের খোকন বিদেশ থেকে ফেরার পরে?

মধুরা। (ঝুড়িতে সেলাই রেখে) আর শুধু পিঠ নয়, চোখও। (চোখ ড'লে হেসে।) বেশ কিছু দিন, মানে বিমান আসার পর থেকে, আমাদের এ সময়ে সেলাই নিয়ে বসা বাদ গিয়েছে। আজ আবার অনেকদিন পরে বসে চোখের দুর্বলতা ধরা পড়ে গেলো!

সুমিতা। আলো জ্বালি।

মধুরা। কি হবে? সব ব্যাপারেই এমন হয়। অভ্যাসে আর কিছুদিন চলে যায়, তা নয়?—জোর ফুরানোর পরেও। [উঠে দাঁড়ালো]

সুমিতা। তুমি তো আজকাল নভেলও পড়ো না। আগে সপ্তাহে দুবার করে গিয়ে নভেল বদলে আনতে হতো। এখন সপ্তাহে একবার করে গিয়েও দেখা যায় বসবার ঘরের টেবিলটাতে বই পড়ে থাকে।

মধুরা। তুই পড়লে পারিস। (হেসে) [শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে দাঁড়ালো] খোকন অনেক বই আনে। ওর ঝোলায় অনেক প্যাম্‌ফ্লেট থাকে। এখন বুঝতে পারি, বলে না বটে, কিন্তু মোটা ধরনের বইগুলি ও আমার চোখে পড়বে বলেই আনে। নিজের সে সবই অনেক দিন আগে পড়া। যে কোন বই নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যায় তা। আমি না পড়লে বোধ হয় দুঃখিত হয়, তাই নয়!

সুমিতা। নভেলের নেশা টানে না?

মধুরা। তা যাই হ'ক। এখন তো তোমার খোকনের দই-এর তদারক করোগে। রাতে ফিরবে এমন কথা নেই যদিও। আবার হঠাৎ আসতেও পারে। আর তখন রাতে দই দিতে পারলে তোমার ভালো লাগবে। অভ্যাসটা তোমারই করানো। (হেসে) রাতে দই।

সুমিতা। দই-এ দীর্ঘ জীবন হয় সেদিনই পড়ছিলুম।

মধুরা। সে, তখন আচ্ছা (শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে) আর তা ছাড়া,...... জগন্নাথের নামে এ পাড়াতেই একটা পার্ক আছে না?

সুমিতা। তা আছে! প্রতি বছরে কবে যেন সেখানে সভাও হয়।

[মধুরা আর কিছু না বলে কিংবা কিছু বলা সম্বন্ধে দ্বিধা করে শোবার ঘরে ঢুকলো। সুমিতা প্যাসেজে দু-এক মুহূর্ত একা দাঁড়িয়ে থেকে কিছু ভাবলো। নিজের বাঁ হাত ডান হাতের তেলোয় রেখে যেন পরীক্ষা করলো। তখন আলোর অভাব বুঝতে পেরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। শোবার ঘরের গরাদহীন জানলার কাছে দেখা গেলো মধুরাকে। আলো জ্বাললো। র‍্যাক থেকে একটা বই নিলো। বই হাতে এগিয়ে এসে পর্দা সরিয়ে ফ্রেঞ্চ জানালার পাল্লা খুলে দিলো। তখনই ফিরে এসে সুমিতাও আলো জ্বাললো। প্যাসেজের আলোটা ফটোর কাছাকাছি জ্বলে উঠলো। ফটোতে কিছুটা পড়লো। বসবার ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললো। এমন ভাবে আলোটা যে জগন্নাথের ছবিটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো]

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রত্যূষ বলা যায় এমন সকাল সেই আগের সেটেই। সেটটাকে প্রয়োজন

অনুসারে ডাইনের দিকে সরানো হয়েছে। মধুরার শোবার ঘর মঞ্চের কেন্দ্রের দিকে সরে এসেছে। প্যাসেজে অল্প আলো। পথে ট্রামের শব্দ। কয়েকটি দাঁড়কাক ডাকাডাকি শুরু করলো খুব জোরে। যেন খবর কাগজের হকারের সাড়াও পাওয়া গেলো।

মধুরার শোবার ঘরের জানালার পর্দা সরানো। মধুরা হাল্কা রাগে কোমর পর্যন্ত ঢেকে ঘুমিয়ে আছে। শীতের সকালের আলো তার গায়ে পড়ছে।

নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ। রান্নাঘর থেকে সুমিতা এসে আর্চওয়ের দরজা খুললো।

সুমিতা। আরে! (নেপথ্যে হাল্কা সুরে—গুড্ মর্নিং ম্যাম্!)

[বিমান আর্চওয়ে দিয়ে প্রবেশ করে। এক হাতে পোর্টফোলিও, অন্য হাতে স্যুটকেস। পরনে আধুনিক পোশাক, অর্থাৎ পায়া-সরু প্যান্ট, ম্যানিলা শার্ট। চোখে চশমা। স্যুটকেসটা সুমিতার বাড়ানো হাতে দিলো। এগিয়ে এলো।]

বিমান। মা?

সুমিতা। এখনও ওঠেন নি।

বিমান। বাহ্, আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে, গ্যাল্।

সুমিতা। সে তো খুব ভালো, পাওয়াই উচিত। হাত মুখ ধুয়ে নাও, টেবিল দিচ্ছি।

বিমান। (শোবার ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে) ভোর চারটাতে মিটিং সেরে শুনলুম পাঁচটাতেই একটা গাড়ি আছে। তখনই স্নান সেরে নিলুম।

[দরজায় আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে] পুটু, পুটু, [সুমিতা দাঁড়িয়ে কথা শুনে হাসিমুখে রান্নাঘরের দিকে গেলো।]

বিমান। পুটু, পুটু।

[হাতল ঘুরিয়ে ঠেলতে দরজা খুললো। শোবার ঘরে ঢুকলো বিমান। তাকে মুক্ত জানালা দিয়ে খাটের পাশে দেখা গেলো। এগিয়ে এসে পর্দা ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিলো। এক ঝলক রোদ গিয়ে পড়লো বিছানায় এবং ঘুমন্ত মধুরার গায়ে। বিমান হাসি মুখে বিছানার পাশে বসলো। মুখ নিচু করে ডাকলো।]

বিমান। পুটু, ওঠো। ।

[একটু যেন নড়লো মধুরা কিন্তু চোখ খুললো না। বিমান নিচু হয়ে দুহাতে মধুরার কাঁধ জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে] ওঠো মামণি, ওঠো।

মধুরা। (চমকে) ও! তুই? (কম্বলটা ঠেলে অর্ধেক উঠে) কখন এলি? [বিমানের গালে হাত বুলিয়ে দুহাতে বিমানের মুখ নিজের মুখের উপরে ধরে] অনেক বেলা হলো নাকি? [বিমানকে ছেড়ে দিলো] এখনই উঠছি।

বিমান। [কপট গাম্ভীর্যে] বুর্জোয়া, বুর্জোয়া, একেবারে বুর্জোয়া তোমরা। গায়ে রোদ এসে পড়ছে তবু ঘুম। আমি মাঝে মাঝে ভাবি—আমি যখন বিদেশে তোমাদের ব্রেকফাস্ট বোধহয় দশটায় গিয়ে ঠেকতো। [সিগারেট বার করলো]

মধুরা। তার কি উপায় ছিলো? সুমিতা ঠিক ন'টাতেই চা আর রাস্ক হাজির করতো। তোমার মিটিং কেমন হলো, তাই বলো।

বিমান। [উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো।] একটু টারবুলেন্ট যদি তা বলতে চাও। (হেসে) ভোর চারটেতে শেষ আর পাঁচটায় আমি স্টেশন অভিমুখে।। দেখো মম্ কি রকম ডিউটিফুল তোমার ছেলে।

মধুরা। [সস্নেহে ছেলেকে দেখতে দেখতে] রাত জেগে শরীর খারাপ লাগছে না তো? তুই তো বলবি বিপ্লবের ভাষা নয় এমন, কোমলতা ভালো নয় তাদের।

বিমান। [অন্যমনস্কভাবে টিপয়ায় রাখা

বইখানাকে হাতে নিলো। নামটা দেখলো কি না দেখলো] বিপ্লব! কোন ভাষা যে বিপ্লবের তা বলা কঠিন। ইন্‌ট্‌রেস্টিং। শোন কাল সভাতেই একজন আমাকে সমালোচনা করলো আমি নাকি মাঝে মাঝে ব্রাশ্‌ফেমি করি। আমি নাকি প্রয়োজনীয় শব্দগুলোকে অপব্যবহার করি। অনুপযুক্ত পরিস্থিতিতে বলার ফলে তিরস্কারগুলো মোলায়েম ঠাট্টা হয়ে যাচ্ছে। [মুখ টিপে হাসলো] আমার লেখায়—

মধুরা। কি রকম সে?

বিমান। যেমন তোমার ঘুম দেখে বুর্জুয়া বললুম। [হাসতে গিয়ে হাসির চাইতেও খুশী হয়ে বইটাকে দেখতে লাগলো।]

মধুরা। এরকম কথাকে ব্রাশফেমি বলেছে?

বিমান। তুমি কি সিয়ারিআসলি নিচ্ছ? তা হলে তো আমার সমালোচকও ব্রাশফেমি করেছে, কারণ সে লবিতে নাকি বলেছে আমার শরীরের উচ্চতা এবং স্বাস্থ্য এবং নাকি ভারতীয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সুগৌর রং এসবই বুর্জুয়া এক্‌স্‌ট্রাক্টের চিহ্ন এবং প্রমাণও।

মধুরা। আমার ছেলে, আমার ছেলেই, তার চেহারা নিয়ে অন্যের আলোচনা অহেতুক।

বিমান। [হঠাৎ যেন হাতের বইটা লক্ষ্যে এলো।] আর বাস্‌, এ যে দেখছি মার্কস্‌। কোথায় পেলে। না, তুমি, ইম্‌পসিব্‌ল্‌। অর্থাৎ—অর্থাৎ ছোট্ট একটি প্যাভেলের মা না হয়ে ছাড়ছো না। দেখো সৎ-সাহিত্য মানুষকে কেমন সাহায্য করে।

মধুরা। তুই একে সাহিত্য বলবি?

বিমান। [হেসে] বড্ড গোঁড়া, মানে হার্ড-লাইনার হচ্ছো কিন্তু মামণি; মার্কসকে আমি সাহিত্য বলিনি। প্যাভেলের মায়ের কথায় তোমার প্রিয় গোর্কির কথা বলেছি।

মধুরা। আচ্ছা, খোকা, এই বইখানা, মানে প্রবন্ধগুলো, ডাস্‌ ক্যাপিটালের আগে লেখা এক কথায় এই বলা যায় বোধ হয়, না?—ধর্মযাজকরা উপাসকদের উপরে যে চাপ সৃষ্টি করে তা এমন যে ধর্মযাজকদেরও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব স্ফুরিত হতে বাধা দেয়। ঠিক তেমনই বুর্জুয়া শ্রেণীর শোষণ-প্রবৃত্তি শুধু শ্রমিকদের নয়, তাদেরও অর্থাৎ বুর্যুয়াদেরও মানবত্ব ফুটে ওঠার পথে বাধা, তাই নয়?

বিমান। (নিভাঁজ মসৃণ গলায় হেসে) কিন্তু, মামণি, ব্রেকফাস্টের জন্য হয়তো টেব্‌ল-ক্লথ পাতছে সুমিতা। ফয়ারব্যাক্‌ থেকে শুরু করে বলছো, কিন্তু তুমি ওঠো।

[বিমান নিজেও ভিতরের দিকে দরজা ঠেলে নিজের ঘরে চলে গেলো। মধুরা উঠলো বিছানা থেকে। আলনা থেকে শাড়ি তোয়ালে নিলো। টেবল থেকে টুথব্রাশ—স্নানঘরে যাওয়ার জন্য সে প্যাসেজে এলো। রান্নাঘরের কাছে ডাকলো সুমিতাকে। সুমিতা এলো।]

সুমিতা। ঘুম ভাঙলো?

মধুরা। (মুখের হাসিতে) খোকন এসেছে।

সুমিতা। হ্যাঁ। তাগাদা লাগিয়েছে ব্রেকফাস্টের [হেসে]।

মধুরা। আচ্ছা! এটা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের লক্ষণ—এই ব্রেকফাস্টের উপরে টান। আর তা ছাড়া, দেখলে তো? কেমন চওড়া পিঠ আর কাঁধ চোখে পড়ছে। আর কেমন দৃঢ় কুঁদে বার করা চিবুক। আর যখন দাঁড়াবে একটা সজীব সতেজ গাছের কথাই মনে হয়, গাছ যার ত্বক ফেটে থলো থলো ফুলের কুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

সুমিতা। সুন্দর বটে।

মধুরা। [মাথার উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো।] কিন্তু তুই তাড়াতাড়ি কর। এখনই আসছি আমি।

[মধুরা রান্নাঘরের পাশের উইংস দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সুমিতা রান্নাঘর থেকে টেবলক্লথ এনে প্যাসেজের টেবলটায়

পাতলো। তারপরে ছুরিকাঁটা চামচ প্লেট ইত্যাদি একপ্রস্থ এনে রাখলো।

বিমান প্রবেশ করলো শিষ দিতে দিতে। দেয়ালের ফটোটায় খানিকটা রোদ চক্‌চক্‌ করছে। অবশ্যই সুমিতা যে প্লেটগুলো রেখেছে টেবলে তারই একটা থেকে প্রতিফলিত আলো। বিমান টেবলের ধারে বসলো। সুমিতা আর-এক প্রস্থ কাঁটা চামচ ইত্যাদি রেখে গেলো। বিমান কাঁটা চামচ চোখের সামনে তুলে তুলে পরীক্ষা করতে শুরু করলো। ছুরি তুলে নিয়ে সেটাকে পরখ করে টেবলক্লথে মুছে পালিশ যাচাই করলো। মাঝে মাঝে শিষও দিচ্ছে। নেপথ্যে মোটরের হংক্‌। তারপর ভারি জুতোর শব্দ। অতঃপর আর্চওয়ে দিয়ে মটুক সিং-এর প্রবেশ। হাতে সকালের খবর-কাগজ।

বিমান। [হেসে] আরে! মটুক সিং যে।

মটুক। হাঁ। সে-হি। [খুশী হয়ে] গুট্‌মর্নিং।

বিমান। তা হলে ওটা তোমারই সেই আদি অকৃত্রিম সাদা শেভ্রলের হর্ন।

মটুক। জি সাব্‌।

বিমান। খুব ভালো। গতবার তোমাকে পুলিশ স্যালুটের বদলে গুড্‌মর্নিং শিখিয়েছিলুম তা মনে আছে দেখছি। তোমাকে আমার খুবই ভালো লাগে মটুক্‌। আচ্ছা, সিংজি, তুমি আর তোমার শেভ্রলের মধ্যে কে বেশী সম্মানযোগ্য—মানে বেশী পুরনো?

মটুক। পঁচিশ বরস এই শেভ্রলে ড্রাইব্‌ করলম। উর আগে প্রিজন্‌ভ্যান ড্রাইব করিয়েছি, ওয়ারলেস ভ্যান বি।

বিমান। (হেসে) ইম্‌পসিবল্‌ মটুক, তুমি তুমি আর তোমার শেভ্রলে আর এই ফ্ল্যাট। আমি এখন সাবালক, কি বলো? গত জ্যানুয়ারি থেকে মা মাসোয়ারা নিচ্ছে না, ফ্ল্যাটটাও বদলাবো আমরা হয়তো এ-মাসেই। অবশ্য আমি এখনই গাড়ি কিনছি না বলে হয়তো মা ডিপার্টমেন্টকে গাড়ি ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেনি। আরও কিছুদিন হয়তো শেভ্রলেটা কাজে লাগবে মার। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিলো আমাকে বলতে পারো? একবার বলেছিলে বটে দনাদ্দন দনাদ্দন কি সব। তখন ঠিক ধরতে পারিনি—

মটুক। এ হি রকম সকাল হবে। সাহেব বাহার হোবেন। আমি তো গাড়ি লিয়ে হাজির।

বিমান। তোমার এই শেভ্রলে! যাও বিশ্বাস হয় না।

মটুক। এ হি। সাহেব সিঁড়ি সে নামিয়ে গাড়িকা পাশ খাড়া হয়ে সিগরেট্‌ পাকাতে ধরলেন তো জোগ্‌নাথ আসিয়ে গেলো। এ হি সাদা শেভ্রলে।

বিমান। জগন্নাথ?

মটুক। ও হি তো। জিস্‌কা নামসে পার্ক বনলো।

[তার কাছে অদ্ভুত এই ব্যাপারটা মনে হওয়ায় সে হাসলো]

বিমান। ইন্‌ট্‌রেস্টিং। তা তোমার সাহেব জগন্নাথকে চিনতেন? তারপর?

মটুক। সাহেব জানিয়ে লিলেন। সাহেব বোলেন—ওঠো, জোগনাথ, গাড়িমে ওঠো। [হাত দিয়ে গাড়িতে উঠতে বলার অভিনয় করলো]। তো জোগনাথ ঝটক্‌ সে পিস্তল বাহির করলো। [নিজের ডান তর্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে পিস্তল তৈরি করে দেখালো।]

বিমান। [কৌতুক বোধ করে খাড়া হয়ে বসে] আচ্ছা?

মটুক। সাহেব বললেন—উস্‌সে কি হবে। গাড়ি মে উঠো। বহোৎ দিনসে ঢোড়তা থা, আজ আপ্‌সে আগিয়া। উঠো, উঠো। তো উসকো বাদ দনাদ্দন্‌ দনাদ্দন্‌।

বিমান। তারপর?

মটুক। সাহেব গিরিয়ে গেলেন। আমি চুপি-

সে গাড়িসে নামলোম। দেখি জোগনাথকে হাত মে বি গোলি লাগিয়েসে লগ্‌ভগ্ দুঠো হোবে। দেখি শালা ভাগতা। তো মারিয়ে দিলম পিছেসে হ্যান্ডিলকে বাড়ি। গিরিয়ে গেলো। এ হি শেভ্রলেকে হ্যান্ডিল।

[সুমিতা ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো। মটুকের গল্প কানে গেলো। মটুকের দিকে কিছুটা বিরক্ত হয়ে চাইলো। রান্নাঘরে ফিরে গেলো।]

বিমান। আচ্ছা! তারপর?

মটুক। দোনো ফুটপাতসে পুলিস আসিয়ে ঘিরিয়ে লিলো।

বিমান। [মটুকের হাত থেকে খবর-কাগজ নিলো] তারপর থেকেই তুমি এই ফ্ল্যাটের হয়ে গেলে?

মটুক। আরে বাস্, উসকো আগে জোগ-নাথকে ফাঁসি তো হইতে দেন্। (গলায় হাত দিয়ে ভঙ্গি করলো]

বিমান। (হো হো করে হেসে) তারপর থেকে তোমার শেভ্রলে, তুমি আর এই ফ্ল্যাট্। তোমার সাহেব কেমন দেখতে ছিলো এতদিন পরে তা কি তোমার মনে আছে?

মটুক। [আর্চওয়ের ফটোর দিকে চেয়ে] ফ'টোমে যেইসা। ওহি তো।

বিমান। [কাগজ খুলে, হাসি মুখে] কিন্তু মটুক, একটা কথা। চাকরিটা এতদিন তুমি কার করলে। কখনও মনে হয় এই ফ্ল্যাটের নম্বর, কখনও ভাবি ওই সাদা শেভ্রলে তোমার মনিব।

মটুক। হে-হে। মনিব তো ডিপার্ট আছে।

বিমান। ডিপার্টমেণ্ট?

[মধুরা স্নানঘর থেকে একেবারে তৈরি হয়ে টেবলের দিকে এগোলো। রান্নাঘর থেকে সুমিতা এলো, আরও ব্রেকফাস্টের সরঞ্জাম নিয়ে। মধুরাকে দেখে অ্যাটেনশন হয়ে পুলিশী কায়দায় স্যালুট করলো মটুক]

মটুক। চা খাওগে মটুক।

মটুক। জি সাব্!

[মধুরা টেবলের ধারে বসলো। সুমিতা টোস্ট র‍্যাক এবং টিপট নামিয়ে রেখে মটুককে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো তার সঙ্গে যেতে। মটুক তার পিছনে গেলো]

সুমিতা। [রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মধুরা এবং বিমান থেকে সরে এসে— অর্থাৎ মঞ্চের সম্মুখভাবে] এমন করে বলো কেন? ওর বাবা নয়?

[মটুক তিরস্কারে বিভ্রান্ত হয়ে মাথা চুলকালো। কি করা উচিত বুঝতে না পারার ভঙ্গি করলো। সুমিতার পিছনে রান্নাঘরে গেলো]

বিমান। [ছুরির ডগায় মাখন তুলে টোস্টে লাগাতে লাগাতে] টোস্ট সুমিতা একে-বারে পারফেক্ট করে থাকে। এমন গরম রাখে যে মাখন দেয়ামাত্র ঘিয়ের চেহারা নেয়।

মধুরা। আর দেখো জানলা দিয়ে খানিকটা ঝক্‌ঝকে মিষ্টি গরম রোদ এসে পড়লো টেবিলে।

[খানিকটা বিনা চিনি-দুধের চা ঢেলে নিলো মধুরা। টোস্টে মাখন মাখিয়ে নিজের ও মধুরার প্লেটে রাখলো বিমান। তার হাতের ছুরিটা থেকে প্রতিফলিত আলো দেয়ালে পড়ছে নড়ছে। সেদিকে তাকালো মধুরা।]

বিমান। আবার ওই রক্তের মতো চা, কিছু না খেয়েই!

মধুরা। অভ্যাস, যদি তা বলো। এই গরম খানিকটা ঠোঁটে না লাগলে ব্রেকফাস্টে মন যায় না। [হেসে চায়ের কাপে চুমুক দিলো।]

বিমান। [খেতে শুরু করে] কিন্তু তারপরে তুমি আর খেতেও পারো না।

[মধুরা পরিজের পাত্রটা টেনে দিলো বিমানের দিকে। দেয়ালের ফটোটার উপরে একটা আলোর বৃত্ত গিয়ে পড়লো। মধুরা

সেদিকে চাইলো আবার।]

বিমান। [পরিজে চামচ ডুবিয়ে] তোমার পরিজের দুধটা ভালো। বেশ ভালোই। তুমি কিন্তু খাচ্ছ না মামণি।

[দেয়ালের গা থেকে চোখ নামালো মধুরা। বিমানকে লক্ষ্য করলো নিবিষ্ট হয়ে]

মধুরা। ওই দুধটাই যা ভালো পাচ্ছি।

বিমান। এরপরে বুর্জুয়া-মার্কা ভুঁড়ি তৈরি হবে।

মধুরা। [হেসে] আবার ব্লাশফেমি! তোমাব মত চেহারায় কখনও ভুঁড়ি হয়? আচ্ছা, খোকন, তুমি গোটি রাখো না কেন? আমার তো মনে হয়, আচ্ছা, তুমি দু সপ্তাহ শেব না করে দেখো দেখি।

বিমান। [হেসে] গোটি?

মধুরা। ভ্ল্যাডিমির ইলিচের গোটি ছিলো কিন্তু।

বিমান। [ঝির ঝির করে হেসে] ভ্ল্যাডিমির ইলিচ্! লেনিন! আ, মা, তোমার ছেলেকে, তোমার ছেলে কতবড় বলো তো?

মধুরা। আমার ছেলে কত বড়?

[মধুরা শাণিত হয়ে উঠলো যেন কেউ তার হাতের কাজের সমালোচনা করেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ উপস্থিত না থাকায় সে হাসলো। টোস্টে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নিলো। দেয়ালের ফটোর গায়ের আলোকবৃত্তকে লক্ষ্য করলো। নিজের পরিজ পাত্রটা সরালো। কিছু হলো না। প্লেটটাকে পাত্রটার দিকে টেনে নিলো। ছবির গায়ের একটা আলোকবৃত্ত নড়ে উঠে পাশে সরলো। বিমানও আলোর আকর্ষণে মাথা ঘুরিয়ে ফটোটাকে লক্ষ্য করলো]

মধুরা। অবশ্য, আমার ছেলেকে আমি একাই তৈরি করেছি। একেবারেই একা, সেই এক বছরের থেকে। অবশ্য গোটি রাখা না-রাখা এমন কিছু নয়। এমনিতেই তোমাকে জমকালো দেখায়। একাই এই ফ্ল্যাটে আর এক শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ ধরে তিল তিল করে তাকে গড়া হয়েছে। [সে হাসলো]

বিমান। আ, সুইট্‌হার্ট।

মধুরা। আর ভালোই করেছো তুমি সরকারি চাকরি না নিয়ে। তোমার আকাশ কত নীল!

বিমান। কি যে বলো, কি যে বলো।

মধুরা। আচ্ছা, খোকন, যখন এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণী চেপে রাখবে না, যখন মানুষের চিত্ত পরিপূর্ণ বিকশিত হবে—

বিমান। কি তখন?

মধুরা। তখনও কি বিপ্লব হবে?

বিমান। [হাত বাড়িয়ে ডিমসিদ্ধ তুলে নিয়ে খুলতে শুরু করলো।] বিপ্লব, মানে, তা, আচ্ছা, মামণি, দেখো ছোটবেলায় আমরা মার্বেল খেলেছি, আরও আগে তুমি বোধ হয় আমাকে প্র্যামে নিয়ে বেরিয়েছো আমাদের পাড়ার এই পার্কটায়। আরও বড় হয়ে ক্রিকেট, কিংবা তা নয় বোধ হয়, ব্যাট্‌বল খেলেছি। এককথায় [হাসলো] জগন্নাথের পার্ক, একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, কি বলো? কিন্তু তোমার কি মনে হয় বলো তো? বুর্জুয়াদের অসন্তোষকে বিপ্লব বলা যায় না বোধ হয়, তাই নয়? সত্যিকারের বিপ্লবের পরে তখন আমরা ভেবে দেখবো।

[সুমিতা রান্নাঘরের কাজ শেষ করে প্যাসেজ দিয়ে বসবার ঘরে কাজ সারতে গেলো। তার হাতে পালকের-ঝাঁটা। জগন্নাথের ছবির পাশে দাঁড়ালো। টেবিলের যে কোণটা দেখা যাচ্ছে সেটার ধুলো ঝাড়লো। জগন্নাথের ছবির গলা থেকে শুকনো মালাটা খুলে নিলো। আলাপ থামিয়ে তা দেখলো এরা। মধুরা টি-পট থেকে নিজের জন্য চা ঢেলে নিয়ে দুধ চিনি মিশাচ্ছে]

বিমান। ও কি এরই মধ্যে চা ঢেলে নিচ্ছ!

[নিজের প্লেটে ডিমসিদ্ধতে মশলা ছড়িয়ে দিয়ে] অবশ্য সেকালের সে সব ব্যাপারকে যদি বিপ্লব বলতেই চাও, তবে একালের অর্থাৎ সত্যকার বিপ্লবকে অন্য শব্দ দিয়ে বোঝাতে হবে। তাতে আমার আপত্তি নেই যদি দুটোকেই একই শব্দ দিয়ে বর্ণনা না করো।

মধুরা। সেকালে ওরা কিন্তু প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে—

বিমান। আ, সুইটি; (হেসে) নিজের নামে একটা পার্ক পাওয়া এমন কিছু নয়, তোমার মতো একটি মিষ্টি মেয়ের মনে স্থান পাওয়াতে ওদের প্রাণ দেয়া সার্থক হয়ে গেছে। কিন্তু বুর্জুয়া বিদ্রোহ, তার জন্য কেউ প্রাণ দিয়ে থাকলেও তাকে বোধ হয় বিপ্লব বলা উচিত নয়, কি বলো?

[সুমিতা জগন্নাথের ছবিটাকে মুছলো। পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তাতে আকৃষ্ট হয়ে বিমান ও মধুরাও সেই দিকে চেয়ে রইলো। সুমিতা তারপর এটা-ওটা মুছতে মুছতে অন্যদিকে সরে গেলো কাজ করতে করতে। মধুরা চায়ে দুধ দিতে মিল্ক-পট্‌টাকে টানলো। আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়লো বিমানের মুখে। সে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করলো। হাসলো।]

বিমান। ভারি ঝক্‌ঝকে সুন্দর রোদ, নয়? কিন্তু কিছুই খাও না। আচ্ছা, মামণি, এখনও এই পঁচিশ বছর বাদেও তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে কেন? তোমাকে কেন কষ্ট করতে হবে? বরং তোমার মতো একজনকে মিস্‌ করলো যে—হ্যাঁ, তুমি বলো তো, এই পঁচিশ বছর পরেও সংযম, না শোক?

[বিমান টেবল খুঁজে দেখলো। সুমিতাকে ডাকলো]

সুমি, সুমি—[টোস্ট র‍্যাকটা এগিয়ে দিলো মধুরার দিকে। সুমিতা এলো বসবার ঘর থেকে।]

বিমান। দেখো কিছু নেই যা মাকে দেয়া যায়। কাল থেকে ব্রেকফাস্টে একটি করে আপেল যেন থাকে। [সুমিতা মাথা নেড়ে জানালো থাকবে।]

মধুরা। (সুমিতাকে) এত ধুলো কেন?

বিমান। মিউজিঅমে ঢুকেছিলো। (হেসে) কিন্তু, সুমি, আমরা তো ফ্ল্যাট বদলাবো। তখন তুমি কি করবে? কি মুছবে আর কোথায় ধুলো ঝাড়বে? এসব ছবি-টবি কি সেখানে যাবে? তোমার সেখানে কাজই থাকবে না দেখছি। [চায়ে চুমুক দিলো। সুমিতা একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে শোবার ঘর সাফ করতে ঢুকলো।]

মধুরা। [একটা টোস্ট তুলে নিয়ে] আচ্ছা, খোকন—

বিমান। কিছু বলবে?

মধুরা। [ভয়ে ভয়ে] আচ্ছা, আবার জেলে যাওয়ার মতলব নেই তো?

বিমান। [হেসে] আ, মাদার, সেকালে ওরা, আচ্ছা তোমার কি মনে হয় বলো তো? আমার তো মনে হয় সেকালে ওরা জনগণ কিছু একটা করার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠলেই জেলে গিয়ে আশ্রয় নিতো। জেলে যাওয়াটা বিপ্লবীদের, অন্তত আমাদের পেশা নয়, বরং আন্ডারগ্রাউন্ড যদি প্রয়োজন হয়।

[ওদিকে মৃদু স্পষ্ট শব্দে ঘড়ির আওয়াজ হলো। কব্জি উল্টে বিমান হাতঘড়ি দেখলো। চায়ে চুমুক দিলো। মধুরা টোস্টর‍্যাক সরিয়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দিলো।]

মধুরা। নখগুলো কিন্তু তোমার বড় বড় হয়েছে, খোকন।

বিমান। [বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের আঙুল রেখে নখগুলোকে লক্ষ্য করে বললো] আর একটু চা দাও।

[মধুরা টি-পট থেকে চা ঢেলে দিলো।

বিমান নিজে দুধ চিনি নিলো। মটুক সিং রান্নাঘর থেকে বাজারের থলে হাতে প্রবেশ করলো।]

বিমান। মটুক, বাজারে যাচ্ছ নাকি? একটু থেমে যাও নিচে। তোমার রথে একটু পেঁাছে দাও আমাকে আমাদের পত্রিকা অফিসে আর বারোটা নাগাদ আমাকে আর একটা লিফট্ দিও। ফিরে এসে যাতে করে—তখন কি কোর্টে দিয়ে আসতে পারবে?

মটুক। ওহি তো আমার ডিব্‌টি আছে।

বিমান। নেহি তো দনাদ্দন দনাদ্দন (হাত দিয়ে পিস্তলের ভঙ্গি করে হেসে হেসে) [মটুক আর্চওয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো]

মধুরা। তুমি কি এখনই বেরুবে, খোকন?

বিমান। [চায়ে চুমুক দিয়ে] মটুক, আর সাদা শেভ্রলে, কিম্বা এই ফ্ল্যাট, কে দায়ী জানি না—মনে হয় ওরা যেন, কি যেন সেই, ও, ক্ষুধিতপাষাণ। হ্যাঁ, এখন বেরুবো। আজ নতুন ফ্ল্যাটটাকেও দেখে আসার কথা।

মধুরা। (চায়ে চুমুক দিয়ে) আচ্ছা, খোকন, বুর্জোয়ারা কিন্তু বিপ্লবই বলে থাকে।

বিমান। (সিগারেট বার করলো। হাসলো।) আ, মামণি, তুমি আজকাল বড্ড ভাবছো। কিন্তু হাতের কাছে তোমার জগন্নাথ আছে তা থেকেই বুঝতে পারবে। মটুক বলে জোগনাথ। জিস্‌কা নামসে পার্ক ভি বনলো। কিন্তু আর কি হয়েছে। বিপ্লব তো একটা আমূল পরিবর্তন। কি বদলেছে বলো? এই আজাদী মিথ্যা নয় কি? ইংরেজরা চলে গেছে কিন্তু এখন কি আরও বেশি করে ব্যবসার মুনাফা নিচ্ছে না? দেশ শাসন করার ঝক্কি-ঝকমারি ছিলো, এখন তাও নেই। শুধু লাভ। আ, মামণি, কেক কি জাতের তা খেলেই বুঝতে পারবে। [সিগারেট ধরালো। হাসলো। এই অত্যন্ত সাধারণ কথাগুলো বলতে হচ্ছে বলে সে যেন সঙ্কুচিত] আগে তবু আমেরিকানদের সংস্পর্শে আসতে হয়নি, এখন দেখো শুধু ইংরেজ নয়, আমেরিকানরাও; আর আমেরিকা মন পর্যন্ত পেঁাছেছে। মনে ঢুকে পড়েছে বলা যায়। কিন্তু আমি এখন উঠবো। [সে উঠে দাঁড়ালো] এ কি বিপ্লবের প্রমাণ?

মধুরা। (ভাবলো) কি সুন্দর স্বচ্ছ তোমার দৃষ্টি। আমার তো মনে হয় আমার আরও পড়া দরকার, আরও পড়া আর চিন্তা। (হেসে)

বিমান। [টেবিল ঘুরে এসে পাশে দাঁড়ালো] আ, মম্।

মধুরা। [তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো] কিন্তু তুই কি এই পোশাকে বার হবি?

বিমান। এই তো বেশ।

মধুরা। কিন্তু—

বিমান। কি কিন্তু?

মধুরা। অবশ্য এতেও ভালোই দেখায়, খুবই ভালো। কিন্তু লাঞ্চের পরে কিম্বা আজ বিকেলে সেই লাল টাইটা পরো, সেই লালে কালো বিন্দু দেয়া টাইটা। [বিমানকে আপাদমস্তক সাগ্রহে লক্ষ্য করে]

বিমান। (হেসে) আচ্ছা, সে তখন......ওদিকে তোমার মটুক অপেক্ষা করে আছে তার শেভ্রলে নিয়ে।

[বিমান টেবিল থেকে আর্চওয়ের দিকে এগোলো। মধুরা উঠে এগোলো তার পিছনে]

বিমান। [দরজার কাছে থেকে হেসে] আর গোটি রাখবার কথাও ভেবে দেখবো।

মধুরা। (হাসলো) কিন্তু দেরি করো না।

বিমান। আ, মামণি। [হাসিমুখে সে নিষ্ক্রান্ত হলো।]

[মধুরা আর্চওয়ের কাছে কিছু সময় দাঁড়িয়ে তাকে দেখলো। টেবিলের কাছে

ফিরে এলো। খবরের কাগজটা তুলে নিলো। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বসলো। কাগজ তুলে ধরলো মুখের সামনে। সুমিতা এলো ব্রেকফাস্টের টেবিল সাফ করতে।]

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

সেটটা কিছু বাঁয়ে সরেছে। অর্থাৎ শোবার ঘরটা দেখা না গেলেও চলবে। বসবার ঘরটা জগন্নাথের ছবিসমেত প্রাধান্য পাচ্ছে। বেলা বারোটা হবে এখন। সকালের আলো-ছায়া অথবা প্রতিফলিত রোদ নেই এখন।

প্যাসেজে বসবার ঘরের কাছাকাছি টেবিল থেকে বরং দূরে মধুরা একটা চেয়ারে বসে আছে। কাগজ পড়ছে সে। পাশে টিপয়ের উপরে সেলাইঝুড়ি। তার পায়ের কাছে একটু দূরে একটা খালি মোড়া।

খবরের কাগজ উল্টে নিলো মধুরা। রান্না-ঘর থেকে দু হাতে দু মাগ্ চা নিয়ে সুমিতা এলো।

মধুরা। আবার চা?

সুমিতা। কি করে যে পারো তুমি! আমার তো এতদিনের এই অভ্যাস কিছুতেই যায় না।

মধুরা। [কাগজ রেখে চা নিয়ে হেসে] অবশ্য, বলি বটে, একদিনও বাদ দিই না নিজেও বারোটার এই চা। অভ্যাসই যে তার কারণ তাতে ভুল কি? অন্তত এটা পনরো বছরের অভ্যাস এই দু মাগ্ চা।

সুমিতা। [মোড়াটায় বসে] আর কোন কোন অভ্যাস বিশ বছরের, এমন আছে।

মধুরা। আঠারো বছরের তুমি এই করে প্রায় চল্লিশে চলে এলে। আর এই বসবার ঘরটা যখন তুমি ঝাড়ো তখনও আমার অভ্যাসের কথাই মনে হয়।

সুমিতা। কে যেন ওকে মিউজিঅম বলেছে, ও হ্যাঁ খোকনই বোধ হয়।

মধুরা। মিউজিঅম? তা কি করে হবে? তা বলা যায় বোধ হয়। একটা টেবিল, খান-কয়েক চেয়ার, একটা বুক্‌সেলপ্। টেবিলে পেজমার্ক দেয়া একখানা ফরেনসিক্ মেড্‌সিনের বই। তার পাশে একটা রুপোর সিগারেট কেস। আর দেয়ালে গ্লাসকেসে সে সময়কার অপরাধীদের ছোট ছোট ফটো। সে সময়কার মানে পঁচিশ বছর আগেকার। [মধুরা ভাবলো]

সুমিতা। আজ দেখলুম সিগারেট কেস্‌টা কেমন কালচে হয়েছে। ওটাকে মাজলে হয়।

মধুরা। মাজবি? [মধুরা ভাবলো, হাসলো।] এটাও আমাদের অভ্যাস—এমন করে এই সময়ে বসে ভাবা। ননদের কথায় তোর মনে পড়ে থাকবে সিগারেট কেস্‌টার কথা। কিন্তু মাজলে কি বদলে যায় না? ভিতরের সিগারেটগুলোকে ফেলে দিয়ে কি নতুন টাটকা সিগারেট এনে রাখা হবে?

সুমিতা। তুমি কিন্তু কখনও মিউজিঅম বলোনি।

মধুরা। [বসবার ঘরটার দিকে চেয়ে ভাবলো, অন্যমনস্কের মতো চায়ের মগে চুমুক দিলো।] মিউজিআমই বলতে হয় কারো ব্যবহার করা জিনিসগুলো যদি পঁচিশ বছর ধরে একইভাবে সাজানো থাকে। ধুলো পড়েনি, কারণ তুমি রোজ ঝাড়চো। কিন্তু রুপোর সিগারেট কেস্‌টা কালচে হতে শুরু করেছে। আর পলাতক অপ-রাধীদের ফটোগুলো হয়েছে হলদে। তা একজন পুলিশ অফিসারের মিউজিঅম বলা যায়।

আর এই বড় ছবিটাও তার কাছে অপ-রাধীর ছবিই ছিলো। প্রতিপক্ষের ছবি। ছোট ফটো থেকে বড় করে আঁকানো, যাতে, হয়তো, সব সময়ে দেখে দেখে মনের

পাতে নির্ভুল করে এঁকে নেয়া যায়, ছদ্মবেশ পড়লেও ধরা পড়ে।

সুমিতা। [চায়ের মগ নামিয়ে রেখে] এখন কি সেলাই করবে?

মধুরা। হ্যাঁ, তাই করি। [চায়ের মগ নামিয়ে রেখে সেলাই-ঝুড়িতে হাত দিলো। একটা আধবোনা উলের জামা হাতে নিলো।] কাল রাতেও খানিকটা বুনেছি। আর ডিজাইনটা দেখ এখন। অলিভ গ্রীনে এটা ভালো দেখায় না? ভালো দেখাবে না বিমানকে?

সুমিতা। বেশ ভালো।

মধুরা। [সেলাই শুরু করলো।] আর আলোটা আজ বেশ স্পষ্ট। চশমা না দিয়ে খুব অসুবিধা হয় না।

সুমিতা। [খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে তাতে চোখ রেখে একটু পরে] সংসারের খরচ বেড়ে যায়, নইলে—

মধুরা। [সেলাই থেকে চোখ তুলে] কিছু পাল্টানো দরকার? কথাটা কিছুদিন থেকেই ভাবছি। তুমি আন্দাজও করেছো ঠিক। সেদিক থেকে না বললেও চলে। কিন্তু বলে দেয়ার সার্থকতা আছে। নতুবা তোমাকে না-জেনে থাকার ভান করতে হবে। চার মাস হলো মাসোয়ারাটা বন্ধ হয়েছে।

সুমিতা। হ্যাঁ, এটা একটা পরিবর্তন। পঁচিশ বছরে মস্ত একটা পরিবর্তন।

মধুরা। তা আমাদের ছেলে চালাচ্ছে ভালোই, কি বলো?

সুমিতা। তুমি হাসবে শুনে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়—ওকে এখন আমার খোকা-বাবু বলা উচিত, বাবু কথাটা বলাই ভালো।

মধুরা। [ভাবলো।] তাই কি স্বাভাবিক হয়? অথচ [বোনার ডিজাইনটা ঠিক উঠলো কিনা দেখে নিয়ে] অথচ শুধু [হেসে] ভালো দুধ আর দইয়ের খবর করতেই দিন কেটে গেলো তোমার। সেদিন ওর মুখে একটা কথা শুনে কেবলই মনে হতে লাগলো, কোথায় যেন শুনেছি, কোথায় যেন—। ও বললে, দূর করো। পরে মনে হলো কথাটা তোর। তুই বলে থাকিস। তোর মুখ থেকে নিয়েছে খোকন। [সুমিতা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।]

মধুরা। (হেসে) অমনি মনে পড়ে গেলো তো রান্নার কথা।

সুমিতা। আগে তখন রান্না খারাপ হলে গল্প করে ভুলিয়ে খাইয়ে দেয়া যেতো। এখন রান্না ঠিকঠাক না হলে লজ্জায় মরে যেতে হয়।

[সুমিতা রান্নার তদারক করতে চলে গেলো। মধুরা এক মিনিটকাল বুনলো। তারপর উঠে বসবার ঘরে গেলো বুনতে বুনতে। জগন্নাথের ছবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। সুমিতা ফিরে এলো। সেলাইয়ের ঝাঁপি থেকে নিজের সেলাই বার করে নিলো। মধুরা যা বুনছে তা থেকে ভিন্ন রংয়ের ভিন্ন ডিজাইনের। মধুরা জগন্নাথের ছবিটার অন্য পাশ দিয়ে ফিরে এলো।]

মধুরা। [চেয়ারে বসতে বসতে হেসে] রান্না ঠিক আছে তা হলে!

সুমিতা। (হেসে) তুমি মিউজিঅমটা দেখে এলে?

মধুরা। মিউজিঅম? ও, হ্যাঁ, তা, বিমান বলছিলো না? এটা, একঘেয়ে অভ্যাস বলবি নাকি? কিন্তু যদি রুটিনবাঁধা বলিস, অতীতেও আমাদের রুটিনবাঁধা দিন কখনও কখনও উল্টেপাল্টে যেতো। আর ছোটদের কত রোগই হতে পারে—ইনফ্লুয়েঞ্জা, পেটব্যথা, পা মচকানো, এমনকি মামস্। আর তখন বিশেষ খাবার তৈরি, গরম জলের ব্যাগ নিয়ে ছুটোছুটি। এখন বিমান সে সব অবস্থা ছাড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু তা হলেও এই পঁচিশ

বছর এই ফ্ল্যাটে সে সব দিন কি উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার কারণই না হয়েছে। আর এই সব রুটিন আর এইসব উৎকণ্ঠা নিয়েই পঁচিশ বছর কেটে গেলো এই ফ্ল্যাটে, বিমান গড়ে উঠলো। [ভাবলো] ভালো হয়নি বিমানের গড়ে ওঠা। [যেন স্বপ্ন দেখছে এমন হেসে] সেদিন সেই লাল টাইটায় ওকে কেমন মানিয়েছিলো দেখেছিলি? আচ্ছা, তোর কি মনে হয়? ও যদি গোটি রাখে, আরও সুন্দর হয় না!

সুমিতা। তোমার ননদ অবশ্য এই ফ্ল্যাট সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করেন। [বুনতে বুনতে]

মধুরা। [হাসলো] স্মৃতিতে কি সত্যি জায়গা বদল হতে পারে? এটা কিন্তু একটু অসাধারণ—আমার এই ফ্ল্যাটে স্থির হয়ে থাকা। মনে হতে পারে কেউ যেন একটা অ্যানুইটি রেখে গিয়েছিলো আর তার শর্ত এই ফ্ল্যাটে বাস করা আর পুরনো সাদা শেভ্রলেটাকে ব্যবহার করা। প্রকৃত-পক্ষে তা অবশ্যই নয়। শেভ্রলেটা পুলিসের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অমার্কা-মারা গাড়িগুলোর একটি। একদিন দেখি গাড়ি। জানা গেলো এটাও একটা ব্যবস্থা উপরে কোথাও সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারেও হয়তো ফ্ল্যাটের মালিককে বলে দেয়া হয়েছিলো ডিসর্টাব করো না। যার মৃত্যুর ফলে এমন সব বন্দোবস্ত—ঠিক যেন একজন মা ও তার শিশুর পক্ষে যথেষ্ট একটা নিশ্চিত মাসোয়ারা রেখে যাওয়ার মতো, কিন্তু তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ। বিমানের উপাধিই অন্য কারো প্রমাণ। তাকে কি ভোলা গেছে?—মর্যাদা বোধ হয় কথাটা—(একটু ভেবে) কাল থেকে ব্রেকফাস্ট টেবলে নিরামিষ কিছু রেখো, বাপু।

সুমিতা। খোকন আপেলের কথা বলেছিলো। আপেল আনিয়েছি।

মধুরা। এই ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়ার পরে যা থাকবে তা শুধু বিমানের উপাধি-ই। কথাটাও দেখো—এখন এই পঁচিশ বছর বাদে নিরামিষ খাওয়ার কি সার্থকতা! কিছু একটা রেস্‌পেক্‌টিবিলিটি আছে তাই নয়?—এই নিরামিষে। মর্যাদা—যদি তা বলো।

[সুমিতা সেলাই রাখলো। সামনে হাত লম্বা করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো]

মধুরা। কাজের কথা মনে পড়লো? (হেসে)

সুমিতা। এখন ব্রেকফাস্টের বাসনগুলো ধোব, মুছবো, শুকিয়ে তুলে রাখবো সেল্‌পে। এই বিশ বছরে, আমি, আসার পরে এই ফ্ল্যাটে একটা জিনিসই বদলেছে —বাসন ধোবার বেসিনটা। আগে ছিলো না, রান্নাঘরের নালিটাকে ব্যবহার করা হতো। চিনেমাটির বেসিনটা আর তার গায়ে জলের ট্যাপ বসানো হলো; অবশ্য তার জন্য ভাড়াও বাড়লো দশটাকা। এমন হতে পারে ভাড়া বাড়ানোর ছুতো সেটা। মনে করে দেখো।

মধুরা। [হেসে] ফ্ল্যাটের মালিক কি করে টের পেয়েছিলো সেই বছরে মাসোয়ারার টাকাও বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা আর তা বিমানের হাইয়ার এডুকেশনের জন্য। [ভেবে] অবশ্য মনস্তত্ত্বে এমন একটা কথা আছে। যাতে অনিচ্ছা তাতেই ভুল হয়ে যায়।

সুমিতা। কিসে তোমার ভুল হলো?

মধুরা। যদিও পিঠের ব্যথার কথাও মিথ্যা নয়। চেয়ে দেখ প্যাসেজের ফটোটার তুলনায় জগন্নাথের ছবিটা কত নিচে। মালা দেয়ার পক্ষে সহজ নয়? অবশ্য ননদ বলতে পারে: তোমার পিঠে ব্যথা, চেয়ার টেবলই বা টানাটানি করতে হবে কেন তোমার, সুমিতাকে ডাকলে হতো। সেই মালাটা ঠিক ছবিতে দিতে পারতো।

সুমিতা। হঠাৎ কেন মালার কথা মনে হয়ে-

ছিলো তা আমি মনে করতে পারছি না। হয়তো বাজারে গিয়ে ফুলের দোকানে দেখে তোমার মনে পড়ে থাকবে ছবিতে মালা দেয়ার কথা।

মধুরা। [ঝুড়ি থেকে সেলাই নিয়ে] আর ওটাও মনস্তত্ত্বের কথা। এরকম গল্প আছে। অনেক সময়ে মা ছেলের বিয়ে দিতে চায় না।

সুমিতা। কেন?

মধুরা। মনস্তত্ত্বের বইয়েতেই তা সম্ভব।

সুমিতা। তোমার ননদ বলছিলেন?

মধুরা। আসলে পৃথিবী আর মেয়েমানুষে গুলিয়ে ফেলে মনস্তাত্ত্বিকেরা, কোন কোন ব্যাপারে দুইয়ে মিল আছে ব'লে। তোকে একদিন ইডিপাসের গল্পটা বলবো। আসলে তা নতুন ফসল বোনার ব্যাপার থেকে শুরু, এখন অন্য গল্পে দাঁড়িয়েছে।

সুমিতা। নতুন লোকে ভুল বুঝতে পারে। তোমার ননদও তাই বুঝে থাকবেন। অবশ্য মিউজিঅমে যে ভাবে ছবিটা আছে তাতে কারো মনে হতে পারে ও ঘরখানিতে, এই ফ্ল্যাটে যার স্মৃতি ছড়ানো সে ওই ছবির লোকটি-ই। আর প্যাসেজের দেয়ালের ফটোটা—ঠিক উল্টো, তাই নয়?

মধুরা। অথচ ফ্ল্যাটের মালিক পুলিস অফিসারের চোখে জগন্নাথ অপরাধীদের একজনই ছিলো। আর তার ছবি ওখানে রাখবার কারণ বারবার দেখে এমন চিনে রাখা যে ছদ্মবেশেও চিনতে পারা যায়। পুলিশ অফিসারের সেটা মানসিক ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যে প্রতিপক্ষকে নিজের বসবার ঘরের চোখের সামনে রাখতে চাইতো। শিকারকে থাবার মধ্যে রাখা যেন। অথচ এখন মনে হয় ও ঘরটা জগন্নাথেরও।

সুমিতা। নতুন লোকের কাছে। বরং বিপরীত প্রমাণই বেশী। সেই পঁচিশ বছরের পুরনো হারের ভাড়ায় এই ফ্ল্যাটে থাকা, পুরনো মডেলের শেভ্রলে—

মধুরা। এমনকি এই সেদিনও মাসোয়ারার খাতায় সই দিয়েছি। মিসেস অমুক বললেই আমার পরিচয়। স্মৃতিতে ছবি দুটোর জায়গা বদল উচিত নয়। অন্তত উচিত নয়। [মধুরা যেন ব্যস্ত হয়ে আবার সেলাইটা তুলে নিলো।] আর, কথাটা নাটকীয়, খুবই নাটকীয় শোনাবে, মিউ-জিঅমের ওই ছবিটা প্রকৃতপক্ষে বিমানের পিতৃহন্তার। (মধুরা একটু তাড়াতাড়ি উল বুনতে লাগলো) কেঁদেছিলুম, খুবই কেঁদেছিলুম। এক বছরের খোকনকে, তখন কেউ জানতো না ওর নাম বিমান হবে, বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিলুম। আচ্ছা, বল, সুমি, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে জগন্নাথও আমার জীবনের গল্পে একটা চরিত্র নয়? একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পুরুষ দুটিকে একই ঘটনার দুই-পক্ষ হিসাবে সমান দেখায় না? যেন এই ফ্ল্যাটটাকে দখল করার জন্য দুইটি পুরুষের দ্বন্দ্ব। এখানে মাটি খুবলে গেলো, ওখানে কাঁচ ভাঙলো। তারপর যেন বিজয়ী আর বিজেতা দুজনেই সরে গেছে। (চোখের সামনে উলের ডিজাইনটা তুলে ধরলো।) আর তা ছাড়া (মুখের সামনে থেকে সেলাই নামালো) তা ছাড়া (হাসলো) পৃথিবীর অবশ্য ননদ নেই।

সুমিতা। বিজয়ী আর বিজেতা ইতিহাসে সমান বলছো?

মধুরা। তাই নয়? হয়তো উচিত নয়। উচিত নয়। কিন্তু কি সুন্দরই দেখাবে বিমানকে এ জ্যাকেটে। হ্যাঁ, ওর বাবার চাইতেও মাথায় ইঞ্চি কয়েক উঁচুই হবে। আর গায়ের রঙ্‌ও—(মধুরা হাত উল্টে নিজের হাতের পিঠের রংটাকে লক্ষ্য করলো) খুবই ভালো দেখাবে বিমানকে দেখিস, এই জ্যাকেট, লাল টাই, আর গোটিটতে, যদি গোটি রাখে। তা ছাড়া—

[নেপথ্যে হঠাৎ ট্রামের শব্দ শোনা

গেলো।]

সুমিতা। এমন শব্দ হয়, মাঝে মাঝে!

মধুরা। বাহ্! ভাড়ার হারটা সেকেলে কিন্তু শহরের মাঝখানে নয় এই ফ্ল্যাট। বরং দুটো বড় রাস্তা সেখানে মিশেছে সেই কোণে।

তা ছাড়া আজকের রোদটার মতো কিম্বা তা নয়, বিমানের কথাই বলছি, বিমানের একটা পুতুল ছিলো মনে করে দেখ, পুতুলটা তার বাড়ির তুলনায় লম্বা ছিলো। দাঁড় করাতে হলে বাড়ির ছাদ রাখা যেতো না। এখন এই ফ্ল্যাটে আমাদের রুটিনবাঁধা পুরনো অভ্যাস-গুলোর মধ্যে থেকেই বিমান উঠে দাঁড়িয়েছে যেন তার মাথা ছাদ ফুটো করে উঠছে—এমন মনে হয় না।

সুমিতা। আজই তো খোকন নতুন ফ্ল্যাট দেখে আসবে। আর [হাসলো]

মধুরা। কি?

সুমিতা। এখন থেকে আমি খোকাবাবু বলবো। এখন বড় হয়নি? অনেক বড় হয়েছে।

মধুরা। [হেসে] তাই তো হয়। এখনই, মানে এই পুরনো ফ্ল্যাটেই, সেই তো কর্তা, সেই তো পুরুষ।

সুমিতা। এটায় আর কিছু মিথ্যা খুঁজে পাবে না—অবাক লাগে না, সেই কোলের ছেলে—। এখন তারই সমস্যা, সেই কর্তা।

মধুরা। [হেসে] এ জন্যই পৃথিবীর সঙ্গে মেয়েমানুষের মিল আছে বলে। প্রতি বছরে নতুন ফসল নয় শুধু, একই অযোধ্যায় পরের পর বিভিন্ন পুরুষের রাজা হওয়াও। আর এই ফ্ল্যাটও বদলাবে সে। আর সেই নতুন ফ্ল্যাটটা হবে বিমানের।

সুমিতা। এখানকার অনেক জিনিস রেখে যেতে হবে পিছনে। আর সেখানে এমন একটা ঘর পাওয়া যাবে না যাকে মিউ-জিঅম বলা যাবে। তখন কিন্তু তোমার ননদেরও কিছু বলার থাকবে না। কারণ ছবি দুটোকে সে ফ্ল্যাটে টাঙানোর জায়গা পাওয়া যাবে কি? হয়তো তোমার শোবার ঘরে রাখতে পারো, কিন্তু সে তো আঁচলে ঢেকে রাখার মতো।

মধুরা। (নিঃশব্দ টানা নিঃশ্বাস পড়লো) একেবারে ভুলে যাওয়ার মতো ব্যাপার হবে, তাই না? এসবগুলি পড়ে থাকবে আর তারপর হয়তো ফ্ল্যাটের মালিক অন্য আবর্জনার সামিল করে ফেলে দেবে। আশ্চর্য, তাই ফেলে দিতে হয়? আশ্চর্য! [ভাবলো মধুরা সম্মুখের দিকে চেয়ে। কোথায় একটা ঘড়ি বাজলো। মধুরা চমকে উঠলো।]

মধুরা। একটা!

সুমিতা। (উঠে দাঁড়ালো) ছি, ছি, দেরি হয়ে গেলো।

মধুরা। রান্না বাকি আছে? কি ক্ষিদে যে ওর পায়। আর এই ক্ষিদেই প্রমাণ করে ওর স্বাস্থ্য কত সুন্দর, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওর কত নিশ্চিত আস্থা।

সুমিতা। [রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে] সব ঠিক থাকারই কথা। মাংসটা এতক্ষণে হয়ে গেছে। তা হলেও দেখি। তুমি কি ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখবে দেখা যায় কি না? [রান্নাঘরে গেলো]

[মধুরা উঠে দাঁড়ালো, আর্চওয়েয় দিকে যেতে যেতে যেন থমকে দাঁড়ালো মঞ্চের মাঝখানে। আবার ট্রামের শব্দ শোনা গেলো। রান্নাঘরের দরজায় সুমিতা মুখ বাড়ালো—হাসি মুখ]

সুমিতা। সব তৈরি।

মধুরা। টেবল পাতবে?

সুমিতা। আসছি।

[সুমিতা রান্নাঘরে ঢুকলো, পরমুহূর্তে টেবিল-ঢাকা চাদর নিয়ে এলো। মধুরা টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে

বসলো। টেবিলে চাদর বিছালো সুমিতা। মধুরা তার এক কোণ ধরে সাহায্য করলো।]

সুমিতা। নতুন ফ্ল্যাটে আমার কিন্তু কাজ কমে যাবে।

মধুরা। কেন?

সুমিতা। বসবার ঘরের, যাকে মিউজিঅাম বলা যায়, তার কাজ থাকবে না। ছবি দুটোকে নেয়া হলেও বা কোথায় রাখা যাবে সেখানে?

মধুরা। খোকনের কি দেরি হচ্ছে আসতে? ছবি নিয়েই বা কি হবে?

সুমিতা। এখনই এসে যাবে মনে হয়।
[সুমিতা টেবিল ক্লথ পাতা শেষ করে রান্নাঘরে চলে গেলো, জলের জাগ, গ্লাস নিয়ে এসে রাখলো। এখন খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছে সে। মধুরা তার কাজ লক্ষ্য করছে আর ভাবছে। তার মানসিক চঞ্চলতা শুধু তার টেবিলের উপরে রাখা হাতের আঙুলে ধরা পড়ছে।]

সুমিতা। [প্লেট কাঁটা চামচ ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করে টেবিল গুছিয়ে রাখতে রাখতে] যারা জানে না তাদের কাছে হঠাৎ মনে হবে—[হাসলো]

মধুরা। কি?

সুমিতা। খোকন, আচ্ছা, খোকন নিজেও তো বিশ্বাস করে বিপ্লবে!

মধুরা। তোকে বলি শোন, খোকন বলে, আর সত্যি হয়তো তাই, ও বিপ্লবটাতে মানে জগন্নাথদের বিপ্লবে কিছু ভুল ছিলো হয়তো। হয়তো তীব্র আগ্রহ ছিলো। হ্যাঁ। প্রাণকে পণ করেছিলো কেউ কেউ। কিন্তু

সুমিতা। তোমার জন্য টেবিলে লাঞ্চেও ফল রাখবো। যে ছেলে, নিরামিষ খাওয়া নিয়ে আবার হাঙ্গামা শুরু করবে। [হেসে] কিন্তু কি বলছিলে?

মধুরা। ভোকাবুলারি বলে একটা কথা আছে। হ্যাঁ তাই। [হেসে। কাঁটা চামচগুলোকে গুছিয়ে দিলো] ঠিক শব্দতালিকা নয়। মানে খোকনই আমাদের জীবনের পুরুষ এখন। আর মেয়েদের পুরুষের ভোকাবুলারি শিখতেই হয়। ঠিক যেন সত্যি তাই, তোকেও তো গ্যাল্ বলে।

সুমিতা। ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল এনে দেবো? ভাল হয় না? কি শিখতে হয় বলছিলে?
[দাঁড়ালো কথা বলতে]

মধুরা। বিমানদের হিসাবে সেটা আসলে কিছু নয়। বুর্জোয়া বিপ্লব বলেছে বিমান। একটা ভুল পথে গিয়ে কিছু লোকের প্রাণ দেয়া। কিন্তু ওর কি দেরি হচ্ছে?

সুমিতা। [একটু অবাক হলো। তার কাজের হাত থেমে গেলো।] তাই? মানে জগন্নাথের ব্যাপারও?
[সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে যাবে এমন সময়ে মোটরের হর্ন। হেসে ইসারা করলো—এসে গেলো বিমান]

সুমিতা। কি ছেলে যে! এখনই এই প্যাসেজের বেসিনে হাত ধুয়েই বলবে—দেরি করছো কেন, খেতে দাও। তা খোকনের ভোকাবুলারি আমাদের শিখে নেয়া ভালো। [হাসলো] ভোকাবুলারি নয় কথাটা? আর যদি বলো আমি বাবুই বলবো বরং। [বসবার ঘরে টেলিফোন বাজলো] দেখো হয়তো ফোনে জানতে চাইছে টেবিল পেতেছি কিনা।
[মধুরা উঠে বসবার ঘরে গেলো হাসিমুখে। জগন্নাথের ছবির পাশ দিয়ে বাঁ দিকে সরে অদৃশ্য হলো।]

মধুরা। (নেপথ্যে) হস্পিট্যাল? কি আশ্চর্য! হস্পিট্যাল থেকে বলছেন? কেন? রোড অ্যাক্সিডেন্ট? না, বুঝতে পারছি না। মা, কিছুই বুঝতে পারছি না।
[মধুরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। ট্রামের

শব্দ।]

সুমিতা। কি হলো, কি হলো? [মধুরা টলতে টলতে চেয়ার ধরে দাঁড়ালো। মটুক সিং প্রবেশ করলো।]

মধুরা। [উচ্ছ্বসিত কান্না চেপে] মটুক, মটুক।

মটুক। চলিয়ে সাব।

সুমিতা। কি হলো, মটুক, কি হলো?

মটুক। অ্যাসিড বাল্ব, মুখের এক পাশ, দক্ষিণ চোখ—[হাত দিয়ে দেখিয়ে]

সুমিতা। কি বলছো?

মটুক। হামি তো গাড়ি নিয়ে গেলাম। তো ভারি ঝগড়া বাধিয়ে গেলো। হুঁ, পত্রিকা অফিসমে। ওহি তো উনকো পার্টিকো পত্রিকা অফিসমে।

সুমিতা। আ, মটুক!

মটুক। রিভ্সনিস্ট, রিভ্সনিস্ট, হল্লাগল্লা, , উসকো বাদ দনাদ্দন, দনাদ্দন। ক্র্যাকার মারিয়ে দিলো।

মধুরা। রিভিসানিস্ট! আশ্চর্য! বিমান তাই? আশ্চর্য! মানে, আশ্চর্য! তার বিপ্লবও ঝুঁটো? পার্টির পত্রিকা অফিসেই! অ্যাসিড্ বাল্ব আর ক্র্যাকার। একালের খবরকাগজের ভাষা, একালের উপাদান। সুমি, সুমি, আমি কাঁদতে পারছি না কেন?

সুমিতা। শান্ত হও, দাঁড়াও, বসো, আমাদের খোকন যে!

মধুরা। ঝড় নাকি? মাটি কাঁপছে, দেখো। এই দ্বিতীয়বার, আর এটাও দেখো, এই দ্বিতীয়বার।

[তার ঠোঁট ফোঁপাচ্ছে কিন্তু কান্না আসছে না। সুমিতার দুচোখ থেকে অজস্র জল গড়াচ্ছে।]

সুমিতা। চলো দেখে আসি খোকনকে।

মধুরা। [ফোঁপাতে ফোঁপাতে [আর একবার আর একটা মিউজিঅম নাকি? তারপরে আবার পঁচিশ বছর এই ফ্ল্যাটে!

সুমিতা। চলো দেখে আসি।

মধুরা। আর একটা দুরন্ত পুরুষ, আর তার নিরর্থক দুরন্তপনা। তারপর সে থাকে না, থাকে না। (হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে) ছি-ছি, কি ভাবছি আমি! ছি-ছি, এর মধ্যে বিমানের মিউজিঅমের কথা কেন মনে আসে? বিমান কেন আর একটা পুরুষ মাত্র হবে। যে বিমান আমার কোলজুড়ে... বিমান, বিমান...

সুমিতা। চলো দেখে আসি খোকনকে, এই-ভাবেই চলো।

মধুরা। চলো, সুমিতা। তারপর আমি কি খোকনকেও ভুলে যাবো? [দুহাতে আঁচল তুলে মুখ ঢাকলো। কান্নার শব্দ।] বল তুই, বল।

সুমিতা। চলো, চলো।

মটুক। চলিয়ে, সাব্। [মটুক আর্চওয়ের দিকে যাওয়ার ভঙ্গি করলা।]

যবনিকা
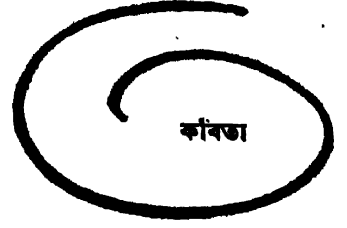
রঙ

হরপ্রসাদ মিত্র

ট্রাম, বাস, ট্যাক্‌সির স্রোত সকাল দশটার রোদে।
টুকটুকে লাল চটি-পায়ে
ছিপ্‌ছিপে মেয়েটিকেও দেখা গেল।
অনেক মানুষেরই চেহারায় নেই বিশিষ্টতা,—
মুখগুলো আলুর মতো মসৃণ নয় বটে,
কিন্তু নিরুত্তর।
সে-সব মুখে কোনো সাড়া নেই।
রোদ আছে কি নেই,
হাওয়া বইছে কি বইছে না,
পৃথিবীতে বসন্ত না বর্ষা—
সে-সব খবর পড়া যায় না
তাদের ছোটো বড়ো মাঝারি চোখে চোখে।

যেন বিবর্ণ দেয়াল
কিংবা চলন্ত অভ্যাস।
একটা লোক আর একটা লোকের পা মাড়িয়ে দিলে
কী যে ঘ'টতে পারে,—
তাতে কারো কিছু এসে যায় না।
চ'লতে চ'লতে কেবলি ওরা পরস্পরের
পা মাড়াচ্ছে।

টুকটুকে লাল চটি-পায়ে সেই মেয়েটিকে
দেখলো ওরাও।

বাঁয়ে হেলে হঠাৎ একটা রিক্‌শকে থেৎলে দাঁড়ালো
প্রকাণ্ড একটা ট্রাক।
খানিকটা রক্ত আর কাঠকুটো,
চীৎকার, আর লোকারণ্য,—
অভ্যাসে হঠাৎ ধাক্কা লাগার সেই বিপর্যয়
এবং পার্কে পাথরের বিবেকানন্দের
বিস্ফারিত চোখ
দেখতে দেখতে লাল চটি মিলিয়ে গেল
কী জানি কোন্ রাস্তায়।
সবুজ কটা গাছের চাঁদোয়া ভেদ করে ছিটকে গেল
এক ঝাঁক কাক।
ঠিক সেই মুহূর্তেই
রোদের নিস্তরঙ্গতা বুঝি অনুভবে এলো।
দেখলুম বাড়িগুলো ভারি উদাসীন,
কলকাতার সর্বাঙ্গ যেন বিবর্ণ,
বালতি বালতি জল প'ড়ছে রাস্তায়,
রক্ত-ধোওয়া লাল্‌চে স্রোতটা লিকলিকে—
কালো কালো মাথার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে
রঙ চটে-যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স।

বাহিরে এলাম

মণীন্দ্র রায়

কেউ কি পালিয়ে যায়?—যেতে পারে? অন্তত যে-জন
রক্তের ভিতরে তার আলো জেবলে আড়মোড়া ভাঙে,
সে কি জেগে ঘুমোনোর মায়ালোকে বাঁচে?
তা হলে কে আর যেত ঝড়ে জলে মাঠে
ধুলোওড়া পথে পথে জীবনের আঁচে?

আসলে অনেক বীজ থেকে যায় অযুত বছর,
অযুত বছর কাটে প্রস্তরস্তূপে নিহিত জবালায়।
তবু একবার তাকে ছুঁড়ে দিলে মাটিতে রোদ্দুরে
সে বুকে সহসা দ্যাখো কী বিপুল যন্ত্র নাড়া খায়।
আর কি সে ফেরে?—ফিরে যেতে পারে, জবালার ভিতরে?
দাঁতালো চাকার টানে কাল তাকে থাকে টেনে নিতে!

আমিও বারেক মাটি ছুঁয়েছি, এবং
রোদ্দুর বুকের মধ্যে উঁকি দিয়ে ডেকে গেছে নাম।
কোথায় পালাব আর? আমি নির্বাসিত!
আমারই ভিতরে আমি হাজতের বন্দী, দিনে দিনে
খোলস ফাটিয়ে তাই বাহিরে এলাম।

বুঝে নাও

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শিল্প—না জীবন,
তুমি এইসব এখন ক'রো না।
বুঝে নাও।

আর পাঁচজন যায় পা-ফেলে পা-ফেলে,
তারা বিকেল-বিকেল
হয়তো বাড়ি চ'লে যাবে।

বাড়ি মানে ছাদ, দরজা,
বারান্দা, বাগান
আড়াআড়ি।

গ্রহতারা ওপরে রয়েছে,
তারা ভালো না খারাপ
তুমি জানো না এখনো,
কিছুদূর ট্রামে যাওয়া যায়,
হেঁটে, হয়তো কিছুটা—

বাকিটুকু কিভাবে পেরুবে?
শিল্প না জীবন—
তুমি এইসব তর্ক ক'রো না,
বুঝে নাও॥

রাত্রির শকুন

জোসেফ হ্যানজলিক্

উৎসর্গিত মেষ চাই। কোমল শাবক
রক্তে তার পারো যদি বিচর্চিত করে রেখো দ্বারের অর্গল
না হলে রাতের পাখী ক্রমাগত দুয়ারে তোমার
ঝাপ্‌টে বেড়াবে ডানা চূর্ণ করে দেবে শির সদ্যোজাত প্রথম শিশুর।

তবু ধিক্ শত ধিক্ বলবো তোমাকে
যদি তুমি তীব্র ক্রোধে, অবিনয়ে, ভ্রমে
আপন স্বজনে এনে বলি দাও, মাখাও দুয়ারে

সংকেত রক্তের চিহ্ন
কেননা তাহলে
রাত্রির পাখীর তুমি পাবেই প্রসাদ
ওই রক্তচিহ্ন গুণে প্রতিবেশীদের।

তখনই দুঃখহীন জেনে যাবে দুঃখ কাকে বলে
তখনই মৃত্যুহীন তুমি হবে মৃতেরও অধিক।

অনুবাদ: **কবিতা সিংহ**

কাব্য, প্রতীকীবাদ ও আধুনিক উপন্যাসের ধারা

বিকাশ চক্রবর্তী

উপন্যাস মূল্যায়ন-পদ্ধতি কি কাব্য অথবা নাটকের মূল্যায়ন-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে আর একটি গভীরতর সমস্যা : নাটক ও কাব্য থেকে স্বতন্ত্র করে উপন্যাসের কোনো স্বকীয় শিল্পরূপ স্বীকার্য কি না। অর্থাৎ, ধ্রুপদী সমালোচকদের—যেমন অ্যারিস্টটল ও হোরেস—জাঁর[১] (genre) থিয়োরি সাহিত্যের ইতিহাসে কতদূরে স্বীকৃত? এই প্রশ্নের দুটি উত্তর সম্ভব : একটি দার্শনিক, অপরটি ঐতিহাসিক। যেহেতু ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রত্যক্ষ ফললাভের সম্ভাবনা বেশি, তাই আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত অনুসরণ করব; এবং আলোচনার সুবিধের জন্য ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসের বিবর্তন লক্ষ্য করা বোধ করি অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের জন্মকাল ১৭৪০, অর্থাৎ রিচার্ডসনের 'পামেলা' রচিত হবার তারিখ, তবে এরকম মনে করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, অর্থাৎ হেনরী জেমসের রচনাকাল পর্যন্ত, সাধারণভাবে উপন্যাস-সমালোচক ও ঔপন্যাসিকেরা ধ্রুপদী জাঁর থিয়োরি মেনে নিয়েছেন। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সাহিত্যের ইতিহাসে জাঁর কোনো নির্দিষ্ট বা বিধিবদ্ধ বস্তু। যুগ ও প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টির প্রভাবে শিল্পরূপ ও হায়ারারকির ধারণা পাল্টাতে থাকে। "প্যারাডাইস লস্ট" সম্পর্কে মিলটনের ধারণা ছিল যে ঐ কাব্য ইলিয়ড ও ঈনিডের সমগোত্রীয়, অর্থাৎ ধ্রুপদী অর্থে মহাকাব্য। স্পেনসারের "ফেয়ারি কুঈন"কে মিলটন মহাকাব্য বলতে রাজি হতেন কিনা সন্দেহ; অথচ স্পেনসার স্বয়ং ভেবেছিলেন যে তিনি হোমারের মতো এক কাব্য রচনা করেছেন। অন্যপক্ষে, অ্যারিস্টটল অনেক বিবেচনার পর ট্র্যাজেডিকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন, যা রেনেসাঁস ও ক্লাসিকস্-অনুগামী অষ্টাদশ-শতকী সমালোচকরা মেনে নেননি। শেক্সপীয়ারের যুগেও এপিকের প্রাধান্য ছিল; হবস্, ড্রাইডেন ও ব্লেয়ার ট্র্যাজেডি এবং এপিককে সমান সম্মান দেখিয়েছেন।

অ্যারিস্টটল অবশ্য উপন্যাস কাকে বলে জানতেন না। সাহিত্যে তিনি যে প্রধান তিনটি শিল্পরূপের উল্লেখ করেছেন সেই তিনটি হলো : নাটক, মহাকাব্য ও লিরিক। মহাকাব্যের ধারণা বহুদিন হল লুপ্ত হয়েছে এবং এর বিকল্প হিসাবে উপন্যাসকে (bourgeois epic?) গ্রহণ করা যেতে পারে। আধুনিক জাঁর থিয়োরির প্রবক্তাদের[২] অধিকাংশই সাহিত্যের প্রাচীন ত্রিভুজ ধারণাটি মেনে চলেন; কিন্তু তাঁদের শ্রেণীবিভাগ অ্যারিস্টটল থেকে একটু ভিন্ন।

---

[১] ইংরেজী ভাষায় জাঁর (genre) শব্দটির ব্যবহার সাম্প্রতিক ঘটনা। অষ্টাদশ শতকে ডাঃ জনসন ও ব্লেয়ার "species" কথাটি ব্যবহার করেছেন। ১৯১০ সালে ইর্ভিং ব্যাবিট (Irving Babbit) The New Laokoönএর ভূমিকায় বলেন যে জাঁর কথাটি এতদিনে ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। কথাটির কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আছে কিনা জানি না। এই প্রবন্ধে 'শিল্পরূপ' ও 'জাঁর' কথা দুটি সমার্থক।

[২] অস্টিন ওয়ারেন তাঁর Literary Genres প্রবন্ধে (Theory of Literature: René Wellek and Austin Warren) বলেছেন যে আধুনিক জাঁর থিয়োরি...instead of emphasizing the distinction between kind and kind, it is interested—after the Romantic emphasis on the uniqueness of each 'original genius' and each work of art—in finding the

মহাকাব্য ও লিরিকের বদলে তাঁরা স্থাপন করেছেন, উপন্যাস-ধর্মী রচনা ও কবিতা; তাঁদের ভাষায় : fiction and poetry. কিন্তু এই শিল্পরূপ শ্রেণীকরণের ভিত্তি কি? অ্যারিস্টটল অবশ্য প্লেটোর manner of imitation-এর উপর ভিত্তি করে বলেছিলেন যে লিরিকে কবি স্বয়ং উপস্থিত, মহাকাব্যে কবি কখনওবা নিজেই সূত্রধার আবার কখনো তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে ঘটনার বিবরণ দেন; এবং নাটকে কবি সর্বদাই অনুপস্থিত। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোলরিজ ও জার্মান দর্শনের সঙ্গে সুপরিচিত ইংরেজ সমালোচক ড্যালাস ঐ তিনটি মৌলিক শিল্পরূপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: নাটক মানে মধ্যমপুরুষ, বর্তমান কাল; মহাকাব্য মানে প্রথমপুরুষ, অতীত কাল; এবং লিরিক মানে উত্তমপুরুষ, একবচন ও ভবিষ্যৎ কাল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সমালোচনা সাহিত্যে শিল্পরূপ শ্রেণীকরণের কোনো সুস্পষ্ট কারণ ও লক্ষণ নির্দেশিত হয়নি। তাঁর একটি পত্রে হবস্ পৃথিবীকে রাজসভা, নগর ও গ্রাম এই তিনভাগে বিভক্ত করে তদনুরূপ তিনটি শিল্পরূপের কথা বলেছেন : heroic, scommatic & pastoral; কিন্তু এদের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি নীরব। যেমন অন্যান্য ব্যাপারে, তেমনি জাঁর সমস্যার ক্ষেত্রেও এই আলোকপ্রাপ্ত যুগ মুখ্যত ক্লাসিকস্-অনুগামী। একটি জাঁর থেকে অপর একটি জাঁরকে পৃথক রাখতেই এ'রা বেশি সচেষ্ট; এগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ'রা বেশি মাথা ঘামাননি। খুব সম্ভব যুক্তিবাদী মানসের কাছে জাঁর সমস্যা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল—ফলে তাঁরা কেউই ঐ সমস্যার ব্যাখ্যা, প্রচার ও মূল্যায়নে উৎসাহী ছিলেন না। অষ্টাদশ শতকের পর থেকে জাঁর সমস্যার ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হ'লো। এ-কথা সত্য যে রোমান্টিকদের কাছে অষ্টাদশ-শতকী শিল্পরূপগুলির ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি অসহ্য মনে হয়েছিল; কিন্তু তা হলেও তাঁরা জাঁর-এর অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন নি; যদিও, পরোক্ষভাবে, আপন উত্তরসূরীদের শিল্পজগতে অদ্বৈতবাদ প্রচারের ভূমিকা রচনা করে গিয়েছেন রোমান্টিকরা। নতুন নতুন শিল্পরূপের সন্ধান করেছিলেন তাঁরা এবং সেইসঙ্গে সংযোজন করছিলেন শিল্পরূপ সম্বন্ধে তাঁদের স্বকীয় ভাবনা। অর্থাৎ, জাঁর বলতে রোমান্টিকরা কোনো প্রক্ষিপ্ত, যান্ত্রিক, বিধিবদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থাপত্র বোঝেননি। নব্য ক্লাসিকদের কাছে যা ছিল সাহিত্যের বহিরঙ্গ, রোমান্টিকদের চোখে তা হয়ে উঠল অন্তরঙ্গ; যা ছিল শুধুমাত্র প্রকরণ তা হয়ে উঠল মর্মস্থল, শিল্পীর চৈতন্যের অংশ। কোনো শিল্পকর্মের প্রাণময়বিস্তারের যে ধারণাটি কোলরিজ জার্মান দার্শনিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রচার করেছিলেন, রোমান্টিক জাঁর থিয়োরির উপর তার প্রভাব সহজেই অনুমেয়। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক শিল্পকর্ম স্বকীয়, স্বতন্ত্র এবং অনন্য। পরবর্তী যুগের প্রতীকী আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগসূত্র নিবিড়। রোমান্টিক জাঁরের একটি প্রচলিত উদাহরণ হল ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং আরেকটি উদাহরণ হল রোমান্স। বস্তুত কবিতার প্রাধান্য সত্ত্বেও উনিশ শতকে লিখিত উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে উপন্যাসেরই যুগ বলা যেতে পারে।

common denominator of a kind, its shared literary devices and literary purpose. তিনি স্বয়ং লিরিক, নাটক ও মহাকাব্য প্রসঙ্গে a common literariness-এর পক্ষপাতী; কিন্তু, সেক্ষেত্রে শিল্পরূপগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়। পক্ষান্তরে, Elder Olsón-এর মতো শিল্পরূপ-গুলির সংখ্যা ক্রমশ বাড়াতে থাকলেও বিপদের সম্ভাবনা। *Critics and Criticism, Ancient and Modern* গ্রন্থে Olson-এর প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

২

১৮৮৮ সালে হেনরী জেমস অনুযোগ করে বলেছিলেন যে ইংরেজি উপন্যাসের পেছনে কোনো তাত্ত্বিকসূত্র ও সচেতন প্রয়াসের ভিত্তি নেই। আশ্চর্যের কথা এই যে. অষ্টাদশ শতকে প্রথম ইংরেজি উপন্যাস রচিত হওয়া সত্ত্বেও, ইংরেজি ভাষায় উপন্যাসের একটি পূর্ণাঙ্গ থিয়োরির জন্য হেনরী জেমস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এমনকি ফরাসী ও রুশীয় সাহিত্যেও উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে প্রথম সচেতন আলোচনা শুরু হয় হেনরী জেমসের মাত্র কয়েকবছর আগে। ইভান্ তুর্গেনিভ ও গুস্তাভ্ ফ্লোবেয়ার—উভয়কেই জানতেন যুবক জেমস। বিক্ষিপ্তভাবে উপন্যাস সম্পর্কে যে আলোচনা কখনো হয়নি তা নয়। ১৭৮৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত Progress of Romance নামক একটি রচনায় ক্লারা রীভ উপন্যাস ও রোমান্সের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। উদ্ধারযোগ্য মন্তব্য ওয়ালটার স্কটেও প্রচুর পাওয়া যাবে। সাধারণভাবে উপন্যাসের আঙ্গিক ও উপাদান সম্পর্কে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকী ঔপন্যাসিকদের ধারণায় কোনো অস্বচ্ছতা ছিল না। তাঁরা সকলেই উপন্যাসের যে তিনটি উপাদান বিষয়ে সচেতন ছিলেন, সে-তিনটি হলো : প্লট, চরিত্র-চিত্রণ এবং পটভূমি। এই তিনটি উপাদানেরই দুই যুগ ধরে বিবর্তন ঘটেছে নানাভাবে। এমনকি একই শতকে রচিত "টম জোনস্" ও "ট্রিসট্রাম স্যান্ডি"র মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া ভার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, উক্ত তিনটি উপাদানের মধ্যে শেষোক্তটির, অর্থাৎ পটভূমির, প্রতীক-সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গত দুই শতকের কোনো কোনো উপন্যাসে পটভূমি যে প্রতীক হয়ে ওঠেনি এমন নয়। কিন্তু কোনো উপন্যাসই কখনো, তীব্র কবিতার মতো, প্রতীকসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের অঙ্গে কবিতার রূপ ও প্রাণের আরোপ বিংশ শতাব্দীর অবদান বা দুর্ঘটনা।[৩]

হেনরী জেমসের জীবদ্দশাতেই এই শতাব্দীর প্রারম্ভে উপন্যাসের জগতে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল, তাকে প্রতীকীবাদের বিশ্বজয় বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি যে এই আন্দোলনের সঙ্গে—যার জন্ম উনিশ শতকের শেষদিকে ফ্রান্সে—ইয়োরোপীয় রোমান্টিকদের যোগসূত্র নিবিড়। কথাটাকে আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে যদিও সকল রোমান্টিকই প্রতীকীবাদী নন, সকল প্রতীকীবাদীই কিন্তু রোমান্টিক। বস্তুত, রোমান্টিকদের সক্রিয় সৃজনী কল্পনাশক্তির থিয়োরিকেই পৃথক করে নিয়ে তাকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করে নিলেন প্রতীকীবাদীরা। জার্মান দার্শনিক কান্টের সাহায্য নিয়ে স্থাপন করলেন এই আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সে যখন এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখনও প্রতীকীবাদের রূপ এতো স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু কতিপয় প্রতিভাবান শিল্পী ও কবি সেখানে যা করেছিলেন তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল ইংলন্ডেও, মুখ্যত আর্থার সাইমন্সের মাধ্যমে। যে যুগান্তকারী পুস্তকের রচয়িতা আর্থার সাইমন্স, সেই *The Symbolist Movement in Literature* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে, এবং

---

[৩] 'সংক্ষেপে বলা যায় বিশ শতকের উপন্যাস কবিতার সমগ্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে। বক্রোক্তি, চিত্রকল্প, প্রতীক; সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উল্লেখ; পূর্বসূরীদের ব্যঙ্গানুকৃতি; লেখকের স্বগতোক্তি ও ভাবনা; ভাষার সচেতন ও অতিসূক্ষ্ম কারুশিল্প; বোদলেয়ার-কথিত সাদৃশ্য স্থাপন (অ্যানালজি ও প্রতিষঙ্গ 'করেসপন্ডেন্স'), র‍্যাঁবো-কথিত ইন্দ্রিয়সমূহের অচেতন বিশৃঙ্খলা সাধন; শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক : কবিতার এমন কোনো কৌশল নেই, যা আধুনিক উপন্যাসে বিপুলভাবে, বিজয়ীভাবে ব্যবহৃত হয়নি।' (উপন্যাসের রূপান্তর। বুদ্ধদেব বসু—অমৃত, ১০ই মে '৬৮)।

পুস্তকটির জন্য যে অনতিদীর্ঘ ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন তার এক স্থানে ফ্লোবেয়ারের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে ঐ ঔপন্যাসিক এমন এক জগতের কথা বলেছেন যেখানে art, formal art, was the only escape from the burden of reality, and in which the soul was of use mainly as the agent of fine literature. দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগৎ, কিংবা যা-কিছু প্রাকৃতিক অথবা স্বভাবী, যা-কিছু অরচিত ও অশিল্প, অশুদ্ধ ও বিমিশ্র—তা থেকে অন্য এক লোকে উত্তরণ—তা সে শিল্পলোকই হোক, অথবা অতীন্দ্রিয়লোক কিংবা মানবমনের রহস্যময় অবচেতনার অতলই হোক—এই হলো প্রতীকী-বাদের মূল কথা। একটি চৈতন্যময় শিল্পজগতের কথা বলেছেন ইয়েটস্ তাঁর বাইজানটিয়ান যাত্রা কবিতায়। অতীন্দ্রিয় লোকের আভাস দিয়েছেন বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবো; এবং মনের গভীরে অতল জলের আহ্বান শুনেছেন টমাস মান, কাফ্কা ও প্রুস। 'শিল্প প্রকৃতির প্রতিবিম্ব নয়'—কলাকৈবল্যবাদীদের এই ধারণাটিকে প্রতীকীবাদীরা যুক্তির শেষপ্রান্তে নিয়ে গেলেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ বোদলেয়ারের কাব্যে সোচ্চার। রিল্‌কেও প্রকৃতি ও বহির্জগৎ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কবিকে আপন সত্তার গভীরে তাকাতে বলেছেন। শিল্পের জগতেই একমাত্র সেই গোপন সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব—এই আশ্বাসে পিকাসো, তাঁর কোনো এক বিরলমুহূর্তে বলেছিলেন, শিল্পী তাই প্রকাশ করে what nature is not; এবং শ্রীমতী গারট্রুড স্টাইনের যে প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছিলেন তা দেখে যখন তাঁর বন্ধুরা অভিযোগ করেন যে ঐ চিত্রের সঙ্গে শ্রীমতী স্টাইনের চেহারার কোনো সাদৃশ্য নেই, তখন পিকাসো উত্তর দিয়েছিলেন 'সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।' যুগ শিল্প সৃষ্টি করে—এই ঐতিহাসিক ধারণার সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রতীকীবাদীরা ঘোষণা করলেন যে শিল্পই জন্ম দেয় যুগ, সময় ও বাস্তবতার।

বোদলেয়ারের উপর লিখিত একটি প্রবন্ধে ভালেরি, এডগার অ্যালান পো সম্বন্ধে বলেছিলেন : Thus by analysing the requirements of poetic delight and defining absolute poetry by exhaustion, Poe showed a way and taught a very strict and fascinating doctrine in which he united a sort of mathematics with a sort of mysticism... 'যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে'—অর্থাৎ শুদ্ধতার জন্য কবিতার নিরন্তর পরিশোধন—এই ভাবনা প্রতীকী-বাদীদের এতদূর বিচলিত করেছিল যে মালার্মে শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতাকে সাংগীতিক নির্যাসে পরিণত করতে চাইলেন। ভের্লেনের কাছে বক্তব্যের ভার, এমনকি শব্দের অর্থময়তাও অসহ্য মনে হয়েছিল। শিল্প হয়ে উঠলো অর্থনির্ভর নয়, প্রতীকী ও ইংগিতধর্মী, স্বপ্রতিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক, স্বতন্ত্র ও অনন্য; এবং যেহেতু অনন্য তাই নিঃসঙ্গ।[৪]

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে উপন্যাস, যেটি শিল্পরূপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজ-সচেতন ও বস্তুনিষ্ঠ—সেই উপন্যাসও প্রতীকীবাদীদের শুদ্ধ শিল্পের ধারণা দ্বারা আক্রান্ত

[৪] ফ্লোবেয়ার একটি পত্রে বলেছিলেন যে শিল্পী ...be like God in creation...Since art is a second world, its creator must act by analogous methods. শিল্পী সম্পর্কে প্রতীকী-বাদীদের এই ধারণাটিকে angelism বলা চলতে পারে। আধুনিক জগতে একমাত্র প্রতীক-সৃষ্টিকারী শিল্পীই বীরবাহু—প্রতীকীবাদীদের এই প্রচ্ছন্ন অহংকার সহজেই চোখে পড়ে :...that it (Image) possesses an absolute autonomy; and that its maker, the artist, is the truly heroic man, (*The Modern Tradition*: *Backgrounds of Modern Literature* গ্রন্থে Richard Ellmann-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

হলো। মহৎ উপন্যাস মানেই কাব্যধর্মী বা কবিতার মতো—এ হলো প্রতীকীবাদী ঔপন্যাসিক-দের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। অতএব উপন্যাসের শরীর থেকে খসে পড়ল তথ্যের ভার, সামাজিক চেতনা। প্লট হয়ে পড়লো অপ্রয়োজনীয় এবং চরিত্রচিত্রণের অর্থ হয়ে দাঁড়ালো অবচেতনের উদ্ঘাটন। গঁকুর ভ্রাতাদের কাছে ফ্লোবেয়ার একবার মন্তব্য করেছিলেন যে প্লট ও চরিত্রচিত্রণ—কোনোটিতেই তাঁর আর আগ্রহ নেই; এবং শুদ্ধশিল্পের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি একটি নির্বস্তুক উপন্যাস (a novel about nothing) রচনা করবার কল্পনা করেছিলেন। শুধুমাত্র ফর্ম রয়েছে, এবং সেই ফর্ম নিছক বাক্-শৈলীর দ্বারা গ্রথিত, এছাড়া আর কিছুই নেই—এমন উপন্যাস অবশ্য ফ্লোবেয়ার শেষপর্যন্ত লেখেননি, লেখা বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু আঁদ্রে জিদ তাঁর "দ্য কাউনটারফিটারস্" উপন্যাসে নায়কের মুখ দিয়ে যে 'উপন্যাস রচনার বিষয়ে উপন্যাস'-এর কথা বলেছেন, তাকে ফ্লোবেয়ারের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। শিল্পের আদর্শ হিসেবে অস্কার ওয়াইলড্ স্থাপন করেছিলেন সঙ্গীতকে; এবং পেটারের সেই সুবিখ্যাত মন্তব্য 'all arts aspire to the condition of music' সাহিত্যে প্রথম ফলপ্রসূ করবার চেষ্টা করলেন প্রতীকীবাদীরা, অন্তত কবিতায়। কিন্তু কাব্যে যা সম্ভব, উপন্যাসে, স্বভাব ও চরিত্রের ভিন্নতার জন্য, তা সম্ভব নয়। তাই কতিপয় প্রতীকীবাদীর গভীর আগ্রহ সত্ত্বেও উপন্যাস শেষপর্যন্ত ফর্ম-সর্বস্ব হয়ে উঠতে পারলো না; কিন্তু যা হয়ে উঠলো তাকে বলা চলে কাব্যমণ্ডিত রচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, "মাদাম বোভারি", যার রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং ফ্লোবেয়ার, সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলো, ফ্লোবেয়ারের অলিখিত নির্বস্তুক উপন্যাসের ভূমিকারূপে নয়, কাহিনীর বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের জন্য। কিন্তু এই বিপরীত সাক্ষ্য সত্ত্বেও, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক, উভয়ের দৃষ্টিতেই কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের ব্যবধান ঘুচে যেতে লাগলো দ্রুত, অপরিহার্যভাবে। উপন্যাসের মাধ্যমে এক ধরনের কবিতা রচনা করেছেন—এই ছিল ফ্লোবেয়ারের প্রতি 'শুধু শিল্পের' শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা মালার্মের অভিনন্দনবাণী।

প্রথম উৎসাহের প্রাবল্যে প্রতীকীবাদীরা লক্ষ্য করতে ভুলেছিলেন যে শুদ্ধতার জন্য শিল্পের নিরন্তর পরিশোধন শেষপর্যন্ত শিল্পের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে। জীবন ও বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে শিল্প কখনও বেঁচে থাকতে পারে না। এটি একটি সাহিত্যিক সম্ভাবনাই শুধু নয়। পুনর্বার কবিতা রচনায় প্রয়াসী হবার পূর্বে ভালেরি প্রায় কুড়ি বছর মৌন অবলম্বন করে ছিলেন; এবং যুবক র‍্যাঁবোর কাব্যদেবীকে পরিত্যাগ করে আফ্রিকার সংগ্রামময় জীবনে প্রস্থানের কাহিনী তো সুবিদিত। এই শতাব্দীর আর-একজন প্রতীকী কবি জীবনানন্দ দাশ উক্ত সম্ভাবনার আর-একটি ভীষণ পরিণতির কথা বলেছেন তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। বস্তুত, জীবন ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত আধুনিক প্রতীকীবাদীদের কাছে আত্মহত্যা একটি সহজ সমাধান।

টমাস মান, মার্সেল প্রুস ও জেমস্ জয়েস প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে গদ্যের রাজ্যে প্রথম সরকারীভাবে প্রতীকীবাদের সূত্রপাত করলেন। আজ পর্যন্ত সেই ঐতিহ্যের ধারা উপন্যাসের জগতে অব্যাহত। এবং যে-কোনো অমনোযোগী ও অনভিজ্ঞ পাঠকের চোখেও এই উপন্যাসগুলির সঙ্গে সমসাময়িক কবিতার আশ্চর্য আত্মীয়তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে লিখিত প্রতীকী উপন্যাসগুলির উপর বোধহয় *Ulysses, Remembrance of Things Past* এবং *The Magic Mountain*—এই তিনটির প্রভাব

সবচেয়ে বেশি; এবং এদের কেন্দ্র করে প্রতীকী উপন্যাসের যে বিপুল সম্ভার রচিত হয়েছে, তাদের যে-কোনো একটির নায়ক-চরিত্র অনুধাবনযোগ্য। এই ঔপন্যাসিকেরা যে 'নির্বিশেষ' নায়কের ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, তাকে জটিল ও আত্মবিভক্ত আধুনিক মানসের প্রতিভূ বলা চলতে পারে। এই নিঃসঙ্গ নাগরিকের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচিত করেছেন কবি এলিয়ট তাঁর 'প্রুফ্রক' কবিতায়। ছিন্নমূল ও নিঃসঙ্গ এই নায়ক, সমাজ ও জীবনের ভারে পীড়িত, ঐতিহ্য ও অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। এবং যেহেতু সে নিজেকে সমাজ ও জীবন থেকে নির্বাসিত বলে মনে করে, তাই তার একমাত্র আশ্রয় মনের গোপন, গভীর ও অন্ধকার প্রদেশে। মনে হয়, এ যুগের প্রতীকী কবি ও ঔপন্যাসিক, উভয়ই, সেই একই 'নষ্টনীড়' নায়কের যন্ত্রণার ভাষ্য রচনা করে চলেছেন ক্লান্তিহীনভাবে।[৩]

অবচেতনের উন্মোচন আধুনিক প্রতীকী উপন্যাসের প্রধানতম সচেতন লক্ষণ। যাকে ফ্রয়েড মনের 'চেতন স্তর' বলেছেন, তা যে আসলে অবচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এবং স্মৃতি ও স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষ যে আবার অবচেতনায় তলিয়ে যেতে পারে, সেই তথ্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ করলেন এই ঔপন্যাসিকেরা। অবশ্য ফ্রয়েডের পূর্বেই তাঁর বহু আবিষ্কারের বিষয়ে অবগত ছিলেন নীট্‌শে ও উলিয়ম জেমস্‌। মার্শেল প্রুস খুব সম্ভব ফ্রয়েড পড়বার আগেই তাঁর কাহিনীগুলিকে 'a sequence of novels of the unconscious' বলে বর্ণনা করেছিলেন। 'চৈতন্য-স্রোত' (stream of consciousness) ও স্বগতোক্তির অধিকতর সজ্ঞান প্রয়োগ করলেন ভার্জিনিয়া উলফ্‌ ও জেমস্‌ জয়েস; এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে উপন্যাসে কালের ধারণা আশ্চর্যভাবে পালটে গেল। বহির্বৈশ্বিক ও ঘটনাপরম্পরার যে কাল, তার বিপরীত প্রান্তে আর-একটি প্রাতিভাসিক সময় (inner time) আবিষ্কৃত হলো। এই কাল অন্তহীন এবং সর্বব্যাপী; কয়েক মুহূর্তের স্বপ্ন ও স্মৃতিচারণের মধ্যে এই কাল পরিব্যাপ্ত করে সমগ্র মানব-ইতিহাস। জয়েসের মহাকাব্যের বা শ্রীমতী উলফের "মিসেস ড্যালওয়ে" উপন্যাসের ঘটনাকাল মাত্র এক বা দুই দিন, অথচ তার মধ্যে ব্যাপ্ত অন্তহীন অভিজ্ঞতা। এই বিপুল ব্যাপ্তির সামনে এক হয়ে যায় অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এজরা পাউন্ডের 'ক্যানটোজ' এবং এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ডে'ও কাল ঘটনাপরম্পরার উপর নির্ভরশীল নয়, পরিব্যাপ্ত এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্বন্ধ। শিল্পজগতে সঙ্গীতই কালাশ্রয়ী, স্থানাশ্রয়ী নয়, সম্ভবত এই ধারণাতেই অগ্রজ প্রতীকীবাদীরা চিত্র ছেড়ে সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছিলেন। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যখন আধুনিক সমালোচকদের মুখে শুনি যে ইউলিসিস ও ওয়েস্ট ল্যান্ড উভয়ই 'সিম্ফনি'র সঙ্গে তুলনীয়।[৪]

[৩] মনের অতলে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে আধুনিক নায়ক অভিজ্ঞতার যে অন্তহীন ব্যাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়ালো যেখানে মুহূর্তের স্থিতি নেই। এই নিরন্তর 'বদলে যাওয়া' (flux) জন্ম দিল এমন এক ভয়ার্ত অনুভূতির যার নাম ঘূর্ণিনেশা। ভার্জিনিয়া উলফের একটি চরিত্র, ক্লারিসা, এই ঘূর্ণিনেশার কবলে পড়ে অনুভব করেছিল: that it is very very dangerous to live even one day. কিন্তু এই ঘূর্ণিনেশা বা নিরুদ্দেশ যাত্রার একমাত্র অর্থ গন্তব্যহীন গতি অথবা মনের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে শুধু নরকদর্শন নাও হতে পারে। জয়েসের ইউলিসিস প্রসঙ্গে ই. এম. ফরস্টার একটি গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন: [It] is an epic of grubbiness and disillusion... *a simplification of the human character in the interests of Hell.* (Italics mine)

[৪] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ—যাঁর সঙ্গীতবোধ ও প্রীতি আধুনিক প্রতীকীবাদীদের তুলনায় কিছু কম ছিল না—কিন্তু কখনই তাঁর উপন্যাসের শরীরে সঙ্গীতের রূপ আরোপ করবার চেষ্টা করেন নি। যিনি গানের ভিতর দিয়ে ভুবন দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁর উপন্যাসে কবিতা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শিল্প ও সঙ্গীতের সমীকরণের চেষ্টা নেই।

অবচেতন উন্মোচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঔপন্যাসিকেরা ব্যক্তি-অবচেতনার স্তর অতিক্রম করে ঐতিহ্যগত অবচেতনের (collective unconscious) সন্ধানে রত হলেন। বলা বাহুল্য এই পর্যায়ের অবিসংবাদী নায়ক সুইস মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক কার্ল ইউঙ; এবং তিনি যে জাতি-স্মৃতিলোকের (racial memory) আবিষ্কারকর্তা, সেখানে পুরাণ (myth) ও আদিমরূপকল্পের (archetypes) অধিবাস। জার্মান ও ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কাছে এই তথ্য অবিদিত ছিল না; এ'দের অনেকেই ব্যক্তিগত নব-পুরাণ সৃষ্টির কথা চিন্তা করেছিলেন। উলিয়ম ব্লেক, যিনি এক সময়ে ভেবেছিলেন : I must create a system or be enslaved by another men's, নিঃসন্দেহে ইয়েটসের পূর্বসূরী। কিন্তু যা ছিল কবিতার নিজস্ব সম্পত্তি এবং কবিদের নিশ্চিত অভ্যাস, প্রতীকী ঔপন্যাসিকেরা তাকেই ব্যবহার করলেন উপন্যাসে। জয়েসের "ইউলিসিস" ও "ফিনে গানস্ ওয়েক" এবং টমাস মানের "জোসেফ স্টোরি" এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

তৃতীয় পর্যায়ে রচিত হলো হালের অস্তিত্ববাদী উপন্যাস। এই বিপুলবিস্তৃত, বহুধা-বিভক্ত এবং জটিল বিশ্বলোকের কেন্দ্রে ঔপন্যাসিকেরা স্থাপন করলেন ব্যক্তিকে, এবং উভয়ের সম্পর্ক বিষয়ে যে টীকা রচনা করলেন জাঁ পল সার্ত্র, অ্যালবেয়ার কামু ও মাল্‌রো, তাতে প্রতীকীবাদের আর-একটি নতুন দিক উদ্ঘাটিত হলো। নায়কচরিত্রচিত্রণে বর্জিত হলো ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য; প্রতীক রূপান্তরিত হলো টাইপ বা মডেলে। জনৈক মার্কিন সমালোচক এই তথ্যটি পরিবেশন করতে গিয়ে বলেছেন যে প্রতীক উৎসারিত হয় মানুষের গভীর অন্তঃস্থল থেকে এবং প্রতীকের ব্যঞ্জনা অনিশ্চিত ও একান্তভাবে প্রতীকাশ্রয়ী। অথচ, . . . a type is a model, derived from above, from general categories, classifications, abstractions, which it incorporates, impersonates.[৭] অতএব উপন্যাস হয়ে উঠলো বিস্তৃত রূপক বা parable। কাফকার গল্প, বিশেষত নায়কচরিত্র নির্বস্তুক রূপক ছাড়া আর কি? প্রসঙ্গত হেমিংওয়ের 'বৃদ্ধ ও সমুদ্র'-র গল্পটিও উল্লেখ্য। একাধিক সমালোচক এটিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

অবশেষে ১৯৫৪ সালের ২৯শে আগস্ট লন্ডন "অবজারভার" পত্রিকায় সার হ্যারল্ড নিকলসন ঘোষণা করলেন যে উপন্যাসের মৃত্যু ঘটেছে।

৩

কিন্তু কি বলতে চেয়েছিলেন স্যার হ্যারল্ড? ঘটনাবহুল, প্লট-নির্ভর ভিক্টোরীয় উপন্যাসের মৃত্যু ঘটেছে, নাকি, আধুনিক উপন্যাস এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যেখানে কবিতা থেকে তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাচ্ছে না? আমাদের মনে হয় দ্বিতীয়টি, এবং এর পাশে যদি আর-একজন অতিখ্যাত আধুনিকের মন্তব্য উপস্থাপিত করা হয়, তবে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে টি. এস. এলিয়ট বলেছিলেন : I sometimes lean towards the view that creative advance in our age is in prose fiction. ভুললে চলবে না যে এই শতাব্দীতে কবিতার লুপ্ত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য যাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি, সেই এলিয়টের মুখ দিয়েই ঐ

[৭] The Transformation of Modern Fiction: Erich Kahler. *Campartive Literature*, Spring, 1955.

মন্তব্য নিঃসৃত হয়েছিল। বস্তুত কবিতার কাছ থেকে পাঠ নিয়েই এযুগের প্রতীকী উপন্যাসের যাত্রারম্ভ। অবশ্য প্রায় ১১০ বছর আগে বোদলেয়ার তাঁর 'তিয়োফিল গ্যোতিয়ে' নামক প্রবন্ধে la nouvelle poetique-এর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ নানাভাবে ফলপ্রসূ হতে দেখেছি আমরা গত পঞ্চাশ বছরের উপন্যাসে; এবং উপন্যাসতত্ত্ব ও সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি যে প্রতীকীবাদের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে হেনরী জেমসের সেই বহু-বিদিত সূত্রে : Don't state—render.

কিন্তু হেনরী জেমস একজন বিপজ্জনক সাক্ষী। বিপজ্জনক, কেননা তিনিই যদিও ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসকে প্রথম একটি সজ্ঞান ও স্বতন্ত্র শিল্পরূপের মর্যাদা দিয়েছিলেন, তবু তাঁর শেষ পর্যায়ের উপন্যাস ও উপন্যাসতত্ত্ব সংক্রান্ত একাধিক মন্তব্য পরবর্তী নব্য সমালোচকদের (New Critics) প্রতীকীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে পুষ্ট করেছিল। A novel is in its broadest definition a personal, direct impression of life— এই হল উপন্যাসের জেমসীয় ভাষ্য। ঐ একই পুস্তকে (*The Art of Fiction*) উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন : all one and continuous, like any other organism। উপন্যাস একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সংঘবদ্ধ ফর্ম—এই জেমসীয় সূত্রাবলীর পেছনে বলাই বাহুল্য দাঁড়িয়ে আছেন ফ্লোবেয়ার, যাঁকে জেমস 'ঔপন্যাসিকের ঔপন্যাসিক বলে মেনেছিলেন। কিন্তু উপন্যাস যেহেতু জেমসের চোখে অরগ্যানিক, তাই নৈর্ব্যক্তিকও। বস্তুত, উপন্যাসকেও নাটকের মতো, কিংবা হিউম, পাউন্ড ও এলিয়ট প্রচারিত কবিতার মতো নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে, উপন্যাস সম্পর্কে এইটাই জেমসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে উপন্যাসে দৃষ্টিকোণ বা point of view-এর প্রশ্ন। কি করে ঔপন্যাসিক আপন ব্যক্তিত্ব ও মতামত থেকে তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসকে পৃথক রাখতে পারেন? স্মর্তব্য যে ঐ একই প্রশ্ন পাউন্ড ও এলিয়টকে বিচলিত করেছিল, এবং কবিদের প্রতি এলিয়ট-প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের (escape from emotion...) কথা যদিও জেমস ও কনরাড জানতেন না, তবু মূলত একই উপায়ে তাঁরা ঐ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। উপন্যাসে ঘটনাবলী বর্ণিত হবে না, ঘটবে, কিংবা কনরাড যেমন বলেছিলেন : before all, to make you see—এই ছিল উপন্যাসে Point of View সম্পর্কে জেমস্ ও কনরাডের অভিমত।

স্পষ্টতই, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঔপন্যাসিক ও সমালোচকেরা উপন্যাসের শরীর, মাধ্যম অর্থাৎ ভাষাব্যবহার, নানাবিধ প্রকরণগত কলাকৌশল ও ফর্মের দিকে ঝুঁকলেন। কি বলা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো কি করে বলা হয়েছে। তাঁর শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে স্বয়ং জেমস ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তির উপর নানা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। জয়েসের কথা তো বলাই বাহুল্য। কোনো একটি পত্রে কনরাড বলেছিলেন যে একটি গল্প রচনার জন্য you must cultivate your poetic faculty...you must search the darkest corners of your heart...for the image; এবং অন্যত্র : I am but a novelist, I must speak in images। শ্রীমতী উলফ মনে করতেন যে প্লটের সাহায্যে জীবনের অনুকরণ ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। তিনি বরং চেতনার একটি জ্যোতিশ্চক্র তুলে ধরবেন পাঠকের সামনে। সন্দেহ নেই যে তথ্যভারাক্রান্ত, নীতিবোধপীড়িত বা অযত্নবর্ধিত ভিক্টোরীয় উপন্যাসের প্রতিষেধক হিসেবে উক্ত ধারণাগুলি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু অতি-স্বাস্থ্যও অস্বাস্থ্য। জনৈক লেখক জয়েস সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তাঁর উপন্যাস কোনো বিশেষ

কিছুর বিষয়ে রচিত নয়—ঐ বিশেষ কিছুই তাঁর উপন্যাস।[৮] প্রতীকী কবিতার একটি মূল প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এই উক্তিতে; কিন্তু উপন্যাস প্রসঙ্গে এর যাথার্থ্য মেনে নেওয়া বোধহয় জেমসের পক্ষেও কঠিন হতো।

আগেই বলা হয়েছে যে হেনরী জেমস একজন বিপজ্জনক সাক্ষী। প্লট সম্পর্কে যদিও তাঁর ধারণা ছিল অ্যারিস্‌টট্‌লীয়, তবু উপন্যাস প্রসঙ্গে তাঁর মোট বক্তব্যের সারাৎসার প্রতীকীবাদের নিকট আত্মীয়। *The Art of Fiction*-এর ভূমিকা রচয়িতা মরিস রবার্টস ও এই আত্মীয়তা লক্ষ্য করেছেন এবং জেমসের ফর্ম-প্রীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: ....implies an elaborate art, *often close to poetry,* the aim of which is the maximum of expression.

অ্যারিস্টটল প্লট বলতে বুঝতেন ঘটনাক্রম, এবং অ্যাকশান বিষয়ে তাঁর অভিমত পাওয়া যায় না যদিও, তবু প্লট তাঁর মতে অ্যাকশানের অনুকরণ মাত্র। ই. এম. ফরস্টার উপন্যাসের আখ্যানভাগকে বলেছেন প্লটের আধার। কিন্তু অ্যারিস্টটল, ফরস্টার, এমনকি জেমসও প্লট এবং অ্যাকশান বলতে যা বুঝতেন বা বোঝেন, আধুনিক সমালোচকেরা তা বোঝেন না। এঁদের মতে, কোনো ঘটনাহীন ভ্রমণ (প্রচলিত অর্থে নয় অবশ্যই, কল্পনায় বা স্বপ্নে) অথবা সমুদ্রযাত্রা,[৯] স্বপ্ন এবং পুরাণ (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ব্যক্তিগত)—এইগুলিই প্রধানত অ্যাকশান বলে বিবেচিত হতে পারে; এবং এদের প্রত্যেকটিই বিশুদ্ধ প্রতীক। "মবি ডিকে"র উপর রচিত ভাষ্যের পরিমাণ বিপুল এবং আমাদের বক্তব্যের একটি প্রমাণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কবিতায় আমরা ইতিপূর্বেই ঐ প্রতীকগুলির ব্যবহার হতে দেখেছি। র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী', ব্যোদলেয়ারের 'ভ্রমণ', বা ইয়েটস ও এলিয়টের পুরাণ ব্যবহারের প্রতীকময়তা তর্কাতীত। মনে হয়, কতগুলি প্রচলিত ও স্বাভাবিক কাব্যসংস্কারকে আধুনিক সমালোচকেরা প্রয়োগ করছেন উপন্যাসের মূল্যায়নে। এই উক্তির সমর্থনে আধুনিক নাট্যতত্ত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন উপন্যাস, তেমনি নাটকও, আধুনিক সমালোচকদের মতে কবিতাশ্রয়ী। এই প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়টের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। C: Do you mean that Shakespeare is a greater dramatist than Ibsen, not by being a greater dramatist, but by being a greater poet? B: That is precisely

---

[৮] ...his writing is not *about* something; it is *that something itself*: Samuel Becket.

[৯] কবি অডেন তাঁর ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে (*The Enchafed Flood*) সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রার রোমান্টিক প্রতীকময়তা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বস্তুত জল- ও স্থলপথে ভ্রমণ অথবা যাত্রা, সাহিত্যের একটি প্রাচীন রূপকল্প। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের যাত্রা-রূপকল্পে গন্তব্য ও নির্দেশের অভাব ছিল না। Pilgrim's Progress, দান্তের নরক, পার্গেতোরিও ও স্বর্গলোক ভ্রমণ এবং মহাভারতে বিজয়ী নায়কদের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা, এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রূপকথাগুলিতে রাজপুত্রের রাজকন্যার সন্ধানে যাত্রা, অথবা তৃতীয় পুত্রের তার অপর দুই অগ্রজের অসমাপ্তকর্মের সাফল্য সাধনে অভিযান নির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক। গন্তব্যহীন গতিলিপ্সা রোমান্টিকদের আবিষ্কার। পরবর্তী যুগের প্রতীকীবাদীরা এই নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে মৃত্যু-চেতনাকে এক করে দেখলেন। 'This country bores, O Death! let us sail' বলেছিলেন বোদ্‌লেয়ার। 'গন্তব্য নয়, গতি অর্থাৎ পলায়নটাই শেষ কথা', উক্ত পঙ্‌ক্তিটি সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ("আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" দ্রষ্টব্য)। টমাস মান ও ভার্জিনিয়া উলফে ভ্রমণের সঙ্গে সম্পৃক্ত মৃত্যু-চেতনার অভাব নেই (দ্রষ্টব্য: *Death in Venice* ও *To the Light House*)। কিন্তু, যাত্রা 'ঘরে ফেরার' জন্যও হতে পারে—যাকে অডেন বলেছেন আত্মোপলব্ধির অন্বেষণ ('The Quest, a Sonnet Sequence' কবিতাবলী দ্রষ্টব্য: 'All journeys die here' বলছেন অডেনের নায়ক তার কাঙ্ক্ষিত উদ্যানে পৌঁছবার পর)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্মর্তব্য, যদিও তিনি সর্বদা নির্বন্ধ নন।

what I mean....E (Archer) was wrong, as you said, in thinking that drama and poetry are two different things। সন্দেহ নেই এই প্রস্তাবে বিব্রত বোধ করতেন অ্যারিস্টটল, যাঁর ধ্রুপদী মানসতায় লিরিক ও নাটক ছিল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প-রূপ। আসলে আদর্শবাদী শিল্পের ধারণায় (idealistic concept of Art) উদ্বুদ্ধ হয়ে এলিয়ট কবিতাকে 'থিয়েটারের' আগে স্থাপন করেছেন। কিন্তু এই প্রতীকী মতবাদ—যা আদর্শবাদী শিল্পতত্ত্বের একটি অবশ্যম্ভাবী রূপ—শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদে পর্যবসিত হতে পারে; এবং এই আশঙ্কা থেকেই ফ্রানসিস ফারগুশানের *The Idea of a Theatre* বইটি রচিত। নাটকে প্লট ও অ্যাকশানের প্রাধান্যের কথা ঘোষণা করেছেন ফারগুশান, এবং এমন একটি নাটকীয় সূত্রের সন্ধানে তিনি রত যা নাটক ও কবিতাকে ভিন্ন করে রাখবে। প্রতীকী-বাদী সমালোচকদের মতো ফারগুশান নাটকে লিরিক গুণাবলী আরোপণে, অর্থাৎ নাটককে প্রধানত বাক্‌শিল্প বলতে রাজি নন। তাঁর ভাষায় : The analysis of the art of drama leads to the idea of a theatre which gives its sanction, and its actual time and place। ইনি অ্যারিস্টটলের 'ইমিটেশান থিয়োরির' পক্ষপাতী, কারণ, এই থিয়োরির সাহায্যে ব্যক্তিচেতনার বাইরে একটি বস্তুনিষ্ঠ অথচ জ্ঞেয় জগতের অস্তিত্ব ধারণা করা সম্ভব; এবং এই অর্থেই, ফারগুশানের মতে নাটক নৈর্ব্যক্তিক। লক্ষণীয়, এলিয়টের objective equivalent- এর চেয়ে ফারগুশানের নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণা ব্যাপকতর, কারণ, তিনি এলিয়ট ও তাঁর উত্তরসূরী প্রতীকীবাদীদের মতো নাটককে শুধু শিল্পীর চিত্তের নির্যাস বলে মনে করেন না। বস্তুত, এলিয়টের তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিকতাকে ফারগুশান মন্ময়তার নামান্তর বলে অভিহিত করেছেন : The phrase 'objective equivalent' seems to support Eliot's announced classicism. Yet it refers, not to the vision of the poet, but to the poem he is making; and it implies that it is only a feeling that the poet has to convey.

আদর্শবাদী সমালোচকদের প্রতীকী মতবাদ শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদে পর্যবসিত হতে পারে, ফারগুশানের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। প্রমাণ, নব্য-সমালোচকদের কাব্যতত্ত্ব। জন র‍্যানসম্, ক্লিয়েনথ ব্রুকস্, উলিয়াম এমপ্সান, ব্ল্যাকমুর—এঁরা সকলেই এলিয়ট ও ডাঃ রিচার্ডস্-এর উত্তরসূরী এবং এঁদের সকলেরই একটি করে বীজমন্ত্র রয়েছে, যার সাহায্যে এঁরা কবিতা তথা সাহিত্যের সমস্ত শিল্পরূপগুলির মূল্যায়ন করে থাকেন। র‍্যানসমের 'টেক্সচার,' ব্রুকসের 'প্যারাডক্স', এমপ্সানের অ্যামবিগুইটি এবং ব্ল্যাকমুরের 'জেসচার'—এই বীজমন্ত্রগুলি আধুনিক সমালোচনায় বহু প্রচলিত ও প্রচারিত। এঁদের সকলেরই লক্ষ্যবস্তু কবিতার মাধ্যম—বক্তব্য বা অন্য কোনো উপাদান নয়। বস্তুত এ যুগের সমালোচনা সাহিত্যের দুটি প্রধান বিশেষত্বের মধ্যে একটি হলো শিল্পকর্মের গঠন-শৈলী বিশ্লেষণ এবং অপরটি হলো মাধ্যম সম্পর্কে প্রায় অস্বাভাবিক আগ্রহ। এবং যেহেতু কবিতা, নাটক বা উপন্যাস—এদের সকলেরই মাধ্যম ভাষা, তাই নব্য-সমালোচকরা জাঁর থিয়োরিতে বিশ্বাস করেন না। চার্লস ফিডেলসান তাঁর "প্রতীকীবাদ ও মার্কিনী সাহিত্য" (*Symbolism and American Literature*) গ্রন্থে নব্য সমালোচকদের মূল বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন এইভাবে : To consider the literary work as a piece of language is to regard it as a symbol, autonomous in the sense that it is quite distinct both from personality of its author and from any world of pure objects,

and creative in the sense that it brings into existence its own meaning.

৪

অদ্বৈতবাদী নব্য-সমালোচকদের যদিও কাব্য ও উপন্যাসে ভেদজ্ঞান নেই, তবু উপন্যাসের সমালোচনায় কিন্তু তাঁরা কোনো নির্গুণ ও নিরপেক্ষ তত্ত্বের প্রয়োগ করেন না; কবিতার মানদণ্ডেই উপন্যাসের মূল্যায়ন করে থাকেন। কথাটি স্পষ্ট করে বলা দরকার। প্রতীকী কবিতায় অভ্যস্ত মন, রুচি ও প্রতীকী কবিতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিয়ে নব্য-সমালোচকরা উপন্যাস সমালোচনার নামে যে অভূতপূর্ব ধারণাগুলির জন্ম দিয়েছেন, সেগুলিকে এক ধরনের কুসংস্কার বলা চলতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো সর্বত্র প্রতীক অনুসন্ধান। প্রতীক অনুসন্ধানের এই উৎসাহ দেখে মনে হয় যে, কোনো যান্ত্রিক কাবালার পাঠোদ্ধারে রত হয়েছেন সমালোচকরা—যেন মুদ্রিত যে-কোনো শব্দই অধ্যাত্মের অর্থবহ। উপন্যাসের ভিতরে নয়, বাইরে, অন্য আর-একটি অর্থবহ উপন্যাসের অস্তিত্ব কল্পনা করে এঁরা অভিজ্ঞতার বাস্তবতা এড়াতে চাইছেন। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই উপন্যাসের একটি রক্ত-মাংসের শরীর রয়েছে। স্পর্শগ্রাহ্য স্থূলতা, পরিবেশ, চরিত্র ও অ্যাকশানের বস্তুনিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার যাথার্থ্য—এই সবই উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ। অস্তিত্বই উপন্যাসের আদি ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম এবং সমস্ত সাহিত্যিক জাঁরগুলির মধ্যে এইটিই যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল, তাই উপন্যাসের কায়াকে মায়া বলবার উপায় নেই। হেনরী জেমসও এ কথা জানতেন, এবং solidity of specifications-কে উপন্যাসের প্রধানতম গুণ বলে বর্ণনা করেছেন। কোনো আলোচ্য উপন্যাসের একাধিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু গল্পটিকে কতকগুলি সূক্ষ্ম ও অতিরিক্ত প্রতীকের আধার বলে মনে করার কি কারণ থাকতে পারে? প্লেটোর ভাবলোকের মতো উপন্যাস একটি অশরীরী ফর্ম মাত্র নয়। মার্কিন অধ্যাপক লাওনেল ট্রিলিং একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে তাঁর ছাত্ররা ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে টাকার উল্লেখকেও প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করবার কৌশল শিখে নিয়েছে। নব্য-সমালোচকদের প্রতীক-প্রীতিই এর জন্য দায়ী।

"মবি ডিকে"র কথা আগেই বলা হয়েছে। একাধিক সমালোচক এই ইঙ্গিতধর্মী উপন্যাসটিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাবতে কষ্ট হয় যে, তিমিমাছ, সমুদ্র এবং বর্ণিত সমুদ্রযাত্রা—এই তিনটি কিসের রূপক বা প্রতীক জানা মাত্রই বইটির প্রয়োজন আমাদের ফুরিয়ে যাবে। উপন্যাস যদি কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ও সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তার খোলস মাত্র হয়, তবে উপন্যাসের সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যার পার্থক্য কি? রূপক ব্যাখ্যার আগ্রহে নব্য-সমালোচকরা ভুলে যাচ্ছেন যে উক্তি ও উপলব্ধির মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তাঁরা রচনা করে চলেছেন তা প্রতীকীবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

নব্য-সমালোচকদের দ্বিতীয় কুসংস্কারটি ভাষাগত। জন র‍্যানসম এই ধারণার একজন প্রধান উদ্যোক্তা : fiction, in being literature, will have style as its essential activity। কিন্তু স্টাইল বলতে র‍্যানসম কবিতার ভাষা ব্যবহার বুঝে থাকেন, এবং তাঁর 'The Understanding of Fiction' প্রবন্ধ পাঠান্তে এ-বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ থাকে না যে তিনি প্রধানত কবিতার জন্য ব্যবহৃত কতকগুলি নির্দেশ উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান : a few passages. . .from reputable fictions, as an indi-

cation of the sort of fixed images or exempla, which I carry around with me, and from which I must start; they will not be poetry but they will be like fictional analogues of lyrical moments। অতঃপর তিনি জেন অস্টিন থেকে একটি অনুচ্ছেদ, হেনরী জেমস থেকে একটি অনুচ্ছেদ এবং টলস্টয়ের "ওয়ার অ্যান্ড পীস" থেকে মাত্র ষোলোটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। শেষপর্যন্ত তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটি এই যে "ওয়ার অ্যান্ড পীস"-এর লেখক does not possess the technical advantages of a style. For concentration he substitutes repetition. . . . ।

অনেকের কাছেই একটু অদ্ভুত ঠেকবে র‍্যানসমের সিদ্ধান্ত। যে ষোলোটি পঙ্‌ক্তির উপর নির্ভর করে র‍্যানসম উক্ত রায় দিয়েছেন, সেই পঙ্‌ক্তিগুলি কিন্তু অনুবাদ মাত্র। দুর্ভাগ্যবশত, জেন অস্টিন বা জেমসের মতো টলস্টয় ইংরেজিভাষী ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, একটি বার শো পৃষ্ঠার উপন্যাস থেকে মাত্র ষোলোটি পঙ্‌ক্তি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, তার সাহায্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে সুবিচার বলা চলে না নিশ্চয়ই। আর যদি মেনেও নেওয়া যায় যে টলস্টয়, হেনরী জেমস বা জেন অস্টিনের মতো কুশলী গদ্যলেখক ছিলেন না, তবু তাতে কি প্রমাণিত হয় যে ঔপন্যাসিক হিসেবে টলস্টয় অপর দুজনের চেয়ে নিম্ন স্তরের? প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, অ্যারিস্টটলের সাহিত্যবিচারে প্লটের স্থান প্রথম, এবং ভাষা বা diction-এর স্থান চতুর্থ। র‍্যানসম যেমন কবিতা থেকে উদ্ভূত তাঁর কয়েকটি ব্যক্তিগত ধারণার প্রয়োগ করেছেন উপন্যাসে, তেমনি কোনো সমালোচক যদি অ্যারিস্টটলের বিচার-পদ্ধতি এ-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তবে র‍্যানসমের সিদ্ধান্ত টিঁকবে কি?[১০]

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটি বাংলা রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বহু-বিতর্কিত ডাঃ জিভাগো প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে পত্রাকারে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে।[১১]

বুদ্ধদেব বসুর দীর্ঘপত্রে বোদ্‌লেয়ারের উল্লেখ নেই কোথাও। কিন্তু পত্রটি পাঠ করবার পর কোনো সন্দেহ থাকে না যে ঠিক যে-যে কারণে বুদ্ধদেব বোদ্‌লেয়ারকে 'কবিদের রাজা' বলে মনে করেন, ঠিক সেই কারণেই পাস্টেরনাক্‌, তাঁর মতে, 'একজন তুমুল ও তর্কাতীত' ঔপন্যাসিক। 'আত্মকেন্দ্রিক', 'চৈতন্যসাধক', 'আত্মবিভক্ত' ও 'জটিল'—প্রশংসার অর্থে এই বিশেষণগুলি জিভাগোর প্রতি প্রয়োগ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য যে তাঁর "বোদ্‌লেয়ারের কবিতা" নামক অনুবাদকর্মের ভূমিকারূপে লিখিত 'বোদ্‌লেয়ার ও আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব ঐ একই বিশেষণগুলি প্রয়োগ করেছেন বোদ্‌লেয়ারের প্রতিভা বিশ্লেষণে। উক্ত পত্রেই ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে পাস্টেরনাকের আত্মীয়তার সূত্রটি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। আবার অন্যত্র, একটি ইংরেজী প্রবন্ধে, তিনি বোদ্‌লেয়ার ও ডস্টয়েভস্কিকে 'যন্ত্রণার যমজ' বলে অভিহিত করেছিলেন। আসলে সাহিত্য বলতে বুদ্ধদেব যা বোঝেন তার প্রতিভূরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এই তিনজন শিল্পী: বোদ্‌লেয়ার, ডস্টয়েভস্কি,

---

[১০] বিশ্ববিদ্যালয় মহলে অত্যন্ত প্রভাবশালী সমালোচক ডাঃ এফ. আর. লিভিসের একটি উক্তি প্রসঙ্গত উদ্ধারযোগ্য: 'A Novel, like a poem, is made of words; there is nothing else one can point to.' (*Towards Standards of Criticism*, 1933) । কিন্তু এই পর্যন্তই তাঁর সঙ্গে প্রতীকীবাদীদের মিল। উপন্যাসের ক্ষেত্রে Dr. Leavis যে 'serious moral vision'-এর মানদণ্ড প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক, সেটি বোধহয় প্রতীকীবাদী নব্য-সমালোচকরা মেনে নেবেন না।

[১১] "সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ"—বুদ্ধদেব বসু।

এবং পাস্টেরনাক। কবি ও ঔপন্যাসিকের জাতিভেদ তাঁর কাছে অর্থহীন। ডাঃ জিভাগো সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মতামতের সারাংশ ঐ পত্রটির শেষের দিকে মাত্র দুটি লাইনে বলা হয়েছে : 'কবির লেখা একটি উপন্যাস, জিভাগো : এই হোলো ওর সবচেয়ে খাঁটি বর্ণনা; কবি, নিছক কবি, একান্তভাবে কবি—এই হলেন পাস্টেরনাক' কিন্তু পাস্টেরনাক কবি বলেই কি তাঁর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ?[১২]

৫

তবে কি উপন্যাসে প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ? বলা বাহুল্য এরকম কোনো কুসংস্কার থেকে আমার বক্তব্য পেশ করছি না। যদিও অত্যধিক প্রতীক-প্রীতির আবর্তে শিল্পকর্মের অস্তিত্ব শেষপর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে, তবু উপন্যাসে প্রতীক ব্যবহারের কোনো বাধা নেই। সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রতীকী উপন্যাস আগেও রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে।[১৩] কিন্তু যে ধারণার বিরোধিতা আমরা এই প্রবন্ধে করতে চেয়েছি সেটি এই যে, উপন্যাস কখনই প্রতীক-সর্বস্ব হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কোনো প্রতীকী উপন্যাস কয়েকটি বিমূর্ত চিন্তার খোলশ, কিংবা উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি কোনো গোপন ও প্রোথিত অর্থের চাবি-কাঠি —এ-ধরনের কোনো প্রস্তাবও মেনে নেওয়া কষ্টকর। উপন্যাস থেকে আলাদা করে প্রতীকের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বিস্তৃতি, জীবন-সান্নিধ্য ও বস্তুনিষ্ঠার জন্য কোনো উপন্যাসের পক্ষে একান্তভাবে প্রতীকী হওয়াও সম্ভব নয়। অর্থাৎ, উপন্যাসে প্রতীক ব্যবহার কোনো প্রক্ষিপ্ত বস্তু নয়; নিবিড়ভাবে সন্নিবদ্ধ, অন্যান্য আরো বহু উপাদানের মতো জীবন্ত একটি অঙ্গ। প্রতীকী কবিতায় অভ্যস্ত কোনো পাঠক যদি মনে করেন যে "মবি ডিক" উপন্যাসটির রহস্য ঐ উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রতীকগুলির যোগফল মাত্র, তবে তাঁকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে উপন্যাসটির একটি প্লট রয়েছে, এবং সেটি প্রতীকগুলির চেয়ে কোনো অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। অধুনালুপ্ত *Scrutiny* পত্রিকার একটি সংখ্যায় মার্টিন টার্নেল একবার মন্তব্য করেছিলেন : The use of symbols is simply one aspect of language; the mistake lies in trying to invest them with some sort of transcendental significance instead of regarding them as a technical device of the same order as simile or metaphor। অনেকের কাছেই বোধহয় এই মন্তব্য গ্রাহ্য হবে না; কিন্তু প্রতীক-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মার্টিন টার্নেলের বক্তব্য আজও উপেক্ষণীয় নয়।

প্রসঙ্গত আর একটি প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিকাগো বিশ্ব-

---

[১২] *The Russian Review* (July 1960) পত্রিকায় প্রকাশিত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের Boris Pasternak—An Indian Viewpoint প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। পাস্টেরনাকের কবিতাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য—উপন্যাস নয়। প্রবন্ধটিতে ঔপন্যাসিক পাস্টেরনাকের অনুপস্থিতি ইঙ্গিতময়।

[১৩] প্রতীকীবাদী ঔপন্যাসিকদের কলাকৌশলগুলি যতটা অভিনব বলে মনে হয়, সেগুলি সত্যই ততটা অভিনব ও স্বয়ম্ভু নয়। The history of these devices, and of their adumbrations in all modern literatures, only begins to be studied: the Shakespearean soliloquy is one ancestor; Sterne, applying Locke on the free association of ideas is another; the 'internal analysis', i.e. the summarizing by the author of a character's movement of thought and feeling, is a third. *The Nature and Modes of Narrative Fiction*: *Theory of Literature.* By René Wellek and Austin Warren.

বিদ্যালয়ের ছয় জন[১৪] অধ্যাপকের রচনায় এই প্রতিক্রিয়া সোচ্চার। প্রধানত নব্য-সমালোচকদের বিরুদ্ধেই এ'দের অভিযান, এবং এ'রা যে নতুন কাব্যতত্ত্বের কথা ঘোষণা করেছেন, তার জন্মদাতা স্বয়ং অ্যারিস্টটল। নব্য-সমালোচকদের প্রতীকীবাদী কাব্যতত্ত্ব যে আসলে অদ্বৈত-বাদী, শিকাগোর অধ্যাপকগোষ্ঠী তা লক্ষ্য করেছেন, এবং এরই প্রতিবাদে এ'রা শিল্পে বহুত্ববাদের প্রচারক। এ'দের একজন মুখপাত্র, নরম্যান ম্যাক্‌লীন বলেছিলেন যে বাক্‌শিল্প অথবা ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে আধুনিক কাব্যতত্ত্বে প্লট ও অ্যাকশানের গুরুত্ব কমে আসছে। বলা বাহুল্য, প্লটের প্রসঙ্গে তিনি অ্যারিস্টটলীয় সংজ্ঞায় বিশ্বাসী, এবং ফর্ম-সর্বস্ব কোনো শিল্পের ধারণাই হলো তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য।

বাক্‌শিল্প বা ভাষাই পরমার্থ—এটি প্রতীকীবাদীদের একটি মূল প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতীকীবাদীরা কল্পনা করে নিয়েছেন একটি স্বরচিত ও স্বপ্রতিষ্ঠ জগতের—এমন একটি জগৎ যার অবস্থান অভিজ্ঞতার সুদূর পারে এবং যেখানে শিল্পই একমাত্র সত্য। কলা-কৈবল্যবাদীরা যে জীবন-বিযুক্ত শিল্পের কথা ভেবেছিলেন, তার পরিণতি ঘটলো প্রতীকীবাদীদের রচনায়, সৃজনী সাহিত্যে ও সমালোচনায়। এই অভিনব শিল্প-ধারণার সারাংশ পাওয়া যাবে ই. এম. ফরস্টারের *Anonymity: An Enquiry* নামক পুস্তকে: We have entered a universe that only answers to its own laws, supports itself, internally coheres, and has a new standard of truth. Information is true if it is accurate. A poem is true if it hangs together. Information points to something else. A poem points to nothing but itself. . . A poem is absolute.

কিন্তু বাক্‌প্রতীক, তা সে যতই শুদ্ধ হোক, শেষপর্যন্ত অর্থবহ। কবিতাকে অর্থশূন্য করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন মালার্মে ও ভের্লেন; কিন্তু সফল হননি। কিসের থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রতীক—এই প্রশ্নটির একমাত্র উত্তর—আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ। শব্দের একটি প্রতিবেশিতার জগৎ আছে, এবং সেখানে সে মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে সম্পৃক্ত। 'শব্দ ব্যবহার তখনই সার্থক যখন তা একটি নিশ্চিত অর্থের বাহক' বলেছিলেন রুজমাঁ (Denis de Rougemont), 'এবং সেই নিশ্চিত অর্থের পিছনে রয়েছে আমাদের ঐতিহ্য, সমাজ, বিশ্বাস ও সংস্কার।' কবিতা যেহেতু সঙ্গীত নয়, শব্দের দ্বারা রচিত, তাই তাকে শেষপর্যন্ত জীবনাশ্রয়ী হতেই হবে। মালার্মেও এই তত্ত্ব বুঝেছিলেন। অর্থাৎ, প্রতীকীবাদীরা যাকে শিল্পের জগৎ বলছেন, তা আসলে অনুভূত জীবন ছাড়া অন্য কিছু নয়; এবং এই অর্থেই প্রত্যেক মহৎ শিল্প নৈতিক।

আর কবিতাতেই যদি প্রতীকীবাদীদের কাঙ্ক্ষিত শুদ্ধত্ব সম্ভব না হয়, তবে উপন্যাসে তা সুদূরপরাহত। অ-নৈতিক উপন্যাসের ধারণায় প্রতীকী ঔপন্যাসিকরাও স্বস্তি বোধ করবেন কিনা সন্দেহ। শোনা যায় প্যারিসের কোনো ভোজসভায় তাঁর এক বন্ধু যখন জয়েসকে নীতিহীনতার স্বাস্থ্য কামনা করে পান করতে অনুরোধ করেছিলেন, তখন জয়েস তাঁর সফেন পানপাত্র নামিয়ে রেখে বলেছিলেন : I will not drink to that.

এইবার আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যেতে পারে। কবিতার প্রভাবে আধুনিক

[১৪] ১৯৩০ ও ১৯৪০ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত এই ছয়জন অধ্যাপক হলেন : R. S. Crane, W. R. Keast, Norman Maclean, Richard McKeon, Elder Olson এবং Bernard Weinberg.

উপন্যাসের শিল্পরূপ বিপন্ন হচ্ছে—এই প্রস্তাব হয়তো অনেকের কাছেই সমস্যার অতি-সরলীকরণ বলে মনে হবে। কিন্তু গত দুই শতকের উপন্যাস ও সমালোচনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ভিন্নতর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ। এর একটি কারণ প্রতীকের প্রাদুর্ভাব এবং অপরটি ভাষার একটি বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধে অহেতুক সচেতনতা। যে প্রশ্নটির সম্মুখীন আমরা হয়েছি, সেটি হলো : উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দের স্বভাব ও উদ্দেশ্য কি কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অনুরূপ? অর্থাৎ কবিতার ভাষা ও উপন্যাসের ভাষা এক, না ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তবে উপন্যাসকে একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসেবে স্বীকার করতেই হবে; এবং এই স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। সন্দেহ নেই যে উপন্যাস ও কবিতা, দুইই শব্দের দ্বারা রচিত। কিন্তু কবিতায় ভাববিন্যাস (theme) ও রচনার (composition) মধ্যে যে সম্বন্ধ, উপন্যাসে সেই সম্বন্ধ গ্রাহ্য নয়। উপন্যাসের ভাষা আমাদের দৈনন্দিন বাক্‌ভঙ্গীর যত কাছে, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের চেষ্টা সত্ত্বেও কবিতা আজও তা হয়ে ওঠেনি। মনে হয়, উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দের কাছে যে সামাজিক দায়িত্ব প্রত্যাশিত, কবিতাকে হয়তো তা থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। নান্দনিক বিন্যাসই কবিতার লক্ষ্য, এবং এই কারণেই কবিতায় ভাষা, আত্মার বাহক নয়, আত্মাই।[১৫] কিন্তু যেহেতু উপন্যাসের একটি বক্তব্য রয়েছে, তাই ভাষা সেখানে উপলব্ধির বাহক মাত্র।

C. W. Lewis বলেছিলেন : A work of literary art can be considered in two lights. it both *means and is.* It is both Logos and Poiema. As Logos it tells a story. . .As Poiema. . .it is an objet d'art. . . .

কিন্তু নব্য-সমালোচকরা Logos-এর কথা ভুলে গিয়ে Poiema নিয়েই মেতে উঠেছেন। অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তবতার প্রতি এ'দের অনীহা দেখে সন্দেহ হয় যে প্রতীকীবাদের আড়ালে আধুনিক সমালোচকরা বোধহয় দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন। সে যাই হোক, Logos ও Poiema-র প্রয়োজনীয় ভেদ-রেখাটি ভুলে গেলে কিন্তু শিল্পরূপ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দিন দিন বেড়েই যাবে।[১৬]

[১৫] কিন্তু প্রতীকীবাদীদের এই সিদ্ধান্তটিও সকলে নীরবে মেনে নেন নি। শিকাগো অ্যারিস্টটলীয়দের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে; আরেকজন হলেন Yvor Winters, যাঁর মতে, প্রত্যেক কবিতার একটি বিশ্লেষণযোগ্য বক্তব্য থাকা উচিত। . . .a poem is first of all a statement in words.

[১৬] রোমান্টিসিজমের আধিক্য ঘটলে সাহিত্যে ও সভ্যতায় বর্ণসঙ্কর বা confusion-এর জন্ম হয়—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন T. E. Hulme বার্গস' ও রোমান্টিকতার প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও। (Irving Babbitt-এর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য)। অধুনা বিস্মৃত-প্রায় Wyndham Lewis-এর একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : [in philosophies like those of Bergson and Whitehead] you lose not only the clearness of outline. . .of the things you commonly apprehend; you lose also the clearness of outline of your own individuality which apprehends them. (*Time and Western Man*)। এই দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে, Lewis-এর মতে, আমাদের Time-mind-এর বদলে spatializing quality of the visual intelligence-এর সাধনা করতে হবে।

ঘর সংসার

মিহির মুখোপাধ্যায়

বাইরের বারান্দায় টিয়েপাখিটা আবার চেঁচাল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘুম ভাঙল সোমনাথের। বেশ বিরক্ত বোধ করল। এখন অনেক রাত। এই বৃষ্টির রাতেও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দেবে না হতভাগা। এই এক আপদ জুটিয়েছে সুপর্ণা।

মাস তিনেক আগে কিনেছে পাখিটাকে। প্রথমে খাঁচায় ছিল। কিছুদিন পরে পায়ে শেকল বেঁধে সুন্দর একটা দাঁড়ে ঝুলিয়েছে। ছোলা-ছাতু-কাঁচালঙ্কার খরচা বেড়েছে। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যখন-তখন ট্যা-ট্যা করে চেঁচাবে। সুপর্ণা যদিও চিনি-ভেজা গলায় পড়াবার চেষ্টা করে—ভক্তদাস, কৃষ্ণকথা কও—জবাবে পাখিটা শুধু ট্যা-ট্যা করে চেঁচায়। দু-পা আর ঠোঁট দিয়ে দাঁড়ের উপরে-নিচে ওঠানামা করে। হাসতে হাসতে অনেকবার বলেছে সোমনাথ,—তোমার ওই ভক্তদাস আর কৃষ্ণকথা কইবে না, মডার্ন পাখি, ওকে বরং হিন্দী সিনেমার গান শেখাও, তাড়াতাড়ি শিখবে। ঠাকুমা কিন্তু সুপর্ণার পক্ষে—না বৌমা, ওকে তুমি কৃষ্ণকথা বলাও, বল রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ, দূর মুখপুড়ি, ঠুকরে দিতে চায়—

মুখে আঁচল তুলে হাসি চেপেছে সুপর্ণা আর শব্দ করে হেসে উঠেছে সোমনাথ।

আজ একবছর এই শহরে বদলি হয়ে এসেছে সোমনাথ। সরকারি চাকরি। মাসখানেক পরে সুপর্ণা এসেছিল, সঙ্গে ঠাকুমা। নাত-বৌ তাঁর চোখের মণি। নতুন বউ একা-একা সংসার গোছাতে পারবে না। সেজন্য ঠাকুমা এসেছিলেন আর এই একবছরে টুকটাক করে সংসারের জন্য অনেক জিনিস গুছিয়েছে সুপর্ণা। রেডিও, সেলাইকল, সিলিং ফ্যান, স্টিলের আলমারি, আলনা, খাট, সোফাসেট, বুক-কেস। জানালায় জানালায় রঙীন পর্দা, বসবার ঘরে কার্পেট। এসবের কিছু কিছু বিয়ের সময় পেয়েছিল, কিছু কিছু এখানে এসে কিনেছে। ছোট-খাট একটা ফ্রিজ থাকলে ভাল হত। কিস্তিতে আজকাল কিনতে পাওয়া যায়। এই শহরে কিস্তিবন্দীর দোকানও আছে। কিন্তু আপত্তি করেছিল সোমনাথ—বদলির চাকরি, আবার হয়তো হুট করে কোথাও বদলি করে দেবে, তখন এত লটবহর নিয়ে যাওয়া, ফ্রিজ-ট্রিজ এখন বাদ দাও—

—আহা, তাহলে তো কোন কালেই কেনা হবে না, সুপর্ণার যুক্তি,—তোমার এই বদলির চাকরিই তো বরাবর থাকবে, তাহলে সুখ-সুবিধের জিনিস কিনব কি, তুমি রিটায়ার করলে পর, বুড়ো বয়সে—

—অনেক টাকার ব্যাপার, আর কটা দিন যাক—সোমনাথের কথায় তখনো আপত্তির সুর।

—ইস্, টাকা তোমার গায়ে লাগবে নাকি, সংসার খরচা থেকে বাঁচিয়ে অল্পে অল্পে শোধ করে দেব, আর একটা ফ্রিজ থাকলে কত সুবিধে ভাবো দিকি, মাছ-মাংস, শাক-সবজি সব টাটকা থাকে, রোজ রোজ বাজারে ছুটতে হয় না—

—রোজ তো রঘুয়া বাজার করে, তোমার ছুটতে হবে কেন?

—আহা, তোমার রঘুয়ার যা বাজার করার ছিরি—নাকমুখ কুঁচকে জবাব দিয়েছিল সুপর্ণা, মাসের মধ্যে আদ্দেক দিন পচামাছ আর পোকায় কাটা বেগুন নিয়ে আসে—

ঠাকুমাও সুপর্ণার কথায় সায় দেন—রঘুর আক্কেলের কথা আর বলিস না দাদুভাই,

অম্বুবাচীর দিন বললুম দেখেশুনে ক'টা ফল নিয়ে আয়। ভুতুড়িসার এক কাঁটাল নিয়ে এল, তুই কাজের মানুষ, বাইরে বাইরে ঘুরিস, তোকে আর বলিনি সে কথা, বৌমা জানে সেই কাঁটাল খেয়ে আমার কি অবস্থা—

সুপর্ণা আর সোমনাথ দুজনেই কোনরকমে হাসি চেপেছে। আড়ালে হাসাহাসি করেছে।

কলকাতার বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোনেরা রয়েছে।

সুপর্ণার বাপের বাড়িও সেখানে। আরেক পাড়ায়। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এই সুন্দর শহরে এক ছিমছাম সাজানো সংসারের আনন্দে মশগুল হয়ে আছে সুপর্ণা আর সোমনাথ। ছোটভাই দেবুও এসে সেই কথা বললো, তোমরা তো বেশ জমিয়ে আছ দেখছি, ও ঠাকুমা, তুমি যে আর কলকাতা ফেরার নামটি করো না, বাবা পাঠিয়ে দিলেন, তোমাকে নিয়ে যাব। কলেজের ছাত্র দেবনাথ। পুজোর ছুটিতে দাদা-বৌদির কাছে এসেছে।

মিটিমিটি হেসে জবাব দিয়েছিলেন ঠাকুমা—এখন যাই কি করে, তোর বৌদি'র শরীর খারাপ—

—কেন, কি হয়েছে বৌদির, দেবু অবাক, কই কিছু তো মনে হচ্ছে না, এখানে এসে দেখি আরো ভাল চেহারা হয়েছে—

লজ্জার হাসিমুখে ধমকে উঠেছে সুপর্ণা,—আপনি চুপ করুন তো ঠাকুমা, কাকে কি বলছেন,—এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে দেবনাথ। হাসি হাসি মুখে বলেছে,—ভালই তো, আমার সঙ্গে কলকাতা চলো বৌদি, সেখানে ভাল ডাক্তার, ভাল হাসপাতাল—

—থাক, তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না—

বাইরের বারান্দায় আবার চেঁচিয়ে উঠল পাখিটা। এবার উঠে বসল সুপর্ণা।

সন্ধ্যে থেকেই খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। এক-একবার মেঘের হুমকি। আবার বিশ্রীভাবে চেঁচাল পাখিটা। আবার—আবার।

সোমনাথের গায়ে হাত দিয়ে ডাকল সুপর্ণা,—ওগো ওঠো, উঠে দ্যাখো তো, অমন ডাকছে কেন পাখিটা—

—আমি পারবো না—সোমনাথের চোখে তখনো ঘুম। ঘুম-জড়ানো গলায় বললো—তুমি দেখে এসো—

হঠাৎ হাওয়ার ধাক্কায় বন্ধ জানালার ছিটকিনি খটখট করে উঠল।

বাইরে একটা অস্পষ্ট সোরগোল, একটু ক্রুদ্ধ গোঙানির শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল সুপর্ণার, সোমনাথের চিবুক ধরে বললো,—এই তুমি ওঠো, আমার ভয় করছে—

—ভয় কিসের, আমি তো জেগে আছি—এবার চোখ মেলে তাকাল সোমনাথ। অন্ধকার ঘর। পাশের ঘরে ঠাকুমা আর দেবু রয়েছে। বাইরের দিকে বসবার ঘরটা সোফাসেট, নিচু টেবিল, ফুলদানি আর কার্পেট দিয়ে সাজানো। সেখানে একটা বই-এর আলমারি। কাঁচের শো-কেসে শৌখিন পুতুল আর ঝিনুকের খেলনা। আরেক পাশে রেডিও আর রেকর্ড-প্লেয়ার। সে ঘরটায় রাত্রে কেউ থাকে না। সেদিকে যাবার দরজাটা ভেজানো। এ ঘর থেকে ঠাকুমার ঘরে যাবার একটা দরজা আছে বটে, কিন্তু সে দরজা জুড়ে মানুষ-প্রমাণ

আয়না-বসানো আলমারি। পেছনের বারান্দা দিয়ে ঠাকুমার ঘরে যেতে হয়। যেখানে দাঁড়ের সঙ্গে ঝোলানো রয়েছে পাখিটা। আবার চেঁচিয়ে উঠল। পাখার ঝাপটানিও যেন শোনা গেল। সোমনাথ বললো,—ভয় নেই, তুমি আগে বাতিটা জ্বালাও, তারপর আমি দেখছি—অগত্যা খাট থেকে নামল সুপর্ণা, আর এক পা নেমেই চেঁচিয়ে উঠল,—এ কি এত জল কেন, শিগগির টর্চটা জ্বালো—

ধড়মড় করে উঠে বসল সোমনাথ। শিয়রের কাছে তোশকের নিচে থেকে ছোট টর্চ-লাইটটা বার করল। আলোটা জ্বেলেই দেখল ঘরের মধ্যে জল। একরকম লাফিয়ে নামল সোমনাথ। পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে আর কি ঠাণ্ডা জল। পায়ে যেন ছোবল মারল। টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখল একবার। ওপাশে আলনাটার কাছে নর্দমার ফুটো গলে, দরজার নিচে চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে পিল পিল করে জল আসছে। ক্রমশ জল বাড়ছে।

আবছা আলোর বৃত্তের মধ্যে কেমন অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে সুপর্ণা। পিঠে একরাশ এলোচুল। গায়ে শুধু শাড়ির আঁচল। চোখে একটা ভীত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। প্রথমে সুইচ টিপল সোমনাথ। বাতি জ্বলল না। কারেন্ট নেই। ডানহাতে টর্চ জ্বালিয়ে রেখে বাঁহাতে খিলটা খুলে দিতেই জলের ধাক্কায় দরজা ফাঁক হয়ে গেল। কলকল করে জল ঢুকছে। উঠোন থই-থই। বারান্দা ভাসিয়ে জল আসছে ঘরে। দেখতে দেখতে গোড়ালি ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া।

ডানহাতে টর্চলাইট, বাঁহাতে সুপর্ণাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বারান্দায় এল সোমনাথ। আশপাশের পাড়া-পড়শীদের বাড়ি থেকে ডাকাডাকি চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রবল জলের স্রোত। স্রোতের শব্দ। দ্রুত জল বাড়ছিল। চীৎকার করে ডাকল সোমনাথ,—দেবু, এই দেবু, শিগগির বেরিয়ে আয়, আমরা ডুবে যাচ্ছি—

দেবু সাড়া দিল,—কি, কি হয়েছে—

—শিগগির বেরিয়ে আয়—

পরক্ষণেই দেবুর আর্তনাদ,—এ কি এত জল কেন, দরজা খুঁজে পাচ্ছি না দাদা—

ঠাকুমা'র এ ঘরটি আয়তনে একটু ছোট। দু'পাশে দুটো তক্তাপোশ। তক্তাপোশের নিচে বাক্স-পেঁটরা, তোরঙ্গ, বাসনপত্তর। সব জলে ভাসতে শুরু করেছে।

স্রোতের ধাক্কায় এধার-ওধার ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে ওই অন্ধকারে নতুন মানুষ দেবনাথের পক্ষে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুঁজে না পাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়।

প্রায় পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চেঁচিয়ে ডাকল সোমনাথ—এই, এদিকে, এদিকে চলে আয়—

পরক্ষণেই দরজা খুলতে পারল দেবনাথ। এবার ঠাকুমা হাউমাউ করে উঠলেন—ওরে সোমা, ও দেবু, কি হয়েছে ভাই—

—শিগগির বেরিয়ে এসো ঠাকুমা। টর্চের আলোটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিল সোমনাথ।

এদিকে জল বাড়ছে। গোড়ালি ছাপিয়ে প্রায় হাঁটু ছুঁই-ছুঁই। আর কী ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে যেন ঠাণ্ডা সাপের শরীর গায়ের চারপাশে কিলবিল করছে। তক্তাপোশের নিচে ঠাকুমার বড় পেতলের ঘটিটা জলে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে লোহার বালতির গায়ে ধাক্কা দিতে ঠুন-ঠুন শব্দ হচ্ছিল। দেবুর মাথার একটা বালিশ নিচে পড়ে ভাসতে শুরু করেছে। লোহার কড়াই, কয়েকটা কাঁসার বাটি, টিনের কৌটো, শিশি-বোতল, এদিক-ওদিক ভেসে যাচ্ছে, গড়াচ্ছে। দেবুর শৌখিন চপ্পলের একপাটি ভাসতে ভাসতে বারান্দায় চলে এল। এই সমস্ত

দৃশ্যটা কয়েক পলকমাত্র চোখে পড়ল সোমনাথের। ঠাকুমাকে একরকম পাঁজাকোলা করে তক্তাপোশের উপর থেকে বারান্দায় নিয়ে এল দেবনাথ। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো—এবার কোন দিকে যাবে দাদা, এখানে আর থাকা—

দেবুর কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড হুড়মুড় শব্দ শুনে উঠোনের দিকে তাকাল সবাই, টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ধরলো সোমনাথ। পাশের বাড়ির সুরেন ডাক্তারের রান্নাঘর ওদের উঠোনের দিকে ভেঙে পড়ছে। একেবারে পড়ে গেল না। উঠোনের সীমানার পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে রইল। ডাক্তারবাবুর ডাকাডাকি শোনা গেল—সোমনাথবাবু, ও সোমনাথবাবু, এদিকে আলোটা ধরুন—খিড়কির দরজার দিকে আলোটা ধরল সোমনাথ। দরজার ওখান থেকে ডাকছেন ডাক্তারবাবু। তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে এল সে। এককোমর জল। কোন-রকমে খিড়কির দরজাটা খুলে দিতে পারল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলের স্রোত বুকসমান হয়ে উঠল।

সেই একবুক জল ঠেলে প্রথমে ডাক্তারের দুই মেয়ে, তারপর ডাক্তার-গিন্নী এবং সবশেষে ছোট ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে সুরেন ডাক্তার নিজে এসে বারান্দায় উঠলেন।

সুরেন-ডাক্তার বললেন—কি সাংঘাতিক কাণ্ড, আর এখানে থাকা যাবে না, জল যেরকম বাড়ছে, চলুন ছাদের উপর উঠতে হবে—

কথাটা মিথ্যে নয়। এক মুহূর্ত ভেবে দেখল সোমনাথ। ঘুমভাঙার পর থেকে এ পর্যন্ত বোধহয় পুরো পনেরো মিনিটও হয়নি। এর মধ্যেই বারান্দায় কোমরজল।

আবার বললেন সুরেন-ডাক্তার,—আমরা চেষ্টা করেছিলুম হীরেনবাবুদের বাড়ির দিকে যেতে। ওদের বাড়িটা দোতলা। কিন্তু রাস্তা পেরোতে পারলুম না, একগলা জল, তার উপর এমন কারেন্ট, চলুন চলুন আর দেরি করবেন না, ছাদের সিঁড়িটা কোনদিকে—

এককোমর জল ভেঙে বারান্দার একপ্রান্তে ছাদে ওঠার সিঁড়ি ধরল সবাই।

প্রথমে সোমনাথ, ডানহাতে টর্চ, বাঁহাত সুপর্ণার পিঠের উপর জড়িয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে আলো ফেলে পথ দেখাচ্ছে। তারপর ঠাকুমার হাত ধরে দেবু। ওদের পেছনে পরপর ডাক্তারবাবুর দুই মেয়ে, ডাক্তার-গিন্নী, সকলের শেষে ছেলেকে কোলে নিয়ে সুরেন-ডাক্তার। চারপাশে জল আর অন্ধকার আর বাতাসের আর্তনাদ। সামনে শুধু আবছা আলোর মধ্যে অনিশ্চিত আশ্রয়ের আশ্বাস। সিঁড়িটার মাঝামাঝি এসে একটু যেন স্বস্তি পেল সোমনাথ। কয়েক ধাপ নিচেই রুদ্ধ জলস্রোত। ধাপে ধাপে উঠে এল সবাই। তারপর এক চিলতে চিলেকোঠার আশ্রয়। মাথার উপর দুর্বল টিনের ছাউনি। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। চারপাশে টর্চের আলোটা একবার ঘুরিয়ে দেখল সোমনাথ। জায়গাটা শুকনো বটে, কিন্তু টিনের ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। একপাশে দুটো ভাঙা ফুলের টব, এক বালতি মাটি, গাছে জল দেবার ঝাঁঝরি। ছাদের উপর ফুলের টবের বাগান করেছে সুপর্ণা। ছাদের দিকে যাবার দরজাটা বন্ধ। খোলার উপায় নেই। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, বৃষ্টির শব্দ। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপর্ণা। একেবারে চুপচাপ। কোন কথাই বলছে না, বলতে পারছে না। ভয়ে বিস্ময়ে কেমন বোবা হয়ে গেছে। পাশেই বসে পড়েছেন ঠাকুমা। তাঁর পাশে ডাক্তার-গিন্নী। আঁচল নিঙড়ে ছোট ছেলেটার মাথা মুছিয়ে দিচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর দুই মেয়ে। সতেরো-আঠারো বছরের পিঠোপিঠি দুইবোন। রেখা আর লেখা। ওপাশে ছাদের দিকে যাবার দরজা আগলে দেবনাথ আর ডাক্তারবাবু। হাওয়ার ধাক্কায় দরজাটা খটখট করছে। বাইরে

যেন একটা খ্যাপা জানোয়ার দরজা ভেঙে ভেতরে আসতে চাইছে। এক-একবার মনে হচ্ছে দরজাটা বুঝি আর বেশিক্ষণ ওই ভয়ঙ্করকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ঘুনঘুন করে কাঁদছেন ঠাকুমা। তাঁর কান্নার ভাষাটা ঠিক শোনা যাচ্ছে না।

অন্ধকারে সুরেন ডাক্তারের গলা শোনা গেল,—আমার আটচল্লিশ বছরের জীবনে এরকম ভীষণ কান্ড আর দেখিনি মশাই, ছোটবেলা থেকে এই শহরে আছি—, একটু দম নিয়ে আবার বললেন,—পুরো নদীটাই যেন শহরের উপর উঠে এসেছে, বোধহয় বাঁধ ভেঙে গেছে, নাকি কোর্স চেঞ্জ করেছে, অনেক সময় তো এরকম হয়। আপনি কি বলেন—

কি বলবে কিছু ভেবে পেল না সোমনাথ। কিছুই যেন ভাবতে পারছে না। মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা। বাঁধ ভেঙে গেছে কিংবা রাতারাতি গতিপথ বদল করেছে শহরের সীমানার নদীটা। অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সকাল না হলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। এখন এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু এখানে এই একফালি চিলেকোঠার মধ্যে আর কতক্ষণ টিকে থাকা যাবে কে জানে। ডাক্তারবাবুর এক মেয়ের গলা শোনা গেল। বোধহয় রেখা। কারণ ওদের মধ্যে কার নাম রেখা আর কোনটি লেখা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে সোমনাথ। এক-বছর পাশাপাশি থেকেও দুইবোনের নাম খেয়াল রাখতে পারে না। রেখা কিংবা লেখা বললো,—ভাগ্যিস মুরগীগুলি ডেকে উঠেছিল, না হলে যে কি হ'ত—

—ভগবান বাঁচিয়েছেন, মেয়ের মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বললেন সুরেন ডাক্তার,—ঘুমের মধ্যেই ডুবে যেতুম মশাই, মুরগীগুলোর ডাকাডাকি শুনে বাইরে এসে দেখি উঠোনে একহাঁটু জল, জলের টানে খাঁচার দরজা খুলে গেছে, মুরগীগুলো সব ঘরের বারান্দায় উঠে এসেছে, দেখতে দেখতে কোমরসমান জল দাঁড়িয়ে গেল, ঘরের মধ্যে আর থাকতে সাহস পেলুম না—

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ না হতেই বললো সুপর্ণা,—আমাদের পাখিটার কি হল, আমাদের টিয়েপাখিটা, আহা বেচারা বোধহয় সেই দাঁড়ের সঙ্গেই ঝুলে রয়েছে—

কোন কথা না বলে সিঁড়ির ধাপে আলো ফেলে পা বাড়াল সোমনাথ। সুপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—এ কি, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

—পাখিটিকে নিয়ে আসি—

—যাবেন না মশাই, যাবেন না, নিচে ভয়ানক জল বেড়েছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না, আপনি পাগল হলেন নাকি—সুরেন-ডাক্তারের কথা শুনে শান্তভাবে জবাব দিল সোমনাথ

—আমরাও ওই টিয়েপাখিটার ডাক শুনেই সজাগ হয়েছিলুম, ওকে না বাঁচালে মহা অধর্ম হবে—

দেবু এগিয়ে এসে বললো—আমিও নামছি দাদা—

—না, তুই এদের কাছে থাক—

একাই নামল সোমনাথ। আলো ফেলে দেখল বারান্দায় একবুক জল। ধনুকের মত বাঁকানো দাঁড়টার উপরের দিকে উঠে চুপচাপ বসে আছে পাখিটা। আশ্চর্য, আর একবারও বোধহয় ডাকেনি। অন্তত সোমনাথ শুনতে পায়নি। জলের মধ্যে নামল সোমনাথ। প্রবল স্রোত। টর্চটা মাথার উপর উঁচু করে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। পায়ের নীচে কিসব ঠেকছে। শিশি-বোতল, থালা-বাটি, তোশক-বালিশ, কাপড়-চাদর। ঘরের জিনিসপত্তর জলের টানে বারান্দার ভেসে এসেছে, এদিক-ওদিক ভেসে যাচ্ছে। দাঁড়ের নিচটা একহাতে ধরে

নামাতে চেষ্টা করল সোমনাথ। পাখিটা ট্যা-ট্যা করে চেঁচাতে লাগল। ডানা ঝাপটে ওড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু দাঁড়টা খুলে আনা যাচ্ছে না। সিলিংএর একটা হুকের সঙ্গে এমনভাবে আটকে আছে যে, একটু উঁচু না হলে খোলার উপায় নেই। সুপর্ণা একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে খুলে আনত, ঝুলিয়ে রাখত। টুলটা কাছাকাছি থাকার কথা। জলের নীচেই এদিক-ওদিক পা বাড়িয়ে টুলটা খুঁজল সোমনাথ। পেল না। এদিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জল বেড়ে যাচ্ছে। এখন প্রায় একগলা। আর কি অসম্ভব টান জলের। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। একহাতে টর্চলাইট আরেক হাতে দাঁড়টা ধরে আছে সোমনাথ। দুটো হাতই মাথার উপর উঁচু করা। এরপর আবার পাখিটা অবুঝের মত ডানা ঝাপটাচ্ছে, এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে। চোখেমুখে ডানার ঝাপটা লাগছে। এভাবে দাঁড়টা খুলে আনা যাবে না। অগত্যা পাখিটার পায়ের শেকল ছেঁড়ার চেষ্টা করলে সে। তাতেও সুবিধে হচ্ছে না। শেকলটা সরু হলেও বেশ মজবুত। একহাতে ছেড়া মুশকিল। ধরাই যাচ্ছে না ঠিকমত। পাখিটার ছটফটানির জন্য আরো অসুবিধে। জলস্রোত প্রায় চিবুক ছুঁয়ে যাচ্ছে। এবার সাঁতার কাটতে হবে। পায়ের নিচের আশ্রয় সরে গেলে স্রোতের টান উঠোনে নিয়ে ফেলবে। সেখানে অথৈ জল। যেন দম ফুরিয়ে আসছে সোমনাথের। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছে। ছোট টর্চবাতিটা আড়াআড়িভাবে মুখের মধ্যে কামড়ে ধরল সোমনাথ। এবার দুইহাতে শেকলটা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল।

আচমকা শেকলটা ছিড়ল বটে, সঙ্গে সঙ্গে টর্চটাও জলের মধ্যে হারিয়ে গেল। ডানহাতে শেকলটা ধরে, বাঁহাতে তাড়াতাড়ি টর্চটা ধরবার চেষ্টা করল। পারলো না। একটু এদিক-ওদিক পা ঘুরিয়ে দেখল। বৃথা চেষ্টা। এবার সাঁতার দিতে হচ্ছে সোমনাথকে। জল প্রায় মাথায় মাথায়। পায়ের নীচের শক্ত আশ্রয় হারিয়ে যাচ্ছে। একহাতে জল ঠেলে এগোনো অসম্ভব। ভয়ানক স্রোত তাকে বাইরের দিকে টেনে নিচ্ছে। উঠোনে অথৈ জল। আর নিদারুণ ঠাণ্ডার জন্য হাত-পা অসাড়। অসাড় মুঠোর মধ্যে শেকলটা আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। চারপাশে হিমস্রোত যেন সহস্র সাপের মত ফুঁসছে। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। আর পারছে না সোমনাথ। কিন্তু এই বারান্দার আশ্রয় ছেড়ে কিছুতেই বাইরে যাবে না সে। এই কুটিল হিংস্র জলরাশি যতই চেষ্টা করুক কিছুতেই তাকে নিয়ে যেতে পারবে না, হারিয়ে দিতে পারবে না। দেয়াল ধরে ধরে একরকম সাঁতার কেটে সিঁড়ির মুখের দরজাটার দিকে এগোতে লাগল সোমনাথ। একসময় আশঙ্কা হল, সিঁড়ির মুখের নীচু দরজাটা বোধহয় ডুবে গেছে। তাহলে ডুব দিয়ে ওপারে যেতে হবে। আর কতটা দূর। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। এই শঙ্কিত মুহূর্তে সামান্য অসতর্ক হয়েছিল সোমনাথ। আর সেই ফাঁকে শিথিল মুঠো থেকে শেকলের শেষ প্রান্তটা ছুটে গেল। প্রায় সারাক্ষণই মাথার উপর ট্যা-ট্যা করছিল পাখিটা। এখন অন্ধকারে কোনদিকে উড়ে গেল হদিশ পেল না। নিরুপায় সোমনাথ। এখন নিজের টিঁকে থাকাটাই প্রধান সমস্যা। এবার দুহাতে জল ঠেলে দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কিছুটা সহজভাবে দরজার কাছাকাছি আসতে পারল। জল প্রায় দরজার মাথা ছুঁয়েছে। সামান্য ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে যাবার সময় ঠুকে গেল কপালটা। দেবনাথের গলা শুনতে পেল—দাদা, দাদা,—

—এই যে আমি—

—এত দেরি কেন, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, টর্চটা জ্বালো—

—টর্চ নেই, জলে পড়ে গেছে—কোনরকমে জবাব দিল সোমনাথ। ধুঁকতে ধুঁকতে

হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল। কপালের কাছটা জ্বালা জরছে। বোধহয় কেটে গেছে। ভেজা কপাল গাল বেয়ে একটা উষ্ণ ধারা। জিভে, ঠোটে তপ্ত লবণাক্ত স্বাদ। হাত-পা অবশ, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। সোমনাথের শরীরে আর একফোঁটা জোর নেই।

—কই গো, কোথায় তুমি—, সুপর্ণার গলা। এই দমবন্ধ অন্ধকারের মধ্যে যেন খোলা হাওয়ার আশ্বাস নিয়ে এল। হাতড়ে হাতড়ে কাছে এসে সোমনাথকে বুকের মধ্যে টেনে নিল সুপর্ণা। তার ভেজা শরীরটা আঁকড়ে ধরে দম ফেলে বললো সোমনাথ,—পারলুম না পর্ণা, পাখিটাকে ধরে রাখতে পারলুম না, স্রোতের টানে কখন যে ছুটে গেল হাত থেকে, উঃ কি ভীষণ জল—

—কি আর করবে, তুমি তো চেষ্টা করেছ—সুপর্ণার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল সোমনাথ। কতক্ষণ ছিল খেয়াল নেই। একসময় বৃষ্টি ধরে গেল। অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। ছাদের দিকের দরজা খুলে প্রথমে বাইরে গেল দেবনাথ। তারপর সুপর্ণার হাত ধরে সোমনাথ। পেছনে সুরেনবাবু, রেখা আর লেখা। ডাক্তার-গিন্নী আর ঠাকুমা চিলেকোঠার অন্ধকারেই গুটিশুটি মেরে বসে রইলেন। ছোট ছেলেটি মায়ের কোলের কাছেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আবছা আলোয় এবার পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পেল সবাই। সুপর্ণার মাথায় একরাশ ভেজা চুল, গায়ে শুধু ভেজা শাড়ির আঁচল। রেখা-লেখার কাদামাখা বিনুনি, ছেঁড়া শাড়ি-ব্লাউজ, চোখে-মুখে অসহায় ভীত দৃষ্টি। দেবুর খালি গা, পরনে পায়জামা। সোমনাথের গায়ে গেঞ্জি-পায়জামা। ডাক্তারবাবুর শুধু লুঙ্গি, গায়ে কিছু নেই, হাতে মাদুলি। আশ্চর্য, চোখে নিকেলের চশমাটা যেন কি করে রয়ে গেছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল সোমনাথ, ভদ্রলোক অসম্ভব রোগা। রোগা আর লম্বা। কোট-প্যান্ট পরা সেই ডাক্তার-বাবুকে আর চেনাই যাচ্ছে না। বাইরের আবরণ ধুয়েমুছে ভেতরের আসল মানুষটি বেরিয়ে পড়েছে।

ছাদের কিনারা থেকে ডাকল দেবনাথ—দাদা, দেখে যাও—

কলের পুতুলের মত নির্বাক ক'টি মানুষ কার্নিশের কাছে এসে দাঁড়াল। কার্নিশের নিচেই জল। পুরো একতলাসমান প্রবল জলধারা।

আকাশ ফর্সা হয়ে এল। একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের রাত্রির পর দিশাহীন, ভরসাহীন অভিশপ্ত দিনের সূচনা। চারপাশে তাকিয়ে দেখল সোমনাথ। শুধু জল। যতদূর দৃষ্টি চলে ক্ষমাহীন ক্রুদ্ধ জলস্রোত। দূরে দূরে একটা-দুটো দোতলা বাড়ি, দু-একটা দোতলা টিনের ঘর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত কোনরকমে মাথা উঁচু করে আছে। সেখানে কিছু কিছু অসহায় নিরাশ্রয় মানুষ। কাছেই ডাক্তারবাবুর একতলা টিনের ঘর ডুবে আছে। চালের উপর কয়েকটি মুরগী। চারপাশে কচুরিপানা। রাস্তার ওপাশে রঘুয়াদের বস্তিটার কোন চিহ্ন নেই। সব ধুয়েমুছে গেছে। পথের পাশে একটা নিমগাছ। তার ডাল-পাতার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি মানুষ। হঠাৎ একটা বিকট হাসির শব্দ এল। বস্তীর পাগল হরিধন হাসছে। মাথায় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, একরাশ গোঁফ-দাড়ি, গায়ে তালিমারা একটা কোট আর হাফপ্যান্ট। পাকানো চেহারা হরি পাগলার এই মূর্তি অনেকবার রাস্তায় দেখেছে সুপর্ণা।

নিমগাছের উঁচু একটা ডালে বসে হাসছে হরি পাগলা। হাসছে আর চেঁচাচ্ছে,—এবার এলি মা, আয় মা, এলোকেশী সর্বনাশী, সব ভাসিয়ে দে মা, সব ভাসিয়ে দে—

শিউরে উঠল সুপর্ণা, বুকের মধ্যে যেন হিম হয়ে গেল।

—বাবা, কি অলুক্ষুণে কথা গো,—দুইহাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল সুপর্ণা।

—কে'দো না পর্ণা, মনে সাহস আনো—মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল সোমনাথ, —ওইদিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তোমার পাখিটা—

জলভরা চোখে মুখ তুলে তাকাল সুপর্ণা। চিলেকোঠার মাথায় টিনের কিনারায় কেমন জুবুথুবু হয়ে বসে আছে টিয়েপাখিটা। পায়ের সঙ্গে ছে'ড়া শেকলটা ঝুলছে।

সোমনাথ বললো,—ভয় কি, দ্যাখো, তোমার পাখিটা বে'চে গেছে, আমরাও বাঁচবো, আমাদেরও বাঁচতে হবে—

সবুজ রঙের পাখিটাকে যেন আশ্চর্য সুন্দর আর নতুন মনে হচ্ছিল।

ছাদের উপর সাজানো ফুলের টবে সুপর্ণার গোলাপগাছগুলি আগের মতই সতেজ আর অম্লান। আকাশের ওপারে তখন নিঃশব্দ বিষণ্ন সূর্যোদয়।

কৃষি অর্থনীতির নতুন দিগন্ত

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

সম্প্রতিকালে এদেশে কৃষিতে ধান, গম ইত্যাদির চাষে অধিক-ফলনশীল বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে, অনেকে নানা রকম আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। তাঁদের মূলকথা : উন্নত-মানের বীজ (তাইচুং, আই-আর-এইট ইত্যাদি) কৃষিতে প্রয়োগ করতে গেলে যতটা সম্পদ প্রয়োজন, একমাত্র বড়ো চাষীদেরই তা আছে, সুতরাং এইসব উন্নত-মানের বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে, ধনী চাষীরা আরো ধনী হবে, সাধারণ চাষীর কোনোই লাভ হবে না। সরকার এই জাতীয় চাষের প্রসারকল্পে যে সব সাহায্য সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুত একমাত্র ধনী চাষীরাই তাতে উপকৃত হতে পারে।

ভারতীয় কৃষিতে বিক্রেয় উদ্বৃত্ত সম্পর্কে কিছুটা অনুশীলন করার ফলে, উপরোক্ত যুক্তিগুলি আমার কাছে গ্রাহ্য মনে হয়নি। কারণ, জমিতে বিঘা বা একর-পিছু উৎপাদনের হার যদি কম থাকে (এবং বর্তমানে তাই আছে) তাহলে যাদের হাতে জমি বেশী, একমাত্র তাদের হাতেই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত শস্য জমা হয়। বিঘা-পিছু উৎপাদনের হার যদি কম হয়, তাহলে যাদের নিজস্ব জমি কম, সেইসব মাঝারি ও ছোট চাষীরা যা উৎপাদন করে তার সবটাই নিজেদের জন্য রাখে; বিক্রি করার মতো বাড়তি ফসল তাদের হাতে জমতে পারে না। বর্তমানে কৃষিতে বিক্রেয় উদ্বৃত্ত সম্পর্কে যে সব তথ্য-সমীক্ষা হয়েছে তার থেকেও এটুকু স্পষ্ট যে, বর্তমান অবস্থাতেই—যখন ভূমির উৎপাদন-মান কম, তখন অপেক্ষাকৃত বেশী জমির মালিক বড় চাষীর হাতেই বিক্রেয় উদ্বৃত্ত জমা হয়ে থাকে। এরাই বর্তমানে শস্যের বাজারের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বজায় রেখেছে। সুতরাং উৎপাদনের মান নীচু থাকার ফলে বড় চাষীর কোনো অসুবিধা হয়নি; বরং তার সুবিধাই হয়েছে। সে, (অর্থাৎ বড় চাষী) শস্যের বাজারে একচেটিয়া সরবরাহের সুযোগে উঠতি-দরের সবটা সুবিধা, একা (চাষীদের মধ্যে একা) ভোগ করতে পেরেছে। বস্তুত এই পরিস্থিতিতে অসুবিধে হয়েছে ছোট চাষীর। একদিকে বিঘা-পিছু উৎপাদনের হার কম, অন্যদিকে তার নিজস্ব জমির পরিমাণও কম। ফলে, উৎপন্ন ফসল তার খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। নিজের খেতের ফসলে তার গোটা বছর খেয়ে-পরে চলে না। মৌসুমের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি তাকে খাবার প্রয়োজনে শস্য কিনতে হয় এবং প্রায়ই নগদ দাম দিয়ে কেনার সামর্থ্য না থাকায়, বড় চাষীর কাছ থেকে অন্যায় শর্তে শস্যঋণ গ্রহণ করতে হয়। পশ্চিম বাঙলার গ্রামাঞ্চলে শস্যঋণের যে হার এখনও চালু তা আশ্চর্য। মৌসুমের মাঝামাঝি কোনো সময়ে একমণ ধান ঋণ নিলে ফসল ওঠার পরেই তার দেড়গুণ দিয়ে (অর্থাৎ দেড়মণ ধান দিয়ে) শস্যঋণ শোধ করতে হয়। এই প্রথাকে সাধারণত বাড়ি বলা হয়। এইভাবে উৎপাদনের হার কম থাকার ফলে ছোট চাষীরা বড় উৎপাদকের কাছে উত্তরোত্তর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন তাই সহজে বড় চাষীর আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। কৃষিতে উৎপাদনের নিম্নমান বড় চাষীরই স্বার্থের অনুকূল, কারণ এতে গোটা গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর তার আধিপত্য অটুট থাকে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের মান নিচু থাকার ফলে বড় চাষী অন্যভাবেও সুবিধা পেয়েছে।

গোড়াতে উৎপাদনের মান কম, তার ওপর কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধিহার পরিকল্পনাকালে জন-সংখ্যার বৃদ্ধিহারের মোটামুটি সমান হওয়ার ফলে, এ-দেশের কৃষিতে সরবরাহ বরাবর প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই কারণে, ভারতে কৃষির বাজারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই একটি স্থায়ী সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।[১] যে কোনো কারণে উৎপাদন অল্প হ্রাস পেলেও এই সংকট কী গভীর ও ব্যাপক আকার নেয়, গত দু-বছর খরার সময়ে আমরা তা দেখেছি। এই স্থায়ী সংকটের পরিস্থিতিতে বড় চাষী আরো কতকগুলি সুযোগ পেয়েছে। সংকটের সময় শস্য মজুত রেখে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার, কৃত্রিম উপায়ে সংকট তীব্র করার ও কৃষির পণ্যমূল্য ক্রমাগত ওপরের দিকে ঠেলে দেওয়ার সুযোগ সে পেয়েছে। যদি জমিতে উৎপাদনের মান আজ বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এবং শেষ পর্যন্ত বাজারে শস্যের সরবরাহও বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে বাজারের স্থায়ী সংকটও দূর হতে পারবে। মৌসুমের মোট চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে শস্য মজুত করে লাভ হতে পারে না—তখন সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বরং দর আরো নেমে যাওয়াতে সকলেই শস্য বিক্রয় করতে উৎসাহী হয়। এ বছর পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় আমরা তা দেখেছি। সুতরাং উৎপাদনের মান বৃদ্ধি পেলে বাজারে একশ্রেণীর উৎপাদকের একচেটিয়া আধিপত্য যে লোপ পাবে তা নিশ্চিত। কারণ এই আধিপত্যের মূলে রয়েছে মোট চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা, যা যোগানকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রিত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অনুমিত চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে, যোগানও বৃদ্ধি পাবে; ফলে, একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি :

(১) বর্তমানে জমিতে উৎপাদনের হার আরো বৃদ্ধি করা বড় চাষীর স্বার্থসম্মত ব্যাপার নয়। বর্তমান অবস্থায় যখন জমিতে উৎপাদনের হার কম, তখনই সে বিক্রেয় উদ্বৃত্ত শস্য সবটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ নেয়।

(২) বর্তমান অবস্থায় মাঝারি এবং ছোট চাষীই জমিতে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহী হতে পারে। কারণ তার উৎপাদনের হার ও জমির পরিমাণ দুই-ই কম বলে নিজের উৎপন্ন ফসলে তার সারা বছর চলে না। কেবলমাত্র খেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদেই তাই এই ধরনের চাষীকে শতকরা ৫০ ভাগ সুদ দেবার শর্ত মেনে নিয়ে শস্যঋণ গ্রহণ করতে হয়। সুদ দিতে হয় একসঙ্গে, এক কিস্তিতে। এইরকম অবস্থায় যদি ছোট চাষী অল্প জমির থেকে আরো বেশী ফসল তুলতে পারে তাহলে সে বেঁচে যায়। নিঃস্ব হবার শর্তে শস্যঋণ নেবার দায় থেকে সে মুক্তি পায়। তার হাতে কিছু বিক্রেয় উদ্বৃত্ত জমতে পারে এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে বড়ো একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

যুক্তির এই ধারা অনুসরণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অধিক-ফসলী ধানের চাষে সত্যকার স্বার্থ ছোট ও মাঝারি চাষীর। এই পরিকল্পনায় তাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী হওয়া সম্ভব এবং এই কাজে তারাই সবচেয়ে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে। অধিক-ফলনশীল ধান চাষের প্রসার তাই ধনী চাষীকে আরো ধনী করুক আর না-ই করুক, তার প্রভাবে মাঝারি ও ছোট চাষী নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে। ঋণভার

[১] এর সূচনা হয়েছে যুদ্ধপূর্ব কালেই। ত্রিশের দশকে ভারতের গম-রপ্তানি বন্ধ হয়ে আসে। বাঙলা চালের জন্য বর্মার ওপর নির্ভর করে। দ্রষ্টব্য : ফিসকাল কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫০, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

থেকে মুক্তি পেয়ে আর্থিক স্বাধীনতার সন্ধান পাবে।

কিন্তু যুক্তি যতই মনোগ্রাহী হোক না কেন, সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে তত্ত্বের যাথার্থ্য বিচারের একমাত্র ক্ষেত্র হলো বাস্তব জীবন। উৎপাদনে কোনো নতুন প্রয়োগ-পদ্ধতি বা আবিষ্কারের প্রবর্তন করার ফলে সমাজজীবনে ও কাঠামোয় কী কী পরিবর্তন আসতে পারে সে বিষয়ে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা সব সময়ে থেকে যায়। এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে তত্ত্বের পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কেও সব সময়ে সজাগ থাকতে হয়। অবশ্য ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে পড়ে, কিন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যাপারে বাস্তবের কষ্টিপাথরকে অস্বীকার করে সত্যসন্ধানের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বর্তমানে মার্কিন অনুপ্রেরণায় এ-দেশে যে তাত্ত্বিক অর্থনীতি ব্যবহারের চেষ্টা চলেছে, যাতে ভারতের বাস্তব অর্থনৈতিক কাঠামো ও জীবন-রূপকে অবহেলা করে অর্থনীতিবিদরা অনুমানের ভিত্তিতে কতকগুলি গাণিতিক মডেল তৈরি করে চলেছেন, তাতে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের যোগ-সংযোগের আবশ্যকতা পরিত্যক্ত হয়েছে। এ-জাতীয় মডেল বুদ্ধির খেলনা বা খাম-খেয়ালের প্রকারভেদ মাত্র। এ-সব করে ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা নিজেরা উপকৃত হলেও ভারতীয় অর্থনীতি উপকৃত হয়নি। এই কারণেই অধিক-ফসলী ধানচাষের ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে, অধিক-ফসলী ধানচাষের ব্যাপারে গ্রামদেশে সত্যি কী ঘটছে সেটা অবহিত হওয়া, এবং চাষের কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত আছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার বিষয় যথাসম্ভব পূর্ণত জানা প্রাথমিক কর্তব্য। বাস্তবের সঙ্গে স্ব স্ব ধারণার মিল আছে কিনা, সেটা যাচাই করা এবং অধিক-ফসলী ধানের চাষের সামাজিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী সেটা স্বচক্ষে দেখে বোঝা, এ বিষয়ে যাঁরা আগ্রহী তাদের পক্ষে প্রাথমিক দায়িত্ব।

২

এই কারণেই যখন সুযোগ এল তখন অন্যান্য নানা জায়গার মধ্যে গত ২৫শে জুলাই বীরভূমের রামপুরহাট ২ নম্বর-ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে চাষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যাই। গ্রামের নাম শ্রীকৃষ্ণপুর হলেও গ্রামটি মুসলিম-প্রধান। কথাটি উল্লেখ্য এই কারণে যে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে এক-একটি জাতি-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের আর্থিক জীবন এক-এক রকম। এক-একটি জাতিবর্ণ বা সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, এক-এক ধরনের বৃত্তি অনুসরণ করে চলে। ফলে কোনো গ্রামের সামাজিক পরিচয় থেকেই সংশ্লিষ্ট গ্রামের আর্থিক জীবনের একটা আভাস মেলে। বর্তমানে ভারতে যে মার্কিনী ধাঁচের শুদ্ধ অর্থনীতি প্রয়োগের চেষ্টা চলেছে, তার অন্যতম ফল হয়েছে এই যে, তথাকথিত অর্থনীতি-বিদ্‌গণ অনুমান আশ্রয় করে এ-দেশের জন্যে যেসব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন তা তাঁদের আনুমানিক জগতের পক্ষে যতই উপযোগী হোক, এ-দেশের বিচিত্র সামাজিক বিন্যাসের জন্যেই তার থেকে একাধিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে। আর এইসব সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের বিষয়ে পরিকল্পনার অনুমান-আশ্রয়ী প্রণেতারা আগাগোড়া অচেতন ছিলেন বলেই এসব দ্বন্দ্ব দেখা দেবার পর, তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের পরামর্শ-নির্ভর সরকার সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত বোধ করেছেন। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা—অর্থাৎ পুলিশ ও সৈন্য নিয়োগ—ছাড়া এইসব দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাঁরা কোনো নীতিগত ব্যবস্থার কথা ভেবে উঠতে পারেন নি। কিন্তু

গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান করতে গেলে সমাজহীন সমাজতন্ত্রীদের মতো কেবল অনুমান-আশ্রিত তত্ত্ব নিয়ে থাকলে চলে না, গোটা গ্রাম-জগতের সামাজিক ভূ-পরিচয় সর্বাগ্রে অবহিত হবার প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবাঙলার গ্রামে সাধারণত কয়েকটি হিন্দুবর্ণ ও মুসলমানরা নিজের জমি নিজে হাতে চাষ করে থাকেন। কোনো কোনো বর্ণসম্প্রদায় অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর নিজে-হাতে লাঙল ধরেন না, যদিও চাষই তাঁদের অর্থাগমের উৎস। এটা উল্লেখ্য যে, পশ্চিম বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে এই প্রবণতা অত্যন্ত কম। অর্থাগম সত্ত্বেও তাঁরা নিজে-হাতে চাষ করে যান এবং নিজের হাতে লাঙলের মুঠ ধরার বিষয়ে তাঁদের কোনো রকম দ্বিধা বা সংস্কার নেই।

শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামটি ছোট। প্রশ্নোত্তরে জানলাম, একশো ঘরের কিছু বেশী ঘর গ্রামে রয়েছে। তার মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫ ঘরের জমি নেই। এই ভূমিহীনরা মুখ্যত মাল বর্ণ-সম্প্রদায়ের মানুষ। যাঁদের নিজেদের জমি নেই, তাঁরা গ্রামের বাইরে জিনিস ফেরি করেন অথবা খাটতে যান। তাঁরা ভাগে জমিচাষ করেন না, কারণ ভাগে দেবার মতো অতো বেশী জমি এ-গ্রামে কারুর নেই। গ্রামটি মুখ্যত ছোট ও মাঝারি চাষীর গ্রাম। চাষীরা সকলেই নিজের জমি নিজের হাতে চাষ করেন আর তাঁদের স্ব স্ব জমির পরিমাণ তিন থেকে ত্রিশ বিঘের মধ্যে। অধিক-ফসলী বীজের প্রয়োগ ও তার ফলাফল সম্পর্কে বাস্তব তথ্যানুসন্ধানের জন্যে এই গ্রামটি বিশেষ উপযোগী মনে হয়েছিল।

অধিক-ফসলী ধান বলতে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে মুখ্যত আই-আর-এইট ও কিছুটা তাইচুং বীজ প্রবর্তিত হয়েছে। কথা হচ্ছিল একজন গ্রামীণ মাতব্বরের দাওয়ায়।

কথাটা উঠল যে, গতবারের চেয়ে এবারে অধিক-ফসলী ধানের চাষ বেশী হচ্ছে কি না। একজন মাতব্বর চাষী ও একজন কলেজের ছাত্র পরপর এগিয়ে এসে জবাব দিলেন যে, গত সালে যতটা জমিতে এ-ধরনের চাষ হয়েছিল এবারে তার ডবল জমিতে তো এ-চাষ হবে! শুধু তাই নয়, কথায়-বার্তায় আরো একটা জিনিস জানতে পারলাম। সাধারণভাবে যার জমি যতো কম সে সেই অনুপাতে নিজের জমির বেশীটা অংশ অধিক-ফসলী ধানের চাষে লাগিয়েছে। যাঁরা এ-বছর আদৌ এ-ধরনের ধানচাষ করেননি, তাঁদের অধিক-ফসলী ধান চাষে যুক্ত না হওয়ার কারণ মুখ্যত প্রাকৃতিক। কারুর কারুর জমি হয়তো এত নিচু যে, তাতে মৌসুমের অনেকটা সময়ে জল দাঁড়িয়ে থাকে, আর এইভাবে জমিতে জল বেশী দিন দাঁড়িয়ে থাকলে, তাতে অধিক-ফসলী ধানের চাষ করা যায় না। এই সব কারণে কেউ কেউ অধিক-ফসলী ধান চাষে যোগ দেননি—নচেৎ যাঁরা পেরেছেন তাঁরা সবাই এতে যোগ দিয়েছেন।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, সাধারণভাবে, যার জমি যতো কম, সে সেই অনুপাতে নিজের জমির বেশী অংশে অধিক-ফসলী ধানের চাষ করেছে। এর কারণও চাষীদের কাছ থেকে জানতে পারলাম।

প্রশ্ন করেছিলাম যে, এই-জাতীয় ধানের চাষ কারা বেশী করছে বা করতে পারছে? যাদের হাতে বেশী জমি আছে, তারা? এতে কি তাদেরই সুবিধে বেশী?

উত্তরে একজন প্রবীণ চাষী স্পষ্ট বললেন, 'এ-চাষ ধনী চাষীরাই করে না। মধ্যবিত্তরা করে।' তারপর ব্যাপারটা যেন আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—এইভাবে, ভেঙে বললেন, 'আমার যদি পঞ্চাশ বিঘা থাকে তো আমি ভাবব—থাক, যা পাই। আমার অত হাঙ্গামায় কাজ নাই।' ঠিক এই সময়ে মাত্র পাঁচ বিঘের মালিক একজন গরিব চাষী এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার জমি কম। আমায় এর মধ্যে সংসার চালাতে হবে। এতে আমার কম জমি থেকেই সংসার

চলবে। বাবুরা (ব্লকের বাবুরা) বলুক আর না-ই বলুক এই ধানের চাষ আমি করব-ই।' কলেজের ছাত্রটি তখন আমাকে অধিক-ফসলী ধানের আর-একটা বড়ো সুবিধের কথা বললেন। এই ধরনের ধান চাষে প্রথাগত ধানের চেয়ে সময় অনেক কম লাগে—পাঁচ মাসের জায়গায় তিন মাস (তাইচুং) থেকে সাড়ে তিনমাসে (আই-আর-এইট) ফলে। এই ধরনের ধানের চাষ করলে যে কোনো চাষী, যদি জল পায়, তাহলে একবছরে একই জমি থেকে তিনটে ফসল পেতে পারে, অন্তত দুটো তো পাবেই! এই কারণে এই ধরনের নতুন ধান চাষে ছোট চাষীদের আরো বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু নতুন ধরনের ধান চাষে বড় চাষীদের আগ্রহ কম কেন? অন্তত এ-চাষ করলেও তারা বেশী জমিতে এইসব ধানের চাষ কেন করে না? ঐদিনই এর উত্তর পেয়েছি জনৈক অভিজ্ঞ কর্মীর কথা থেকে। আমার প্রশ্নের উত্তরে নানা কথার মধ্যে তিনি বললেন, 'দেখুন, অধিক-ফসলী ধান করতে গেলে অনেক যত্ন-পরিচর্যা লাগে। ত্রিশ বিঘের বেশী জমিতে ফসলী ধান চাষ করতে গেলে কারখানার আকারে চাষ করতে হয়। তা করার মতো সংস্থান এই বড় চাষীদেরও নেই।' সংক্ষেপে, বেশী জমিতে অধিক-ফলনশীল ধানের চাষ করতে হলে যতটা পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়, ততটা পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতা আমাদের তথা-কথিত বড় চাষীর নেই। আমাদের বড় চাষী ততটা বড় নয়। এই ধরনের ক্ষমতা আধুনিক প্রথায় সংগঠিত কো-অপারেটিভ বা বড় ফার্মের থাকা সম্ভব। এই ধরনের ফার্মের বিকাশও আমি বীরভূমে—সাঁইথিয়া ব্লকে—প্রত্যক্ষ করেছি এবং ময়ূরেশ্বর দু-নম্বর ব্লকেও এর বিকাশ হয়েছে বলে জানি।

বড় চাষীর পক্ষে বেশী পরিমাণে অধিক-ফসলী ধান চাষ করার পথে আর-একটি বাধা তার আদিম উৎপাদনপদ্ধতি। এই উৎপাদনপদ্ধতি এমন-ই যে, এতে প্রতি বিঘায় চাষে নিযুক্ত চাষীর সংখ্যা অনেক। অধিক-ফসলী ধান চাষে যত্ন-পরিচর্যা অধিক বলে এতে প্রথাগত চাষের চেয়েও লোক আরো অনেক বেশী লাগে। ফলে, একই সময়ে একসঙ্গে অনেক জমিতে এই ধানের চাষ করতে গেলে, চাষের সময় গ্রামে উপযুক্ত-সংখ্যক চাষী মেলে না, বা, তার জন্যে এত বেশী খরচ পড়ে যে, তা অর্থকরী হয় না। এই জন্যে এই চাষে এখনও পর্যন্ত তাদেরই সুবিধা যাদের জমি পনেরো থেকে বিশ বিঘে, এবং দিনমজুরের জন্যে যাদের বাইরের দিকে তাকাতে হয় না। অর্থাৎ যাদের ঘরে যথেষ্ট পুত্রসন্তান আছে—ঘরের লোক দিয়েই যারা ঘরের চাষ তুলতে পারে ও তুলে থাকে। এটা আমার নিজের আবিষ্কার নয়। কথাপ্রসঙ্গে একথা আমায় বলেছিলেন বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার বড়াম্ গ্রামে জনৈক কৃষক।

অধিক-ফসলী ধান-চাষে সবচেয়ে বেশী বাধা আসছে যাঁরা জমি ভাগে দেন সেই সব বাবুদের কাছ থেকে। এঁরা অনেকে শহরে থাকেন, নানাবিধ ইজ্ম্-এর চর্চা করে থাকেন, কিন্তু ভাগের ব্যাপারটা ভোলেন না। এঁরা এতে বাধা দিয়ে চলেছেন, কারণ এই ধান চাষ করতে গেলে নিজেকে মাঠে থাকতে হয়, উৎপাদনের কাজ সংগঠন ও পরিচালনা করতে হয়। তা করার ক্ষমতা এঁদের নেই। সুতরাং কায়েমী স্বার্থের স্বাভাবিক নিয়মে এঁরা পুরনো উৎপাদন-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চাইছেন ও নতুন উৎপাদন-রীতিকে বাধা দিয়ে চলেছেন। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের চাষ করতে গেলে চাষে কিছু-না-কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়, এবং বাবুরা তা করবেন না। তাঁরা ঘরে বসে বাড়তি-ফসল ভোগ করতে চান। তাই চাষীদের মধ্যে যাতে সত্যিই একটা পরিবর্তন আসছে এমন একটা ব্যাপারকে বাধা না দিয়ে তাঁরা

কী করেন! তৃতীয়ত বাবুরা দেখছেন যে, এই ধানচাষ প্রবর্তিত হবার ফলে সর্বত্র সাধারণ চাষীদের মধ্যে অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছে এবং বর্তমানে সবচেয়ে বঞ্চিত বোধ করছে ভাগ-চাষীরা। ইচ্ছে থাকলেও এ-চাষ করার উপায় তাদের নেই—নেই জমি, প্রাথমিক পুঁজি বা ঋণ নেবার ক্ষমতা। তা ছাড়া, এর আনুষঙ্গিক উৎপাদনব্যয় মেটাবার সঙ্গতি তাদের নেই। তারা তাই ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই কারণেই বাবুরা উঠে-পড়ে প্রচার শুরু করেছেন যে, এটা বাজে, এতে কোনোই লাভ হয় না, ইত্যাদি। কিন্তু চাষীরা আর কিছু না বুঝুক, কত ধানে কত চাল তা ঠিক-ই বোঝে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অধিক-ফসলী ধানচাষ দু-এক বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ভাগচাষীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে ভাগচাষ প্রথাকেও বিপন্ন করে তুলবে। অধিক-ফসলী ধানচাষের সেটা একটি বিশেষ মূল্যবান দান হবে।

আধুনিক সাহিত্য

লেখক বা দার্শনিককে, বিশেষত আধুনিককালে, তাঁর দায়িত্ব-গভীর মনন-কর্মের জগতে কোনো না কোনো সময়ে, অথবা ব্যাপকভাবে বলতে গেলে সততই ব্যক্তির বিবিক্ততার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সম্বন্ধ-শূন্যতার প্রতিক্রিয়া ও সম্বন্ধ-পাতের প্রয়াসী যন্ত্রণা, অথবা, দার্শনিক অর্থে বিবিক্ততা ও বিবিক্ততা অতিক্রমণের প্রয়াস একমাত্র মানবচেতনারই অভিজ্ঞান। এই অভিজ্ঞান হারিয়ে ফেললে মানুষের ভবিষ্যৎ দুই আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হতে পারে। (এক) সে চলে যেতে পারে যূথচারী পিপীলিকাশ্রেণীর নৈরাত্ম্য উৎকর্ষে; (দুই) অথবা সে ডুবে যেতো একান্ত প্রাতিস্বিকতার অভবিষ্য অন্ধকারে। কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকার এক্ষেত্রে মানবাত্মার প্রতিভূ হিসাবেই ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তিকে প্রগাঢ় করে তোলেন। এবং সেখানে দাঁড়িয়েই অকৃত্রিম সত্তার সম্বন্ধ নির্ণয়ের অন্বেষাকে তীব্র করে তোলেন। সাধারণত যে শূন্যতা এবং অসম্পৃক্ততা অনির্ণেয় এবং অব্যাখ্যেয়, যা মূলত বোধ্য হলেও, সূক্ষ্মত অসংজ্ঞেয় তা আধুনিককালের জটিল চারিত্রেরই অঙ্গ। সেদিক থেকে দেখলে একথা মানতেই হয় যে বিবিক্ততার সঙ্গে অন্বিত প্রধান দর্শনটি মূলত সংকটের দর্শন। আধুনিক টেকনোলজির কীর্তিচূড়ায় পেঁৗছে এ মানুষ যেদিন বুঝেছে যে তার প্রভুত্ব দাসত্বেরই নামান্তর, যেদিন জেনেছে যে তার শব্দসমষ্টি, কলকব্জা, যন্ত্রপাতির মধ্যে মানুষের প্রভুত্বনিরপেক্ষ হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, সেদিন থেকেই বিবিক্ততার সমস্যা সচেতন মানুষের কাছে প্রধান বলে অনুভূত হয়েছে। সে কারণেই এ সমস্যা আধুনিককালের কবি নাট্যকার গাল্পিক ও ঔপন্যাসিকেরই বিশিষ্ট সমস্যা।

এই অসম্পৃক্ততা বা বিবিক্ততা এবং বিমুখতা বা বিরক্তি একার্থক নয়। বিমুখতা বা সংসার-বিরক্তি সকল সময়েই সকারণ, আর বিবিক্ততা ব্যক্তির প্রাতিস্বিক চেতনায় অনির্ণেয় স্বয়ম্ভূ হয়েও দেখা দিতে পারে। কর্মাটাঁড়-প্রবাসী বিদ্যাসাগরের পত্রাবলীতে যে সংসার-বিমুখতার ছায়া পড়েছিল তার মূলে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তাঁর পরিবেশের অনড় সীমাবন্ধতা সম্বন্ধে চেতনা। তাঁর ক্ষেত্রে এটা এম্‌পিরিক্যাল স্তরেই থেকে গিয়েছিল। বিবিক্ততা বিমুখতার থেকে গভীর, ব্যাপক ও গাঢ়। কীর্তি বা সফলতার প্রান্তে গিয়েও একথা মনে হতে পারে কেমন করে যেন আপনার চারিপাশের সঙ্গে এক অনপনেয় অনন্বয় সাধিত হয়ে গেছে। একালের লেখক হয়তো কুরুক্ষেত্রে লব্ধকীর্তি পাণ্ডবদের অশ্বমেধ-পর্বকে পরোক্ষে সেই বিবিক্ততা পূরণের চেষ্টা বলেই মনে করবেন; মহাপ্রস্থানের পথ সেই তুষারাস্তীর্ণ বিবিক্ততারই প্রত্যক্ষ অঙ্গীকার।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বিবিক্ততাবোধের এই সাম্প্রতিক প্রাধান্যের একটা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবনীয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় মধ্যবিত্তের অন্তর-বাহিরের সমস্ত জটিলতা, সমস্ত সংকট তাকে অবশ্যই আত্মাভিনিবিষ্ট করে তুলেছিল। স্বাধীনতা পাওয়া গেল, মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক ভূমিকা যথাযথ পালিত হল, তবু দেখা যায় অচরিতার্থতা বেড়েছে বই কমেনি। রুশ জার্মান এবং ফরাসী সাহিত্যেও দেখা যায় যে ঠিক সেই অধ্যায়েই বিবিক্ততার প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে যে অধ্যায়ে মধ্যবিত্ত তার প্রতিষ্ঠার মধ্যস্থিত

শূন্যতাকে অনুভব করেছে। এ শূন্যতাকে আবিষ্কার করতে করতেই সচেতন মানুষ নিজের মৌল সত্তাকে উপলব্ধি করে—এবং তখনই যাকিছু তার ঐ মৌল সত্তাকে আবদ্ধ করতে চায় তার সঙ্গে সে মানুষ নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করতে চায়। এ বিবিক্ততা তাকে বিদ্রোহের পথেও নিয়ে যেতে পারে। ফরাসী অস্তিত্ববাদী লেখকদের প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদানের কারণ এইখানেই অনুসন্ধেয়। নাৎসী সর্বগ্রাসকে ব্যক্তির মৌল সত্তার শত্রুরূপেই তাঁরা গণনা করেছিলেন। তাই প্রতিরোধ।

এদেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাংলা উপন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ নায়ক চতুরঙ্গের শচীশ মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বর্ণযুগের পরবর্তীকালের নায়ক-পরিকল্পনার অন্যতম প্রতিভূ। সামাজিক বিধিবিধান, ধর্মীয় আচার, গার্হস্থ্য বন্ধন, সকল pressure group-এর হাত থেকে নিজের মুক্তিসাধনই ছিল শচীশের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের পথেই শচীশ শেষ পর্যন্ত পরম বাস্তবতার সম্মুখীন হতে চেয়েছে। শচীশের আচরণের লৌকিক অর্থ শ্রীবিলাসের কাছে ছিল দুরধিগম্য। শচীশের পাগলামির মানে অনেকের কাছেই ছিল অবোধ্য। বিবিক্ত নায়কের আচরণে অনেক সময় তথাকথিত অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। সীমাবদ্ধ, সংজ্ঞানির্দিষ্ট সঙ্গতি মানবেতর প্রাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। মানুষ যে স্বরূপত অসীম, অফুরন্ত; অনন্তের অভিজ্ঞান তার কাছে, তার মূল্য এইভাবেই তাকে দিতে হয়। লোকনাথ ভট্টাচার্যের "ভোর" উপন্যাসটি পড়ে প্রাথমিকভাবে এত কথা মনে পড়েছে।

"ভোর"[১] উপন্যাসের নায়ক সুমনের গৃহত্যাগ উপন্যাসটির প্রধান বিষয়। সুমনের ছিল অন্তরঙ্গা স্ত্রী, ছিল স্নেহের প্রতিমা বালিকা-কন্যা। সুমন শিক্ষিত, কৃতী। চাকুরির ঔজ্জ্বল্য ছিলই, সম্প্রতি চাকুরিস্থলের যে পরিবর্তন তার বাঞ্ছিত ছিল তাও সুমনের করায়ত্ত। আমেরিকান প্রতিষ্ঠানে মার্কিনী স্নবারি এবং বহিরৌজ্জ্বল্যের মধ্যে দিন কাটাতে কাটাতে সুমনের অন্তরাত্মা পীড়িত হচ্ছিল বহুদিন ধরে। এবার এমন একটা চাকরি সুমন পেয়েছে যেখানে তার 'আত্মিক সন্তোষ' দুর্লভ হবে না। পুরাতন চাকুরিস্থলের বন্ধুদের নিয়ে এই উপলক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় সুমনের বাসায় পার্টির আয়োজন হচ্ছে—এইখানে গল্পের শুরু। এই সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সময় উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কালখণ্ড—পরোক্ষে অবশ্যই নানা অনুষঙ্গে সুমন-নীরার জীবনের অনেক দিন অনেক রাত আভাসিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নীরা পার্টির আয়োজনে ব্যস্ত। সেই গৃহস্বামিনীর ব্যস্ততার ছবিটি বর্ণিত হয়েছে কতকগুলি চেনা রঙে, কিন্তু সেই সূত্রেই সুমন-নীরার সমাজ-পরিবেশ ফুটে উঠেছে। অশিক্ষিতের সঙ্গীর্ণতা অজ্ঞতা বলে ক্ষমার্হ হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিতের সঙ্কীর্ণতায় একটা কটু স্বার্থপরতা থাকে—বীরুর আচরণের স্মৃতিতে সে কথা আরো বেশি করে মনে পড়ে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুমনের প্রবেশ। প্রথম থেকেই তার ক্লান্তি এবং বিষণ্ণতার ম্লানিমা নির্ভুল হয়ে ফুটে ওঠে। সে বিষণ্ণতা নীরার কাছে অবোধ্য হলেও অলক্ষ্য নয়। সে বিষণ্ণতা সুমনের কাছে অনতিক্রম্য এবং অনিবার্য। নীরার কাছে এ বিষণ্ণতা একটা বিস্ময়। এ যেন তার কাছে একটা ছন্দপতনের হঠাৎ-হোঁচট। তাই সুমনকে তার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, কেন এই মনখারাপ? এ কি পুরনো জায়গার জন্য পিছুটান? এ কি ক্লান্তি? পিছুটান যদি হয় তাহলে ভয় কি, তা তো অচিরে মুছে যাবে। যদি এ ক্লান্তি হয়, তাহলেই বা ভয় কি? নীরা তো রয়েছে হাওয়ায় হাওয়ায়, হাওয়াবদলে ক্লান্তি মুছে ফেলা যাবে না?

নীরা এ উপন্যাসে বাস্তবের চেনা অংশের প্রতিনিধি। চেনা বলেই সে অতিপরিচয়ে জীর্ণ নয়। মধুর বর্তমান এবং মধুরতর অতীত তার। দেহ এবং মনের মায়ায়, মায়ার দানে, আর দানের মাধুর্যে সে সুমনকে পূর্ণ করে ফেলেছে বলে ভেবেছে। কিন্তু এরই মধ্যে তটের তলে তলে সঞ্চিত ভাঙনের মতো, স্বাস্থ্যের প্রচ্ছন্নে সংগুপ্ত ক্ষয়রোগের মতো সুমনকে গ্রাস করেছে বিষণ্নতা, বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য। এ যদি শুধুই হত প্রাক-পরিণয় দিনগুলির জন্য ব্যাকুলতা তাহলে এ নৈঃসঙ্গ্য হত কেবল ঝরা বকুলের জন্য কান্না। সুমনের আজকের ভাবান্তর দেখে নীরার কোনো দিনান্তরকে মনে পড়ছে না, যেমন গার্হস্থ্যে, পিতৃত্বে, জীবিকায় কৃতী সুমনকে দেখে শ্রীমতী রাধার মতো নীরার কোনোদিন মনে পড়েনি—মনো মে কালিন্দী-পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি। সুমনের একে একে মনে পড়েছে ফ্রান্সের প্রেমোচ্ছল দিনগুলি, মনে পড়েছে কিশোরদিনের এক সূর্যাস্তকে। সেই সূর্যাস্তবিধুর সুমনকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, প্রতিটি সূর্যাস্তই যে শেষ সূর্যাস্ত, হে মায়াহত, সে কথা সেদিন তুমি বোঝনি কেন?

তা হলেও, সুমনের ভারতীয় রক্তধারায় নির্বেদ ও বৈরাগ্যের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকলেও একে লালাবাবুর সংসারত্যাগের আধুনিক সংস্করণ বলা যায় না। সুমনের সংসার ত্যাগ লৌকিক অর্থে অহেতুক। নীরার দুর্বল বিশ্বাস, আমারও প্রবল বিশ্বাস, সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু আপাতত এই মুহূর্তে, ঠিক এই ভোরেই সে কথা বিশ্বাস্য নয়। এবং, সে ফিরে এলেও আজকের চলে যাবার প্রাঙ্মুহূর্তকে সুমন কখনো ভুলবে না। নীরাও কি কখনো ভুলবে কী এক অননুমেয় গভীর খাদের পাশ দিয়ে তার প্রতিদিনের চলাফেরা। এই শেষ মুহূর্তটিকে উপন্যাসে লেখক অসামান্য করে তুলেছেন ভাবে এবং ব্যঞ্জনায়। এবং এই শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এগিয়ে আসতে সুমনকে পার হতে হয়েছে অন্তবিহীন পথ। অলক্ষ্যে, অজানিতে সুমনের সারাজীবনই এরই প্রস্তুতি। সে বোধহয় শেষ পর্যন্ত বুঝেছে—'সব যেন অতিসাধারণ।' বীরুর মতো ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেই *Nausea* উপন্যাসে সার্ত্রের কথিত অভিধাটি ব্যবহার করা চলে *Salands*। কিন্তু ক্লান্তি শুধু সেখানেই নয়, ক্লান্তি সাথীতে, ক্লান্তি নীরায়। সুমনের প্রচণ্ড অনীহার দার্শনিক আত্মপরিচয় তার নিজের ভাষাতেই সব থেকে জোরালো—'বলবার মতো কোনো কারণ নেই আমি জানি, কিন্তু আমি তো আর গৃহীত হতে চাই না, আমাকে পৃথিবীর লোক বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তবু আমি যাবই চলে, কারণ আমায় যেতেই হবে।' যুক্তির জন্য সুমনের কোন মাথাব্যথা নেই। কারণ বিবিক্ত নায়কের সদাই অভিপ্রায় যুক্তির বাঁধা ছকের বাইরে নিজের authentica selfকে খোঁজা। সুমন বলে, 'সত্য কখনো কখনো হতে পারে প্রমাণের অতীত, হতে পারে যুক্তির অতীত, সত্য হতে পারে গৃহীত হওয়া বা না হওয়ার অতীত'। সুমনের জীবনে এই চিন্তার আবির্ভাবই তার ভবিষ্যৎ নিয়ামক হয়ে উঠল।

'আট বছর আগের একদিন' থেকে উদ্ধৃত এক অংশ এই গ্রন্থের প্রারম্ভে দেয়া হয়েছে। 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে; আমাদের ক্লান্ত করে ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;'—এই বিপন্ন বিস্ময়ের নাটকীয়তা "ভোর" উপন্যাস কিন্তু সযত্নে বর্জিত। 'আট বছর আগের একদিনের' উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 'মরিবার সাধ' হয়েছিল। কারণ সে জেনে গিয়েছিল যে জীবন দোয়েলের ফড়িঙের তার সঙ্গে মানুষের দেখা হয় না। হয় না যে সেটা মানুষেরই অভিজ্ঞান। হয় না বলেই সে পরাপ্রকৃতির সাক্ষাৎ পেতে চায়। কিন্তু "ভোর" উপন্যাসের নায়ক আত্মনাশী নয়। সে

পরম বাস্তবতাকেই খুঁজতে বেরুল, যে বাস্তবতা এই আত্যন্তিক বাস্তবতার মধ্যে হারিয়ে রয়েছে তাকেই পেতে চায় সুমন। প্রসঙ্গত অসীম রায়ের "দেশদ্রোহী" উপন্যাসের নায়ক ভবানীপ্রসাদের কথা মনে পড়ে। তারও গৃহ, গৃহিণী, সন্তানে, সাফল্যে সম্ভাবনায় সচ্ছল পরিবেশে দেখতে দেখতে ফুটে উঠছে এক বিবিক্ততার যন্ত্রণা। সন্ধ্যার নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে একটা সময়ের নানাচারী বামনবক্রতায় ক্লান্ত এমন এক নৈঃসঙ্গ্যকে অনুভব করেছে সে, যে-নৈঃসঙ্গ্য শুধু লেখকের নয়, শুধু ক্লান্তের নয়—'বোধহয় পাগলদের এরকম নিঃসঙ্গতা হয় যখন চারপাশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সাড় থাকে না।' ভবানীপ্রসাদ তো পাগল নয়, তাই সে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে তার সমগ্রতার সন্ধানে, সব খণ্ডীভবন এবং লাজ-বন্ধন ন্যায়কে এড়িয়ে। এ পথেই ভবানীপ্রসাদের মৃত্যু এল। সাধারণ্যে হয়তো এই প্রায় স্বেচ্ছামৃত্যুর মানে নেই। কিন্তু তার অকৃত্রিম সত্তার অফুরন্ত স্বরূপ এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই উদ্ভাসিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের বৃহৎ ক্ষেত্রে দুর্মর হয়ে উঠেছে চরিত্র-হীনতার লক্ষণ। তার মধ্যে এই-জাতীয় উপন্যাসের প্রত্যাশাতেই আমরা এখনও উপন্যাস পাঠ ছেড়ে দিইনি।

সুমনের চলে যাওয়া আর ভবানীপ্রসাদের চলে যাওয়ায় প্রভেদ আছে। ভবানীপ্রসাদের নৈঃসঙ্গ্য শেষপর্যন্ত স্বাধীনতার প্রচণ্ড দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছে। ভবানীপ্রসাদও বর্তমান সমাজের সকল প্রকার pressure group -গুলির হাত থেকে নিজের মুক্তিসাধনে প্রয়াসী। সুমনের বিষণ্ণ নির্জনতায় সেই বিবিক্ততার বোধ থাকলেও তা দায়িত্ব-গম্ভীর গভীরতা পায়নি। অর্থাৎ আমরা তার শেষ আচরণের কারণটা বুঝলেও, লক্ষ্যটা বুঝলাম না। যে নৈঃসঙ্গ্যবোধ থেকে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটির ক্রিয়াকলাপ ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে উপন্যাসের শেষে সেই নৈঃসঙ্গ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করা হল। নায়কের উপলব্ধির দিগন্ত আর একটু না-প্রসারিত হওয়ার ফলে ঔপন্যাসিকের বিষয়কল্পনার পরিধি বাড়তে পেল না। যে পরম এবং চূড়ান্ত বাস্তবতাকে সুমন খুঁজতে বেরুল তার স্বরূপ আজই তার জানার কথা না হতে পারে, কিন্তু কোন পথে তার অন্বিষ্ট তাকে নিয়ে যাবে তার কিছু ইঙ্গিতও থাকবে না?

লেখক যদি সিরিয়াস না হতেন, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শেষ প্রশ্নটি বাহুল্য হত। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বিষয়-প্রদত্ত যে কোনো প্রলোভনকেই দমন করতে পারেন, তাই রচনাকে নিয়ে যেতে পারেন পল্লবগ্রাহী বাস্তববোধের ঊর্ধ্বে। "যত দ্বার তত অরণ্য"[২] তার নিদর্শন। সুবিমল-শান্তা-শরদিন্দু-মাখন একটি গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে দিল্লী থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে বল্লভগড়ের কাছে এক বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। গাড়ি মাখনের, চালাচ্ছিল সুবিমল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের এক হাসপাতালে এনে তোলা হয়েছে। এক-একজন এক-এক কেবিনে। এক-একজনের স্মৃতিচারণের সাহায্যে উপন্যাসটি কথিত হয়েছে। যে চারজন এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগত জট, নিজেদের আভ্যন্তরীণ জটিলতার উন্মোচন হয়েছে প্রতিটি পরিচ্ছেদে। সুবিমলই নায়ক। সুবিমল ও শান্তার বিবাহিত জীবনে শরদিন্দু-জনিত সমস্যা, সুবিমলের ও শান্তার কলেজ-বন্ধু মাখন, অথচ জীবিকাক্ষেত্রে একই অফিসে সুবিমল উচ্চপদে, মাখন নিচে—এর ফলে দুজনের বন্ধুত্বে কাটাকুটি—এগুলি কেমন সুবিমলের জীবনে প্রধান প্রতিক্রিয়া রচনা করেছে এ উপন্যাসে সেটাই মুখ্য বিষয়। বাস-ফিয়াটের ধাক্কাটা কি পরিকল্পিত ঘটনা না অপরিকল্পিত দুর্ঘটনা?

দুর্ঘটনা হলেও এর মূল কি ছিল কারো সমূলক অন্যমনস্কতায়? কারো নির্জ্ঞানের অদৃশ্য গভীরে? এ সমস্ত প্রশ্ন উপন্যাস পাঠের কৌতূহলকে আতত করে তুলেছে।

হয়তো কোনো নবীন সমালোচক, বস্তুস্বরূপ-উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসী ফরাসী নতুন উপন্যাস-ধারার সঙ্গে "যত দ্বার তত অরণ্যে"র ভাবসাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারেন। এ দুর্ঘটনা কেন? নিজেরা মনে মনে এই তদন্ত করতে করতে তারা নিজেদেরই জানল চিনল। এই জানা-চেনাই এখানে আসল কথা। কিন্তু সে-সাদৃশ্য থাক বা না থাক চরিত্রগুলির দীর্ঘ স্বগতোক্তি, আত্মস্থ আত্মবিশ্লেষণ মানুষের জটিলতার সীমাহীনতাকে আভাসিত করে তুলেছে। অথচ এটা সাধারণভাবে দেখতে গেলে দুর্ঘটনাই। কিন্তু নিঃসন্তান সুবিমল-শান্তার নিজেদের শান্তিকে বিশ্বাস নেই; মাখন-সুবিমলের জীবিকাক্ষেত্রের ঈর্ষাদ্বেষকে বিশ্বাস নেই; বিশ্বাস নেই শরদিন্দু-শান্তার সান্নিধ্যকে। এদের যে কোনো একটাই একটা ক্ষুদ্র ঘূর্ণির আকারে ঘুরতে ঘুরতে সৃষ্টি করে থাকতে পারে এই ঝড়। যে যার মনের আলো ফেলে নিজেকে দেখছে বলেই ঘটনাকে মনে হচ্ছে দুর্ঘটনা। সুবিমলের মৃত্যুতে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি, কিন্তু ঘটনার পরিসমাপ্তি নয়। শরদিন্দুর দিক থেকে শান্তা-সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে না। শান্তার সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও না। কেননা শান্তার গর্ভে এসেছে সুবিমলের সন্তানের বীজ। এই উপন্যাসের শেষ দৃশ্য কিছুটা নাটকীয় হতে বাধ্য। তবু শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য সে নাটকের মাত্রাকে সংযত করে তাঁর উপন্যাসের আত্মিক বক্তব্যকে স্থির রেখেছেন।

"ভোর" এবং "যত দ্বার তত অরণ্য" এই দুই উপন্যাসে লেখকের যে নৈতিক সচেতনতা —যা না থাকলে উপন্যাস শুধু কথা আর গল্প হয়ে পড়ে—প্রকাশ পেয়েছে তার মূল কথা হল সত্যে পুনর্বাসন। "ভোর" উপন্যাসের সুমন সংসার থেকে বিদায় নিয়ে এই সত্যকে খুঁজতে চলেছে, "যত দ্বার তত অরণ্য" উপন্যাসে শরদিন্দু সব প্রলোভন থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনের অমেয় অনুরাগকে ফিরে পেতে চেয়েছে। এই বক্তব্যের শৈল্পিক রূপায়নের জন্য লেখক চেষ্টিত; এবং ভবিষ্যতে সে চেষ্টা তাঁর আরো সার্থকতা পাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে, অনপনেয় অমঙ্গলের আধিপত্যকে যিনি স্বীকার করেন না। রাজধানীর পানভোজনের উচ্চালোকিত রঙ্গশালায় বারকতক বসেই যেসব লেখক বিদেশী কেতায় damnation-চিন্তিত হয়ে ওঠেন তিনি তাদের কেউ নন। বরঞ্চ তিনি ভারতীয়লক্ষণবিশিষ্ট। শুদ্ধতাই মানুষের স্বরূপ। আবরণগুলি তাই একে একে সরাতে হবে। তাঁর রচনায় সেই ভাবনা সক্রিয়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১] ভোর—লোকনাথ ভট্টাচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা।

[২] যত দ্বার তত অরণ্য—লোকনাথ ভট্টাচার্য। এস, সি, সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সমালোচনা

বীক্ষা ও অন্বীক্ষা—অসিত গুপ্ত। চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী। কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।

বইখানা পনেরোটি প্রবন্ধের সংকলন, প্রবন্ধ কয়টি তিন চার বৎসরের মধ্যে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কয়েকটি প্রবন্ধ আসলে গ্রন্থ-সমালোচনা। ফরাসী vers d'occasion কথাটির অনুরূপে বলা যায় এই প্রবন্ধ কয়টি prose d'occasion, সাময়িক প্রয়োজনে রচিত। এহেন রচনার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য এর বিষয়-বৈচিত্র্য। অসিত গুপ্তর প্রবন্ধমালায় একদিকে যেমন পাওয়া যাবে অলডাস হক্স্‌লি, যেমস্‌ জয়স্‌, জন স্টাইন্‌বেক্‌ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের আলোচনা, অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তীক্ষ্ম সংবেদনা-শীল অনুসন্ধান অথবা চলচ্চিত্র ও আধুনিক নাটকের আঙ্গিক নিয়েও সে-আলোচনা পাওয়া যাবে যা কিনা হবু চলচ্চিত্রকার ও নাট্যকারেই সম্ভব। দু' নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ-আলোচনার ক্ষণস্থায়িত্ব। কে কোথায় একটি বই লিখলেন অথবা কোনো বক্তৃতায় বা পুস্তিকায় কোনো এক মত প্রচার করলেন, আমার সম্পাদকমশাই বললেন সেই বক্তৃতা বা পুস্তিকা সম্বন্ধেই আমাকে লিখতে হবে। এহেন অনিচ্ছাজনিত ক্ষণস্থায়িত্বের কিঞ্চিৎ ছাপ এই প্রবন্ধমালার এখানে সেখানে নজরে পড়ে।

আশ্চর্যের বিষয়, এবং অতীব প্রশংসার বিষয় যে, এতৎসত্ত্বেও, রিভিউ-রচনার প্রায় অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষণিকতা সত্ত্বেও, অসিত গুপ্তর প্রবন্ধসংগ্রহে ছন্দগ্রন্থিত কয়েকটি মৌল চিরন্তন চিন্তার সম্মুখগতি যে কোনো পাঠকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করবে। অসিত গুপ্ত স্পষ্টই পড়েছেন অনেক, অনেক বিষয়ে। অনেক কাল ও দেশ জুড়ে তাঁর ঔৎসুক্য পরিব্যাপ্ত। আত্মতৃপ্তির জৃম্ভনলিপ্ত আধুনিক বাঙালীর পক্ষে অসিত গুপ্তর চিন্তাপরিধি অস্বস্তিকর হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অনেক পড়ার ফলে যে মনঃশৈথিল্য, যে স্বাধীনতা-হীনতা, যে পরমত-উদ্‌গীরণপ্রবণতা আমাদের থল্‌থলে বাঙালী চিত্তকে পেয়ে বসে তার কিছুমাত্র আভাস দেখতে পাইনে অসিত গুপ্তর রচনায়। বরঞ্চ আলোচ্য প্রায় সব বিষয়েই তাঁর নিজ ধারণাগুলি অতীব সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ আমার মনে হয়েছে একটু বেশি সুস্পষ্ট। মনে হয়েছে অধ্যয়ন নিবিড়তর হলে, জ্ঞান গভীরতর হলে সৎ চিন্তায় যে মহান অনিশ্চয়তা, যে প্লুরালিজম্‌ জন্মায়, সে-অবস্থায় অসিত গুপ্ত এখনো পৌঁছন নি। তবে অসিত গুপ্ত অহমিকাবদ্ধ জীব নন, নিজকে সমালোচনা করার মতো দূরত্বসঞ্চারকৃতির তিনি অধিকারী। 'আমার শিক্ষানবিশী কাল কোনদিনই ঘুচবে না', এই কথা পাচ্ছি অসিত গুপ্তর পূর্বভাষে। বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে ঠিক শিক্ষানবিশির ছাপ নেই, নিপুণ চিন্তারই ছাপ, তবুও তাঁর বিনয়াবনত বাক্যটিতে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে অসিত গুপ্ত মানসিক চরৈবেতিতে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁর চিন্তার কোনো স্থায়ী ছেদ সূচিত হচ্ছে না, বরঞ্চ অগ্রগতির আভাসই পরিলক্ষিত হবে।

হরেকরকম বিষয় নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও অসিত গুপ্তর দৃষ্টি নিবদ্ধ থেকেছে কয়েকটি মৌল চিন্তাবস্তুতে। দ্বিতীয়ত, বিদেশের আলোচনা তিনি যতই করুন না কেন, তাঁর আসল

লক্ষ্য ভারতীয় সংস্কৃতি। তৃতীয়ত, তাঁর আরো আসল লক্ষ্য তাঁর নিজ শিল্পৈষণা। এই প্রবন্ধ কয়েকটি পড়তে গিয়ে আমার পুনঃপুনঃ মনে হয়েছে যে অসিত গুপ্ত বাস্তবিক হক্‌স্‌লি বা সার্ত্র্‌, বর্নার্ড শ অথবা বেরটোলড্‌ ব্রেখ্‌ট্‌ সম্বন্ধে ততটা কৌতূহলী নন যতটা অসিত গুপ্ত সম্বন্ধে। তিনি হয়তো আজো কোনো মহৎ উপন্যাস অথবা নাটক রচনা করেন নি। আদৌ কোনোকালে করবেন কিনা সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে আমি অপারগ, কিন্তু যদি তিনি নিজ মনোজগতে একটা আশ্চর্য সৃজনীকল্পনায় আগ্রহী থাকেন, যদি নিজ সত্তার গভীর কন্দরে তিনি একটির পরে একটি আশ্চর্য উপন্যাস-নাটক রচনা করে যেতেই থাকেন, তাহলে সেই অন্তঃস্বরূপপ্রোজ্জ্বল মানসের চেতনার রং-এ পান্না হয় সবুজ, হক্‌স্‌লি-স্টাইনবেক-কাজানাকি মূল্য পরিগ্রহ করে সেই সৃষ্টিশীল মানসের আণবিক অংশীদার হয়ে। এই গভীর সম্ভাব্য সত্তার আভাস পাচ্ছি বলেই এই প্রবন্ধগুলি আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান।

অমলেন্দু বসু

The Development of Modern Nigeria. *By* Okoi Arikpo. Penguin Books. London. 4*s*. 6*d*.

অকয় এরিকপো'র জন্ম ও শিক্ষা নাইজেরিয়াতে, কর্মস্থানও নাইজেরিয়াতে। সুতরাং নাইজেরিয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু আধুনিক নাইজেরিয়ার গড়ে ওঠার যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন তাতে, ১৯৬৭-৬৮ সালে নাইজেরিয়ার যে-শোচনীয় দুঃখকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বিন্দুমাত্র আভাস তিনি তাঁর বইতে দেন নি। যদিও তিনি ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারির বিপ্লব ঘটার পরই বইটি লিখেছেন এবং ১৯৬৬ সালে এই পরিণতির আভাস স্পষ্টই পাওয়া গিয়েছিল। ফেডারেলিজমের সমস্যা, নাইজেরিয়ায় ঐক্যের বাধা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অবহিত, নাই-জেরিয়াতে ফেডারেশন শিথিল হওয়া উচিত অথবা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকা উচিত, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন, অথচ যে উপজাতি-বিরোধ নাইজেরিয়াকে ভেঙে ফেলেছে এবং ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে এরিকপো মোটেই চিন্তিত নন। তাঁর বক্তব্য, নাইজেরিয়া কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক অবস্থান অথবা ব্রিটেনের শাসনের ফলে একীভূত দেশ নয়, নাইজেরিয়া তার অসংখ্য বিভিন্ন ভাষা, আচার-বিধি, ধর্ম, উপজাতি নিয়েও একটি জাতীয় ঐক্যেরই ফল। বর্তমানে বায়াফ্রার সঙ্গে নাইজেরিয়া ফেডারেশনের আত্মধ্বংসী বিরোধ অবশ্য এই জাতীয় ঐক্য প্রমাণ করে না। বরং মনে হওয়া স্বাভাবিক, ইবো, হাউসা, ইওরোবা, কানুরি, ইডো, ইবিবিওস ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত নাইজেরিয়া শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধার জন্যে একটি দেশে পরিণত হয়েছিল, এই দেশের উত্তর-পূর্ব পশ্চিমের উপজাতিদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ নিতান্তই ক্ষীণ। একথা অস্বীকার করে but England consists of Angles and Picts, Normans and Celts, yet England is a nation বলা নিরর্থক। ইতিহাস বয়স্কদের জন্য লেখা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্যও লেখা হয়। এরিকপো

তাঁর বিদ্যালয়ে পঠিত ইতিহাস ভুলতে না পেরে তাঁর চারপাশের বাস্তব নাইজেরিয়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন।

সমস্যাটি এরিকপো'র একার নয়। ৬০০০ উপজাতি অধ্যুষিত বিরাট আফ্রিকার চৌদ্দ কোটি আফ্রিকাবাসীর প্রত্যেকেরই একই সমস্যা। আফ্রিকার প্রায় তিরিশটি স্বাধীন রাষ্ট্রে উপজাতির অস্তিত্ব হচ্ছে বাস্তব ঘটনা, আর জাতীয় ঐক্য হল তাঁদের স্বপ্ন এবং আশা। বিশেষ করে যে নতুন শিক্ষিত তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে আফ্রিকার দেশে দেশে, তাঁরা জানেন, উপজাতীয় সংস্কার, মোহ এবং কূপমণ্ডূকতা কাটিয়ে উঠে জাতীয় চরিত্র, জাতীয় রাষ্ট্র তৈরি করতে না পারলে রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান জগতে বাস করা অসম্ভব। তাঁদেরই একজন অকয় এরিকপো। তিনি দেখেছেন, কীভাবে উন্নত দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর চোখ ক্যানাডার দিকে, অস্ট্রেলিয়ার দিকে, আমেরিকার দিকে, ইংল্যান্ডের দিকে। নাইজেরিয়ার শাসনতন্ত্র আলোচনার সময় তিনি যখন তুলনা করেন তখন তাঁর মনে থাকে এইসব দেশের শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা। অথচ নাইজেরিয়ায় বাস করে যে অশিক্ষিত, আদিমসংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র নাইজেরিয়াবাসী তাদের সঙ্গে ক্যানাডা ইত্যাদির সচ্ছল সাদাদের কোনই সমতা নেই। সুতরাং তাঁর বইয়ের আলোচনা নাইজেরিয়ার অধিবাসীদের পক্ষে, সারা আফ্রিকাবাসীদের কাছে কি পুরো অবান্তর হবে না?

সঙ্গত কারণেই এরিকপো বিশ্বাস করেন, শক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ছাড়া নাইজেরিয়ার ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু সেটা কী করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন। যার ফলে তাঁর মতামত কখনো সুদূরাশ্রিত, কখনো বা পুরো ভ্রান্ত।

উদাহরণ নেওয়া যাক। নাইজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে যে ইবো উপজাতি বাস করে, তার প্রায় দশ লক্ষের মতো লোক নাইজেরিয়ার অন্যত্র বাস করে, চাকরি করে। সুতরাং পূর্বাঞ্চল বার বার বিচ্ছিন্নতার দাবি জানালেও সে দাবি, ১৯৬৬ সালে এরিকপো'র মতে, নেহাতই মুখের কথা, কোন পূর্বাঞ্চলীয় নেতাই মনে মনে বিচ্ছিন্নতা চান না। তাঁরা জানেন, পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হলে ওই দশ লক্ষ লোকের চাকরির সংস্থান করা দুরূহ হবে। তাই এরিকপোর বিশ্বাস no regional leader seriously believes that the secession is a practical alternative to Nigeria's problem of adjustment to the modern world. বায়াফ্রার জন্ম, কর্নেল ওজুকুর বক্তব্য, কর্নেল গাওয়ানের উল্টোপাল্টা কথা এবং আচরণ নিশ্চয়ই এতদিনে এরিকপো'র মোহমুক্তি ঘটিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এরিকপো'র মতও অত্যন্ত বিস্ময়কর। নাইজেরিয়ার বাজেটের একচতুর্থাংশ ব্যয় হয় শিক্ষাখাতে। পূর্বাঞ্চলে মোট খরচের অর্ধেকই প্রায় শিক্ষা বাবদ ঘটে। এর বেশির ভাগ ব্যয় হয় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য। কিন্তু এরিকপো'র ধারণা, এত মোটা টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ করা বৃথা, কারণ স্কুলপাশ করা ছেলেরা চাকরির অভাবে বেকার বসে থাকে, সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের নেবার দরকার নেই, এই দায়িত্ব নিক সন্তানের মাতাপিতা। বরং এই টাকা সরকার খরচ করুক টেকনিক্যাল স্কুল, রাস্তাঘাট, কলকারখানা তৈরি করতে।

প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া যে টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা বৃথা হবে, সেবিষয়ে বোধহয় বলার দরকার নেই। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, এরিকপো দেশবাসীকে শিক্ষিত করবার দায়িত্ব দিচ্ছেন আফ্রিকান মাতাপিতাদের যাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, এবং সংস্কার ভুবনবিদিত।

তাড়িঘড়ি উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য কলকারখানা সম্পর্কে এরিকপো'র দুর্বলতা অনুমেয় কিন্তু স্বীকার্য নয়। বরং আফ্রিকার দৈন্য ঘোচানোর জন্য প্রথম প্রয়োজন দেশময় জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের উপজাতীয় সংস্কার থেকে মুক্ত করা। এই অনগ্রসরতার জগদ্দল পাথর সরানো সম্ভব একমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই। ১৯৬১ সালে নাই-জেরিয়ার সরকার শিক্ষাখাতে বাজেটের একচতুর্থাংশ খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। এরিকপো'র কলকারখানা অপেক্ষা করতে পারে, প্রাথমিক শিক্ষা পারে না। বরং যে সেকেন্ডারি স্কুল, ইউনিভার্সিটির প্রতি এরিকপো'র অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্বলতা, সে বাবদ খরচ বন্ধ রাখা সম্ভব, কারণ তাতে পাশ্চাত্যশিক্ষিত কিছু উন্নাসিক আফ্রিকানের জন্ম হয়েছে, দেশের কল্যাণবৃদ্ধি তাতে বেশি ঘটছে না। গত একবছরের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, নাইজেরিয়ার বৃহত্তম সমস্যা, অর্থনীতি বা রাজনীতি নয়, তার বৃহৎ সমস্যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে প্রচন্ড হিংসা এবং বিরোধ। নাইজেরিয়া সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা বৃথা হবে, যদি তার সমাজের এই মূল ক্ষয়শক্তি সার্থকভাবে প্রতিরোধ করা না যায়। এরিকপো এবিষয়ে মোটেই সচেতন নন, তিনি ধরেই নিয়েছেন নাইজেরিয়া একটি নেশন, যা কিছু উপজাতীয় বিরোধ তা সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব।

নাইজেরিয়া যে একটি দেশ, একটি জাতি, তার মধ্যে যে একটি ঐক্য বিরাজ করছে, তা প্রমাণ করার জন্য এরিকপো সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন—কী করে ইংরেজি ভাষা সমস্ত নাইজেরিয়াকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে, কী করে পার্লামেন্টীয় সরকার নাইজেরিয়াকে এক রাষ্ট্রে গ্রথিত করেছে, কী করে ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার ফলে নাইজেরিয়ার উপজাতিরা তাদের উপজাতীয়ত্ব ভুলে এক লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে। আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা এই ধরনের যুক্তির অসারতা হাড়েহাড়ে বুঝেছি, ওসব কথা শৌখিন বক্তৃতার কথা, ওতে হিন্দু-মুসলমানের, বিহারি-বাঙালি ইত্যাদির বিরোধ কমে না। নাইজেরিয়াতেও কোন বিস্ময়কর ঐক্য ঘটে নি, তার প্রমাণ ইওরোবা-হাউসা-ইবোদের সাম্প্রতিক দাঙ্গা যার বলি লক্ষ লক্ষ লোক, এবং যা আজও চলছে।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

French Writing Today. *Edited By* Simon Watson Taylor. Penguin. London. 8*s*. 6*d*.

আলোচ্য গ্রন্থ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফরাসী সাহিত্যের একটি সুনির্বাচিত সংগ্রহ। সংকলক ভূমিকায় বলেছেন, আমাদের কালের কাছাকাছি সময়ের উপর, এবং বয়স্ক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের বদলে উল্লেখযোগ্য তরুণতর লেখকদের উপর তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। ভূমিকায় আরও বলা হয়েছে, কবিতা এবং ছোটগল্প (অথবা কোন দীর্ঘকাহিনীর নির্বাচিত অংশ) বইতে স্থানলাভ করেছে, অন্যবিধ রচনা নয়।

সংগ্রহগ্রন্থের আলোচনার দু'টি দিক আছে। এক, সংগ্রাহক তাঁর উদ্দেশ্যের সীমার মধ্যে সিদ্ধিলাভ করেছেন কিনা। দুই, সংগৃহীত রচনাগুলি সার্থক রচনা কিনা।

প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা' হল বইখানিতে সংগৃহীত আশিজন কবি ও

লেখকের মধ্যে একজনও বাস্তববাদ বা প্রাকৃতবাদ বা প্রাক্-এলিয়ট যুগের কাব্য-ধারার অনুবর্তনকারী নেই। বাস্তবকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াসে যেসব নব্য পরীক্ষামূলক রীতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেইসব রীতি যে এতজন কবি-লেখক অনুসরণ করছেন তা বিস্ময়ের বিষয়। নিছক ফ্যাশনের মোহে যে এ'রা অপরীক্ষিত পথে যাত্রা শুরু করেছেন তা ভাবা যায় না। লেখক হিসাবে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন এ অনুমান করা যায়; এ'রা জানেন যে, পরীক্ষিত পথে জনপ্রিয়তা এবং প্রতিপত্তি লাভ করা সহজসাধ্য এবং সুনিশ্চিত সে-পথ তাঁরা হেলায় প্রত্যাখ্যান করে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়িয়েছেন। অবশ্য মোহের ব্যাপার যে একেবারে নেই তা নয়। পাশ্চাত্যের গতিশীল এবং পরিবর্তন-শীল সমাজে নব্য ধারার অন্যতম প্রবক্তা হওয়ার গৌরব কম নয়; সেই গৌরব অর্জন করার জন্য অনেকে যে আপাত-সাফল্যের আশাকে ত্যাগ করতে চাইবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু মোহ দিয়ে নতুন প্রয়াসের বিপুলতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না; পাশ্চাত্যের লেখক-শিল্পীদের মন অনেক বেশী সক্রিয়। নতুনতর পথে বাস্তবের নিবিড়তর উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যে ও'দের মধ্যে অনেক বেশী আন্তরিক এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

স্বস্তির সংগে লক্ষ্য করছি যে নব্য রীতির প্রতি আকর্ষণ যতই থাক, দুর্বোধ্যতার কুয়াশার মধ্যে নিজেদেরকে আবৃত করে রাখার প্রবণতা থেকে তরুণ লেখকরা বহুলাংশে মুক্ত। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে লেখক ও কবিদের মধ্যে যে ব্যাকরণের সীমা-বদ্ধতাকে অস্বীকার করবার এবং ঘটনার কালানুক্রমিকতাকে উপেক্ষা করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এ'দের মধ্যে সে প্রবণতা অনুপস্থিত। রচনা দুর্বোধ্য হলে তার কোন আবেদন নেই : গভীরতর তাৎপর্য যতই দুরধিগম্য হোক, রচনার একটি আক্ষরিক অর্থ সহজেই পাঠকের বোধগম্য হওয়া দরকার। মনে হয় তরুণ ফরাসী লেখকেরা এই সত্যকে মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু একালের ফরাসী লেখকদের মধ্যে দুর্বোধ্যতাকে পরিহার করার শুভবুদ্ধি দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু কারও কারও মধ্যে ছেলেমানুষী ধরনের অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। রে'মো কোঁয়েনের মতো খ্যাতনামা লেখক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন যার নাম "এ হান্ড্রেড্ থাউজান্ড্ বিলিয়ন পোয়েমস্"। বইটিতে মোটমাট দশটি সাধারণ গোছের সনেট স্থান লাভ করেছে। বলা হয়েছে যে এই সনেট কয়টির লাইনগুলি পার্মুটেশান করে যে-বিপুলসংখ্যক কবিতা পাওয়া যাবে তা একজনের পড়তে ১৯০, ২৫৮, ৭৫১ বছর লাগবে। উক্ত দশটি সনেটের মধ্যে দু'টি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অনুরূপভাবে ফ্রাঁসিস পঁজ "সোপ" নামক গ্রন্থে সাবানকে অবলম্বন করে বহুরকম ভাবনাকে সংগ্রথিত করেছেন। বইখানি কুড়ি বছরের বেশী সময় ধরে লেখা। কিন্তু তার যে অংশ সঙ্কলনে গৃহীত হয়েছে তা পড়ে এই ধারণা হয়েছে যে লেখক এত পরিশ্রম না করলেও পারতেন। তেমনি জাঁক প্রাভার্টের লেখা "শীটস্ ফাউন্ড ইন এ হোটেল বেডরুম"-এ লেখক একজায়গায় বলছেন যে তাঁর বিষয়বস্তু 'কিছু না', সুতরাং তিনি পাতার পর পাতা সাদা রাখবেন। সত্যিই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি এরপর একটি সাদা পৃষ্ঠা সংযোজিত করেছেন, এবং তার নীচ থেকে 'বাট' বলে আবার লিখতে শুরু করেছেন। এ সব প্রয়াস-গুলোকে সাহিত্যের সার্কাস বললে অত্যুক্তি হবে না।

আমার ভাল লেগেছে কতকগুলি রচনা যেখানে কল্পনার সাহায্যে কোন রূপকধর্মী বক্তব্য হাজির করার চেষ্টা রয়েছে। অনেক জায়গায় কল্পনা স্পষ্ট, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট কোন

ঘটনা। জাঁ ব্লান্‌সাঁট-এর 'সিন্‌গ্‌ল কমব্যাট'-এ নায়ক স্বপ্নের মধ্যে শয়তানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অনেক সময়েই কল্পনা খুব স্পষ্ট নয়,—যেন লেখক বাস্তবেরই কোন ঘটনা বলছেন, অথচ যে-বাস্তব ঠিক আমাদের পরিচিত বাস্তব নয়,—অনেকটা কাফ্‌কার কাহিনীর মত। এ ধরনের কাহিনী এক্সপ্রেশনিজমেরই একটি বিশিষ্ট রূপ,—আমাদের পরিচিত বাস্তবের মধ্যেই লেখক যেন এক গভীরতর বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করছেন যাকে ঠিক আমাদের অভ্যস্ত যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ-জাতীয় যে ক'টি রচনা সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে ইউজিন আইনেস্কো-র 'দি ফোটোগ্রাফ অব্‌ দি কর্নেল' আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। আইনেস্কো নাট্যকার হিসাবে আমাদের দেশে পরিচিত। কিন্তু ফরাসী দেশের বিশেষত্ব এই যে ওখানকার অনেক লেখকই বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। গল্পটি বাস্তব আর কল্পনার অদ্ভুত মিশ্রণ,—বাস্তব যেন গলে যাচ্ছে এবং কিনারাগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে বলেই যেন দৃশ্যটায় অবাস্তবের ছোঁয়া লাগছে; বাস্তব-অবাস্তবের আলোছায়ার মধ্যে লেখক হৃদয়হীন সীমাহীন নিষ্ঠুরতার এক রূপমূর্তি উপস্থিত করেছেন। বলা বাহুল্য এই নিষ্ঠুরতা জীবনেরই এক মর্মান্তিক সত্য।

অনেক গল্পে কল্পনা এক ধরনের জাগ্রত স্বপ্নের রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে ক্লদ অলিয়েরে 'নক্টার্ন ইন ইনভার্টেড্‌ কমাস্‌' এবং মিচেল বুটর-এর 'দি কনভার্সেশান' এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উভয় গল্পেই অভাবনীয়তার চমক এবং ভয়ংকরের অনুভূতি পাঠকের মনকে ধরে রাখে। এক ধরনের রহস্যজনক গা-ছম্‌-ছম্‌-করা অতীন্দ্রিয়তার অনুভূতির ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় বলে গল্পগুলির উপর সুর্‌-রিয়লিজমের প্রভাবে আছে বলে সন্দেহ হয়।

কোন কোন গল্পে বাস্তবের মধ্যেই পিরান্দেল্লোর কায়দায় এমন চমকপ্রদ অভাবনীয় এবং কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যে বাস্তবের মধ্যেও যেন কল্পনার আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। এমনি কতকগুলি গল্পে আধুনিক মানসের গভীর নৈরাশ্যবাদ, যন্ত্রণাবোধ এবং মৃত্যু-কামনার প্রতিফলন ঘটেছে। এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম স্যামুয়েল বেকেটের নাম উল্লেখ করা যায়, কারণ বহু তরুণ লেখক তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই সংকলনে বেকেট-রচিত মেলয় নামক বৃহৎ কাহিনীর অংশবিশেষ মুদ্রিত হয়েছে। কতকটা তরলীকৃত চেতনা-প্রবাহের রীতিতে নায়কের দীর্ঘ যন্ত্রণা-ভোগের কাহিনী লিপিবন্ধ হয়েছে, যুগের মানস-যন্ত্রণাকেই যেন বাইরের ঘটনায় প্রক্ষেপ করা হয়েছে। রোজার গ্রেনিয়ে-রচিত 'দি নেইবার' নামক গল্পের নায়ক অসহ্য বোধ হওয়ায় সংসার ত্যাগ করেছে আত্মহত্যা করার জন্য; অনুরূপ অবস্থার আর-এক ব্যক্তির আত্মহত্যা সে স্বচক্ষে দেখল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে আত্মহত্যা করতে পারল না। এর বিপরীত গল্প বোরিস ভিঁয়ে-রচিত 'রিকল্‌'-এ একটি পঞ্চাশতলা বাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সার্থকভাবে আত্মহত্যা করার গল্প।

মার্গারিট ডুরাসের 'বোয়া' এক প্রেমবঞ্চিত শিক্ষিকা এবং তাজা-ছাগল-ভক্ষণকারী বোয়া একটি ছোট ছেলের মনের উপর কী ভাবে বিস্তার করেছিল তার গল্প। আঁন্দ্রে পিয়েরে দ্য মাঁদিয়ার রচিত গল্প 'চাইল্ডিশনেস্‌' নারী-সঙ্গমরত নায়কের মানস-গতির কাহিনী; সে একের পর এক মৃত্যু-স্মৃতি চিন্তা করে চলেছে; সবচেয়ে মর্মান্তিক একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার দৃশ্যের স্মৃতি যখন সে রোমন্থন করছে তখন তার চরম পুলক লাভ হল। মৃত্যুর সঙ্গে যৌনক্রিয়ার সম্পর্ক দেখানোই হয়তো গল্পটির উদ্দেশ্য। সমগ্র সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে এই দুটি গল্পই প্রায় বাস্তববাদী মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীর নিকটতম উদাহরণ।

নিউ নভেল আন্দোলনের প্রবক্তা আলে' রব্-গ্রীলে 'ইন দি করিডর্স অব্ দি আন্ডার গ্রাউন্ড' নামক একটি রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। রব্-গ্রীলে, চরিত্রের মানস প্রতিক্রিয়া, বা মানস গতি বা মানস বিশ্লেষণে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে লেখক কেবল নিজের মন (তা-ও আংশিকভাবে) ছাড়া আর কারও মন জানেন না। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস নিছক লেখকের ভণিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা যেটুকু জানতে পারি তা হল বহির্দৃশ্য, বা ঘটনার বহিরাবরণ। ঘটনার বহিরাবরণ চিত্রায়নের একটি নিখুঁত উদাহরণ আলোচ্য ভূনিম্নস্থ রেলগাড়ির একটি স্টেশনের চিত্র। অটো সিঁড়ি বেয়ে নেমে করিডর পার হয়ে প্লাটফর্মে নেমে যে জনতা রেলগাড়িতে উঠেছে তার একটি বর্ণনা আশ্চর্য নাটকীয় হয়ে উঠেছে নিছক যথাযথ পর্যবেক্ষণকে লিপিবন্ধ করতে পারার দক্ষতায়। *Tel Quel* পত্রিকা ও তৎসংশ্লিষ্ট লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জাঁ পিয়েরে ফে-র 'আনালগ্স্' রচনাটিও এ বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কোন ঘটনাকে আমরা যথাযথ জানি না; আমাদের জানা মানেই ঘটনার একটি বিশেষ ব্যাখ্যা; এবং সে ব্যাখ্যা নানা রকম হতে পারে;—এমন একটি বক্তব্য রচনাটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সংগ্রহ-গ্রন্থে যে-সব কবিতা স্থান পেয়েছে তাদের অনেকগুলোর উপরই সুর্-রিয়লিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে অনুভব করা যায়। হেনরি মিচো রচিত 'পীস্ অ্যামিড্ দি স্যাটারিং' কবিতায় কবির অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্য আগ্রহ খুব স্পষ্ট। পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণা ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে কবি খুঁজছেন—

The path that leads upwards
upwards
always upwards
the path
how can I not have found it before?

রেনে চার তাঁর 'অন এ নাইট উইদাউট অর্নামেন্ট' কবিতায় রাত্রির ভিতর দিয়ে প্রতীয়মান সত্যের গভীরে দৃষ্টিপাত করতে চান—

Night strips our human past of innocence, tilts the looking glass toward the present, puts our future in doubt.

একটি জিনিস বর্তমান সমালোচকের আশ্চর্যজনক লেগেছে, বইতে অস্তিবাদী রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কেবল অস্তিবাদী ঢঙ্কে প্যারোডি করে লেখা কোয়েনুর তিনটি ছোট রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

অচ্যুত গোস্বামী

Selected Poems *By* Zbigniew Herbert. Penguin. London. 4*s*. 6*d*.

এই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা সিগনিউ হার্বাট ইংরেজি কাব্যপাঠকসমাজে অপরিচিত। পোল্যান্ডের অধিবাসী এই কবির জন্ম ১৯২৪ সালে; অর্থাৎ তাঁর যৌবনকাল অতি-বাহিত হয়েছে এ শতাব্দীর এক দুর্ভাগ্যজনক সময়ে এবং বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত

দেশের নাগরিক হিসাবে। যুদ্ধের সময়ে তিনি আত্মগোপনকারী মুক্তিসেনাদের কাজকর্মে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধের পরেও স্ট্যালিনি তালার আড়ালে তাঁর সৃজনী ক্ষমতা বহুকাল রুদ্ধ থাকে। প্রথম বই প্রকাশ করতে হার্বাটকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। যুদ্ধ, বিপ্লব, রাজনীতি এইসব নৈর্ব্যক্তিক দায়িত্ব ও দুর্বিপাক কবি হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করেছে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে করেছে প্রশস্ত। বর্তমান সংগ্রহটি থেকে মনে হল তাঁর কাব্যচেতনার মূলে একটি সামাজিক কল্যাণবোধ প্রতিষ্ঠিত। এই মানবিক কল্যাণদৃষ্টির কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক আলভারেজ তাঁর ভূমিকাতে। তিনি বলেছেন হার্বাটের কবিতা মূলতঃ রাজনৈতিক এই কারণে যে তিনি সর্বদাই একক সংগ্রামে বিশ্বাসী। এবং তাঁর সংগ্রাম সমাজদেহের সর্বপ্রকার অতিরেকের বিরুদ্ধে। সম্ভবতঃ মহাযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে তিনি এই শিক্ষা পেয়েছেন যে গোষ্ঠীজীবনের সমস্ত সংকটের কেন্দ্রে আছে ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক প্রসার। যেমন ধরা যাক Elegy of Fortinbras কবিতাটি যেখানে হ্যামলেট নাটকের দুটি চরিত্র, হ্যামলেট ও ফর্টিনব্রাসকে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যামলেট বুদ্ধিমান, যোদ্ধা, কবি এবং আদর্শবাদী, তার চরিত্রে নাটকীয়তার উৎস তার ব্যক্তিগত নৈতিকতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক নীতিহীনতার সংঘাত। ফর্টিনব্রাস প্রায় একই পরিস্থিতিতে জড়িত; তবু তাকে প্রায় হ্যামলেটের বিপরীত প্রতিচ্ছবি বলা চলে। তার চরিত্রে ঔজ্জ্বল্য নেই তেমন, সে নারী-বিদ্বেষী নয়, বাক্‌পটু নয়, কলারসিক নয়, তার নৈতিক ইন্দ্রিয়ে প্রাত্যহিকতার শৈথিল্য। নাটকের শেষে একমাত্র ফর্টিনব্রাস-ই অস্তিত্বের বোঝা টেনে নিয়ে চলে। হার্বাটের ফর্টিনব্রাস হ্যামলেটের উদ্দেশে বলে

> Adieu prince I have tasks a sewer project
> And a decree on prostitutes and beggars
> I must also elaborate a better system of prisons
> Since as you justly said Denmark is a prison
> I go to my affairs this night is born
> A star named Hamlet We shall never meet
> What I shall leave will not be worth a tragedy

এখানে ফর্টিনব্রাসের মুখে কবি তাঁর নিজের বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করেছেন। অস্তিত্বের স্থিতি ও নির্ভর আসতে পারে একমাত্র সর্বপ্রকার উৎকেন্দ্রিকতার অবসানে, এই তাঁর বিশ্বাস। সে হিসাবে তিনি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির সম্মিলিত আশাকেই প্রতিফলিত করেছেন।

তবে হার্বাটের কবিতা সে অর্থে সাধারণীকৃত নয়। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তিনি যে বহুবর্ণময় ব্যক্তিত্বের বিসর্জনের কথা বলেছেন তার উপর কিঞ্চিৎ দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প লেগে রয়েছে। যান্ত্রিকতাকে মানবজীবনের চরম সোপান হিসাবে মেনে নিতে তাঁর দ্বিধা আছে প্রচুর; কিন্তু তাঁর চিত্তে মানবিকতা প্রবল। এবং এই সর্বব্যাপী মানবিকতার প্রয়োজনেই ব্যক্তিত্বকে যূথস্বার্থের ছাঁচে ঢালাই হতে হবে। তাঁর Objects নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতা পূর্ণ উদ্ধারের লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

Inanimate objects are always correct and cannot, unfortunately, be reproached with anything. I have never observed a chair shift fram one

foot to another, or a bed rear on its hind legs. And tables, even when they are tired, will not dare to bend their knees. I suspect that objects do this from pedagogical considerations, to reprove us constantly for our instability.

যে বেদনাকে আবৃত করবার জন্য তাঁর এই তির্যকভাষণ তা পুরোপুরিই দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়েছে পূর্বোল্লিখিত Fortinbras কবিতাটিতে। সে কবিতাটি পড়লে মনে হয় কোন আদর্শ কবির অন্বিষ্ট—হ্যামলেটের না ফর্টিনব্রাসের ?

তবে এ-সব হার্বাটের কবিতার তত্ত্ব-সম্পর্কিত প্রস্তাব, যাকে সৎ বা আন্তরিক আখ্যা দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু সচেতনভাবে মৌলিক বললে কিছু সন্দেহ হবে। কিন্তু নিছক শব্দশিল্পী হিসাবে সিগনিউ হার্বাট অনেক বেশি মৌলিক এবং স্বতন্ত্র। তিনি কবি হিসাবে অত্যন্ত সংযত। তাঁর মিতভাষিতা প্রায়ই পাউন্ডকে মনে করিয়ে দেয়। তাঁর কবিতার বিষয়বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। টেবিল, চেয়ার, নুড়ি, কাচ—সবকিছুর উপরই তিনি খুব প্রাবন্ধিক ধরনে কবিতা লিখেছেন, এই বিপুল জড়জগতের মধ্যেই তিনি জীবনের সমস্ত রূপক সন্ধান করেছেন। তাঁর চিত্রকল্প দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতি কালানুমোদিত কাব্যবিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগ কম। তাঁর মননে একটি সঙ্কোচনী প্রতিভা আছে যা প্রকৃতির অপার ঔদার্যকে নিজের হাতের মাপে ছোট করে দেয় :

forest of arden
from umbrella
ionian sea
from parkers quink ('Nothing Special' পৃঃ ৮১)

এই সংকলনের প্রথম কবিতা 'Two Drops' হার্বার্টের অল্প বয়সের রচনা। কিন্তু সে কবিতাতেও এই ধারাটি লক্ষণীয়। একটি পুরুষ একটি নারীকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করছে, এবং সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে নেমে আসছে বোমা। তারা আসন্ন মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে।

To the end they were brave
To the end they were faithful
To the end they were similar
Like two drops
Stuck at the edge of a face.

কবিতাটি অল্প বয়সে লেখা সন্দেহ নেই। রীতিমত কাঁচা লেখা—মোটেই এ সংকলনের উপযুক্ত নয়। তবু যেটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল শেষ দুটি লাইন like two drops/ stuck at the edge of a face। অন্যত্র কবি তাঁর কল্পনাকে তুলনা করেছেন বিলিয়র্ড টেবিলের সঙ্গে, যেখানে :

I strike the doard
it answers me
yes—yes
no—no

অর্থাৎ, সিগনিউ হার্বার্ট সর্বদাই তাঁর তত্ত্বকে বস্তুময় আধারে পরিবেশন করতে সচেষ্ট। কবি হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের এটিই সম্ভবতঃ মূল কারণ।

তবে dramatic monologue-এ লেখা কবিতাগুলি সম্পর্কে তাঁকে কিঞ্চিৎ উদাসীন বলে মনে হয়। তিনি বিভিন্ন চরিত্র অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই পুনরাবৃত্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তা। হার্বার্টের কবিতা মূলতঃ অ-নাটকীয়। ব্রাউনিং-এর মতো একটি সজীব চরিত্র সৃষ্টি করতে কবি কখনোই সচেষ্ট হননি। তাঁর কবিতার কণ্ঠস্বর একান্তভাবেই ব্যক্তিগত।

কবিতার অনুবাদ হয় কি হয় না সে তর্ক না তুলেও বলা যায় এই অনূদিত কবিতাগুলি কাব্যভাষার লক্ষণ অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সুমিত মিত্র

সহজ সুন্দরী—কবিতা সিংহ। চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী। কলিকাতা ৯। মূল্য তিন টাকা।

চেতনাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলার প্রবণতা একদিকে যেমন শ্রীমতী কবিতা সিংহের কবিতার অব্যবহিত লক্ষণ, তেমনি, তাঁর প্রথম কবিতার বই, "সহজ সুন্দরী"তে এমন অনেক কবিতা আছে, সংবেদনশীলতার গুণে যার আকর্ষণ হয়তো এড়ানো যায় না; অথচ, যা আসলে কোন মহিলা কবিরই রচনা। উপরোক্ত দুইয়ের বিরোধ এতই স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল যে, এই বই থেকে দু' ধরনের কবিতা বেছে নিয়ে দুটি পৃথক সংকলন হতে পারত। এক, যা বুদ্ধিপ্রবণ, সমসাময়িক বিভিন্ন চৈতন্য ও ঘটনার সংমিশ্রণে তৈরী; দুই, তাৎক্ষণিক আবেগের সৃষ্টি কিছু ছিমছাম প্রেমের কবিতা।

দ্বিতীয়-শ্রেণীভুক্ত কবিতার সংখ্যাই "সহজ সুন্দরী"তে বেশি। অন্য ধরনের কবিতাগুলি হয় কবির নিয়মিত চর্চার ব্যতিক্রম, না হয় একটি বিশেষ সময়কালে রচিত, যার ফলে কবিচারিত্র্যের অসম ধারাবাহিকতা দেখা দিয়েছে—কবিতা-পাঠকের মনে যা কিঞ্চিৎ বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য, ভূমিকায় স্পষ্ট, সংকলনের কবিতাগুলি গত আঠারো বছরের নানা সময়ে রচিত, তথা প্রকাশিত। এই দীর্ঘ সময়কালে যদি শ্রীমতী কবিতা সিংহের মনোধর্মে নানা বৈপরীত্য ও পরিবর্তন দেখা দিয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তবু, নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঈষৎ আর্দ্র, হার্দ্যগুণসম্পন্ন প্রেমের কবিতা রচনাই শ্রীমতী সিংহের বৈশিষ্ট্য; এবং এই বৈশিষ্ট্য কোথাও কোথাও পরিশুদ্ধতার স্তরে উন্নীত।

না, আমি হব না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।
হবো না শিমুল শস্য সোনালী নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম।

কবিতা লেখার পরে বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেব না।
আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ;
জানলে না কাটামুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তী-অসুখ।

লোনা জল ঝাপ্‌সা করে চুপিসাড়ে চোখের ঝিনুক।

অন্ধকার আছে বলে, হতে পারি চমৎকার দুই
প্রতিমার মত এই নীল মুখ তুমি দেখবে না
তোমার বাঁ পাশে তাই নিশ্চিন্ত পুতুল হেন শুই

যন্ত্রণা আমাকে কাটে, যেমন পুঁথিকে কাটে উই। ('না'। পৃঃ ১)

পরিচ্ছন্ন শব্দচয়ন ও ব্যঞ্জনাধর্মিতায় রীতিমতো মৌলিক, 'না' একটি সফল কবিতা; কিন্তু, লক্ষ্য করেছি, উপরোক্ত কবিতার বাক্‌সংযম কিছু কবিতায় রক্ষিত হয়নি। কোন কোন কবিতা আবার সৌখীন শব্দের ব্যবহারে অতিরিক্ত রকমের সপ্রতিভ :

বুলেট বিক্ষত চিত, বিস্তীর্ণ তুয়ারে চিত শুয়ে থেকে
বড় লজ্জা হয়।
এত যে বিক্ষত তবু একবিন্দু রক্ত নেই বলে লজ্জা
বাঘের নিকটে।
চোখ নেই, জিভ নেই পেটের ভিতর কোন খাদ্যনালী নেই
বলে খুব লজ্জা হয় ডোমদের কাছে। ('কাল রাত্রে প্রেমহীনতায়'। পৃঃ ৭)

কিংবা,

এই মাত্র এক লক্ষ মিথ্যা বলে
আমরা দুজনে ছ-কাপ চা।
আমরা দু'জনে, ছ-কাপ চা ও এই মাত্র এক লক্ষ মিথ্যা। ('শুধু আমরা দু'জন'। পৃঃ ৩৫)

এই ধরনের চটুল ও চমকপ্রদ পংক্তি গতানুগতিকতায় আক্রান্ত, প্রচলিত আধুনিকতার শর্ত পূরণ করেই ক্ষান্ত হয়; অন্তত, 'না' কবিতার কবিকে অধিকন্তুর মর্যাদা দেয় না। এই কথা বলতে হল শুধু এই কারণে যে, ঠিক ঠিক শব্দব্যঞ্জনায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সর্বজনীন ও হৃদয়সংবেদ্য করে তোলার অনেকানেক প্রমাণ আছে "সহজ সুন্দরী"তে, যা একই সময় মৌলিক ও তাৎপর্যময়—

আত্মমৈথুন ছাড়া কিছু নেই
নিজের বীর্যের দ্বারা নিজে গর্ভবান হতে হতে
ক্রমশ নিজের গর্ভে নিজেরই জন্ম দিতে দিতে
ক্রমশ নিজের রক্তে নিজেরই রক্ত ঘষে ঘষে
দারুণ ক্যান্সার রোগে ক্রমাগত জীর্ণ হতে হতে
নিজেকেই গিলে ফেলে অচেতন মল ফেলে যাওয়া
সেই সব চিহ্ন খুঁটে খুঁটে
ভবিষ্যৎ বলে দেবে
আমাদের প্রত্যেক পতন। ('অসমাপ্ত কবিতা'। পৃঃ ৪১)

ভাবতে ভাল লাগে, পরিণত চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসাপ্রসূত উপরোক্ত পংক্তিগুলি এই চটক-চমৎকৃত সন্তুষ্টির যুগে বাস করেও একজন তরুণ কবিই লিখতে পেরেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত

ত্রিংশত্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫

বয়কট, বোমা ও ভদ্রলোক, ১৯০৫-১৮

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হিন্দুদের কল্পনায় ঈশ্বর অনাদি এবং অনন্ত। ইতিহাসও তেমনি, কারণ তার আশ্রয় মহাকাল। তবু ঐতিহাসিক যিনি, তাঁকে কোন একটা বিশেষ সময় থেকে তাঁর কাহিনী শুরু করতে হয়, কোন একটা বিশেষ সময়ে থামতে হয়। বিশ্ব-ইতিহাস রচনার দুরভিপ্রায় যদি তাঁর না থাকে তাহলে স্থান কাল ও পাত্রের দিক থেকে তাঁকে বাছাই করতেই হয়, অখণ্ড সময় থেকে এমন কয়েকটা বছর তুলে নিতে হয় যার একটা নিজস্ব চরিত্র আছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ এইরকম একটি পর্ব। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে এতদিন ছিল মডারেটদের রাজত্ব; এখন সেখানে, অন্তত বাংলায় পাঞ্জাবে মহারাষ্ট্রে, এক্স্ট্রিমিজ্ম্ নামে নতুন মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মডারেট নেতাদের প্রার্থনা ছিল সরকারী চাকরির যথাসাধ্য ভারতীয়করণ; এক্স্ট্রিমিস্ট্রা দাবী করলেন 'স্বরাজ' কিংবা স্বাধীনতা। পাকেচক্রে মডারেট পক্ষ থেকেও নানা শাসন-সংস্কার চাওয়া হল যাতে ভারতবাসী স্বাধীনতা না হোক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য তৈরী হতে পারে। শুধু 'স্বরাজ' নয়, আর এক নতুন ধুয়ো উঠল: স্বদেশী। স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের কথা যে এর আগে ভাবা হয়নি তা নয়, তবে সে ভাবনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ধরনের কয়েকজন আদর্শবাদীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে স্বদেশী ব্যবহার এবং বিলিতি বর্জন স্বদেশীকে সিডিশস চেহারা দিল। যা ছিল একটা ধোঁয়াটে অর্থনৈতিক আদর্শবাদ তা পরিণত হল বয়কট নামক রাজনৈতিক অস্ত্রে। বয়কটের হাত ধরে এল টেররিজ্ম্। ১৯১১ সালে বাংলাদেশ জোড়া লাগলেও সন্ত্রাসবাদ অব্যাহত রইল যতদিন না, ১৯১৯-এ, গান্ধীজী সারা ভারতে আর একটি নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন: অহিংস অসহযোগ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা অধ্যায় মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে আর একটা অধ্যায় শুরু হল। তারপর ভারতবাসীকে আরও যেতে হয়েছে: জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে চৌরিচৌরা, সেখান থেকে ডান্ডি আর চট্টগ্রাম, তার পর মেদিনীপুর, কোহিমা, লাল কেল্লা। মাঝে মাঝে কতগুলি নোংরা কিন্তু স্মরণীয় স্টেশন: কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার।

একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য ছিল নিরস্ত। সমুদ্রপথে বিকীর্ণ ছিল নানা ব্রিটিশ ঘাঁটি, তাদের মধ্যমণি ভারত। স্বাধীন ভারতের কল্পনায় সাম্রাজ্যবাদীর গা শিউরে উঠত। 'ভারতের বিরাট বাজার হাতছাড়া হবে, ব্রিটিশ শক্তির মেরুদণ্ড যে ভারতীয় সেনাদল তারাও বেহাত হবে, আমরা শক্তি হিসেবে একটা তৃতীয় শ্রেণীর মুর্খামিতে তলিয়ে যাব'—এই কথা বলে ১৯০৯ সালে কার্জন আক্ষেপ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে ভারতশাসনের মূলে ছিল ব্রিটিশের স্বার্থের তাগিদ; কিন্তু সেকথা স্পষ্ট স্বীকার করতে সভ্যতায় বাধে, সেজন্য শাসকেরা 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বহনের গুরু দায়িত্বের কথা তুলে মুখরক্ষা করতেন। বলার দরকার হত যে ধর্মবিরোধ আর আঞ্চলিক কলহে বিদীর্ণ ভারত ইংরেজের কাছে পেয়েছে শান্তি ও ঐক্য। ভারতীয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হত যে ইংরেজি লেখাপড়া আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই প্রবীণ কিন্তু কুসংস্কারদুষ্ট দেশকে আধুনিক কালের চৌকাঠে এনে পৌঁছে দিয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে আর একটু যাঁদের চক্ষুলজ্জা বেশি ছিল, যেমন এল্‌ফিন্‌-স্টোন কিংবা মেকলে কিংবা রিপন, তাঁরা নিজেদের এই নাবালক জাতির গার্ডিয়ান হিসেবে কল্পনা করে সুখ পেতেন, নাবালকেরা যতদিন না সাবালক হয় ততদিন তাদের হাতেকলমে স্বায়ত্তশাসনের বিদ্যা শেখাতে হবে। মানুষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়ের ক্ষমতা না থাক আছে মঙ্গল।

মহারানীর হয়ে ভারত শাসন করতেন বড়লাট। বিলেতে ভারতসচিব ও ভারতে বড়লাট এই দুয়েরই ওপরওয়ালা ছিলেন পার্লামেন্ট। সাধারণ মানুষের কাছে এ সবই দূরের ব্যাপার। বহু যুগ স্বৈরাচারে অভ্যস্ত, তারা বুঝত থানার দারোগাকে, জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে। সিভিলিয়ানরাও বড়লাটকে ভাবতেন তাদের ইজ্জতের—শাসনবর্গের কাছে ইজ্জত শব্দটি ছিল মন্ত্রের মতো—প্রতিভূ। দূর কোন দ্বীপ থেকে তাঁর আসা-যাওয়া ছিল প্রায় শীতের পাখির মতো। চার-পাঁচ বছরের জন্য এদেশে এসে বাঘ শিকার করে, নবাব-মহারাজার সঙ্গ করে, নকল-মোগলাই দরবার ডেকে আর বিশেষ সময় থাকত না ভারতবর্ষ চেনার। আই. সি. এস.-রা এদেশে বছর ত্রিশ কাটাতেন, তাঁদের অনেকেই বিশেষ কুশলী ও পরিশ্রমী ছিলেন, কিন্তু স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ ও ইউরোপিয়ান ক্লাবের বাইরে ভারতবর্ষের সত্য-রূপ পরবাসী তাঁদের কাছে ধরা পড়ত না। তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছেই পড়ে না!

সে যাই হোক, তাঁরা ছিলেন ভারতবর্ষের গার্ডিয়ান। কিছু ভারতবাসী অবশ্য সেকথা মানতে রাজী ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ তাই বহু বিদ্রোহে চিহ্নিত। কোনটা কৃষকবিদ্রোহ, কোনটা উপজাতিবিদ্রোহ এবং অধিকাংশই প্রভাবে আঞ্চলিক। সমগ্র ভারতের ইতিহাসে তাদের তাৎপর্য যৎসামান্য। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান অনেক বড় দরের বটে, কিন্তু সে আন্দোলনও ঠান্ডা করা হয়েছিল এবং তার রাজকীয় নেতৃবর্গ ব্রিটিশ আড়ম্বরের বশংবদ অংশীদার হতে বিশেষ বিলম্ব করেন নি। বাঙালীর রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে ১৮৫৭ অনুল্লেখ্য বছর। বাংলাদেশে হাঙ্গামা ছিল না তা নয়—১৭৫০-এর পরেকার বিদ্রোহী সন্ন্যাসী কিংবা সমস্ত উনিশশতক-জোড়া জলঠগী আর জমিদার-ডাকাতের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এসবের মধ্যে রাজনীতির গন্ধ ছিল না। যাকে পোলিটিশ্যানরা masses বলেন সেই দিন-আনি-দিন-খাই গোছের মুসলমান কিংবা নীচবর্ণের হিন্দু চাষী-মজুরদের মধ্যে তখনও ইংরেজির আলো এসে পৌঁছয় নি, তাদের চোখে সরকারই মা-বাপ। এ নয় যে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল না, না থাকলে নীল বিদ্রোহ হত না, কিন্তু এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্য ভদ্রলোকের আবিষ্কার। পীনাল কোডের অঙ্কে প্যাক্‌স্‌

ব্রিটানিকা মোটের উপর ভালই বিরাজ করছিল।

রাজনৈতিক চেতনা সে যুগে মোটামুটি আবদ্ধ ছিল ভদ্রসমাজে, বাংলাদেশে, যে স্থান ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রথম ঘাঁটি। পরবর্তী বয়কট ও বোমার আন্দোলন বহুলাংশেই বাঙালী ভদ্রলোকের আন্দোলন সে কথা শুধু যে সিডিশান কমিটি বলেছেন তা নয়, বোমারু যুগান্তর গ্রুপের ভুপেন দত্ত ও টেররিস্ট অন্যান্য কেউ কেউ স্বীকার করেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে আমলের ভদ্রলোক কারা? ভদ্র ব্যবহার যাঁর তিনিই যদি ভদ্রলোক হতেন তাহলে আর ভদ্রলোক দিয়ে কোন আন্দোলন হত না, কেননা সে অর্থে ভদ্রলোক বাংলাদেশে কেন সর্বত্রই নামমাত্র। ইতিহাস-ব্যাখ্যায় ভদ্রলোকের আক্ষরিক সংজ্ঞা অচল।* ঈশ্বরের মতো ভদ্রলোককে নেতি-নেতি করে পেতে হয়। ভদ্রলোক শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণের সোজা উপায় হল ভদ্রলোক কে নন সেটা আগে জানা। ভদ্রলোক আর যাই হোন তিনি ছোটলোক নন; এবং ভদ্রলোকের ধারণায় ছোটলোক তারাই যারা গায়ে খেটে জীবিকার সংস্থান করে। গায়ে-খাটা মানুষ বাদে এই পোড়া বাংলাদেশে সবাই ভদ্রলোক। বিশ্রান্ত জমিদার ও খাজনা আদায়কারী, কলমঠেলা কেরানী ও সরকারী চাকুরে, ডাক্তার উকিল ছাত্র মাস্টার এরা সবাই ভদ্রলোক। এদের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙালী হিন্দুদের তিনটি উচ্চবর্ণের মধ্যে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যেরা তখনকার ভদ্রলোক জোগাতেন। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল। পাচক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নয়, কেননা সে গায়ে খাটে। আবার, উল্টো দিক থেকে, ইংরেজ আইনের চোখে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ ঘুচে আসছিল এবং পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারের ফলে নিম্নবর্গের কেউ কেউ, যেমন বিখ্যাত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ভদ্রলোকের মন্ত্রপড়া গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে পড়ছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায়, ভদ্রলোক হতে গেলে হয় উচ্চবর্ণে জন্মাতে হত, নয় কিছু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (ইংরেজি হলে ভাল) লাভ করতে হত; কিছু সম্পত্তি ও কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকলে সোনায় সোহাগা। দৈহিক পরিশ্রম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নির্লিপ্তিও ভদ্রলোকের লক্ষণ। সুতরাং ভদ্রলোকের ইংরেজি প্রতিশব্দ middle class বললে ভুল হবে। পশ্চিমের ব্যবসাবাণিজ্যভিত্তিক middle class-এর মতো ভদ্রলোক একটা অর্থনৈতিক শ্রেণী নয়। পশ্চিমে যোগ্যতার বলে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে ওঠা যায়; ভারতে ভদ্রলোক হওয়া অনেকটাই দৈবায়ত্ত। ম্যাক্স্ ওয়েবার থেকে ধার নিয়ে বলতে পারি, ভদ্রলোক একটা 'status group'।

ভদ্রলোকেরা জন্মাবধি রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতেন নি। কৃষকের পরিশ্রমে পুষ্ট হবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁদের করে দেয়া হয়েছিল ১৭৯৩ সালে। তাঁরা সরকারের হয়ে খাজনা আদায় করতেন, ইংরেজি স্কুলে ছেলে পাঠাতেন। ইংরেজি শিখলে গাড়িঘোড়া চড়া যাবে এটাই একমাত্র গরজ ছিল বললে ভদ্রলোকের প্রতি অবিচার করা হবে। পশ্চিমী সভ্যতার উৎকর্ষে তাঁদের কেউ কেউ আন্তরিকভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৫৭-র রাজনৈতিক আঁচ তাঁদের গায়ে লাগে নি, তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন সমাজ- ও ধর্ম-সংস্কার নিয়ে। সব মিলিয়ে তাঁরা সুখেই ছিলেন।

তবু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার হাওয়া কিছু রাজনীতির বীজ উড়িয়ে আনল ভদ্রসমাজে।

* একটি আনুষঙ্গিক শব্দ বাবু। এরও অনেক মানে। যখন বলি বাবু অমুক, তখন বাবু কথাটা ইংরেজি মিস্টরের কাজ সারে। বাবু বলতে জমিদারও বোঝায়, গরীব কেরানীও বোঝায়। আবার ফুল-বাবুও মনে পড়ে। ভদ্রলোকের আন্দোলনে বিরক্ত ইংরেজ বাবু বলতে বুঝত সেই সব বি-এ ফেল বাঙালীদের যারা রাজকীয় ইংরেজির শ্রাদ্ধ করে বাবু ইংরেজিতে কথা বললেও উচ্চতর সরকারী চাকরি চাওয়ার স্পর্ধা করত।

ইংরেজি রোম্যান্টিক সাহিত্য আর য়োরোপের ইতিহাস পাঠ বৃথা গেল না, জন্ম নিল জাতীয়তাবোধ। উপরন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বেও পরভোজী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী খাজনা আদায়কারীদের সমৃদ্ধি ক্ষয়ে আসছিল। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সমদৃষ্টির ফলে খাজনা আদায়কারীদের সংখ্যা ভূয়সী বেড়ে চলেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের ধাতে সইত না, সুতরাং তাঁরা কেরানীগিরিতে ঢুকতে আরম্ভ করলেন। কেউ কেউ শিক্ষক কিংবা উকিল হবার জোগাড়ে লাগলেন। উচ্চাভিলাষী ভদ্রলোকেরা আরও উঁচুতে নজর দিলেন; তাঁরা আই. সি. এস. হতে চাইলেন। সেই তাঁদের আন্দোলনের সূচনা।

বাঙালী তথা বাঙালীসদৃশ ভদ্রলোকের এই আই. সি. এস আন্দোলনের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খানিকটা বংশপরম্পরায় যুক্ত। সন্দেহ কী, তাঁদের দেশাত্মবোধ কিছুটা উন্মার্গগামী। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের জনকেরা সাহেব গার্ডিয়ানকুলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত ছিলেন যে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব দৈব অভিপ্রায়ের ফল। সুতরাং সরকারী চাকরির দরখাস্ত দিয়ে তাঁদের আন্দোলন আরম্ভ, রাজনৈতিক অধিকার চেয়ে নয়। ১৮৫৮ সালে মহারানীর ঘোষণাপত্রে শিক্ষিত ভারতীয়ের সরকারী চাকরির প্রতিশ্রুতি ছিল মাত্র। ইংল্যান্ডের ইতিহাস-পড়া ভদ্রলোক তাকেই Magna Carta বলে ঠাওরালেন।

মুশকিল এই যে আই. সি. এস. পরীক্ষা হত ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড দূর অস্ত্। পরন্তু পুরোহিতশাসিত হিন্দু ভদ্রলোকের কালাপানি পেরিয়ে জাত খোয়াবার ভয় ছিল। সরকারও চাইতেন না যে ভারতীয়েরা, বিশেষত বাঙালী, আই. সি. এস.-এ ঢুকুক। আই. সি. এস. নামের মধ্য দিয়ে সাহেবেরা যে জাদু বিস্তার করেছিলেন সে জাদু ভেঙে যাবার ভয় ছিল। কারণ লেখাপড়ায় বাঙালীর সুনাম ছিল, তাদের পক্ষে আই. সি. এস. হওয়া কঠিন ছিল না। সেজন্য সরকারী কর্তারা বাঙালীর পৌরুষে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা রটালেন মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে দেশ শাসন করা যায় না, তার জন্য চাই পৌরুষ। ইংরেজি-শেখা ভদ্রলোকেরা টললেন না। ১৮৬৯-এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও দুজন বাঙালী আই. সি. এস. হলেন। সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য, পরে প্রতিদ্বন্দ্বী, বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের সাফল্য তাঁদের স্বদেশবাসীর মধ্যে 'একটা নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করল......দলে দলে সিভিল সার্ভিসে ঢুকতে হবে এবং সেই সার্ভিসের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের শাসনভার আমাদের হাতে তুলে নিতে হবে।' ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটানোর ইচ্ছে কিছু লক্ষ করা যায় না; যা লক্ষণীয় সে হচ্ছে বালসারল্য, ভাবখানা এই, যেন আই. সি. এস. ছাড়া ব্রিটিশরাজের আর কোন জীয়নকাঠি ছিল না।

ব্রাউন হলে কী, সিভিলিয়ান দেশপ্রেমিকেরা 'সাদা মানুষের বোঝা' ঘাড়ে তুলতে উৎসাহী। তাঁরা ছিলেন এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী, শুধু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের জন্ম হয়েছিল ভুল দেশে। কিছু অপমান তাঁদের কপালে লেখা ছিল। সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল ১৮৭৪-এ তুচ্ছ অপরাধে। ঐ ঘটনা ভদ্রলোকের আন্দোলনে উৎসাহ জোগাল। বিপিন পাল মহাশয়ের স্মৃতিকথা পড়লে জানা যায় Her Britannic Majesty-র তাঁরা প্রজারূপে তাঁরা নিজেদের ব্রিটিশের সমগোত্রীয় ঠাওরাতেন। সে ধারণায় একটা রূঢ় আঘাত পড়ল। দু-বছর বাদে আই. সি. এস.-এ ঢোকার ঊর্ধ্বতম বয়স একুশ থেকে নামিয়ে করা হল উনিশ। ভদ্রলোকেরা সন্দেহ করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে আই. সি. এস. দুর্গ দুর্ভেদ্য করার চেষ্টা চলেছে। সন্দেহে ভুল ছিল না। ভাইসরয় লিটন সরকারী দলিলে লিখে রেখে গেছেন যে ভারতীয়ের কানে-কানে কর্তৃপক্ষ যে প্রতিশ্রুতি জপতেন হৃদয়ে দাগা দিয়ে সে প্রতিশ্রুতি

ভাঙতেও তাঁরা ছিলেন তৎপর।

সুরেন্দ্রনাথ অদম্য Surrender-Not। তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত Indian Association-এর মাধ্যমে ইংরেজি-পড়া ভারতীয়দের তিনি আন্দোলিত করতে লাগলেন। বিভিন্ন প্রদেশ জুড়ে এই ধরনের আন্দোলন আগে হয় নি। তাছাড়া কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে তিনি ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির বিষয়ে বক্তৃতা চালালেন। কিছু গুপ্ত সমিতি জন্ম নিল যার বর্ণনা আছে বিপিনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। বাঙালী তরুণেরা সিভিলিয়ান-দেশপ্রেমিকদের জন্য শহীদ হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। বিপিনচন্দ্রই লিখেছেন: 'সে-সব দিনে পলিটিক্স্ ছিল নিরাপদ...সমস্তটাই একটা অবসর বিনোদনের ব্যাপার'।

সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ: আই.সি.এস. পরীক্ষার্থীদের বয়সের সীমাবৃদ্ধি এবং ইংল্যান্ড ও ভারতে যুগপৎ পরীক্ষার ব্যবস্থা। তাঁর আন্দোলনের পরোক্ষ ফল ইংরেজিশিক্ষিতের জাতীয়তাবোধ। অধস্তন সরকারী চাকরি নিয়েও ঠেলাঠেলি লেগে গিয়েছিল ক্রমবর্ধমান ইংরেজিশিক্ষিতের মধ্যে। তাঁরা অফিসে-অফিসে ধর্না দিলেন, চাকরি দুর্লভ হওয়ায় জেলায় জেলায় রাজনৈতিক অ্যাসোসিয়েশন গড়লেন। খবরকাগজে সরকারী নিয়োগনীতি এবং শ্বেতাঙ্গের বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে সমালোচনা লেখা হতে লাগল। তার জবাবে ১৮৭৮ সালে লিটন পাশ করলেন ভার্নাকুলর প্রেস অ্যাক্ট্।

ইতিমধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যাঁর ফলে জাতীয়তাবোধ চাকরি-খোঁজার স্তর থেকে উত্তীর্ণ হতে সুযোগ পেল। কর্নেল অল্কট্ ও মাদাম ব্লাভাট্স্কি ভারতে এলেন তাঁদের থিওলজিক্যাল সোসাইটি নিয়ে। হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন করে বহু ইঙ্গবঙ্গ হিন্দুকে তাঁরা হিন্দু বলে গর্বিত হতে শেখালেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন তাঁর বিখ্যাত বন্দেমাতরম সঙ্গীত। ১৮৮২ সালে সেই গান আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্গত হয়, আরও পরে বন্দেমাতরম স্বাধীনতা আন্দোলনের স্লোগান হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৮৩ সালে ইলবর্ট বিল নিয়ে হৈ-চৈ আর এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় জেলাশাসক ও সেসন্স্ বিচারকদের ক্ষমতা ছিল না ব্রিটিশ অপরাধীর বিচার করার। ইলবর্ট বিলের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সেই ক্ষমতা দেয়া। অসভ্য 'নেটিব' তাদের বিচার করবে এই চিন্তা শ্বেতাঙ্গের পক্ষে সুখপ্রদ ছিল না। তাঁরা ভাইসরয় রিপনের এমনই শ্রাদ্ধ করলেন যে সেই বিল তুলে নেয়া হল। এই ঘটনায় ভদ্রলোকের যথেষ্ট শিক্ষা হল। বিপিনচন্দ্র বলছেন যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের (সে যুগে যার অর্থ ছিল ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ) কাছ থেকে তাঁরা অনেক কিছুর সঙ্গে রাজদ্রোহের অ-আ-ক-খ শিখলেন। তাঁরা বুঝলেন যে ন্যায্য অধিকার কায়েম করতে হলে সবিনয় নিবেদন কোন কাজের কথা নয়, চাই অসংযত আন্দোলন। দ্বিতীয়ত, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিদ্বেষ বহুলাংশে বেড়ে উঠল। বিলেতের মোহ খানিকটা কেটে গেল। এই বিশ্বাস জন্ম নিল যে পশ্চিমের নকল করে নয়, ভারতকে তার নিজের মতো করে বেড়ে উঠতে হবে। সমাজসংস্কারের আন্দোলনে বাধা পড়ল, কারণ অনেকের সন্দেহ হল যে সমাজসংস্কার মানে বুঝি পশ্চিমীকরণ। রাজনীতির মধ্যে হিন্দু গোঁড়ামি এসে মিশ্রিত হল।

ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কে এই যে তাল কাটল তাতে অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের মডারেট কর্তাদের হুঁশ ছিল না। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কংগ্রেসকে তাঁরা ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট মনে করে সুখ পেতেন। নিজেদের মনে করতেন অপোজিশনের সদস্য। পরাধীন দেশে এই এক পার্লামেন্ট-পার্লামেন্ট খেলা চলেছিল। মডারেটরা ইংল্যান্ডের জনমত

প্রভাবিত করবার জন্য 'constitutional agitation' চালিয়ে যেতে লাগলেন। খেয়াল ছিল না যে ভারতবর্ষের কোন সংবিধান নেই। তাঁরা প্রার্থনা করতেন যুগপৎ আই.সি.এস. পরীক্ষা, সামরিক ব্যয়হ্রাস, শাসনব্যবস্থার আর একটু ভারতীয়করণ ইত্যাদি। তাঁদের প্রার্থনা হোয়াইটহল, কলকাতা কিংবা সিমলার মেঘলোকে দেবতাদের কানে পৌঁছত না, পৌঁছলেও দেবতারা বরাভয়ে দ্রব হতেন না। কংগ্রেসকে জাতীয় সভা মনে করার তখনও কারণ ঘটে নি। কংগ্রেসে রাজা-মহারাজারা যেতেন না, কৃষকেরা তখনও কংগ্রেসের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ। আলিগড়ের স্যর সৈয়দ আহ্মদ চাইতেন তাঁর স্বধর্মী সম্প্রদায়ের রাজভক্তি অটুট থাক, যাতে সরকারী কর্মলাভ নির্বিঘ্ন হয়। হিন্দুরা ইংরেজি শিখে অনেক অর্জন করেছে, এইবার ব্যালট বাক্স যদি চালু হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা মুসলমানকে আরও পিছনে ফেলবে। তাঁর পরামর্শে মুসলমানেরা কংগ্রেসের ধারেকাছে বিশেষ এগোত না। সুতরাং সরকারী চোখে কংগ্রেসের অস্তিত্ব ছিল 'আনুবীক্ষণিক'।

মডারেটরা যখন বড়দিনে-বড়দিনে তিনদিনের 'তামাশা'য় মত্ত ছিলেন তখন এক্স্ট্রিমিস্ট্দের উদ্ভব। তাঁরা নতুন জাতের রাজনীতিক। মডারেট পদ্ধতিতে তাঁদের রুচি ছিল না। কিন্তু এ কথা বললে ভুল বলা হবে—যদিও অনেকে সে ভুল করেন—যে এক্স্ট্রিমিজ্ম্-এর সৃষ্টিমূলে মডারেট পদ্ধতির ব্যর্থতা। অভিধাহিসেবে মডারেট আর এক্স্ট্রিমিস্ট অসম্পূর্ণ; শুধু সুবিধের খাতিরে কথা দুটো ব্যবহার করা যেতে পারে। এই দুটো শব্দে এই রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দুটি দলেরই উদ্দেশ্যে কোন ভিন্নতা ছিল না, তাদের কলহের কারণ শুধু সেই অভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছনর পথ নিয়ে। এক দলের চরম পথ, অন্যের নরম। প্রকৃতপক্ষে এই দুই দলের উদ্দেশ্যেই ছিল মৌলিক পার্থক্য। পদ্ধতি নিয়ে তর্ক সেজন্য অবান্তর।

ব্রিটিশের সুবিচারে মডারেট আস্থা ছিল দুর্মর। সেজন্য তাঁরা ব্রিটিশ রাজ দূর করতে চান নি, চেয়েছিলেন শাসনব্যবস্থা থেকে 'un-British' কলঙ্ক দূর করে সেই রাজের মহান ছায়াচ্ছত্রে, বড়জোর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে, নিজেদের ভবিষ্যৎ পাকা করতে। আখের গুছোনো যার উদ্দেশ্য আবেদন নিবেদন তার স্বাভাবিক রীতি। পক্ষান্তরে, 'un-British' শাসন নয়, ব্রিটিশ শাসনই এক্স্ট্রিমিস্ট্দের প্রতিবাদের লক্ষ্য। তাঁদের সাধনা স্বাধীনতা, যদিও একথা সোজাসুজি বলতে তাঁদের ১৯০৬ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রাজনৈতিক এই উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁদের সাংস্কৃতিক কিছু কথা ছিল। মডারেটদের বিলিতি চালে তাঁদের ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। সমাজসংস্কার গোঁড়ামিপ্রসূত, তবে অবিমিশ্র গোঁড়ামিপ্রসূত কিনা সন্দেহ আছে। এই সব সংস্কারে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে য়োরোপের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠবে এবং তার ফলে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব পাকা হবে এও তাঁদের আশঙ্কা ছিল। তাঁদের স্বপ্নে ছিল এমন এক ভারতবর্ষ যা কিনা ঘোরতর ভারতীয় (হিন্দু হলে চমৎকার) এবং পশ্চিমের দ্বারা অস্পৃষ্ট।

ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণার আগে এক্স্ট্রিমিস্ট্রা দলবল জোগাড়ে নামলেন। বঙ্কিমের সাহিত্যিক উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আত্মশক্তির কথা শোনালেন। মহারাষ্ট্রে টিলক গোঁড়া হিন্দুদের দলে টানলেন। বাঙালী অরবিন্দ আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন শুধু ইংরেজি-জানা মুষ্টিমেয়র উপর ভরসা করলেই চলবে না, মজাতে হবে 'প্রলেটারিয়েট' সম্প্রদায়কে, তারা হবে New Lamps for Old। পুনায় মহারানীর হীরকজয়ন্তী উৎসবে বিঘ্ন পড়ল দুজন ব্রিটিশ কর্মচারীর গুপ্তহত্যায়। সেই বছর,

১৮৯৭, অ্যামেরিকাবিজয়ী কালীসাধক বিবেকানন্দ বাংলায় ফিরে তরুণ বাঙালীকে মায়ের নামে অভী হবার মন্ত্র দিলেন। আবার তরুণেরা ব্যায়াম সমিতি গড়তে লাগলেন এবং বিবেকানন্দের উপদেশমত, সমাজসংস্কার নয়, সমাজসেবায় মেতে উঠলেন। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা অনুশীলন সমিতি।

ইতিমধ্যে ভারতে বড়লাট কার্জনের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর ইচ্ছে ছিল ক্ষীণস্বাস্থ্য কংগ্রেসের মৃত্যুর পথ প্রসারিত করা। অবস্থাবৈগুণ্যে যা তিনি করলেন তাতে রাজের অবক্ষয়ের পথ পরিষ্কার হল। ভদ্রলোকেরা কোনকালেই কলকাতা শহর পরিষ্কার রাখেন নি। তাঁদের শহর শাসনের ক্ষমতা তিনি ছেঁটে দিলেন। ভদ্রলোকেরা লেখাপড়া শিখে বেকার হয়ে কংগ্রেসের দল ভারী করছেন। সুতরাং য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা তাদের শিক্ষা-সুযোগ সঙ্কুচিত করার প্রস্তাব হল। ভদ্রলোকেরা সরকারের সমালোচনায় মুখর, আসলে তারা মিথ্যাবাদী, সমস্ত প্রাচ্যই মিথ্যাভাষণে পারঙ্গম—কার্জনের এই রূঢ় ধিক্কারে ভদ্রলোকের আঁতে ঘা লাগল। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব মার-খাওয়া ভদ্রলোকদের ভাল করে ঘাঁটিয়ে তুলল।

কার্জনের আগেও বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উঠেছিল এবং বঙ্গভঙ্গের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে নিন্দার কিছু ছিল না। তৎকালীন বাংলা প্রদেশ ছিল বিপুল। বাংলা ছাড়া বিহার ও উড়িষ্যাও তার অন্তর্গত ছিল। এতে শাসনকার্যের অসুবিধে নিশ্চয় ছিল। কিন্তু কার্জন এক জায়গায় ধরা পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকেরা বললেন প্রদেশ যদি শাসনতান্ত্রিক সুবিধের জন্য ভাঙতেই হয় তো ভাঙা হোক, কিন্তু বাংলাভাষী অঞ্চল যেন টুকরো না হয়। কার্জন বাংলাভাষী অঞ্চল দু টুকরো করতে কোমর বেঁধে লাগলেন। তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে তাঁর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক নয়। বাঙালীর, বিশেষ করে কলকাতা ঢাকা ও ময়মনসিংয়ের বাঙালীর যে বড় বাড় বেড়েছে, এ তাঁকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল। সরকারী চিঠিপত্রে তার প্রমাণ আছে। কার্জনী প্রস্তাবে বলা হল যে ঢাকা ময়মনসিং এবং উত্তর ও পূর্ব বাংলার আরও কয়েকটি জেলা আলাদা করে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হোক। এতে যে শুধু বাঙালী ভদ্রলোকের রাজনৈতিক ঐক্য ব্যাহত হবে তা নয়, নতুন একটা প্রদেশ তৈরী হবে যেখানে মুসলমান স্বার্থ প্রাধান্য পাবে।

বাঙালীর জাতীয়তাবোধের নটে গাছটি মুড়োনোর জন্য বঙ্গভঙ্গ। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গে বাঙালীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল। বঙ্গভঙ্গই যে ১৯০৫-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণ তা নয়। আগে থেকেই রাজনীতিক অর্থনীতিক সাংস্কৃতিক অসন্তোষ ছিল। বঙ্গভঙ্গ সেই সব অসন্তোষ উস্‌কে দিল। বিলিতি দ্রব্য বয়কট করা হল, তারপর দেখা দিল সন্ত্রাসবাদ। সরকার এবং উচ্চাশী ভদ্রলোকের মধ্যে যে শত্রুতা দেখা দিল তা শীঘ্র বঙ্গভঙ্গবিরোধী চরিত্র হারিয়ে ব্রিটিশবিরোধী রূপ নিল। তখন থেকে আন্দোলন প্রায় অবিরত বলা যায়। সাম্রাজ্যে ছায়া পড়ল দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর, যদিও সূর্য অস্ত যেতে তখনও চল্লিশ বছরের বেশি বাকী।

[ক্রমশঃ]

জন্ম বেজন্ম

অসীম রায়

মর্গ আর প্রসূতিসদন পাশাপাশি এ হাসপাতালে। ঠিক পাশাপাশি নয়, মাঝখানে একটা লন যেখানে এই শীতের সন্ধ্যে শুরু হতেই নিয়ন আলো জ্বালানো। আর সে আলোয় ঝকমকে ফুলন্ত ডালিয়ার এক হৃদয়হীন রাক্ষুসে সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্যের চুম্বক-আকর্ষণ এমন তীব্র যে এমার্জেন্সি ও দুরারোগ্য পীড়াবিভাগ থেকে আনীত স্ট্রেচারে ঢাকা শবের পাশাপাশি ওয়ার্ডবয়দের অভ্যস্ত চোখও সেই নৈর্ব্যক্তিক শোভার দিকে এক নজর চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়; আর সদ্যোজাত শিশুদের কান্না শোনবার জন্যে পিপাসু কান নিয়ে যাঁরা সমাগত তাঁরাও সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাঁদের ভাঙা জীবনের নৈরাশ্যের মাঝখানে কোন আদি-ভৌতিক আয়েসঘরের স্বপ্ন দেখেন।

বিকেল থেকেই যে লোকটা জন্তুর মতো ভ্রূক্ষেপহীন মমতায় তাঁর পাট-জোয়ান স্থূলাঙ্গী স্ত্রীর হাতখানা জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন তিনি হঠাৎ সরব হয়ে ওঠেন, 'মনু, আমাকে একটা কিছু দাও, একটা কিছু। আমি ছেলেই চাচ্ছি না, মেয়ে হলেও চলবে।'

ভদ্রলোক এককালে নিশ্চয় বিকচ ছিলেন কিন্তু এখন সামনের দিকে দুতিনগাছা কচা অবশিষ্ট মাত্র। মস্ত বড় টাকে, টাই-হীন গায়ের সঙ্গে লেবড়ে থাকা নীল সার্জের সুটে, সিল্কের শার্ট আর সোনার বোতামে, চিবুকের মোটা ভাঁজে, ভাবগম্ভীর গলায় যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিরেট আস্তর তা এই আকস্মিক কাতরতার ছুরিতে ফালা ফালা হয়ে যায়।

—এখনও নড়ছে, এইখানে, এইখানে হাত দাও। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর হাতখানা চাদরের মাঝখান দিয়ে তাঁর তলপেটে রাখেন।

উৎসুক বালক যেমন চকোলেটের লোভে উদগ্রীব তেমনি এক গভীর আকাঙ্ক্ষায় স্ত্রীর তলপেটে হাত রাখেন। গরম চামড়ার মৃদু লোমশ স্পর্শে ভদ্রলোকের উৎসাহ বাড়ে না, বরং এক ক্লান্ত রুটিনের অনিবর্তনীয় নির্দেশে তাঁর মোটা আঙুলগুলো সমস্ত পেটখানা বেড় দিয়ে ঘুরে আসে। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাসে কথা উঠে আসে,—কি জানি! গতবারও তো ঠিক এইরকম!

—না না, গতবার তো এর অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। এবার এখনও আছে। এবার মনে হচ্ছে থাকবে।

ভদ্রমহিলার গলা আশ্চর্য মদালসা। এ গলা যেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের নায়িকার গলা, এমন কাটাকাটা ছোট ছোট কথা বলবার জন্যে নয়, দীর্ঘ পয়ারে বাঁধা নিটোল গলায় স্বামীকে প্রবোধ দেন,—তুমি অতো ভেবো না, ভগবান তো আছেন।

ভদ্রলোক কেমন মুষড়ে পড়েন। তাঁর রাশভারী গলায় ঘ্যান ঘ্যান করেন তাঁর ভাগ্যের কাহিনী অবলম্বন করে।—ব্যাটা বললে, মঙ্গলটা বাধ সেধেছে। কিন্তু বেস্পতি আমার বরাবরের অ্যাসেট। কি গাড্ডায় পড়েছিলাম। ইনকাম ট্যাক্সের ওকালতি একটা গোল্ড মাইন্। আমার ভাগ্যে সেখানেও ঢুঁ ঢুঁ। তারপর এই লরির ব্যাবসা করে, কেউ ভেবেছিল? আট দশ বছর আগে তুমি ভেবেছিলে?

—ভগবান যা করেন......

—মঙ্গলের জন্যে, বলছো তো? কিন্তু এবারেও যদি......

—অতো ভেবো না, অতো ভেবো না। পয়ারমন্থর গলা বাতাস ভারাক্রান্ত করে।

—দ্যাখো, আমি এই শেষ বারের মতো বললাম। এবার যদি কিছু না হয় আমি পাগল হয়ে যাব।

ভদ্রমহিলা স্বামীর হাতখানা আবার টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখেন। আস্তে আস্তে হাত বুলান।

—এত রোজগারপাতি কেন? কিসের জন্যে? বাড়ি তো দেখেছো, সব বেস্ট মেটিরিয়াল। স্প্রে পেন্টিং, টাইল ফ্লোরিং, কোন হেঁজিপেঁজি ব্যাপার না। আমি কোয়ালিটি চাই, মিস্ত্রিদের বলেছি আমি!

—কাকে বলছো মণি?

—কাকে বলব? রাস্তার লোককে ডেকে ডেকে বলব?...দাদার ছেলেদের ভালবাসি, তুমি তো জানো, কিন্তু নিজের, নিজের বলতে কেউ থাকবে না?

বড় হলঘরখানা দুদিকে দুটো ঢাকনি-দেওয়া আলোর দরুন প্রায় অন্ধকার। এক মোলায়েম হলদে আভায় ঘরের সামনে প্যাসেজটা ঝিকমিক করে। স্ট্রেচার আসে অপারেশান থিয়েটার থেকে। দুজন নার্স এসে আধঘুমন্ত তরুণীটিকে নামিয়ে পাশের খালি বেডে শুইয়ে দেয়। মৃদু নিঃশ্বাস ওঠে রোগিণীর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। মহিলাটি সুন্দরী, প্রায় অবাস্তব মার্বেলের মতো ফর্সা, গ্যাস ওষুধ ও যন্ত্রণায় মুখখানা নীলচে, বিশেষ করে চোখের নীচে সরু সরু নীল শিরাগুলো এত প্রকট যে তা এই নীলাভ সৌন্দর্য বিকাশে তৎপর। তরুণীটি প্রথমে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়। তারপর নিঃশ্বাস ক্রমশঃ সংযত হয়ে আসে।

—প্রথম বোধহয়? সেই শ্বেতকমলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

—আই ডি কেস্।

—অ্যাঁ?

—ইন্‌কমপ্লিট ডেলিভারি।

—আহা বেচারি! একই অবস্থা!

আবার তাঁর রাশভারী গলায় সন্তান কামনার আকূতি প্রকাশ করতে থাকেন এবং গত দশ বছর ধরে প্রত্যেকবার সন্তান নষ্ট হবার আগে যে ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন তেমনি-ভাবে মদালস গলায় স্ত্রী সান্ত্বনা দেন স্বামীকে, মাঝে মাঝে হাত টেনে নিয়ে হাত বোলান।

এক কোণে ঠান্ডা মেঝেতে বসে বসে হাবুর মা কমলার আধখানা নিজে খায় আর আধখানা হাবুকে খাওয়ায়। হাবুর চোখে পিচুটি কিন্তু মোটা মোটা খড়ি-ওঠা কালো হাত-পায়ে চাপা স্বাস্থ্যের দীপ্তি। এক কোয়া কমলা মুখে তুলতে গিয়েই সে থেমে গিয়ে মাকে দেখে। মায়ের চেহারার রূপান্তরে তার ভাবান্তর হয় না, মায়ের প্রায় প্রতি শীতেই পেট উঁচু হয়। কিন্তু খুব কিছু এসে যায় না তাতে। তাই নিয়েই মা হাসপাতালের কাজ করে, তিন-চারদিন শোয়ার পরেই আবার যে-কে সেই।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার প্রথম ঘণ্টি পড়ে। হাবুর মা উঠে পা টানতে টানতে সুমিতার বেডের কাছে দাঁড়ায়। গায়ের ওপর পাতলা লাল কম্বলখানা টেনে দেয়। পিকদানি সরিয়ে যথাস্থানে রাখে।

—এই নাও। একটা টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে নীল সার্জের সুট পরা

ভদ্রলোক হুকুমের স্বরে বললেন,—বাথরুমে খুব ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে। ঠিকমতো হলে আবার পাবে।

হাবুর মা অনেকটা লম্বা, ভদ্রলোকের চেয়েও। নীচু হয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। সেটা বিদ্রুপ না তার প্রসন্ন স্নিগ্ধতা বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক তাঁর স্বাভাবিক নিস্পৃহ ক্লান্তির খোলসে ঢুকে পড়েন। একবার বেজারভাবে হাবুর মা-র দিকে, স্ত্রীর দিকে, নিয়ন আলো সজ্জিত ডালিয়া বেডের দিকে, এক কথায় সমস্ত জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আর সেই বেজার দৃষ্টি নিয়ে হঠাৎ প্রবল শব্দে নস্যি নেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে নাসারন্ধ্রে সুড়সুড়ির আরামে বোঁজা গলায় হাবুর মা-কে বলেন, —মনে থাকে যেন।

ইতিমধ্যে একটানা ঘণ্টির আওয়াজে সুমিতার ঘুম ভাঙে, আস্তে আস্তে, যেন অনেকগুলো হাল্কা হলদে রেশমি তুলোর মতো মেঘের মধ্যে থেকে তার মাথাটা বেরিয়ে আসছে। তারপর নিজের নাকের পাশে ওষুধের চ্যাড়চেড়ে অস্তিত্ব, গন্ধ আর ঘরের মধ্যে হাল্কা অপরিচিত অন্ধকারে তার মাথাটা ঘুরে ওঠে। চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে ডাকে, 'প্রতুল'। কিন্তু সাড়া আসে না। দ্বিতীয়বার চোখ খুলেও তার দৃষ্টি শয্যার পাশে রাখা শূন্য টুলের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে থাকে। তারপর বাড়িতে বাবলু আর টুটুলের কথা মনে পড়ে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয় বাবলুটা তার ছোট বোনকে অসম্ভব জ্বালাচ্ছে। সুমিতার চোখে জল উছলে ওঠে। জল পড়ে চোখের কোনাতেই শুকিয়ে যায়। হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় হাসিতে তার শীতে ফাটা ঠোঁটদুখানা বেঁকে বেঁকে করুণ দেখায়। তার পাঁচ বছরের মেয়ের সুরেলা ধমক তার কানে বাজতে থাকে,—মা, তুমি অতো কড়া কেন বল তো? ঠিক যেন স্টেনলেস্ স্টিল্। ঠোঁট চ্যাটালো হতেই ঠোঁটের পাতলা পর্দা কেটে রক্ত পড়ার উপক্রম হয়।

দ্বিতীয়বার ঘণ্টি পড়বার আগেই প্রতুলকে হন্তদন্তভাবে লন পার হতে দেখা যায়। বম্বে থেকে আমদানি পুরো হাতা ডবল নিটিং-এ বোনা কমলা রঙের সোয়েটারে তার রোগাটে চেহারা বেশ মানানসই দেখায়। নিওন আলোর নীচে সেই আজগুবি সৌন্দর্যের দিক থেকে চোখ ফেরাতেই থমকে দাঁড়ায় মুহূর্তের জন্যে স্ট্রেচারে শববাহী ওয়ার্ডারদের ঘাসের ওপর মৃদু পদধ্বনিতে। স্ট্রেচার বওয়ার মধ্যে যে নিরাসক্তি ও ত্বরিত গতি যার ফলে চাদরে মোড়া মাথাটা ঝুলতে ঝুলতে দুলতে থাকে তাতে একনজরেই আন্দাজ করা যায় রোগীর প্রাণ নেই। সেদিকে চেয়ে একান্ত যুক্তিবাদী প্রতুলের মনও ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অজানা আশঙ্কা মানেই মিথ্যে আশঙ্কা এইরকম একটা ধরতাই যুক্তির চাদরে তার কমলালেবু রঙের সোয়েটার আর টেরিলিনের প্যান্টে মোড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে সে আলো-অন্ধকারে ভরা হলঘরের প্যাসেজে পা দেয়। অনেকগুলো রোগিণীর মধ্যে হলেও ধবধবে সাদা ফ্যাকাশে মুখখানা খুঁজে নিতে দেরি হয় না। ধপ করে টুলটার ওপর বসেই হাঁফাতে হাঁফাতে প্রতুল বলে,—মনু, কেমন আছো?

সুমিতা উত্তর দেয় না। কি উত্তর দেবে? শুধু গতকাল সন্ধ্যেবেলা বে-আইনী ক্লিনিকে তার গর্ভনষ্ট করার হাতুড়ে চেষ্টা, তাই নিয়ে টানাহেঁচড়া, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ফিরে আসা, তারপর মাঝরাত্রে থান থান রক্তের মাঝখানে ঘুমভাঙা, ভোরে ছোটাছুটি, হাসপাতাল, হাসপাতালে গ্যাস দেবার সময় চৈতন্য বিলুপ্তির মধ্যেও ডাক্তারদের নিজেদের আলাপ,—একেবারে ক্রিমিনাল ব্যাপার! এরা শিক্ষিত বলে নিজেদের! যাই বলুন

স্বামীটিরও বলিহারি যাই, এরকম স্টেজে—অর্থাৎ গত চব্বিশটা ঘণ্টা তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করে একসাথে। এবং নিজের অজান্তেই তার হাতখানা টেনে নেয় প্রতুলের হাত থেকে।

—অতো ঘাবড়াচ্ছো কেন মনু? অতো ঘাবড়াচ্ছো কেন? আমি ডক্টর সেনের সঙ্গে কথা বলে এলাম। কালকেই নিয়ে যেতে বলেছে।......অবশ্য এরকম একটা ব্যাপার হবে ঠিক বুঝতে পারি নি। কালকে যদি আমাদের অফিসে সেল্‌স প্রমোশনের মিটিংটা না থাকতো তাহলে আমি তোমার সঙ্গেই যেতে পারতাম। কি করে বুঝব বল? আমাদেরই কলিগ্‌, বীরেন, তারও স্ত্রীর করালে সেদিন। কোন ঝামেলা হয়নি।

বছর চৌত্রিশ বছরের ছোকরাটি আত্মপক্ষ সমর্থনে তড়বড় করে।—সমস্ত ব্যাপারটা ইমোশানালি ভাবলে চলে না সুমি। নিজেই দেখতে পারছো ছেলেমেয়ে মানুষ করার কি অবস্থা, বাবলু-র তো এবারেও সেণ্ট লুনিতে হল না। এখন কি হবে বল? বাংলা স্কুল মানেই তো গোয়াল। বল? এক-একটা ছেলেমেয়ে মানে থার্টি টু ফর্টি থাউজেন্ড, বীরেন বলছিল সেদিন। আর বীরেন কিছু ভুল বলেনি।

সুমিতা নিস্তব্ধ, আরও সাদা, আরও পাথরের মতো অপার্থিব দেখায় তাকে। দ্বিতীয়বার ঘণ্টি বাজে।—টুটুল বাবলু কেমন আছে? প্রতুলের দিকে চোখ তুলে চায় সুমিতা।

আবার তড়বড় করে প্রতুল,—তোমার কিছু ভাবতে হবে না।......আজকে আর মাছ আনিনি। মাংস করতে বলেছি আঝালা। ঐ সবাই মিলে খাচ্ছি।

—সরলা ঠিকমতো কাজ করছে?

—সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।......তুমি শুধু বিপদে পড়ো নি মনু। আমি যে কি কষ্টে আছি! প্রতুল বললে বটে কিন্তু তার রঙীন সোয়েটারে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে সে ঝকমক করে। সুমিতার কলেজে পড়তে ততো মনে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হতে থাকে নারী-পুরুষের ব্যবধান। ছেলেরা সবসময় এক নিরাসক্ত দীপ্তিতে ঝকমক করবে আর তার চোট পড়বে মেয়েদের ওপর এরকম একটা যুক্তি তার সহপাঠিনীরা কেউ কেউ বললেও সে রাজী হয়নি। হঠাৎ প্রতুলের হাতখানা খপ করে ধরে সুমিতা বললে,—প্রতুল, তুমি আমাকে ভালবাসো? সত্যি করে বল তো, আমি কিচ্ছু ভাবব না।

প্রবল অসোয়াস্তিতে আঁকপাঁক করে প্রতুল। এসব ব্যাপারে কোন যুক্তি নেই। কি বলবে সুমিতাকে, তাকে ভালবাসি? তার কোন মানে আছে? অথবা বলবে, না, ভালবাসে না? তারও বা কোন মানে আছে? এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ইংরেজীতে আশ্রয় নেয়, —ডোণ্ট বি সেণ্টিমেণ্টাল সুমি!

আস্তে আস্তে পা টেনে টেনে হাবুর মা কাছে আসে। আই-ডি কেসের ব্যাপারটা সে জানে। এসব ব্যাপার জেনে জেনে তার মুখস্থ। তার লম্বা গড়নের দীঘলতা এখনও সবটা যায় নি। ছোপানো বাসন্তী রঙের শাড়িটা তার আবার দুধে টনটন বুকখানার ওপর টেনে সে প্রতীক্ষা করে কখন ঘরখালি হবে, কখন আবার দুধের বাটি আর বিস্কুটের প্লেট নিয়ে আসতে হবে রোগিণীদের কাছে।

আবার প্রবোধের বন্যা উপচাতে থাকে প্রতুলের মুখ দিয়ে। আমাদের সামনে নানারকম সমস্যা আসবে সুমি। সেগুলো আমরা কিভাবে ট্যাকল্‌ করতে পারছি—হঠাৎ অপ্রস্তুত-ভাবে কথার মাঝখানে থেমে যায় সে। মনে হতে থাকে আজকে মারকেটিং প্রমোশনের মিটিং-এ

সে এইভাবেই বলেছিল। এবং তাতে তারিফও পেয়েছিল। শেষ ঘণ্টি বাজে। প্রতুল লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।—আর একটা তো দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার বাড়িতে ছেলেরা......

আস্তে আস্তে ভিজিটাররা বিদায় হন। হঠাৎ খুব ফাঁকা লাগে চারপাশ।—প্রথম বুঝি? পাশের শয্যা থেকে পয়ারমন্থর মদালস গলা ভেসে আসে।

—না তৃতীয়। তৃতীয় বলবার আগে সুমিতা-র গলা কাঁপে তার অজাত শিশুর জন্যে।

—বাঃ, আমার পেটে থাকে না, আর আপনার......ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, বাবা বলতেন।

—হ্যাঁ।

লন দিয়ে কয়েকটা দুধের বাটি আর বিস্কুটের প্লেট নিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ায় হাবুর মা। নিয়ন আলোয় ঝকমকে ডালিয়ার ঝাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে সে টের পায়। তার লম্বা পোড়খাওয়া শরীরখানা জুড়ে নবজাতকের পদধ্বনি কয়েক মুহূর্ত উঠেই মিলিয়ে যায়। ট্রে-খানা থেকে একটার পর একটা বাটি নামিয়ে শেষ বাটি নামায় সুমিতার সামনে এসে। তার মুখে প্রশান্ত হাসি খেলা করে, তা বিদ্রূপের না তার স্বাভাবিক আত্মমগ্নতার ঠিক বোঝা যায় না।

খালি বাটিটা হাবুর মা নিতে নিতে বললে,—যে চলে গেছে সে আবার আসবে দিদিমণি, আমি বলে দিচ্ছি। আপনার চারপাশে ঘুরঘুর করবে। সুযোগ পেলেই চলে আসবে।

সুমিতা উঠে বসে। জানলার বাইরে লনে সেই অপার্থিব হৃদয়হীন সৌন্দর্যের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। তেমনি একটা অপার্থিব কোকিল হাসপাতালের ধুলোয় ভরা আমগাছ থেকে ডেকে ওঠে।

পরদিন তখনও তার ঘুম ভাঙেনি। ডাক্তারের পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙে। আর ঘুম ভাঙতেই একজনের একটা কথাই মনে পড়ে। হাবুর মার কথা। তার চোখ খোঁজে চারিদিক। কিন্তু কাছেপিঠে কোথাও হাবুর মা-র দেখা পায় না।

ডাক্তার সেন আসেন। খুব ভাবগম্ভীর সুপুরুষ। অনেকক্ষণ ধরে ধরে যত্নের সঙ্গে রোগিণীদের দেখেন। পাশের শয্যায় উৎসুক মহিলাটি তাঁর মদালস গলায় ডেকে ওঠেন, দেখুন তো ডাক্তারবাবু, এখনও নড়ছে কিনা।

ডাক্তারবাবু টুল পেতে বসেন। তারপর চাদরের মাঝখান দিয়ে তলপেটে হাত রাখেন। চোখ বোঁজেন। তিনি যেন গানের আওয়াজ শুনতে চাইছেন বারে বারে। বারে বারে তাঁর আঙুল এদিক সেদিক ঘোরে। কিন্তু বারে বারেই তাঁর মনস্কামনা অপূর্ণ থাকে। গম্ভীর-ভাবে চাদরটা যথাস্থানে রাখেন।

—নড়ছে? ভদ্রমহিলার আকুল গলায় সুমিতা চমকে তাকায়।

—নাঃ! রাখতে পারলাম না।

—আমার স্বামী এবার পাগল হয়ে যাবে!

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ান। মহিলাটিকে এখনই অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে। উঠে দাঁড়িয়েই চাপা ভারীগলায় হাঁক দেন, 'হাবুর মা!' তারপর তাঁর মনে পড়ে যায়। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকান। নিজের মনে আবার বিড়বিড় করেন। 'মাগীটা ফের বিইয়েছে!'
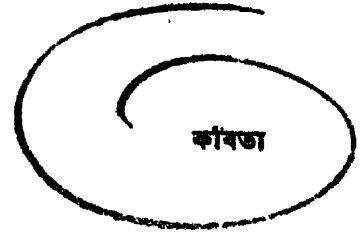
শৈশবে অসুখ হলে

চিত্ত ঘোষ

শৈশবে অসুখ হলে মায়ের হাতের তালপাখা হাওয়া
কালো পাথরের শীতল বাটিতে জল বদলে বদলে
কপালে জলপটি, তুলসী-তলার মাটি, পাতা, সারারাত
অফুরন্ত, শীতল, গভীর নিঃশব্দ বৃষ্টি।
গ্রীষ্মে নদী বালু হয়।
বালু অগ্নিকণা হয়।
দুপুর ক্রোধের মতো জ্বলে।
কেৎলিতে চায়ের জল।
কে জানে কখন খুলবে অন্ধকারে শীতের শিকল!
ট্রেনে চড়ে অনেক দূরের রাস্তা। শিশির শুকুবে তার আগে।
মাঠ জুড়ে বসে আছে রোদ্দুরের বিশাল ধবল পাখি।
পাখির গায়ের রঙ জলে ভাসে, ভেসে যায় দূরে।
সন্ধ্যার জোয়ারে ফিরে টেবিলে আয়নায় মুখে
সময়ের ছাপ। কোন উপলব্ধির ভুবনের দিক ছেড়ে
সময়ের স্তর থেকে কোন ক্ষণ তুলে আনতে গিয়ে
বেতের মোড়ায় বসে রঙিন ঘুড়ির খেলা দেখো!

একদিন একবার

সুনীল বসু

আমার আগুন আমি তোমার ভিতরে জেবলে দিয়ে চলে যাব
তুমি আমার, নরম শরীরের মত চাপ-অন্ধকার
সহস্র হাউই হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উড়ে তোমার ভিতরে মিশে যাব
তোমার ভিতরে সোনার তুবড়ির মত ফেটে গিয়ে রুপোলি ফুল আর ফুলকি হয়ে
কোটি কোটি মাছির মতন উড়ে যেতে কি যে ভাল লাগে

আমার ভাল লাগার পিপাসায়, তোমার নিস্তল ভাসমান থৈ থৈ অন্ধকার
তোমার স্তনের মত নক্ষত্রের আগুনে ভরা অন্ধকার
আমার অসহ্য স্বর্গসুখের চরিতার্থতা
প্রিয়তমা কি ভীষণ ঐন্দ্রজালিক প্রবল অন্ধকার তুমি, গন্ধ, স্বেদ
মৃত্যু মূর্চ্ছা পতন-উত্থান ইহকাল-পরকাল, তার মধ্যে
তার মধ্যে শ্মশানের মত আমি দাউ দাউ জলন্ত,
একবার একাকার হয়ে মিশে যাব এবং তোমাকেও জ্বালাব

আমার আগুন আমি তোমার ভিতরে জেবলে দিয়ে চলে যাব
নরম শরীরী চাপ-অন্ধকার তুমি
অসংখ্য রুপোর ফুল হয়ে তুবড়ির বুক ফেটে তোমার হৃদয়ে ঝরে যাব
কোটি কোটি নক্ষত্রের মত জ্বলন্ত মৌমাছি হয়ে উড়ে যাব
একদিন একবার উড়ে যাব।

কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাসা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু প্রশ্ন রয়ে যায় রহোন্যাস থেকে কবিতার
কতটা ফারাক।

দস্যুতা—লুঠতরাজ—তাজা খুন—যৌন ব্যাভিচার—
পাপীয়সী সুন্দরীর কিস্‌সা—সব বাদ দিলে পরে
কবিতার হেমোপকরণ থাকে কতটুকু?

—বুকের উপরে পাতা শেখ গরিবুল্লার প্রণীত
'য়ুসুফ-জোলেখা'—
—বুকের উপরে পাতা সাঁওতালী টুসু-র
দিব্য ঘট—

এরই মধ্যে মালা ও সঙ্গীতহীন সন্ধ্যাবেলাকার রাস্তা দিয়ে
খুব পরাজিতের মতন মাথা নুয়ে চলে কবিতার
স্বগতদুর্ভার পংক্তিগুলি।

কবিতা কি ভিড়ের বাইরেকার সব পথ থেকে চ্যুত শুধু
সযত্নে বানিয়ে তোলা গভীর রাত্রির জাগরণ?

স্বহস্তে খারিজ করে দিতে গেছি সন্দর্ভে-সাজানো কবিতার
পরাদর্শনের প্রতারণা—

স্বহস্তে খারিজ করে দিতে গেছি
সুরেলা গানের পরাশ্রয়,

কবিতা কি তবু হাটপত্তনের উষ্ণ বিবরণ?

শাসকবর্গের প্রতি

দিব্যেন্দু পালিত

কিছু আবেদন আছে আপনাদের জন্য—
হে বিধাতা, সৌজন্যের দয়িত, আমার প্রভু,
পাটাতন খসে গেলেও আমরা লড়ছি।

লড়ছি জলের বিরুদ্ধে, যে-জল
নির্বীর্যকরণের আগে আমাদের শিখিয়েছিল
সাঁতারের মন্ত্র বা, ডুবন্ত মানুষকে
মাতৃভাবনায় পুষ্ট কিভাবে ছেঁকে তুলতে হয়
নদীগর্ভ থেকে, শিখিয়েছিল রণতরী ও বাণিজ্যপোতের
ব্যবধান, কিভাবে দূর থেকে দূরে যেতে যেতে
প্রত্যেক বুকের মধ্যে, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নের মধ্যে
জেগে ওঠে আশ্চর্য এক সাবমেরিন;
আত্মহননের আগে, শিখিয়েছিল, কিভাবে
শৃঙ্খলিত চরাচরের কাছে শেষবার
নতজানু হতে হয়।

রৌদ্র কলরব থেকে দূরে আপনাদের বিরাট সৌজন্য
সেই একই তরী জলবাহিত করে
আমাদের এনে দিয়েছে প্রশান্ত জলগর্ভে—
প্রসববেদনার মতো যেখানে অতর্কিতে ফুলে ওঠে
ঋক্-তরঙ্গ, আর
উদ্যত ডান হাতে আক্রমণ শানাতে শানাতে আমরা দেখি,
বাঁ হাতের রক্তে ইতিহাসের রং ক্রমশ বদলে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত

মঞ্জুশ্রী দাশ

সেই ধারালো পথ বরফ আর সন্দেহী গাছ-গাছালির বাকলের সবুজ
কুয়াশা ছাড়িয়ে যেখানে নেকড়ের সাদা দাঁতের মত ঝকঝকে
সেরকম আবছা আভাস চারপাশে নৈঃসঙ্গ অঘ্রানের
অন্ধকারে নির্জন মাঠের মত নয়, চলার প্রতিটি আঁকেবাঁকে
ছড় টেনে আলুথালু চেহারায় অবসাদে ফিকে না হয়ে।
গনগনে মালসার ভীড়ে যেসব মানুষ-মানুষী নৈঃসঙ্গে
ধুঁকে ধুঁকে আগুনের আঁচে আমিও। পোড়োজমিতে
চড়ুয়ের ভাঙা ডানার আমেজ পেলে নোঙর করি।

কিছু কথার আকেবাঁকে ঢেউ তুলে—সময়ে—পাতা, কুটো,
ভাঙাডিম, ফড়িং, ধুলোখড়, অনেক বাদামী জীর্ণপাতা
জমিয়ে চলি। কখনো যে পিয়াশাল পিয়ালের ছিটেছিটে
আমেজ কুড়িয়ে পাইনি তা নয়—কিন্তু সমুদ্রের
উথালি-পাথালিতে যে ভাটিয়ালি আমেজ—কখনও পাইনি।

একবার ঝাঁসির গেরুয়া দুর্গের কোন পাথরে
পেয়েছিলাম কিছু ফসলের গাড়ম্বর। উজান বেয়েছিলাম
জলপাইবনের প্রসারিত হাতে। ভেজা শাড়ির মত জীবনের
কিছু পর্যায় জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে বিছিয়েছিলাম।
তারপর হরিয়ালের স্বরে ক্ষয়ক্ষতির পরগাছা এসে পড়ল।
খেজুরের ছায়াতে হলুদ পাতার আঘ্রাণ—জমে উঠল।

এখন কোন এক দুপহর—পাখনায় পালকে
বিন্দু বিন্দু ঘাসেরা ঝরছে। মৌসুমী সমুদ্রের মত সময়।
কোন এক মিশরের মানুষের মেহগনির মত অন্ধকার
বেড়ায় বাদামী হরিণের মতো সময় এসেছিল।
তারপর সেই বেদনাময় রেখা, সেই রক্তাভ রৌদ্রের স্বর।

এবারে চিতোরের নীল মরুভূমির পথ দিয়ে
উটের গ্রীবার মতো সময়ের নিঃসীম বেদনার ঝাঁকে।
বিষণ্ণ হলুদ খড়। চোখে এখনও বৈশালী-বিদিশার
বেলোয়ারি আমেজ। আলোর কত্থক। ঝাপসা লাগলে
মমির গহ্বর খুঁড়ে কিছু শুকনো গুঞ্জরন কুড়োই।
নৈঃসঙ্গ হাতে হাত রেখে—ক্ষয় ক্ষতির আঘ্রাণে
কয়েক মুহূর্তের সূর্যের আলোর কঙ্কাল অঙ্গারে
ঠেলেঠেলে......

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের রচনাকাল ১৯২২ সন থেকে ১৯৫০ সন, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের আঠাশ বছর। তাঁর গল্পের সংখ্যা দুশ আঠার[১]। বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প উপেক্ষিতা ১৩২৮, মাঘে "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হয়। এর পর "প্রবাসী"তে ১৩২৯, শ্রাবণে উমারাণী, ১৩৩০, অগ্রহায়ণে মৌরীফুল ও ফাল্গুনে মেঘমল্লার, ১৩৩১ আষাঢ়ে অভিশপ্ত, পৌষে নাস্তিক এবং মাঘে পুঁইমাচা, "বিচিত্রা"য় ১৩৩৪, শ্রাবণে বউচণ্ডীর মাঠ, ১৩৩৫, বৈশাখে নববৃন্দাবন, কার্ত্তিকে ঠেলাগাড়ি এবং "প্রবাসী"তে ১৩৩৭, আশ্বিনে খুকীর কাণ্ড প্রকাশিত হয়। এর পর চার বছর তাঁর রচনার প্রকাশ বন্ধ, রচনার পরিকল্পনা ও রচনা কিন্তু বন্ধ নয়। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে[২] খেলাৎ ঘোষের এস্টেটে চাকরি নিয়ে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে আসেন এবং এই বছরের পুজোর সময় থেকে "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত" রচনার পরিকল্পনা তাঁর মনে আসে।[৩] ১৯২৬ সনে বিভূতিভূষণ "পথের পাঁচালী" লিখতে শুরু করেন[৩] এবং ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে লেখা শেষ হলে[৪] এই বছরের জুন মাস থেকে অর্থাৎ বাঙলার ১৩৩৫ সালের আষাঢ় থেকে ১৩৩৬, আশ্বিন পর্যন্ত "বিচিত্রা" পত্রিকায় "পথের পাঁচালী" প্রকাশিত হয়। ১৩৩৬ পৌষ থেকে ১৩৩৮, আশ্বিন পর্যন্ত "প্রবাসী" পত্রিকায় "অপরাজিত" প্রকাশিত হয়। ১৩৩৮, শ্রাবণে মৌরীফুল গল্পটি বাদে বাকি দশটি গল্প নিয়ে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পগ্রন্থ "মেঘমল্লার" প্রকাশিত হয়।

বিভূতিভূষণের উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভূগোলে তেমন কোন পার্থক্য নেই। উভয়েরই ক্ষেত্র প্রধানতঃ পল্লী বা মফস্বলের শহর। "অপরাজিত"[৫], "দম্পতি" এবং "অনুবর্তন" এই তিনটি উপন্যাসের স্থান অবশ্য কলকাতা। তবু প্রথমতঃ তাঁর সমস্ত উপন্যাস-সাহিত্যের এক-তৃতীয়াংশেরও কম আয়তন জুড়ে নাগরিক জীবন। দ্বিতীয়তঃ "অপরাজিত"-এর অপুর মত সার্থক, জীবনবোধের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের বিবর্তন ও পরিণতি পল্লী নিশ্চিন্দিপুরে। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে বিভূতিভূষণ একান্তভাবে নগরবিমুখ, আসলে তিনি নাগরিকতাবিমুখ। জীবনের অভিজ্ঞতার জন্যে শহরে থাকার প্রয়োজন আছে। দেওয়ানপুরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দত্ত অপুকে বলেছিলেন, 'কলকাতাতেই পড়ো অনেক জিনিস দেখবার শোনবার আছে—কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভাল বলি।'[৬] যেমন উপন্যাসের তেমনি ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল ("নবাগত"), মরফোলজি ("ছায়াছবি") প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের ক্ষেত্রও এই খাস কলকাতা। ক্ষেত্রের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের পার্থক্য চোখে পড়ে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের এবং ছোটগল্পের ক্ষেত্র যেমন

[১] পরিশিষ্ট দেখুন
[২] উৎকর্ণ (২য় মুদ্রণ), পৃঃ ৩৬।
[৩] তৃণাঙ্কুর (৪র্থ মুদ্রণ), পৃঃ ৬৬-৭।
[৪] স্মৃতির রেখা, ২৬।৪।১৯২৮।
[৫] অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭০।
[৬] অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭০।

প্রধানতঃ অভিন্ন, রবীন্দ্রনাথের কিন্তু তা নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ক্ষেত্র যেমন নগর, ছোটগল্পের ক্ষেত্র তেমনি পল্লী। বিভূতিভূষণের জন্ম, লালন-পালন, প্রাথমিক শিক্ষা, এক-কালের কর্মস্থল (জাঙ্গিপাড়া, হরিনাভি, ভাগলপুরের জঙ্গলমহাল) এবং আশ্রয় এই পল্লীতে (বারাকপুর)। সুতরাং তাঁর পক্ষে উপন্যাস-ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লী হওয়াই স্বাভাবিক। বিভূতিভূষণের উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্র এক হলেও উভয়ের মধ্যে এক ধরনের স্বজাতীয় ভেদ চোখে পড়ে। সে ভেদ ক্ষেত্রের বিষয়বস্তুর ভেদ। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ একত্র-গ্রথিত এবং পরস্পর-সম্পূরক। "পথের পাঁচালী," 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'ইছামতী' প্রভৃতি প্রতিনিধিস্থানীয় সমস্ত উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনা যেখানে অত্যন্ত প্রবল—কোথাও বা একান্তই লক্ষস্থানীয়—সেখানে তাঁর ছোটগল্পের প্রধান লক্ষ মানুষ। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির ও মানুষের সম্পর্ক যেমন প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও সাপেক্ষ, ছোটগল্পে সে সম্পর্ক প্রধানতঃ পরোক্ষ ও অনপেক্ষ। গ্রামীণ মানুষের এবং প্রকৃতির মিলিত পূর্ণরূপ যেমন তাঁর উপন্যাসে, গ্রামীণ মানুষের মানবিক রূপ তেমনি তাঁর ছোটগল্পে। অবশ্য এখানেও এই বিভাগের ব্যতিক্রম আছে। প্রকৃতিকে নিয়ে কুশল পাহাড়ী, আচার্য কৃপালনী কলোনি, কনে দেখা-র মত গল্পও তিনি লিখেছেন। নিছক প্রকৃতিকে নিয়ে এমন গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এবং তার বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মিল চোখে পড়ে। রবীন্দ্র-নাথেরও ছোটগল্পের লক্ষ গ্রাম্য জনপদ।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের ইতিহাস ও ভূগোল যথাক্রমে বর্তমান এবং গ্রামবাঙলা নিয়ে হলেও তার সীমা দূর কালে ও দেশে বিসর্পিত। তাঁর ছোটগল্পের ইতিহাস যেমন মেঘমল্লার, প্রত্নতত্ত্ব, শেষ লেখা প্রভৃতি গল্পের অতীত বৌদ্ধযুগে ব্যাপ্ত, ভৌগোলিক সীমাও তেমনি দ্রবময়ীর কাশীবাস, অভিমানী, চ্যালারাম, টান প্রভৃতি গল্পে সুদূর উত্তর-ভারত, কাবুল এমনকি আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর ছোটগল্পের অধিবাসী আদিবাসী থেকে ঈশ্বর। তবু এই ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির মাঝখানে তিনি মনে করেন, 'বাংলার সন্ধ্যাসকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল, বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে-ফুলবিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।'[৭]

বিভূতিভূষণের সাহিত্যিকমানস বিশ্লেষণ করলে যে তিনটি উপাদান চোখে পড়ে সে তিনটি উপাদান—অধ্যাত্ম, সাধারণ মানব ও প্রকৃতি। প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা'য় তাঁর সাহিত্যিকমানসের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। বিভূতিভূষণের মনের এই তিনটি মৌলিক উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেমন তাঁর উপন্যাসগুলিকে ভাগ করা যায় তেমনি তাঁর ছোটগল্পগুলিকেও প্রধানতঃ ভাগ করা চলে। সে ভাগ সবচেয়ে তাঁর মনের কাছাকাছি হবে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবনের দার্শনিকতা নিয়ে অধ্যাত্মবিষয়ক গল্পগুলি গড়ে উঠেছে। মানুষের মমতা, সহানুভূতি, প্রেম, কৌতুক এবং মানুষের চরিত্র ও তার জীবনের ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে মানববিষয়ক গল্পগুলি এবং প্রকৃতির রূপ ও স্বরূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতিবিষয়ক গল্পগুলি। এই তিন শ্রেণীতেই বিভূতিভূষণ মেঘমল্লার, দ্রবময়ীর কাশীবাস, কুশল পাহাড়ী, প্রভৃতির মত সার্থক গল্প লিখেছেন। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে

[৭] স্মৃতির রেখা, সাহিত্যের কথা, পৃঃ ১৪৩।

সার্থক গল্পের হার কিন্তু সমান নয়। জীবনের সার্থকতা ও দার্শনিকতা এবং মানুষের মমতা-সহানুভূতি-প্রেম-প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ নিয়ে লেখা গল্পগুলি যেমন অসাধারণ, অপরদিকে হাস্যরসাত্মক এবং চরিত্র ও ঘটনাপ্রধান গল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসার্থক। এই সার্থকতা-ব্যর্থতার কারণ বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে। বিভূতিভূষণের জীবনে যে তিনটি ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সে তিনটি ধারা হল প্রকৃতি-প্রীতি, জীবনের প্রতি মমতা এবং জীবনাতীতের প্রতি কৌতূহল। লেখকের অনুরাগ-মমতা এবং উপলব্ধির গভীরতা থেকে এই গল্পগুলির সৃষ্টি বলে পরিকল্পনার চমক না থাকা সত্ত্বেও এগুলি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণ স্বভাবের কক্ষপথ ছেড়ে যেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অপরিচিত পথে গেছেন, সাহিত্যের কারখানায় তাৎপর্য্য বা কলা-কৌশলে মণ্ডিত হবার আগেই ব্যস্ত হয়ে কাঁচা চরিত্র ও ঘটনাকে তুলে দিয়েছেন সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানে গঠনের শিথিল আকস্মিকতা, দ্বিধাকম্পিত রেখাঙ্কনপ্রবণতা ও কেন্দ্রসংহতির অভাবের জন্য তাঁর অনেক গল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে।[৮] সাধারণতঃ এই ধরনের হাসির গল্পে অপরকে বিদ্ধ করার জন্যে যে ধারাল ভাষার এবং বাক্যবাণের, চরিত্র ও ঘটনাকে ফোটানর জন্যে বিন্যাসের যে বৈজ্ঞানিক আঙ্গিকের প্রয়োজন হয় তা বিভূতিভূষণের স্বভাবে অনুপস্থিত ও অনায়ত্ত। তিনি চান 'বিস্তীর্ণ পটভূমিকা, ধীর মন্থর স্বেচ্ছাবিচরণ, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ, দরদী মনের স্মৃতিরোমন্থন ও স্বপ্নজাল-বয়নের প্রচুর অবসর। ছোটগল্পের সংকীর্ণ অঙ্গনে তাঁহার এই অবাধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকে বলিয়া তিনি সকল সময় ইহার মাপে নিজেকে সংকুচিত করিতে পারেন না।'[৮]

১

অধ্যাত্ম, মানবিক মমত্ব এবং প্রকৃতিবোধের গল্পগুলি ন্যূনতম তথ্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। তথ্যাল্পতা তাঁর গল্পের এক সাধারণ গুণ। মেঘমল্লার, দ্রবময়ীর কাশীবাস, কুশলপাহাড়ী—এই তিন জাতের গল্পেই তথ্য পরিকল্পনার কোন মৌলিকত্ব চোখে পড়ে না। প্রদ্যুম্নের আত্মত্যাগ, দ্রবময়ীর মাটির ও মানুষের প্রতি মমতা, ভৈরবথানের সাধুর প্রকৃতিপ্রীতি কোন জটিল কাহিনীর ফলশ্রুতি নয়—যতটুকু গল্প না হলেই নয় ততটুকু গল্পকেই তিনি আশ্রয় করেছেন। আর সেই ন্যূনতম গল্পটুকুও অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে বলা। এত অনাড়ম্বর যে মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় গল্পের সৌন্দর্যটুকু বোধ হয় পাঠকের নজরে পড়বে না। আশংকার একটি কারণ যেমন অনাড়ম্বর ভঙ্গী, আর-এক কারণ চরম মুহূর্তের অভাব, যা আবার এই সার্থক গল্পগুলির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পে সাধারণতঃ তথ্যবিন্যাসের ধাপ ভাঙতে ভাঙতে একটি পরমমুহূর্তের মুক্তাঙ্গন থাকে। বিভূতিভূষণের গল্পগুলিতে ন্যূনতম তথ্যের মধ্যে বিশেষ করে কোন পরম তথ্য নেই। তাঁর গল্পে পরম, বিশেষ করে কোন চরম মুহূর্ত নেই, তা সারা গল্পেই ছড়িয়ে আছে। সে পরম কোন চরম অবস্থাতেই শুধু দীপ্ত নয়, সব অবস্থাতেই তা দ্রুত। জলের মত তা সমগ্র গল্পে অবিরল, আভার মত তা সমগ্র গল্পে বিচ্ছুরিত। প্রদ্যুম্নের আত্মত্যাগ, দ্রবময়ীর মমতা, ভৈরবথানের সাধুর প্রকৃতিপ্রীতি কোন আকস্মিকতার ধাক্কায় চরমে উপনীত নয়,

[৮] বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ), পৃঃ ৫৮৮।

চরমই অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় শুধু প্রকাশিত। প্রদ্যুম্ন সরস্বতী দেবীর জন্যে আত্মত্যাগের আগেই কলালক্ষ্মীর কাছে নিবেদিত, দ্রবময়ী কাশীবাসের আগেই মাটির ও মানুষের সঙ্গে শতপাকে বাঁধা, কথকের কাছে প্রকৃতিপ্রীতির প্রকাশের আগেই ভৈরবথানের সাধু প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। গল্পের পরিণতি সারা গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে এক অসামান্যের ইঙ্গিত আনে, বইয়ের পাতায় যেখানে এইসব গল্প শেষ হয় সেখান থেকে আমরা মনে মনে গল্পগুলিকে যেন নতুন করে পড়তে শুরু করি। এ আঙ্গিক গীতিকবিতাধর্মী গল্পের আঙ্গিক। কোথাও একটি উপলব্ধি কোথাও মানুষের বা প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধ একটি মনোভাব ন্যূনতম তথ্যাশ্রয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই আঙ্গিকের অনেকগুলি গল্পের কথক উত্তমপুরুষ। শুধু সার্থক গল্পগুলি নয় সাধারণভাবে তাঁর অধিকাংশ গল্পই গীতিকবিতাধর্মী ছোটগল্পের আঙ্গিকে লেখা। তাঁর গল্পগুলির আঙ্গিকে যে গঠন-শৈথিল্যের এবং সংহতির অভাব চোখে পড়ে তা আন্তরিকতার আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে এবং যেখানে এই আন্তরিকতার অভাব ঘটেছে সেখানেই আঙ্গিকগত ত্রুটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের গল্পগুচ্ছ গীতিকবিতাধর্মী ছোটগল্পের আঙ্গিকে প্রধানতঃ পরিবেশিত হলেও এই আঙ্গিকই একমাত্র নয়। তাঁর অতিপ্রাকৃতবিষয়ক (অভিশপ্ত, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প') এবং চরিত্র ও ঘটনাপ্রধান কিছু কিছু গল্প (ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, তিরোলের বালা) কাহিনী-বিন্যাসধর্মী আঙ্গিক অবলম্বনে সার্থক ভাবে লেখা।

বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মবিষয়ক গল্পগুলিতে শুধু ঈশ্বর নয় জীবন সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভাব-ভাবনা এবং দার্শনিকতা প্রধান হয়ে উঠেছে। সরাসরি ঈশ্বরদর্শন নিয়ে এই গোষ্ঠীতে মাত্র একটি গল্প—নববৃন্দাবন ("মেঘমল্লার")। সংসারত্যাগ ও ভক্ত কর্ণপুরের কাছে যে কৃষ্ণ অদর্শন সেই গোপবিহারী কৃষ্ণ কর্ণপুরের পালিত বালক দুষ্টু নীলমণির কাছে প্রত্যক্ষ হন এবং শেষ পর্যন্ত কর্ণপুর এই শিশুর সাহায্যেই কৃষ্ণের দেখা পান। শিশুর এই দিব্য প্রভাবেরই আর এক পার্থিব কাহিনী একটি দিন ("যাত্রাবদল")।[১] এই গল্পে জীবনের একঘেয়ে তুচ্ছতা এবং নির্বুদ্ধিতার মাঝখানে এক শিশু তার অর্থহীন অবোধ লীলায় জীবনের হারান বৈচিত্র্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই বৈচিত্র্য 'নববৃন্দাবন'-এর অপ্রাকৃত কৃষ্ণের চেয়ে প্রাকৃত এবং ইঙ্গিতময় বলে এ গল্পটি এত বিশ্বাস্য ও মধুর লাগে। বিভূতিভূষণ যে মহাকালের মিছিলে কৌতূহলাক্রান্ত সেই তাঁর একান্ত প্রিয় ও অনুভূত মহাকালকে নিয়ে এই বিভাগে অনেকগুলি সার্থক গল্প রচিত হয়েছে। সেগুলি : একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস ("ক্ষণভঙ্গুর"), রামতারণ চাটুজ্জে-অথর ("ক্ষণভঙ্গুর"), দুই দিন ("অসাধারণ"), উল্টোরথ ("মুখোশ ও মুখশ্রী"), দুইদিন ("জ্যোতিরিঙ্গণ"), দিবাবসান "বড়দিদিমা", অবিশ্বাস্য, এমনই হয় ("কুশলপাহাড়ী") ও কাদা ("রূপহলুদ")। সব গল্পগুলিতেই কালের চলমানতার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। এই ইঙ্গিতকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিভূতিভূষণ তার মাঝখানে দুটিকালের বিন্দু বসিয়েছেন—সেদিন ও এদিন, সেকাল আর একাল। দুইদিন এই একই নামের দুটি আলাদা গল্পে একই ইঙ্গিত ও আঙ্গিক। রামতারণ চাটুজ্জে অথর, উল্টোরথ, এমনই হয়, কাদা, দিবাবসান এইসব গল্পেরই দ্বিতীয় নাম 'দুই দিন' হতে পারত। রামতারণ চাটুজ্জে-অথর সেই দুই দিনের খ্যাতি-অখ্যাতির গল্প, উল্টোরথ সেই দুই দিনের গমনাগমনের কথা—কি ছিলাম আর আজ কি হয়েছি, এমনিই হয় সেই দুইদিনের হওয়ার গল্প, কাদা সেই দুইদিনের কাদার সঙ্গে জড়ান কাহিনী, দিবাবসান,

[১] এই গল্পটি অকারণ নামে "জন্ম ও মৃত্যু" গ্রন্থে সংকলিত।

আশি বছর আগের সেকালের এক দিবসারম্ভ থেকে আশি বছর পরে একালের দিবাবসানের কাহিনী। 'কোথায় আজ আশি বৎসর আগেকার সে সব প্রথমপ্রণয়হর্ষাকুল তরুণী নববধূ? কোথায় তাদের প্রিয়জনেরা? কোন দূর অতীতে কতদিন হল ছায়ার মত মিশে গিয়েছে কে আজ তাদের সন্ধান দিতে পারে!'[১০] সেদিন ও এদিন, সেকাল আর একাল—এই দুদিন এবং দুকালের মাঝখানে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে মহাকাল বিভূতিভূষণ তাকে দেখাতে চান। কোঠাবাড়ির ইতিহাসও আসলে এই দুদিন ও দুকালের গল্প—শুধু মধ্যবর্তী এক পর্বে আরও বিস্তৃত। একদিকে কালীপদ চৌধুরী, তার ছেলে সুকুমার চৌধুরী এবং তার ছেলে অনাথবন্ধু চৌধুরী আর একদিকে একতলা কোঠাবাড়ি, তার পাশে দ্বিতলগৃহ, তারপর লেকরোডের প্রাসাদ। কোঠাবাড়ির দেওয়ালটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে, দোতলা বাড়ি জঙ্গলে-ঢেকে গেছে, কালের করতলে যেতে বাকি শুধু প্রাসাদটি। ভ্রূক্ষেপহীন কাল আপনমনে চলেছে এই গল্পগুলিতে। অবিশ্বাস্য গল্পেও পদস্থ হাজুর অতর্কিত মৃত্যুতে সেই একই ইঙ্গিত এবং বগ্‌দার মত এক অখ্যাত ও দরিদ্র স্কুল শিক্ষককে পাত্তা দেওয়ায় এই ইঙ্গিত আরও নিবিড়। চেনো না-চেনো কোন কিছুতেই সেই আনমনা কালের চলার বিরাম নেই। ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব সবকিছুই মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার মত কোথায় ভেসে গেছে। বড়দিদিমা গল্পেও বিশ বছর আগের গ্রামের চারিদিকে দুইদিনের, দুইকালের চিহ্ন ছড়ান। চাঁদনী রাতে ভগ্ন অট্টালিকার মায়াময় পরিবেশের মাঝখানে অতীতের সাক্ষী বড় দিদিমার উপস্থিতি সারাগল্পের চারপাশে এক রহস্যময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। 'কোথায় হুতুম প্যাঁচা ডাকচে যেন দুর্গামণ্ডপের জঙ্গলে। জ্যোৎস্নার আলোয় এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা আর কালমেঘের গোয়ালে-লতার জঙ্গল রহস্যময় দেখাচ্চে। কতকালের কত ইতিহাস এদের গায়ে লেখা। পিছন ফিরে আবার দেখলাম, বড় দিদিমা বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে আমার গমনপথের দিকে চেয়ে আছেন। কতদিন এই ইঁটের কারাগারে বন্দিনী থাকবেন দিদিমা? পাষাণী অহল্যার উদ্ধারের আর কত বিলম্ব কে বলবে।'[১১]

বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মচেতনার গল্পগোষ্ঠীতে ঈশ্বর ও মহাকালের স্বরূপ উপলব্ধির পাশে তাঁর জীবনবোধ নিয়ে কতকগুলি গল্প আছে। তাঁর এ জীবনবোধ জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার সার্থকতার মধ্যে। মহাকালের উপলব্ধির মতই তাঁর জীবনবোধের উপলব্ধি একান্তই অন্তরঙ্গ, অবারিত এবং সার্থকপ্রতিপন্ন। তাঁর কাছে 'জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে।'[১২] জীবনবোধের সার্থকতা নিয়ে লেখা গল্পগুলি হচ্ছে: সার্থকতা, ডানপিটে, বাইশ বছর ("যাত্রাবদল"), কিন্নর দল ("কিন্নর দল"), প্রত্যাবর্তন। ("বেণীগির ফুলবাড়ী"), দ্রবময়ীর কাশীবাস ("নবাগত"), নুটিমন্তর, হাট, বুধোর মায়ের মৃত্যু ("ক্ষণ ভঙ্গুর"), জন্মদিন, বংশলতিকার সন্ধানে, তুচ্ছ ("অসাধারণ"), দৈবাৎ ("উপলখণ্ড"), নাস্তিক ("মেঘমল্লার")। সার্থকতার মত সব গল্পেরই দ্বিতীয় নাম 'সার্থকতা' হতে পারত। যে মাটিতে মানুষের জীবন সেই মাটি আর মানুষ উভয়কে নিবিড়-ভাবে উপলব্ধি করার মধ্যেই এই গল্পগুচ্ছের নায়ক-নায়িকারা সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

১০ দিবাবসান ("জ্যোতিরিঙ্গণ")।
১১ 'বড় দিদিমা' (কুশল পাহাড়ী)।
১২ 'তৃণাঙ্কুর' (৪র্থ মুদ্রণ), পৃঃ ৯।

অজ-পাড়াগাঁ রূপগঞ্জের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রবাসী ব্যবসায়ী ননীর মনে পড়ে তার বোবা ও বধির ছোটভাই এই পেছনকার ডোবাটাতে মারা যায়—মমতায় সারা বুক তার ভরে ওঠে। 'সমস্ত জীবনটা ননী যেন এক মুহূর্তে একটা ম্যাপের মত চোখের সামনে পড়ে আছে দেখতে পেলে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, প্রথম বিদেশ যাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ—তার মনে হল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছে, জীবনে আসলে তার মূল্য কি? তার যেন আজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুন ভাবে পড়তে শিখেচে, জীবনে যা নিয়ে এতদিন সে ভুলে আছে আজ মনে হচ্ছে তা ভেতরের স্পন্দন নয়, বাইরের পালিশ মাত্র। তাও নয়। জীবনটা যেন এতদিন জ্যামিতির সরল রেখার মত প্রস্থবিহীন, গভীরতাবিহীন একটা পথে চলে এসেছে—গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারেনি যে জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর একদিকে, সেটা তার গভীরতা।'[১৪] সে বিশ্বাস করে বহুদূর উত্তরকালের মানসপটে 'এই ম্লান মেঘলা দুপুরের আলো, এই প্রাচীন জগডুমুর গাছটা, এই পানা-শেওলা-ভরা ডোবা, এই আশ্চর্য অদ্ভুত জীবন মুহূর্তটি স্বপ্নের মত মনে আসবে।'[১০] বংশলতিকার সন্ধানে-ও ঠিক একই ধরনের সার্থকতা। উত্তর ভারতে মানুষ নীরেন অখ্যাত পল্লী মেটিরি-রামচন্দ্রপুরে এসে সইমার স্নেহে, চৈত্ররাত্রে নাম-না-জানা ফুলের তীব্র সুবাসে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। কৈলাস-মানসে ভ্রমণ না করার দুখ এই অনুপম প্রাপ্তিতে অন্তর্হিত হয়। 'ঐ মুচুকুন্দ চাঁপার ফুল যেন কতকাল পূর্বের কোন বিস্মৃত অতীত শৈশবদিনে তাহার অজ্ঞাতসারে একদা সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল—মায়ের মুখের সঙ্গে সে দিনটির ছন্দ একই তারে গাঁথা হইয়া আছে তার মনের বীণায়।'[১৪] তুচ্ছ গল্পে সামান্যা এক কামারদের মেয়ের মাথায় গন্ধ তেল মাখিয়ে দিয়ে কথকের কি অসামান্য চরিতার্থতা! 'কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা।'[১৫] 'দ্রবময়ীর কাশীবাস'-এ দ্রবময়ীর জীবনের সার্থকতা কাশীবাসে নয়, যে উঠোনের মৃত্তিকাতে তার স্বামী মারা যায় সেই মৃত্তিকাতে, তার মুংলী গাইয়ের ও খয়ের-খাগী গাছটার মাঝখানে। 'ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেছে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়স তিন কুড়ি ছয়।'[১৬] জন্মদিন-এ রায় বাহাদুর কেশববাবু একষট্টিতম জন্মদিনে লেকের ধারে বেঞ্চিতে একলা বসে নিজের অন্তঃসারহীন সার্থকতার কথা ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে আজকের এই সার্থকতার ওপারে রাতুলপুরে শিক্ষকতার ও প্রথম প্রেমের স্মৃতির মাঝখানে আর এক গভীরতর সার্থকতার শান্তি পেলেন। 'অসহ্য হয়ে উঠেছে এ সংসার শান্তি বলে জিনিস নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের শত মধুস্মৃতিমাখা গ্রামটিতে। হয়তো নিরুপমার সঙ্গে দেখা হয়ে-ও যেতে পারে—অন্তত সেই সব জায়গাতেও আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে।'[১৭] বাইশ বছর-এ-ও পঞ্চাশোর্ধ্ব কথকের বাইশ বছরের জন্যে বেদনা, 'হায়রে আমার বাইশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তুমি যখন এসেছিলে,

[১৩] সার্থকতা, ("যাত্রাবদল")।
[১৪] বংশলতিকার সন্ধানে, ("অসাধারণ")।
[১৫] তুচ্ছ ("অসাধারণ")।
[১৬] 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' (নবাগত)।
[১৭] জন্মদিন (অসাধারণ)।

তখন তোমায় চিনিনি।'[১৮] এই ব্যর্থতাতেও সেই সার্থকতার ইঙ্গিত। হাট, ডানপিটে, নুটিমন্তর এবং প্রত্যাবর্তন—চারটি গল্পেই সেই সার্থকতার সন্ধান। সে সন্ধান পূর্ব-জীবনকে ফিরে পাওয়ার পথে। অর্থের সুবিধে সত্ত্বেও পুরোন মন্ডলের কাছে ঝিটকি-পোতার হাটই ভাল লাগে, সতীশের কাশীই ভাল লাগে, হাবুর সহজ সাধারণ মানুষ হতে ইচ্ছে যায়, কলকাতার মত নগরী ছেড়ে গোবিন্দের গ্রামে ফিরে যেতে মন চায়। চারটি গল্পেই ফিরে পাওয়ার আবেদন ফুটে উঠেছে। শুধু ডানপিটে গল্পটিতে প্রত্যাবর্তনের পথ উপকাহিনীতে অযথা জটিল হওয়ায় আবেদনের সংহতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রত্যাবর্তন রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পটি মনে করিয়ে দেয়। বুধোর মায়ের মৃত্যু এবং দৈবাৎ গল্প দুটিতে বুধোর মা গ্রামবাসীকে অন্নদানে এবং কালী চৌধুরী পুকুর কেটে জলদানে জীবনের সার্থকতা ও শান্তি খুঁজে পেয়েছে। ভিড় ("নবাগত") এবং গল্প নয় ("জ্যোতিরিঙ্গণ") একই ধরনের গল্প। পুত্রশোকাতুরের কান্নায়, নারীহৃদয়ের মাতৃস্নেহে সার্থকতার এক নবীন বার্তা রচিত হল 'যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্বকালের সর্বযুগের।'[১৯] কিন্নরদল ব্যতীত এই সমস্ত গল্পে সার্থকতা যেমন নিজের মাঝখানে জীবনের উপলব্ধিতে, কিন্নরদল-এ তেমনি এই সার্থকতা অপরের মাঝখানে জীবনের সার্থকতার উপলব্ধি সৃষ্টিতে। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনের কিন্নরদল ক্ষণিকের জন্যে সংকীর্ণ এক পল্লীজীবনে স্বর্গের আভাস এনেছে। নাস্তিক গল্পে যে লোকনাথ জীবনে পরমের অস্তিত্বের উত্তর খুঁজে পেলে না, সেই লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টির সামনে অস্তিত্বের সার্থকতার একটা ইঙ্গিত যেন ফুটে উঠল। 'সে সার্থকতা এই পৃথিবীতে, এই জীবনেই লোকনাথের মুগ্ধদৃষ্টিতে ফুটে উঠল।' 'পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে? কেন আমায় মারবে তুমি? এ পাড়ায় আসি বলে? আর কখনো আসব না—দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি......।'[২০]

বিভূতিভূষণের এই গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প মেঘমল্লার। বিস্মৃত এক বৌদ্ধযুগের ছায়ান্ধকারে প্রদ্যুম্নের জীবনবোধের গভীরতায় এবং সুনন্দার ব্যর্থ প্রতীক্ষায় এ গল্প বিভূতিভূষণের সাহিত্যে তুলনাহীন সৃষ্টি। বিভূতিভূষণের আর কোন গল্পেই বোধ হয় এমন করে জীবনবোধের নিবিড়তা, ঘটনাবিন্যাসের নিপুণতা এবং ভাষার সৌন্দর্য সার্থকভাবে মিলিত হয় নি। ইতিহাসের ধূসরতায় আষাঢ়ী পূর্ণিমার তরল অন্ধকারে প্রদ্যুম্নের সংশয়াকুল দৃষ্টিপথে সরস্বতীর আবির্ভাবের অলৌকিক ব্যাপারটিকে লেখক কি নিপুণভাবে নিষ্পন্ন করেছেন। কলালক্ষ্মী বন্দিনী সরস্বতীকে মুক্ত করার উদার প্রেরণার ও অধিকারের আনন্দ অনির্বাণ আলোর মত গল্পের মধ্যে জ্বলছে। 'যুগে যুগে যে উদার প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজ-ও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তার রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।'[২১] আর এই অনির্বাণ আলোর নীচে সন্ধ্যার আকাশে বন্ধ-আঁখি বাতায়ন-পথবর্তিনী তার দুঃখিনী মা, জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জন পাষাণ-অলিন্দে বিরহিণী সুনন্দা। বৌদ্ধযুগের পরিবেশে আরও দুটি গল্প তিনি লেখেন—দাতার স্বর্গ

[১৮] 'বাইশ বছর' ("যাত্রাবদল")।
[১৯] গল্প নয় ("জ্যোতিরিঙ্গণ")।
[২০] নাস্তিক ("মেঘমল্লার")।
[২১] মেঘমল্লার ("মেঘমল্লার")।

("মৌরীফুল") এবং শেষ লেখা ("কুশলপাহাড়ী")। দুটি গল্পেই অবশ্য তাঁর জীবনবোধের পরিচয় রয়েছে, তবে মেঘমল্লার-এর পাশে তারা একান্তই নিষ্প্রভ। দাতার স্বর্গ-এ শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন তাঁর অজস্র দানের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পরের দুঃখমোচনের জন্যে শুধু একটিবারই দান করেছিলেন। মর্ত্যে তিনি তার জন্যে প্রায় কোন প্রশংসাই পান নি। মর্ত্যের সেই অপুরস্কৃত দানটি স্বর্গবাসের অনুমোদনে পুরস্কৃত হওয়ায় বেশ স্নিগ্ধ একটা চমক উপভোগ করা যায়। খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধির মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। শেষলেখা গল্পটি নীতিকথা-লক্ষণাক্রান্ত। বুদ্ধ তাঁর অনুজ নন্দকে সংসারের বা পার্থিব প্রেমের অসারত্ব বুঝিয়েছেন। এখানে 'মেঘমল্লার'-এর তুলনায় ইতিহাসের রহস্যময় পরিবেশ রচনায় বিভূতিভূষণ অমনোযোগী, যার ফলে বুদ্ধ তাঁর ইচ্ছামত নন্দকে উড়িয়ে অপ্সরীদের স্বর্গে নিয়ে যেতে পেরেছেন। দ্বিতীয়তঃ, পার্থিব প্রেমের অসারত্ব সমগ্র কাহিনীতে সঞ্চারিত না হয়ে আরোপিত হওয়ায় জীবনবোধের নিবিড়তা গল্পটিতে অনুপস্থিত। শেষলেখা বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের উদাহরণ মাত্র।

জীবনে সার্থকতা নিয়ে আসে কোথাও মহাকাল ও মানুষ, কোথাও বা সুদূর। এই সুদূরের পিপাসা নিয়ে সার্থক দুটি গল্প হল—একটি ভ্রমণ কাহিনী ("উপলখণ্ড") ও সিঁদুরচরণ ("ক্ষণভঙ্গুর") গোপীকৃষ্ণবাবু, শম্ভু ডাক্তার এবং সিঁদুরচরণ তিনজনই সুদূরের পিয়াসী। গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার প্রতিবারেই পুজোর আগে একসঙ্গে বসে বিদেশ ভ্রমণের প্ল্যান আঁটে—পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে শুরু করে বীরভূম জেলার নলহাটি পর্যন্ত কোন জায়গাই তাদের বাদ পড়ে না। কিন্তু অর্থাভাবে ও পারিবারিক অসুবিধায় শেষপর্যন্ত কোথাও যাওয়া হয় না। অতদূর না হলেও সিঁদুরচরণেরও দুদিনের জন্যে দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা যায়। শেষপর্যন্ত তিনজনেরই ভ্রমণের ইচ্ছা সার্থক হল। তবে তা সুদূরে নয়, অদূরে। গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার বারাসত থেকে দুমাইল দূরে লাঙলপোতায় গেল এবং সিঁদুরচরণ কৃষ্ণনগর থেকে অদূরে বাহাদুরপুর গেল। কিন্তু তাতেই তিনজনে খুব খুশি। বিভূতিভূষণের কাছে সুদূর দূরত্বে না হলেও কিছু এসে যায় না কারণ তাঁর মতে সুদূর শুধু দূরত্বে নয়, দূরের মানসিকতায়। ভ্রমণ শুধু ভ্রাম্যমাণতায় নয়, ভ্রমণেচ্ছায়। আসলে তুমি কত খুশি হলে, কত চরিতার্থ হলে তাই দিয়েই ভ্রমণের বিচার। প্রথম গল্পের স্মিত হাসি ও দ্বিতীয় গল্পের অকপট সরলতা ভ্রমণের সার্থকতার অর্থকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। ভ্রমণবিষয়ক না হলেও একই আবেদন আর একটি গল্পে ফুটে উঠেছে। গল্পটির নাম—আমোদ ("ছায়াছবি")। এখানে অকিঞ্চিৎকর দূরত্বের মত আমোদের উপকরণও একান্তই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমোদটা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর নয়। দর্শকদের হাতে মার খেয়ে, সারারাত স্রেফ দাঁড়িয়েও রামধন ও তার ছেলে ফণি উভয়েরই যাত্রা দেখে কি আনন্দ!

জীবনবোধের এইসব তাৎপর্যমণ্ডিত অর্থগভীরতার পাশে আর এক জায়গায় জীবন যেখানে কায়াহীন, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন অনির্দিষ্টতা হয়ে আছে সেই অনির্দিষ্টতাকে নিয়ে বিভূতিভূষণ ভণ্ডুলমামার বাড়ি-র ("যাত্রাবদল") মত এক ইঙ্গিতময় সার্থক গল্প রচনা করেছেন। এই অনির্দিষ্টতা শুধু এককালের নয়, কাল থেকে কালান্তরে বিসর্পিত—ভণ্ডুলমামার বাড়ির মতই তা সমাপ্তিহীন। 'জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে যেন অনন্তকাল, অনন্তযুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইঁট একখানির পর আর একখানি উঠছে—শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাল বেয়ে কতশত

জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে—ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।'[২২] ভণ্ডুলমামার বাড়িকে কেন্দ্র করে গল্পের এই গভীর ইঙ্গিত যেমন সুন্দর হয়ে ফুটেছে তেমনি ভণ্ডুলমামার বাড়ির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনির্দিষ্টতার অগ্রগতি লিপিচাতুর্যে উচ্চাঙ্গের শিল্প হয়ে উঠেছে।

২

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের আর এক উপাদান সহজ সাধারণ মানুষ। এ সম্বন্ধে তাঁর কথাতেই বলা চলে 'তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যাসকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল-বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল-বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।'[২৩] বিভূতিভূষণের সাহিত্য রচনার শুরু এই চেনা সহজ সাধারণ মানুষকে নিয়ে। 'উপেক্ষিতা'র জন্মের ইতিহাস গল্প করতে করতে তিনি জানান, 'পল্লীগ্রামের একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গ কাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্য বধূকে দেখি পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক।'[২৪] পূর্বেই বলা হয়েছে বিভূতিভূষণের ছোট গল্পের লক্ষ প্রধানতঃ মানুষ—সেই জন্যে তাঁর সমগ্র গল্পসাহিত্যে সহজ সাধারণ মানুষকে নিয়ে গল্পের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাঁর গল্প-ভূমণ্ডলের প্রায় তিনভাগ মানুষ এবং একভাগ অপরাপর। সাধারণ মানুষকে বিভূতিভূষণ কোথাও নানান কাহিনীতে, কোথাও বিচিত্র চরিত্রে দেখলেও সবচেয়ে সার্থক করে দেখেছেন মমতায়। অখ্যাতির আড়ালে বোবা মানুষের বুকে যে মমতার মধু জমেছে এই ধরনের গল্পের পত্রপুটে বিভূতিভূষণ তাকেই আমাদের কাছে নিবেদন করেছেন। তাঁর মানবিক মমত্ববোধের গল্পগুলিতে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধির কথা রয়েছে এবং সেই অর্থে এগুলিকে পূর্বশ্রেণীতে ফেলা যেতে পারত। বিভূতিভূষণের এই দুই শ্রেণীর গল্প থেকে যে কোন একটি সার্থক গল্প তুলে নিলেই চোখে পড়ে তাতে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানুষের নিবিড় মমতার মিলন ঘটেছে। মেঘমল্লার-এ প্রদ্যুম্নের তরুণ প্রাণের উদার প্রেরণার পাশেই তার 'বাতায়ন পথবর্তিনী' মায়ের জন্য মমতা। সুতরাং এই দুই জাতের মধ্যে জল-অচল কোন অবস্থার কথাই ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ, বিভাগ কখনও বিসংবাদিক না হয়ে পারে না, কারণ তা একজন স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী—তবে তা স্রষ্টার স্বেচ্ছাচারিতা না হলেই রক্ষা। অধ্যাত্ম বা জীবনবোধের অনেক গল্পই মানবিক মমত্ববোধের মধ্যে আনা যায় এবং মানবিক মমত্ববোধের গল্পগুলিও তদ্বিপরীত করা যায়। গল্পগুলির দার্শনিক ফলশ্রুতির ও তার আপেক্ষিক অভাবের দিকে লক্ষ রেখে এখানে তা কিন্তু করা হয়নি। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দ্রবময়ীর মমতা গল্পের পাত্র উপছে মমতার

[২২] ভণ্ডুলমামার বাড়ি ("যাত্রাবদল")।
[২৩] স্মৃতির রেখা ("সাহিত্যের কথা")।
[২৪] আমার লেখা ("নবাগত")।

দার্শনিকতায় গিয়ে পড়েছে।

সাধারণ মানুষের মমতাকে নিয়ে বিভূতিভূষণের গল্পের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। পূর্বে বলা হয়েছে তাঁর গল্পসাহিত্যের তিন ভাগ জুড়ে সাধারণ মানুষ। আর এরই এক-চতুর্থাংশ জুড়ে মমত্ববোধের গল্পগুচ্ছ। এই মমত্ববোধ স্নেহে, সহানুভূতিতে, করুণায় উচ্ছ্বসিত। মমত্ববোধ নিয়ে বিভূতিভূষণের দুটি সেরা গল্প—পুঁইমাচা ("মেঘমল্লার") এবং জলসত্র ("মৌরীফুল")। দুটি গল্পেই মমতার উপকরণ—বালিকা। পুঁইমাচা গল্পে লোভী মেয়েটির বাবার সঙ্গে মেটেআলু চুরি করতে যাওয়া থেকে শুরু করে, প্রৌঢ় দোজবরের সঙ্গে বিবাহিত হওয়া, শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছনা এবং শেষপর্যন্ত মারা যাওয়া—এই ঘটনাগুলিকে লেখক কি অপরূপ করুণায় সিক্ত করে বর্ণনা করেছেন! 'ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত—তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়িতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বলব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি?'[২৫] এই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায় জড়িয়ে আজ মাচাজোড়া পুঁইগাছ হয়েছে। বর্ষার জল, কার্তিকের শিশিরের মমতা তার ওপর বর্ষিত। 'কচি কচি সবুজ ডগাগুলো মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে—সুস্পষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'[২৫] 'জলসত্র' গল্পের কলু বালিকাটিকেও বিভূতিভূষণ বড় মমতায় এঁকেছেন। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে চার-ক্রোশব্যাপী দীর্ঘ প্রান্তর পার হতে গিয়ে এই ন'-দশ বছরের কলু বালিকাটি পিপাসায় অবসন্ন হয়ে পড়ে। বটের ছায়ায় তাকে নামিয়ে রেখে ভাইরা যখন জল নিয়ে ফিরে আসে তখন দেখে বোন কচুর ডগা মুখে মরে পড়ে আছে। সেই মরা বোনের স্বপ্নাদেশে আজ এখানে জলসত্র। অসহ্য পিপাসায় যে জলের অভাবে মারা গিয়েছিল 'আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘমধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লীপথিককে জল যোগাচ্ছে।'[২৬] বৃদ্ধ মাধব শিরোমণির ক্রমিক পিপাসাকাতরতা এবং এই পরিস্থিতিতে কলু বালিকাটির করুণ কাহিনী শ্রবণে তাঁর গোঁড়ামির পরিবর্তনে লেখকের গভীর বাস্তববোধের পরিচয় মেলে।

মানবিক মমত্ববোধের পর্যায়ে অনেকগুলি গল্পের সন্ধান মেলে যেগুলিতে বাৎসল্য এবং স্নেহের প্রকাশ ঘটেছে। মাতৃস্নেহ নিয়ে যে গল্পগুলি রচিত সেগুলি : আহ্বান ("বিধু-মাস্টার"), ডাইনী ("কিন্নরদল"), হিংয়ের কচুরি("জ্যোতিরিঙ্গণ"), জাল ("কুশলপাহাড়ী")। এই গল্পগুচ্ছের শ্রেষ্ঠ গল্প আহ্বান। সমস্ত গল্পগুলিতেই নারীর করুণা ও স্নেহময়ী মূর্তি ফুটে উঠেছে। আহ্বান গল্পের জননী বিভূতি-সাহিত্যের জননী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক দরিদ্রা ও অক্ষমা এবং সবচেয়ে রূঢ়ভাবে আহতা। এই সবকিছুর মাঝখানে তার মাতৃহৃদয়ের অনপেক্ষ আহ্বান 'অ মোর গোপাল' 'যেতে নাহি দিব'র আট বছরের কন্যাটির আহ্বানের মত চেতনার গভীর লোক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে হয়। হিঙের কচুরিতে কুসুমকে সামাজিক বিচারে হীন ও পতিত অবস্থার মধ্যে রেখে লেখক তার মধ্যে মাতৃত্বের আবিষ্কার করেছেন। সে আবিষ্কার অবশ্য আহ্বান-এর মত এত পরীক্ষিত নয়। জাল গল্পে অনসূয়ার মাতৃত্বের জালে কথক আটকে পড়েছে। হাজারিবাগের দূর অরণ্য-পরিবেশে তার স্বাভাবিকভাবে মনে হয়েছে, 'নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রের শোভার সঙ্গে মিশে গেল হারানো-মায়ের

[২৫] পুঁইমাচা ("মেঘমল্লার")।
[২৬] জলসত্র ("মৌরীফুল")।

কথা। মেয়েরা হচ্ছে, আসলে মা, তারপর অন্য কিছু। কি ভালো লাগলো সে-রাত্রে অনসূয়া বাঈয়ের স্নেহসিক্ত ওই সামান্য দুটি কথা।'[২৭] ডাইনী গল্পে এক সন্তানহীনা বধূর সন্তান-স্নেহের প্রকাশ ডাইনীগিরির মতলবে ব্যাখ্যাত। গল্পটি একেবারে মামুলি, নিবিড়তা বা বিস্ময় খুব কম। মায়ের বাৎসল্যের মত পিতার বাৎসল্য নিয়ে রচিত গল্প—অন্নপ্রাশন ("জন্ম ও মৃত্যু") ও সতীনাথের বাড়িফেরা ("কুশল পাহাড়ী")। দুটি গল্পের মধ্যে প্রথম গল্পটিই সুন্দর। দরিদ্র কেশব দশমাসের শিশুটিকে যখন সকালে বাঁশবাগানে পুঁতে এল তখনও তার গায়ে উত্তাপ ছিল। মনিববাড়ির ছেলের অন্নপ্রাশনের কাজ শেষ করে স্বামী-স্ত্রী রাত্রে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। বৃষ্টির শব্দে কেশবের ঘুম ভেঙে সহসা মনে হল খোকাটার ঠাণ্ডা লাগবে। পিতৃস্নেহের নিবিড় মুহূর্তে কেশবের কাছে ক্ষণিকের জন্যে জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা মুছে গেল—এই ইঙ্গিত গল্পটিতে মর্মস্পর্শী রমণীয়তায় ফুটে উঠেছে। 'সীতানাথের বাড়ি ফেরা' পিতৃস্নেহের অসংযত অশ্রুতে ও উচ্ছ্বাসে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। ভ্রাতৃস্নেহ নিয়ে তিনটি গল্প রচিত হয়েছে : উপেক্ষিতা, উমারাণী ও ঠেলাগাড়ী। প্রথম দুটি গল্পে বোনের ভাইকে ভালবাসা, অপরটিতে ভাইয়ের ভাইকে ভালবাসা। তিনটি গল্পেই এদের সম্বন্ধ জন্মগত নয়, অর্জিত। এই তিনটি গল্পের মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকত্ব না থাকলেও বিভূতি-ভূষণ তাঁর হৃদয়ের সব সহানুভূতি উজাড় করে এগুলি লিখেছেন, বিশেষ করে তাঁর প্রথম গল্প উপেক্ষিতা। বিভূতিভূষণের গল্পগুলিতে জীবনের জটিলতা বিশ্লেষণের মনোভাবের চেয়ে জীবনের মাধুর্য প্রদর্শনের প্রবণতা বেশি। শুরু থেকেই তাঁর প্রথম রচনা নিজস্ব স্বভাবের পথ ধরে চলতে শুরু করেছে। খুকীর কাণ্ড ("মেঘমল্লার") এবং বৈদ্যনাথ ("যাত্রা-বদল") গল্পদুটিতে স্নেহসিক্ত মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ঘটনা কেন্দ্রসংহত না হওয়ায় গল্পদুটি অনেকাংশে বিবৃতিতে পরিণত হয়েছে।

মানবিক মমত্ববোধের মধ্যে বিশুদ্ধ সহানুভূতি নিয়ে বিভূতিভূষণ অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। এগুলির মধ্যে সেরা গল্প মৌরীফুল ("মৌরীফুল")। কলহপরায়ণা সুশীলার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার বেদনা লেখকের সহানুভূতিতে গল্পটিতে নিবিড়ভাবে ফুটে উঠেছে। একগুঁয়ে অথচ স্নেহকাতর সুশীলার ভাগ্যবিপর্যয়ের বেদনাকে লেখক নিপুণ ঘটনাবিন্যাসের এবং ভাবের ঐকান্তিকতার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। বিচ্ছেদের পূর্বরাত্রে একাকী সুশীলার মনে হয়েছে 'তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে এমন সব রাত্রে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল?'[২৮] দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে এত নিবিড় না হলেও আর একটি গল্প গায়ে হলুদ। পুঁটির কাছে তার আসন্ন দাম্পত্য জীবন অন্ধকার লেগেছে। অবশ্য তা সুশীলার মত বাস্তবিকতায় নয়, তার ভাবুকতায়। দাম্পত্যব্যর্থতা না হলেও বিবাহ সংক্রান্ত ব্যর্থতা নিয়ে চারটি গল্প চোখে পড়ে : মরীচিকা, রাক্ষসগণ ("মৌরীফুল"), খোসগল্প ও উন্নতি ("কিন্নরদল")। কোথাও কোষ্ঠীর অশুভ ফলের আশঙ্কায় ও আকস্মিক মৃত্যুতে, কোথাও রূপগুণবতী ও ধনবতীর আবির্ভাবে পূর্বের পছন্দ বা সম্বন্ধ করা কন্যার ও তার আত্মীয়-স্বজনের বেদনাকে বিভূতিভূষণ চরম সহানুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এই গল্পগুলির গায়ে বিষণ্ণ মমতার মাধুর্য লেগে রয়েছে। লেখকের, জ্ঞানীর ও শিল্পীর প্রতি অনুরূপ সহানুভূতি নিয়ে বিভূতিভূষণ যে কয়েকটি গল্প রচনা

[২৭] জাল ("কুশল পাহাড়ী")।
[২৮] মৌরীফুল ("মৌরীফুল")।

করেছেন সেগুলি : লেখক, যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ ("জন্ম ও মৃত্যু"), গ্রহের ফের ("মৌরী-ফুল") ও জনসভা ("বেণীগির ফুলবাড়ী")। এই গল্পগুলিতে কোথাও একদা খ্যাত, কোথাও অবহেলিত, কোথাও অক্ষম অথচ কবিযশঃপ্রার্থী শিল্পীদের জন্যে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। তাঁর এই সহানুভূতির রূপকল্পনায় মৌলিকত্ব নেই বটে কিন্তু লেখকের একান্ত আন্তরিকতায় এগুলি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। লেখক ও গ্রহের ফের গল্পে নিস্তরঙ্গ কাহিনী যেমন নির্দিষ্টভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে, অন্য গল্প দুটিতে যদু হাজরার শিখিধ্বজের নগণ্য অভিনয়ে ও কবি ভূষণ চক্রবর্তীর নিজের পয়সায় হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে নিজের কাব্য-সম্বর্ধনার কৌতুককর প্রয়াসে কাহিনী অপেক্ষাকৃত তরঙ্গসংকুলতায় ভাব-পরিণতির দিকে আপন বৈচিত্র্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে। অনেক সময় বিষয় একান্ত তুচ্ছ, যৎসামান্য বলেই বিষয়ীর প্রতি তাঁর অসামান্য দরদবোধ। সে তুচ্ছতা কোথাও পল্লীবধূর ডাকগাড়ি দর্শনে (ডাকগাড়ী), রুণ্না অলকার বাটিচচ্চড়ির প্রতি লোভে (বাটিচচ্চড়ি), রেল অফিসের কর্মচারীদের অতি সাধারণ বার্ষিক উৎসবের থিয়েটারের টিকিটে (থিয়েটারের টিকিট), স্বামীর আদায় করা খাজনা থেকে আঠারো টাকা সাত আনা সঞ্চয়ে (সঞ্চয়), হাবুলের মার সইয়ের কাছে ছেঁড়া জামার ও কিছু খাদ্যের প্রত্যাশায় (সই), জেলের ছেলে কানাইয়ের চাকরি ও কোয়ার্টার প্রাপ্তিতে (বাসা)। মৃত্যুর পটভূমিতে সহানুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে দুটি গল্পে : যাত্রাবদল-এ ("যাত্রাবদল") এবং জন্ম ও মৃত্যু-তে (("জন্ম ও মৃত্যু")। দুটি গল্পেই মৃত্যু অতি পরিচিত সাধারণ জনের। প্রথম গল্পের ভদ্রলোক বহুদিন মেসে ছিল—এতদিন পরে বাসা ভাড়া করে ঘরবাঁধার জন্যে স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। পথে সেই নবগৃহোন্মুখ ভদ্রলোকের তরুণী স্ত্রীর মৃত্যু। দ্বিতীয় গল্পে পদস্থ সন্তানেরা থাকতেও কায়ক্লেশে দিন চলত যে শশী ঠাকরুনের, সেই বৃদ্ধা শশী ঠাকরুনের মৃত্যু। প্রথম গল্পে পথের প্রান্তে তরুণীর মৃত্যুর আকস্মিকতার এবং দ্বিতীয় গল্পে চিরদুঃখিনী শশী ঠাকরুনের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধের ঘটায় লেখক বঞ্চিতা রমণী দুটির প্রতি পাঠকচিত্তে গভীর সহানুভূতির সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ সহানুভূতি ঢেলে তিনি রচনা করেছেন নিরীহ বিধুমাষ্টারকে (বিধুমাষ্টার), গ্রামের অখ্যাত গৌর পিওনকে (অভিনন্দন সভা), ভীমরতিধরা বৃদ্ধ ঠাকুরদাকে (দাদু), সদ্য বিধবা রাণীকে (একটি দিনের কথা), পতিতা হাজুকে (বিপদ) এবং কলহপরায়ণ শ্বশুর ও পুত্রবধূকে (সংসার)। এই গল্পগুলির মধ্যে অভিনন্দন সভায় লেখকের সহানুভূতির পাশে আধুনিককালে সভা-সমিতি-বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি কটাক্ষ উপভোগ্য।

স্তুতিবর্ষণের মাঝখানে বিপন্ন 'গৌর পিওন কিছু বলতে উঠে ঝরঝর করে কেঁদে উঠল। শুধু সে হাতজোড় করে সভাস্থ সকলের দিকে চেয়ে দু'তিনবার বললে বাবুরা বাবুরা—।' প্রায় প্রতিদিনের সাংসারিক কলহের এবং ভিন্নতার মাঝখানে উপেন ভট্টাচার্য কখনও কখনও মমতার টানে পুত্রবধূর হাতে সিধে তুলে দেয়, পুত্রবধূও সেই টানে সেদিন শ্বশুরকে রাঁধতে দেয় না, নিজে রেঁধে দেয়। সংসারের প্রতিদিনের স্বার্থ-ইতরতা সত্ত্বেও মমতায় এক একটি দিন যে অতিসুন্দর হয়ে দেখা দেয় এই ইঙ্গিত 'সংসার' গল্পটির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর অতি পরিচিত সহজ সাধারণ মানুষের অনুরাগকে নিয়ে খুব বেশি না হলেও গুটিকয়েক গল্প লিখেছেন। সাধারণতঃ প্রেমের গল্পে অনুরাগের যে দুরন্ত

আবেগের পরিচয় ও চিন্তাবিশ্লেষণ থাকে বিভূতিভূষণের প্রেমের গল্পে সে ধরনের আবেগ ও বিশ্লেষণ নেই। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অনুরাগ অনেকটা মমতারই নামান্তর। অপুর ওপরেও অপর্ণার এই মমতা, 'অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসারানভিজ্ঞতা, হাসিখুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে'। 'অপুর দিক থেকে-ও সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রানুদি, কি লীলা, কি অপর্ণা—এদের সকলের মধ্যেই মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছেন।' বিভূতিভূষণের মানবিক মমত্ববোধের গল্পগুলি যেমন পরিকল্পনার নতুনত্বে উজ্জ্বল নয়,—সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ, তেমনি তাঁর প্রেমের গল্পগুলিও। বিভূতিভূষণ তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি ঢেলে এগুলি রচনা করেছেন এবং আন্তরিকতার স্নিগ্ধ উত্তাপে গল্পগুলি মনোরম হয়ে উঠেছে। এই মনোরম গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী গল্প অরন্ধনের নিমন্ত্রণ ("জন্ম ও মৃত্যু")। লীলা-সঙ্গিনী কুমীর সঙ্গে হীরেনের দশ বছর বাদে দেখা। 'তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে দুটো গরুর দড়ি ধরে নিয়ে আসছে।' কুমীর এই দীন অবস্থা, হীরেনের প্রতি তার পূর্বের ব্যবহার এবং কাতর প্রশ্ন, 'আমার কথা মনে পড়ত হীরুদা?'—এই সব কিছু মিলে কুমীর যে ম্লান ও কাতর মূর্তি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তাকে কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না। কুয়াশার রঙ-এ ("বেণীগির ফুলবাড়ী") প্রতুলের ও কণার কাহিনী প্রায় একই রকমের কিন্তু পরিণতি অরন্ধণের নিমন্ত্রণ-এর মত মর্মস্পর্শী নয়। বরং 'কুয়াশার রঙ'-এ বয়সের রোদে কণার রূপের কুয়াশা ফিকে হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলের যে দুঃখ ও বিবাহ না করার জন্যে স্বস্তিবোধ তা যেমন পূর্ববর্তী গল্পটির তুলনায় অগভীর, তেমনি বিভূতিভূষণের মনোভাবের পক্ষে অস্বাভাবিক। অনুরাগের স্মরণচিহ্ন নিয়ে এই গল্পগুচ্ছে তিনটি গল্প আছে : বাঁশি ("বেণীগির ফুলবাড়ী"), বোতাম ("মুখোস ও মুখশ্রী") ও চিঠি ("আচার্য কৃপালনী কলোনী")। সুলেখার জীবনে মৃত স্বামীর বিবর্ণ পিতলের বাঁশি, স্বদেশী আন্দোলনের নেত্রী এলিশবা কুইএর জীবনে কথকের দেওয়া পিতলের বোতাম ও মৃতা স্ত্রীর পত্র নিয়ে বিষণ্ণ ও মধুর তিনটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। স্মরণচিহ্নের এই কাহিনী-তিনটির মধ্যে চিঠি গল্পটিতে প্রৌঢ় কথকের জীবনে ত্রিশ বছর আগের মৃতা স্ত্রীর যৌবন বয়সের এক পত্র অপূর্ব আহ্বানের ইঙ্গিত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 'চমৎকার শরৎ দুপুরটিতে শুধু বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম চিঠিখানা হাতে করে। দূর আকাশের কোণে যেন বেলপুকুর গ্রামটিতে আমার প্রথম শ্বশুর বাড়ির চিলে কোঠার ঘরে আমার প্রথম পরিণয়ের নববধূ আজ-ও যেন আমার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছে।'[২১] একটি বিশেষ কোন স্মরণচিহ্ন না থাকলেও মুক্তকেশীর সঙ্গে যাপিত সমগ্র মধুর যৌবনই স্মরণচিহ্ন হয়ে কেশব গাঙ্গুলির অবসরপ্রাপ্ত জীবনে দেখা দিয়েছে ("ঝগড়া")। উত্তর জীবনে পূর্ব অনুরাগের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা হয়েছে : পারমিট ("নবাগত"), বিড়ম্বনা ("উপলখণ্ড"), অসমাপ্ত ("বিধুমাস্টার"), আমার ডাক্তারি ("রূপহলুদ") এবং মরফোলজি ("ছায়াছবি")। কথকের সঙ্গে জমিদারকন্যা স্মৃতির, বিষ্ণুর সঙ্গে তাদের গ্রামের মেয়ে নন্দির, কথকের সঙ্গে তার বাল্য-সঙ্গিনী শান্তির, ডাক্তার কথকের সঙ্গে বিধবা দীপুর, কথকের সঙ্গে তাঁর একদা সহপাঠিনী নির্মলার সম্বন্ধ নিয়ে যথাক্রমে এই গল্পগুলি রচিত। এই গল্পগুলির মধ্যে মরফোলজি গল্পটিতে প্রেমের ব্যাপারে কথকের সলজ্জ স্বভাব, নির্মলার মৃদু ইঙ্গিত এবং

[২১] চিঠি ("নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব")।

দীর্ঘ আঠার বছর বাদে এক পরীক্ষার্থিনীর মুখচ্ছবিতে যৌবন-সঙ্গিনীর ম্লান প্রতিরূপ-দর্শন বড় বিষণ্ণমধুর হয়ে ফুটেছে। বাক্সবদল-এ ("বিধুমাস্টার") বদলের মধুর ভুল গল্পে এক মিষ্টি আমেজ সৃষ্টি করেছে। প্রেম-বিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে রোমান্স্ ("মৌরীফুল"), খুড়ী মা ("জন্ম ও মৃত্যু") এবং বেণীগির ফুলবাড়ি ("বেণীগির ফুলবাড়ী") লেখকের নিবিড় সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে অনেকাংশে শুধু বিবৃতিধর্মী কাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

অল্প. হলেও বিভূতিভূষণের গল্পগুচ্ছে কতকগুলি হাসির গল্প আছে। এই গল্পগুলিতে মানুষের দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা নিয়ে লেখক কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও কৌতুক করেছেন। মানুষকে নিয়ে হাসানর পথ বিভূতিভূষণের স্বভাবসিদ্ধ মানব দরদের কক্ষপথ থেকে দূরে ও তাঁর অপরিচিত বলে বিভূতিভূষণ এই গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেও সার্থকতা দেখাতে পারেননি। হাস্যরসাত্মক গল্পের আঙ্গিকে বাক্যের যে সংহতি ও ক্ষিপ্রতা এবং ভাষার যে শাণিত দীপ্তি এবং সবটা জড়িয়ে যে প্রচ্ছন্ন অথচ অব্যর্থ আক্রমণ থাকে বিভূতিভূষণের মনোভাব থেকে সেগুলি দূরে থাকায় হাসির গল্পের কলাকৌশল তাঁর অনায়ত্ত থেকে গেছে। এখানেও তাঁর স্মৃতিধর্মী সাহিত্যের উপযুক্ত বিলম্বিতলয় বাক্য এবং ভাষার দীপ্তির পরিবর্তে বিবৃতিমূলকতা ও গাম্ভীর্য—বড়োজোর সবটা জড়িয়ে একটি মৃদু কটাক্ষ। মানুষের দুর্বলতা ও আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করে তাঁর গল্পগুচ্ছে চারটি গল্প রয়েছে : আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা ("উপলখণ্ড"), উড়ুম্বর ("মুখোশ ও মুখশ্রী"), অনুশোচনা ("জ্যোতিরিঙ্গণ") এবং অভয়ের অনিদ্রা ("বিধুমাস্টার")। কোন গল্পেই ব্যঙ্গের উপযোগী শাণিত ভাষা এবং তীক্ষ্ম বিদ্রূপের মনোভাব নেই, কিছুটা কটাক্ষের উপযোগী ভাষা এবং বাস্তব মনোভাব রয়েছে। গল্প চারটির মধ্যে প্রথম দুটি গল্প চলচ্চিত্রপ্রীতির আতিশয্যকে এবং শেষটি চারিত্রিক দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে। চলচ্চিত্রপ্রীতির অতিশয্যের ব্যাপারে ব্যঙ্গের লক্ষ যথাক্রমে সাধারণ মানুষ ও লেখক। আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা গল্পে শুধু জনসাধারণ কেন শিক্ষিতরাও যে চিত্রতারকাদের প্রতি তাদের মনোভাবের ব্যাপারে জনসাধারণের মত অতি সাধারণ এবং সাংবাদিকরাও যে এ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিচার-বিবেচনাশূন্য এই কটাক্ষ তিনি করেছেন। আইনস্টাইন কখন ভারতে এসেছিলেন বলে শোনা যায় নি। এলে ইন্দুবালার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যে সম্ভাব্য পরিস্থিতি হত তাকে কোন কাল্পনিক পরিবেশে যুক্ত না করে বাস্তব পরিবেশে রচনা করায় সমগ্র ব্যাপারটির অসঙ্গতি আমাদের পীড়া দেয়। আইনস্টাইন, রানাঘাট, সংবাদপত্রের রিপোর্ট এসবই এত সত্য যে এগুলির মধ্যে আইনস্টাইনের আসার মত একটি কাল্পনিক ঘটনাকে বসাতে আমাদের অসুবিধা হয়। পাঠক তার প্রাথমিক অবিশ্বাস কাটিয়ে গল্পের কটাক্ষকে নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে পারে না। লেখক অবশ্য এই কাল্পনিকতাকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মাধ্যমে না দিয়ে জনশ্রুতির পর্যায়ে রেখে বিশ্বাস্য করার চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে উড়ুম্বর গল্পে ব্যাস, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতির (আসলে লেখক-সাধারণের) নিজ নিজ গ্রন্থের আলেখ্য চিত্রের জন্যে যে ব্যগ্রতা সেই ব্যগ্রতার পরিবেশ মর্তে নয়, স্বর্গে। তাঁরা স্বর্গ থেকে মর্তে সিনেমায় নিজেদের চিত্রনাট্যরূপ দেখে যান। পূর্ব কাহিনীর মত কল্পনা ও বাস্তবকে অবিশ্বাস্যভাবে মিশিয়ে না ফেলে লেখক এখানে ভালই করেছেন। অনুশোচনা গল্পে এই ধরনের কোন অসঙ্গতি নেই। যে পাদ্রী বালাদাস আশ্তের কাছে কৃষক মঙ্গলদাস তার সুন্দরী শালীকে স্নানরতা অবস্থায় দেখার স্বীকারোক্তি করে সেই পাদ্রীর চুরি করে মেয়েটিকে দেবার মধ্যে মনুষ্যস্বভাবের

দুর্বলতার প্রতি লেখকের মৃদু কটাক্ষটি ফুটে উঠেছে। অভয়ের অনিদ্রায় অভয়ের অর্থ-লোভের আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকের চেয়ে স্ত্রীর একআনা সোনার কানের দুল শবদেহের সঙ্গে চিতায় ভস্মীভূত হয়ে গেল এই দুঃখই তার আরও দুঃসহ লেগেছে। অভয়ের অর্থলোলুপতার গল্প একটু উদ্দেশ্যধর্মী ও আতিশয্যদুষ্ট। এই গুচ্ছের বাকি গল্পগুলিতে বিভূতিভূষণ সরল মানুষের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে সস্নেহ কৌতুক করেছেন। সে কৌতুকের উপকরণ কখনও এক যোধপুরী বাচাল প্রেমিক-ছাত্র (মুলো-র‍্যাডিশ-হর্সর‍্যাডিশ), কখনও এক গ্রাম্য মূর্খ ছাত্র (হারুণঅল রসিদের বিপদ), কখনও এক কাণ্ডজ্ঞান-হীন ব্রহ্মজ্ঞানী (মুক্তপুরুষ হরিদাস), কখনও এক অবসরপ্রাপ্ত প্রতিবেশীর বেকার শ্যালক (বেচারী), কখনও এক স্বখ্যাত ভগবান (জওহরলাল ও গড)।

বিভূতিভূষণের মানবচেতনার তথা পরিচিত সহজ সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা কাহিনীগুলিকে যেমন মমতা, সহানুভূতি, প্রেম, কৌতুক প্রভৃতি উপবিভাগে ভাগ করা যায় তেমনি চরিত্রচিত্রণের গল্পগুলিকে আর একটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। এ ভাগও পূর্বের মত অনড় এবং অবিসংবাদিত নয়। এই উপবিভাগের গল্পগুচ্ছে লেখক মানবচরিত্রের কোন একটি অপূর্বতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রপ্রধান গল্পগুলিতে যে গভীর মনস্তত্ত্ববোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ঘটনাবিন্যাসের সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় বিভূতিভূষণের গল্পগুলিতে তার একান্ত অভাব থাকায় এই ধরনের গল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর এই গল্পগুলিতে চরিত্রচিত্রণ শুধু বিবরণে, বিশ্লেষণে নয়। বিভূতি-ভূষণের সমস্ত চেতনায় জীবনের মহত্ত্ব যতখানি জায়গা পেয়েছে, জীবনের জটিলতা ততখানি পায়নি এবং মহত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী ঘটনায় তাঁর উদার ক্ষমাশীল ও ভাবুক দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের প্রতি উদাসীন থেকেছে। মানবচরিত্রের অপূর্বতাকে দেখানোর জন্যে বিভূতিভূষণ অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। কিন্তু চরিত্রের বিরাট হাটে যারা ভিড় করেছে তারা বিচিত্র ও অনাত্মীয় নয়, সধর্মা ও আত্মীয়,—সবাই মূলতঃ ভালমানুষ। এই বিরাট আত্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে আছে—ফকির (ফকির), ভিক্ষুক (পার্থক্য), পাচক (বায়ুরোগ), ফিরি-ওয়ালা (বেণীগির ফুলবাড়ী), শিল্পী (অনুসন্ধান), অথর (রামতারণ চাটুজ্জে অথর) কবি কুণ্ডুমশায় (ঝড়ের রাতে), শিক্ষক (মাষ্টারমশায়), সন্ন্যাসী (হরিকাকা), টেনিস-খেলোয়াড় (মুখোশ ও মুখশ্রী), যাত্রাদলের কর্তা (বারিক অপেরা পার্টি), উদাসীন সংসারী (নসুমামা ও আমি), নিবেদিতা নারী (অসাধারণ), চাষী (রূপোবাঙাল), উকিল (খোলস), বারবণিতা (গিরিবালা), ছাত্র (আমার ছাত্র), কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি (পরিহাস), স্নেহপরায়ণা রমণী (বামা), ঠাকুরদা (ঠাকুরদার গল্প), সংগীতশিল্পী (সুলেখা)।

চরিত্র-চিত্রণবিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ঘটনাবিন্যাসের দিক থেকে ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল ("নবাগত") গল্পটি অপেক্ষাকৃত ভাল। অভিনব উপায়ে কৃষ্ণলালের হারানো চাকুরির পুনঃপ্রাপ্তির ঘটনা বেশ চমকপ্রদ। বড়বাবুর বাহাদুরি ("জন্ম ও মৃত্যু" গল্পটিতে গাছ-গাছড়ার ব্যবসায়ী হরিপদ ৪০ টাকার পরিবর্তে ১১০০ টাকা পাওয়ায় প্রথমে খুশি হল এবং তারপর তার মতের পরিবর্তন হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টাকাটা সে ফেরৎ দিল। হরিপদের এই মানস বিবর্তনের ধারাটি বিস্তৃত না হলেও ইঙ্গিতের দ্বারা গল্পটিতে দেখানো হয়েছে। বিবেকের তাড়নায় হরিপদর টাকা ফেরৎ দেবার ব্যাপারটিকে অফিসের বড়বাবু সুবিধামত ব্যাখ্যা করে বাহাদুরি দেখিয়েছেন। এই বাহাদুরি দেখানোর ব্যাপারে লেখকের গভীর বাস্তববোধের পরিচয় রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে আর একটি গল্প আছে। গল্পটির

নাম ফিরিওয়ালা ("বেণীগির ফুলবাড়ী")। আগের গল্পের মত বিশ্লেষণ এখানে নেই, আছে শুধু চিত্রণ। কিন্তু সে চিত্রণ লেখক এত সহানুভূতিশীল হয়ে করেছেন যে তারই আন্তরিকতায় গল্পটি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর চেনাজানা মানুষের চরিত্র নিয়ে যেমন গল্প লিখেছেন তেমনি তাদের জীবনের নিছক কাহিনী বা ঘটনা নিয়ে অনেকগুলো গল্প লিখেছেন। তাঁর সমগ্র গল্পগুচ্ছের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে এই কাহিনীপ্রধান গল্পগুলি। কাহিনী-প্রধান গল্প যে বৈচিত্র্য ও বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল বিভূতিভূষণের গল্পগুলিতে তা না থাকায় এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্থক হয়নি। বিভূতিভূষণের মন জীবনের বহির্বৈচিত্র্যে তেমন উত্তেজনা বোধ করেনি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দার্শনিকতা ও মানবিকতায় বৈচিত্র্য এবং বিন্যাসের আবেদন একান্তই কম ছিল। যাই হোক, এই বৈচিত্র্য ও বিন্যাসের অনুপস্থিতিতে কাহিনীপ্রধান গল্পগুলি গল্পের খসড়ায় পরিণত হয়েছে। এই গুচ্ছের কোন কোন গল্পকে তিনি আমার লেখা ("নবাগত"), গল্প নয় ("কুশল পাহাড়ী") প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। এই উপবিভাগের অধিকাংশ গল্পই গল্প নয়, তাঁর ডায়েরির বা নোটবুকের নোট বলে মনে হয়। সম্ভাবনাময় কাহিনীগুলিকেই যেন সেখান থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে, সমুদ্ভূত কাহিনীগুলি যেন এখনও লেখার অপেক্ষায় আছে। এই সম্ভাবনাময় কাহিনী বিচিত্র না হলেও বহু। বিবিধ কাহিনীর মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিতা অথচ বাপের বাড়ি ফিরে যেতে বিমুখ এক কন্যা (রামশরণ দারোগার গল্প), ঠাকুরমার হাতে লাঞ্ছিতা কথকের মা (পুরোনো দিন), যুগীদের নিগৃহীতা বিধবা নিস্তারিণী (মুক্তি), ভুবন বোষ্টুমী (ভুবন বোষ্টুমী), অকালমৃতা ছোটপিসি লক্ষ্মী (পৈতৃক ভিটা), সুহাসিনী মাসীমা (সুহাসিনী মাসীমা), সচ্চরিত্রা সুলোচনা (সুলোচনার কাহিনী), মৃত কেরাণীর স্ত্রী (অরণ্যকাব্য), দৈববিশ্বাসী তরঙ্গিণী (দৈব ঔষধ), পতি-প্রেমিকা নিরুপমা (বেসাতি), মাতৃ-স্বভাবা আশালতা (চৌধুরাণী), সাধিকা রাখনি (অভিমানী), সাহসী ও দুর্দশাগ্রস্তা বারো বাগদিনী (বারো বাগদিনী), সাংসারিক কষ্টে পড়া ননীবালা (ননীবালা), সন্তানকাতরা রমণী (বুড়ো হাজরা কথা কয়), ঔদরিক পূর্ণবাবু (উইলের খেয়াল), দুর্দশাগ্রস্ত মণি ডাক্তার (মণি ডাক্তার), বিয়ের ব্যাপারে কুশলী পাঁচুমামা (পাঁচুমামার বিয়ে), সাধু শান্তিরাম (সাধু শান্তিরাম), স্ত্রীর ব্রেসলেট চোর হরিচরণ (দুর্মতি), অভিশপ্ত জমিদার (অভিশাপ), সাধু-সন্ন্যাসী (ছেলেধরা), অসাধারণ (মড়িঘাটের মেলা), জুয়াখেলুড়ে (ফেরখেলা), ক্ষণ-ভঙ্গুর (মুস্কিল ঃ জ্যোতির্রিঙ্গণ), চরিত্রহীন পিতাপুত্র (কম্পিটিশন), নীতিবিদ (ব্ল্যাকমার্কেট দমন করা), রাসু হাড়ি (রাসু হাড়ি), কলহান্তরিতা খুড়ী মা (কলহান্তরিতা), কবিওয়ালা (অন্তর্জলি), বসন্তরোগীর সাহায্যকারী (সাহায্য), সাধু সতীশ ঘোষ (হাজারি খুড়ীর টাকা) পড়ে পাওয়া টাকার বাকসের উদ্ধারকারী ছেলেরা (পড়ে পাওয়া), পাগল যুবক (বন্দী), ভূতত্ত্ববিদ্ থনটন কাকা (থনটন কাকা), কালচিতি গ্রামে ভ্রাম্যমাণ কথক (কালচিতি), পুত্রের খেলার সাথী মতিলাল (খেলা), চালের জন্যে দুর্দশাগ্রস্ত খুকীর বাবা (চাউল), ভয়ার্ত পথিকের বন্ধু (পথিকের বন্ধু), আর্টিস্ট অশ্বিনী বাজিয়ে (আর্টিস্ট), বর্শেলের বিড়ম্বনাকারী ছেলেরা (বর্শেলের বিড়ম্বনা), ড্রাইভার চ্যালারাম (চ্যালারাম), ফেলকরা ও মিথ্যাবাদী ছাত্র সতীশ (সতীশ), ডাকাতদের হাতে বিপদগ্রস্ত রাধারমণ (বিপদ)। এই কাহিনীপ্রধান গল্পগুচ্ছের সেরা গল্প তিরোলের বালা ("বেণীগির ফুলবাড়ী")। সন্ধ্যার শান্ত দামোদরের বুকে বিকৃতমস্তিষ্কা সুন্দরী তরুণীর মমতাময় আতিথ্যের পাশে

তার অতর্কিত পলায়ন এবং দাদাকে হত্যা সমগ্র গল্পটিতে ঘটনার বৈচিত্র্য ও বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এক মর্মান্তিক অথচ রোমাঞ্চকর ভয়াবহতার সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রের স্তম্ভিত দামোদর, বিস্তৃত বালির চর, জলাভূমি গল্পটিতে ভয়াবহতার অপূর্ব আবহ তৈরী করেছে।

৩

প্রকৃতিবিষয়ক গল্পের সংখ্যা বিভূতিভূষণের গল্পগুচ্ছে একান্ত কম হলেও এই বিভাগে গুটিকয়েক ভাল গল্প আছে। ছোটগল্পে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা তাঁর অন্যান্য লেখার মত অনেক সময় ঐশী বা ভাগবতী সত্তার দিকে বিসর্পিত নয়, মাটির সঙ্গে শতপাকে বাঁধা। দার্শনিকতাকে আশ্রয় করে তাঁর প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ হয়েছে গুটিকয়েক গল্পে। সেগুলি : কুশল পাহাড়ী ("কুশল পাহাড়ী"), প্রভাতী ("আচার্য কৃপালনী কলোনী") এবং মাকাল-লতার কাহিনী ("অসাধারণ")। তিনটি গল্পেই এই দৃশ্যমান প্রকৃতির পেছনে যে আর একটি আধ্যাত্মিকতার জগৎ আছে এবং এই দৃশ্যমান প্রকৃতি যে সেই অদৃশ্য শিল্পীর আভাস আনে একথা বলা হয়েছে। কুশলপাহাড়ী-তে অরণ্য পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝখানে ভৈরবথানের সাধুর মুখ দিয়ে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা বেদমন্ত্রের মত গভীর ও প্রাচীন। 'কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি, এই শালগাছটিতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো, এসব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েচি।'[০০] মর্ত্যের মৃত্তিকার সঙ্গে শতপাকে বাঁধা প্রকৃতি-মায়ের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে প্রত্যাবর্তন, আচার্য কৃপালনী কলোনি ("আচার্য কৃপালনী কলোনি"), শাবলতলার মাঠ (উপলখন্ড), নদীর ধারের বাড়ি ("অসাধারণ") ও আবির্ভাব ("কুশলপাহাড়ী")। সব গল্পগুলিতেই মানুষের জীবনে প্রকৃতির স্থান কত বড়, প্রকৃতি তার স্নিগ্ধতার প্রলেপে আহত মানুষকে শুশ্রূষা করছে, আশ্রয় দিচ্ছে তাই দেখান হয়েছে। বনে দেখা ("যাত্রাবদল") গল্পটিতে লেখকের প্রকৃতিপ্রীতি আতিশয্যদুষ্ট হওয়ায় গল্পটি নষ্ট হয়ে গেছে। ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ("রূপহলুদ"), মান তালাও ("কুশল-পাহাড়ী") ও অরণ্যে ("তালনবমী") তাঁর ডায়েরির স্থানবিশেষের মত প্রকৃতিবর্ণনায় ভরা।

বিভূতিভূষণের গল্পগুচ্ছে অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে নিয়ে লেখা অনেকগুলি গল্প আছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিভূতিভূষণের কাছে শুধু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার নয়, পারলৌকিক অদৃশ্য জগতের ইঙ্গিতবহ। কবিরাজের বিপদ ("ছায়াছবি") গল্পের কবিরাজ কবিরাজী করতে গিয়ে জানতে পেরেছে, মরা মানেই বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা। পারলৌকিক ও বৃহত্তর জীবনবিশ্বাসের মতই প্রবল তাঁর অলৌকিকের ওপর বিশ্বাস। লেখকের কাছে অবশ্য অলৌকিক বলে স্বতন্ত্র কোন বিষয়ের অস্তিত্ব নেই—তা প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত বলেই অতিপ্রাকৃত। 'জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার-বুদ্ধিঅভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া

[০০] কুশল পাহাড়ী ("কুশল পাহাড়ী")।

তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।'[৩১] অতিপ্রাকৃতের প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাসে এবং অতিপ্রাকৃত কাহিনী রচনার নিপুণতায় এই বিভাগে একাধিক সার্থক গল্প রচিত হয়েছে। এই গল্পগুলি : তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প ("জন্ম ও মৃত্যু, কিন্নরদল"), অভিশপ্ত ("মেঘমল্লার") এবং পেয়ালা ("যাত্রাবদল")। তারানাথ তান্ত্রিকের দুটি গল্পেই বীরভূমের জনহীন শ্মশান, বরাকর নদীর ধারে শালবনের ওপর ফুটফুটে জ্যোৎস্না, যোগিনী পাগলীর এবং মন্ত্রের টানে অপূর্ব এক সুন্দরীর আবির্ভাব মায়াময় পরিবেশে এবং রহস্যময় ঘটনাবলীতে আমাদের মনে ভয়ের নিবিড় শিহরণ জাগায়। মধ্যযুগীয় গড় কীর্তিপাশার পাশে মেঘাবগুণ্ঠিত এক জ্যোৎস্নারাত্রে অভিশপ্ত-এর বর্তমান পরিবেশ। কীর্তি রায় ও নরনারায়ণের বিরোধ-প্রতিহিংসার কাহিনী, মধ্যরাত্রের বুক চিরে ওঠা চিৎকার 'ওগো নৌকাযাত্রীরা তোমরা কারা যাচ্ছ—আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে ম'লাম—আমাদের ওঠাও ওঠাও—আমাদের বাঁচাও' পাঠকের মনে অপার্থিব অনুভূতির সৃষ্টি করে। কোন এক কালের ঐতিহাসিক জনপদের ভগ্নাবশেষের নীচে অশরীরী সত্তার হাসি নিয়ে হাসি ("মৌরীফুল") নামে একটি গল্প রয়েছে। সুন্দরবনের আরণ্যক পরিবেশে অমানুষিক হাসির এই কাহিনী। কাহিনীটির পরিবেশ পূর্বের গল্পগুলির মত জমাট হলেও রহস্যময় কাহিনী অংশের অনুপস্থিতির ফলে গল্পটি অসমাপ্ত থেকে গেছে। পেয়ালা গল্পে মড়ক-লাগা মেলায় কেনা একটি পেয়ালা দুর্গ্রহের মত কথকের পারিবারিক জীবনের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রতিবারের মৃত্যুর সঙ্গে পেয়ালাটির দুর্লক্ষণযুক্ত অথচ অমোঘ উপস্থিতি আর্টের দিক থেকে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত উপায়ে এক অশরীরী সত্তার অলক্ষ হস্তের শিহরণময় ইঙ্গিতকে এনেছে। বউচণ্ডীর মাঠ ("মেঘমল্লার") ও খুঁটিদেবতা ("মৌরীফুল") লৌকিক প্রবাদ-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ভয়ের শিহরণ কোন গল্পেই নেই। টান ("অনুসন্ধান") এবং কবিরাজের বিপদ ("ছায়াছবি") গল্প দুটিতেও অতিপ্রাকৃত ভীতির চেয়ে অশরীরী সত্তার মমতার দিকটি উজ্জ্বল করে দেখান হয়েছে। কবিরাজের বিপদ এবং কাশী কবিরাজের গল্প ("রূপহলুদ") দুটি একই গল্প। প্রত্নতত্ত্ব ("মৌরীফুল") গল্পে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের উপস্থিতি, আরক ("নবাগত") গল্পে বিনায়ক দত্ত সিংহের ঠাকুরদার বালিহাঁস শিকার করতে গিয়ে অপার্থিব রমণীদের দেখে পাগল হওয়া ছায়াছবি, ("ছায়াছবি" অপরূপ এক মেয়েকে দেখা, বিরজা হোম ও তার বাবা ("রূপহলুদ") গল্পে মৃত্যুর পূর্বে অশরীরী এক বিরাট সত্তার উপস্থিতি, আয়া, ("রূপ-হলুদ") এক মায়াময় বধূর আবির্ভাব এবং 'ভৌতিক পালঙ্কে' ("রূপহলুদ") পালঙ্কের আজগুবি আচরণ একান্তই গতানুগতিক। গল্পগুলির পরিবেশেরচনাও পূর্ববর্তী গল্পগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট। সম্ভবতঃ ১৯৪৫ সনে প্রকাশিত সপ্তডিঙা নামে এক কিশোর-পাঠ্য গল্প সংকলনে ভূত গল্পটি প্রকাশিত হয়। এ গল্প ভূতের নয় এবং গল্পও নয়—একান্তই সাধারণ কাহিনীর বিবরণ। ১৩৫১ সালের আশ্বিন সংখ্যা "মৌচাক"-এ তিনি রহস্য নামে একটি ভূতুড়ে গল্প লেখেন। গল্পটি কোন গ্রন্থে এখনও সংকলিত হয়নি। এ গল্পটি এত সাদাসিধে এবং গল্পটির ভৌতিক পরিবেশ এত রহস্যহীন যে এটি পড়ে ভয়ের কোন শিহরণ আমাদের মনে জাগে না।

এ ছাড়া বিভূতিভূষণ ছোটদের জন্যে কতকগুলি অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছেন। 'তাল-

[৩১] রুক্মিণী দেবীর খড়্গ ("তাল নবমী")।

নবমী' গ্রন্থে এমন কতকগুলি গল্প আছে। গল্পগুলির নাম, রুক্মিণী দেবীর খড়্গ, মেডেল এবং গঙ্গাধরের বিপদ। বিশেষ করে ছোটদের জন্যে লেখা হলেও শুধু কৈশোরকালের বিশ্বাস-প্রবণতার ওপর নির্ভর করে তিনি গল্পগুলি লেখেননি। তিনটি গল্পেই কোথাও চোরা গ্রামের আরণ্য পরিবেশ ও পুরোহিত বংশের পরিত্যক্ত কুঠুরী, কোথাও ১৮৫৪ সনের যুদ্ধে প্রাপ্ত এক মৃত সার্জেন্টের মেডেল, কোথাও এক খুন-হওয়া আমীরের অশরীরী থাকার বেদনা অবলম্বনে বিভূতিভূষণ কিশোর হৃদয়ে ভয়ের অনুভূতি জাগিয়েছেন। গঙ্গাধরের বিপদ গল্পে মৃত্যুর পরেও হতভাগ্য আমীরের মৃত্যুর ধারণা না হওয়া দেবযান-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মৃত্যুর পরেও মারা যাবার কথা বুঝতে না পারা এক পারলৌকিক ব্যাধি। কিশোরদের জন্যে লেখা অলৌকিক কাহিনীগুলির মধ্যে মসলাভূত গল্পটি একান্তই আজগুবি ও নিকৃষ্ট। ভৌতিক না হলেও মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে ছোটদের জন্যে একটি গল্প তিনি লিখেছেন। গল্পটির নাম বাঘের মন্তর। ("ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প")। সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়ে নিধিরাম ভট্টাচার্য বাঘ ডাকার মন্ত্র-জানা ফকিরের দেখা পায়। ফকিরের এবং বিশেষ করে শিকারীগোষ্ঠীর অসাবধানতায় ফকিরকে বাঘে নিয়ে যায়। গল্পটিতে রহস্যময় পরিবেশ থাকলেও গল্প কম থাকায় এটি একটি বৈশিষ্ট্যবর্জিত কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।

অলৌকিক এবং ভুতুড়ে গল্প ছাড়া বিভূতিভূষণ ছোটদের জন্যে গুটিকয়েক গল্প লিখেছেন। ছোটদের জন্যে লেখা গল্পগুলিতে বড়দের বিভূতিভূষণ কখনও কখনও অসতর্ক-ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এবং ছোটরা সাধারণতঃ যে বৈচিত্র্য ও বিন্যাসে জমাট গল্প ভালবাসে সেই ধরনের কাহিনীর অভাব থাকায় অনেক সময় গল্পগুলি তেমন জমেনি।

'তালনবমী' (তালনবমী) শিশুদের প্রতি বড়দের অবহেলার করুণ কাহিনী। শিশুদের কাছে এ গল্প শোনানো হলেও এ গল্পের উদ্দিষ্ট বড়রা। ফলে গল্পটিকে তাঁর মানবচেতনা বিষয়ক গল্পের শ্রেণীতে ফেলা যায়। রাজপুত্র ("তালনবমী") গল্পটি গল্প নয়, নীতিকথা। তেঁতুল তলার হাট ("অসাধারণ"), মাছচুরি ("মুখোস ও মুখশ্রী"), ডালুর বিপদ ("ছায়া-ছবি"), বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি ("তালনবমী") এই গল্পগুলি গল্পাংশে কম এবং বিশেষত্ববর্জিত। একমাত্র এয়ার গান (বাক্সবদল) গল্পটি অপেক্ষাকৃত ভাল। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে হাবুল এয়ার গান পায় এবং আফ্রিকায় শিকারের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাঁদরে গালে চড় মেরে হাবুলের হাত থেকে এয়ার গান ও ঘর থেকে কলা নিয়ে গেল। হাবুলের এই দুরবস্থার মধ্যে শিশুদের উপভোগ্য মজার যথেষ্ট অবকাশ লেখক দিয়েছেন।

মানবেতর প্রাণী বা পশুপ্রীতি নিয়ে বিভূতিভূষণ দুটি গল্প লিখেছেন : নিষ্ফলা ("বেণীগির ফুলবাড়ী") এবং বুধীর বাড়ি ফেরা ("কিন্নরদল")। প্রথম গল্পে সন্তানহীনা রমার কুকুরটির প্রতি স্নেহ একতরফা ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত। কিন্তু পরের গল্পটিতে খুকীর ও বুধী গাইয়ের স্নেহ পারস্পরিক। বুধীর মনের ভাব, প্রকৃতির ও তার পরিচিত আবেষ্টনের প্রতি বুধীর আকর্ষণ এবং কসাইখানা থেকে পালানর পর তার মুক্তির উপলব্ধি মৌলিকতা-গুণসম্পন্ন।

পরিশিষ্ট

মেঘমল্লার	...	১০
মৌরীফুল	...	১০
যাত্রাবদল	...	১০

জন্ম ও মৃত্যু	...	১২	(গল্পের সংখ্যা মোট তেরটি। একটি গল্প পূর্বেই সংকলিত।)
কিন্নরদল	...	১১	
বেণীগির ফুলবাড়ী		১২	
নবাগত	...	১২	
তালনবমী	...	৯	
উপলখণ্ড	...	১১	
বিধুমাস্টার	...	১০	(গল্পের সংখ্যা মোট এগারটি। একটি গল্প পূর্বেই সংকলিত।)
ক্ষণভঙ্গুর	...	৯	
অসাধারণ	...	১৬	
মুখোশ ও মুখশ্রী	...	১৪	
আচার্য কৃপালনী কলোনি		১২	
জ্যোতিরিঙ্গণ	...	১২	
কুশলপাহাড়ী	...	২১	
অনুসন্ধান	...	৪	
ছায়াছবি	...	৮	
রূপহলুদ	...	১০	
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প		১	(গল্পের সংখ্যা মোট এগারটি। দশটি গল্প বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত। মাত্র একটি নতুন।)
গল্প পঞ্চাশৎ	...	১	(গল্পের সংখ্যা মোট পঞ্চাশটি। ঊনপঞ্চাশটি গল্প বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত। মাত্র একটি নতুন।)
বাক্স বদল	...	১	(গল্পের সংখ্যা মোট সাতটি। ছটি গল্প বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত। মাত্র একটি নতুন।)
পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থাকারে অসংকলিত		২	

নেপথ্যে

নিখিলচন্দ্র সরকার

আজ আর শিরীষের চায়ের দোকানের সামনে তেমন আড্ডা নেই। রাস্তায়ও ভিড় কম। যে ছেলে-ছোকরাগুলো দিনরাত নরক গুলজার করত এখানে, তাদের কেউ নেই এখন। সবাই একরকম গা-ঢাকা দিয়েছে। এরই মধ্যে দু-তিনবার পুলিসের গাড়ি টহল দিয়ে গেছে। পাড়ায় ঢুকবার মুখেই শিরীষের দোকান। রাস্তার দুপাশে আরো কিছু দোকানপাট ছড়িয়ে রয়েছে। নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, রমা স্টেশনারি স্টোর, রঞ্জন টেলারিং হাউস, লালার মুদির দোকান, পরিতোষ কেবিন, ফিটফাট সেলুন। একটু দূরেই শ্রীপতি ডাক্তারের চেম্বার। রাস্তাটা ছোট, এঁকেবেঁকে সরীসৃপের মতন হেলেদুলে এগিয়ে গেছে। এর ওপর দিয়েই সর্বসাকুল্যে খান দশেক প্রাইভেট বাস ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে যাওয়া আসা করে। নতুন নতুন পাড়া হয়েছে, বাড়ি উঠেছে, লোকজন বেড়েছে, তবু বাসের সংখ্যা সমানই রয়েছে।

বাঁদিকে কিছুটা এগোলেই ছোটমতন একটা মাঠ পড়বে। পাশে একটা ডোবা, তার পরই ক'ঘরের বস্তি। দিনের বেলায় এক জরাজীর্ণ ভাঙাচোরা চেহারা চোখে পড়ে, কিন্তু রাত যত গভীর হয়, ঐ বস্তির প্রতিটি বস্তু যেন জেগে ওঠে। আর অন্ধকার যেদিন ঘন ও পুরু হয়ে পড়ে, সেদিন কিসের একটা উত্তেজনা রাতভর এখানে ছুটোছুটি করে। এ পাড়াতেও তা ঢুকে যায়। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা ঝিল; ঝিলের পুব পাড় দিয়ে রেল-লাইন চলে গেছে। প্রায়ই ঝিলের পাশে খুনখারাপি হয়, লাশ পড়ে থাকতে কেউ দেখেছে, কেউ শুনেছে। একটা গা-ছমছম-করা নির্জনতা, ভয় যেন সারাক্ষণ এখানে ঘোরাফেরা করে। ওয়াগন-ভাঙা দলের কিছু ছেলে ওই বস্তিটায় থাকে। দিনের বেলায় এই মোড়ে এসে এরা আড্ডা জমায়। মেয়েদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা, নোংরা রসিকতা, ছোট-খাটো মারপিট, ছুরি চালানো, সোডার বোতল ছুঁড়ে মারা, এসব ঘটনা ইদানীং বেড়ে গেছে। জায়গাটা কেমন দূষিত ও ঘোলা করে তুলেছে এরা। এজন্যে শিরীষের দোকানের দুর্নাম। তার এখানে এসেই ভিড় জমায়, খিস্তি গুলতানি সব এখানে দাঁড়িয়েই। আজকাল ফিটফাট সেলুনের সামনেও ভিড় হয়। এজন্যে তার দোকানের বিক্রিবাটাও পড়ে গেছে। চায়ের সঙ্গে, পাশের সামান্য একটু জায়গায় পান বিড়ি সস্তা দামের কিছু সিগারেটও সে রাখে। আগে ভালমন্দ দু-ধরনের খদ্দেরই তার ছিল। কিন্তু আজকাল অনেকেই তার দোকানে আসা বন্ধ করেছে, শিরীষ বুঝতে পারে, এই লক্কা ছেলেগুলোর জন্যেই তার দোকানের এ অবস্থা। যখন-তখন এসে চা চাইবে, পান সিগারেট তো আছেই, না দিলে নিজের হাতে তুলে নেবে, মাঝে মধ্যে কিছু কিছু পয়সা ঠেকায়, আর প্রায় সময়ই ধার। এদের এই দৌরাত্ম্যে সেও ধৈর্য হারায়। সে কি দানসত্র খুলে বসেছে এখানে? এটা যেন তাদের জমিদারি পেয়েছে। রাগে উত্তেজনায় মাঝেমাঝে মরীয়া হয়ে ওঠে শিরীষ। আগে মাঝে মাঝে আলুর দম ঘুগনি হতো তার দোকানে। এখন বন্ধ করে দিয়েছে। না দিয়ে উপায় কি? ধারের পয়সা আদায় করতে গিয়ে তাকে কম হুজ্জত পোয়াতে হয়! অনেকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে এ নিয়ে। ওই বস্তির কয়েকটা ছেলেই এরকম করে। যত গণ্ডগোল আর ইতরতার মূলে ওই কটা ছেলে। এরা এতটা প্রশ্রয় পেত না। আসলে এ পাড়ার কিছু

ভদ্র অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেও এদের দলে এসে জুটেছে। আস্কারা পেয়ে এরাও অনেকখানি বেড়েছে। গাঙ্গুলীবাড়ির ছোট ছেলেটা শঙ্কর, সব সময়ই এদের দলে থাকে। পড়াশুনোর নামগন্ধ নেই; মেয়েটেয়ে দেখলেই টিটকিরি মারবে, কুৎসিত ইঙ্গিত করবে, কিছু না কিছু নোংরা ছড়া কাটবে। এ পাড়ার আরো দু-তিনটে ছেলে আছে এদের দলে। পয়সা ওড়ায়। বস্তির ছেলেগুলোকে হাতে রাখে।

ইদানীং রঞ্জা গুঁইই যখন-তখন তার দোকানে এসে বসছে। শঙ্করই নিয়ে আসে। খাওয়ায়। শিরীষ ছেলেটাকে পছন্দ করে না। বয়েস বড় জোর আঠারো কি উনিশ। কালো বেঢপ চেহারা, চোখদুটো ছোট ছোট, গর্তে ডুবে আছে; মুখে বসন্তর দাগ। তাকালেই মনে হবে মুখটা যেন পুড়ে গেছে, বিকৃত, কদাকার। কঞ্চির মতন রোগা ঢেঙা। বেশিক্ষণ এ মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখদুটো যেন জ্বলছে। এমন কোন নেশা নেই যা ও করে না। এত কুৎসিত চেহারার ছেলে আগে কখনো দেখেনি শিরীষ। দেখলেই কেমন অস্বস্তি হয়। ক'দিন আগেই একজনের পেটে গজ পুরে দিয়েছে ও। তারপরও গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আরো সব নানান অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। আসলে এটুকু বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না, এদের এই দুঃসাহসের আড়ালে কোন বড় হাতের প্রশ্রয় আছে।

ওর সঙ্গে শিরীযেরও একদিন লেগেছিল। মাসের পর মাস ধার খাবে, অথচ পয়সা চাইলেই যত গোঁসা। এরপরও চালিয়াতি কমে নি; কোন কথায় ধরে না যেন ওকে। এমনই বেহদ্দ চেহারা। সেদিনও রোয়াবের মাথায় এসে সিগারেট চাইল। শিরীষ আর রাগ সামলাতে পারে নি, ঝাঁজের গলায় বলেছিল, 'এটা কি তোর বাপের জমিদারি পেয়েছিস, তোর খাস তালুকের প্রজা আমি? আগের পয়সা ছাড়, পরে অন্যকথা।'

রঞ্জা সোজাসুজি ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'মেলা ফ্যাচফ্যাচানি ছেড়ে, সাফ বলে দাও দেবে কিনা।'

'আগে পয়সা ছাড়, পরে; ওসব ধারে কারবার আমি তুলে দিয়েছি।'

'অ, সোজা কথায় দেবে না তাহলে?'

'যা যা, এসব তরপানি অন্য জায়গায় গিয়ে দেখা। সব মিয়াকেই চিনি আমি।

'বাজে কথা বলবে না বলছি।'

'হ্যাঁরে, পয়সা চাইলেই তো বাজে কথা।'

'কোন্ শালা হারামির বাচ্চা এখানে ধার না খায়।' বলেই এক প্যাকেট নাম্বার টেন সিগারেট তুলে নিয়ে হাঁটা দিল রঞ্জা।

শিরীষের মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল, দৌড়ে এসে ওকে জাপটে ধরে প্যাকেটটা কেড়ে নিল। বস্তি থেকে ততক্ষণে আরো কটা ছেলে ছুটে এসেছে। তারা একসঙ্গে শিরীষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই ফাঁকে রঞ্জা পকেট থেকে ছুরি বের করে ফেলেছে। আর একটু হলেই ও বসিয়ে দিত। এমন সময় পুলিসের একটা গাড়ি এসে পড়ায় ওরা চম্পট দিল। এরপর থানায় গিয়ে এজাহার লিখিয়ে এসেছিল শিরীষ।, কোন ফল হয়নি, বরং নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছে। থানা থেকে তাকে সাবধান করে দিয়েছে, তার দোকানেই ওদের আড্ডা, সেও এদের দলে আছে। পরে অবশ্য বড়দের মধ্যস্থতায় একটা মিটমাট হয়েছিল, রঞ্জাও কিছু টাকা শোধ করে দিল।

কিন্তু একটা জিনিস সে বুঝেছিল সেদিন, অনেকের চোখের সামনেই এটা ঘটেছে,

কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না, তার হয়ে একটা কথা বলল না, শুধু মজা দেখেছে।

পুলিস এসে শিরীষকেই আগে কিসব জেরা করেছে। কারণ তার দোকানের সামনেই খুন হয়েছে। শঙ্কর রঙ্গা বুলেন বাসু ওরাই চন্দনকে ঘিরে ধরেছিল। ওদের ভেতরে রঙ্গাই প্রথম ছুরিটা চালিয়েছে। আরো দুজনের হাতে ছুরি ছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতেই শঙ্কর সরে পড়েছে। এরা প্রায় সময়ই তার দোকানে বসে আড্ডা মারে। শুনে সবাই আঁতকে উঠেছে। যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারাও হতভম্ব, একটা ভয় যেন অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সমস্ত দোকানপাট খোলা, লোকজন চলাফেরা করছে, বাসের জন্যে অনেকেই দাঁড়িয়ে তখন। সকলের চোখের ওপরই এই নৃশংস দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটল। অথচ কেউ একটা কথা বলল না, এগিয়ে এলো না, কোন বাধা দিল না। সবার মুখেই আতঙ্ক। তার ওপর, যে ছেলেগুলো একাজ করেছে, তাদের কারোই বয়েস কুড়ি পেরোয় নি। এসব করেও তারা বীরদর্পে ধীরে সুস্থে হেঁটে গেছে। শিরীষ ভেতরে ছিল, চীৎকার শুনে বাইরে এসে দেখল, ততক্ষণে কাজ সেরে ফেলেছে ওরা। রঙ্গা ছুরিটা চন্দনের জামায় মুছল, পরে বন্ধ করে পকেটে রাখতে রাখতে সকলের দিকে একবার চাইল। সবাই একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওদের দিকে। শিরীষ সবার মুখের ওপর দিয়ে পলকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল, পরে রঙ্গাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কাজটা ভাল করলি নারে—'

ওরা বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে। এবার একজন দুজন করে অনেকেই এগিয়ে এলো। দৌড়োদৌড়ি হাঁফাহাঁফি, 'খুন খুন' বলতে বলতে কজন ছুটে গেল। সমস্ত পাড়াটা এতক্ষণ পরে এইমাত্র যেন কি এক উত্তেজনা ও আতঙ্কে কেঁপে উঠল। টাটকা রক্তে রাস্তা ভিজে গেছে।

'কে, কে খুন হলো?' উৎকণ্ঠা অস্থিরতা নিয়ে এগিয়ে এলো অনেকে।

'চন্দনদা।'

'প্রণবের দাদা চন্দন!'

'হ্যাঁ।'

'শীগগির ওদের বাড়িতে খবর দে একটা।'

'চন্দনদার বাবা তো বাড়ি নেই এখন, ভোরে কাজে চলে যান তিনি।'

'তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডাকুন।'

'এখনও বেঁচে আছে; তাড়াতাড়ি কিছু একটা কর, না হয় তোরাই নিয়ে যা।'

'এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যা, বড় দেরি করছিস তোরা।'

'শ্রীপতি ডাক্তারকে একবার ডাক।'

'দরকারের সময় কি আর পাওয়া যায়, দুবার গিয়ে ফিরে এসেছি।'

'আহা রে, এমন একটা ছেলেকে মেরে ফেলল!'

'ওই তো আসছে প্রণব।'

দাদাকে এ-অবস্থায় দেখে প্রণব মুহূর্তে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল। তার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। এ কি, এত রক্ত! জামা প্যান্ট রক্তে ভরে গেছে। রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার দাদা। তিন-চার জায়গায় ছুরি চালিয়েছে। ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুলল চন্দনকে। তখনও রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষতমুখ দিয়ে। প্রণব কেমন কথা বলতে পারছে না। গলাটা কেমন শুকিয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা শুধু কাঁপছে। সমস্ত বায়ু যেন শুষে নিচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দন মারা গেল। মরবার

আগে একবার চোখ মেলবার চেষ্টা করেছিল ও; পারল না। ঠোঁট দুটো সামান্য নড়েছিল, তারপরই সব শেষ।

প্রণব তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না, তার দাদা আর ইহজগতে নেই। অথচ চোখের সামনেই চন্দনের দেহটা বিদ্যুৎস্পর্শের মতন কাঁপতে কাঁপতে একেবারে স্থির হয়ে গেল একসময়ে। ঘণ্টা কয়েক আগেও তার দাদা ছিল; এই অল্প সময়ের ব্যবধানে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, এখনও কেমন অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন বলে মনে হয়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় তাকেও ডেকে তুলেছিল চন্দন, বলেছিল, 'তুই আজ বাজারটা সেরে ফেলিস, আমার একটা জরুরী কাজ আছে, সকালে না বেরোলে লোকটাকে পাওয়া যাবে না আবার, এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি আমি।' পা বাড়িয়েও ফিরে এলো চন্দন। সামনেই মীরাকে দেখে বলল, 'তোরা খেয়ে নিস, ফিরতে একটু দেরি হতে পারে আমার।'

'কেন, আজ অপিস যাবে না?'

'হুঁ, যেতেই হবে। ওদিক দিয়ে চলে যাবো, দুপুরে এসে একফাঁকে খেয়ে যাবো।'

'সব তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন।'

'তা হোক।' একটু ভেবে পরে আবার বলেছিল চন্দন, 'যদি পারি তো বাড়ি এসেই কাজে যাবো।'

'সেই ভালো।' চন্দনকে চলে যেতে দেখে মীরার কি একটা মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি দু-পা এগিয়ে আস্তে করে ডাকল, 'শোন রাঙাদা।'

'আহা, কি যে করিস তোরা।' হেসে হেসে চন্দন মীরার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কি বল।'

'পাঁচটা টাকা হবে তোমার কাছে?'

'কেন, কি করবি?'

'দরকার আছে।'

প্রণব কাছে ছিল, বলল, 'না না, দিও না রাঙাদা। গত পরশু না তার আগের দিন আমার কাছ থেকে তিন টাকা নিয়েছে।'

'ইস্, কি মিথ্যে কথা বলতে পারে!'

'বল, নিস নি তুই?' প্রণব হাসছিল।

'তুমি না ভীষণ মিথ্যুক নদা।'

'ঠিক আছে, তোর যখনই দরকার হবে চাইবি।' চন্দন পকেটে হাত দিয়ে দেখল একবার, পরে বলল, 'পাঁচটাকা তো হবে না এখন। ফিরে এসে দেবো।' আর দাঁড়াল না চন্দন। একটু তাড়াহুড়ো করেই বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

আর ঘরে ফিরল না, কোনদিনও ফিরবে না তার দাদা। বুকের ভেতরে প্রণবের কী যে একটা কষ্ট, বোঝানো যায় না; টনটন করছে। চোখের কোনায় একফোঁটা জল নেই। সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা, অস্থিরভাব।

প্রণব কাঁদতে পারছিল না, বুকটা খালি জ্বলে যাচ্ছে তার, ভেতরে অসহ্য এক ছটফটানি। একটু অস্বাভাবিক, রুক্ষ দেখাচ্ছিল তাকে। তার জামা-কাপড়েও রক্তের দাগ। একটার পর একটা ভাবনা আসছে, চলে যাচ্ছে; চিন্তাগুলো মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বাবা বুড়ো হয়েছেন। তিন বছর আগে তার মা মারা যাওয়ার পর-পরই বাবা যেন সংসার সম্পর্কে একটু উদাসীন, নিরাসক্ত। এ ঘটনা কি তাঁকে আরো বিচলিত ও নিস্পৃহ করবে না,

এ শোক কি তিনি সামলাতে পারবেন? এই বুড়ো বয়েসে পুত্রশোক ! বুকের হাড়-পাঁজরা গুড়ো হয়ে যাবে বুঝি! তাছাড়া চন্দনই ছিল এখন তাদের সংসারের প্রয়োজনীয় নির্ভরতার আচ্ছাদন। আজ মাথার ওপর থেকে সেই স্নেহ ভালবাসার ফুলকাটা আচ্ছাদনটিও নির্মম হাতে সরিয়ে নিলেন বিধাতাপুরুষ। মীরার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল; তারপরই দাদার বিয়ে। কত কষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ হয়েছে তারা। তার দাদা আরো বেশী কষ্ট করেছে। তবু দাদাকে ঘিরে সবাই স্বপ্ন দেখত। মা কতদিন সেই শুভদিনটির কথা ভাবতে ভাবতে আত্মভোলা হয়ে যেত। কিন্তু দাদার পয়সা চাকরি কিছুই আর দেখা হলো না তাঁর। এমনি করেই দুঃখের রাত্রি একদিন শেষ হয়েছিল। কষ্ট আর অভাবের ভেতর দিয়েই চন্দন এম. এস্‌সি. পাশ করেছে; কিছুদিন হয়, ভাল একটা চাকরিও পেয়েছিল ও। এতদিন ধরে এ-পাড়ায় তারা আছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না কারো সঙ্গে তাদের ঝগড়া বিবাদ হয়েছে, কাউকে অসম্মানসূচক কোন কথা বলেছে, তাদের আচরণে কথাবার্তায় চলাফেরায় কেউ কোন কষ্ট পেয়েছে। বরং তার দাদা চোখের সামনে কোন অন্যায় ঘটতে দেখলে প্রতিবাদ করেছে। সাহস ছিল পুরোমাত্রায়। লোকের আপদে বিপদে যতটুকু সাধ্য পাশে গিয়ে দাঁড়াত। এতদিন প্রণব জানত, তার দাদার কোন শত্রু ছিল না, আজ সেই ধারণা তার পালটে গেল। পাঁচজনে ঘিরে ধরে তার দাদাকে মেরেছে। এতে লাভ হলো কতটুকু? দাদা এমন কি গর্হিত কর্ম করেছিল যে জন্যে এই রাগ-বিদ্বেষ? এই নিষ্ঠুর বর্বরোচিত কাজে এত উৎসাহ উল্লাস! একটুও হাত কাঁপল না? চোখের সামনে একটা মেয়ের অপমান, তার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি, শালীনতার ওপর নোংরা ইতর হাত বাড়ানো, এসবের প্রতিবাদ করা কি অন্যায়? তার পরিণাম কি এই? কেউ একটা বাধা দিল না? অনেকেই ছিল তখন, কেউই এগিয়ে এলো না? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রণব।

আরো অনেকে হাসপাতালে এসেছে। চন্দনের বন্ধুরা খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। পাড়ার আরো কিছু বয়স্ক লোকজনও এসেছিল। তারাও জেনে গেছে, চন্দন আর নেই। এক রকম ধরেই নিয়েছিল তারা, এ অবস্থায় কেউ বাঁচে না, তবু সবাই চেয়েছিল, ও বাঁচুক। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঁচল না। বিষণ্ণ মনে অনেকেই পাড়ায় ফিরে গেল। প্রণব এবং আরো কয়েকজন এখানে থাকল। পুলিস মর্গে নিয়ে যাবে লাস। ওখানে কাটাচেরা হবে, রিপোর্ট লেখা হবে, তারপর ছাড়া পাবে।

পাড়ায় খবরটা সবার মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। শুনে কেউ কেউ চোখের জল ফেলেছে, আহা রে, বাবা-মার মনে না জানি কি হচ্ছে এখন। অনেকেই চিনত না চন্দনকে, আজ চিনল, সবাই নাম জানল তার। কোন্ ছেলেটি চন্দন? লম্বা ছিপছিপে গড়ন ছিল চন্দনের; চোখদুটো বুদ্ধিদীপ্ত, মাথার চুল ঘন, কোঁকড়ানো। মুখে হাসি। কতদিন এ-রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে, পাড়ার সব কাজেই তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। পুজো, উৎসব, পাড়ায় ভাল একটা লাইব্রেরি করা, গরীব অথচ মেধাবান ছেলেদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে খেলাধুলো, গান-বাজনার আয়োজন ইত্যাদি এসব অনেক কাজেই তার মতন উৎসাহী আর কেউ ছিল না। ও নিজেও রবীন্দ্রনাথের গান গাইত। এ রাস্তা দিয়ে আর কোনদিনও ও হাঁটবে না। সমস্ত পাড়াটা যেন আজ ওর শোকে বিমর্ষ মলিন।

প্রণবও বুঝতে পারেনি তার দাদার ওপর ওদের এতটা আক্রোশ ছিল। রাগ ছিল, শুনেছে। ওরাও সুযোগের সন্ধানে রয়েছে, এটুকুই জানত প্রণব। কিন্তু এর পরিণাম যে

এমন করুণ ও নিদারুণ হবে, ভাবে নি কেউ। দিনের পর দিন যেন ওদের দুঃসাহস বেড়ে যাচ্ছিল। নোংরা কাজ করেও বুকের ছাতি ফুলিয়ে পাড়ায় হাঁটবে, কেউ কিছু বলবে না, প্রতিবাদ করবে না—অসহ্য। আর কিছু বললেই যত গোঁসা, ছুরি চালিয়ে খার মেটানো! ওরা যে একটা ষড়যন্ত্র করছে, দেবুর কাছেই খবরটা প্রথম শুনেছিল প্রণব। দেবু একসময় ওর সঙ্গে পড়ত। ফেল করে করে ও পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। ইদানীং মাঝেমাঝে ওকে ওদের দলে দেখা যায়। ও এসে প্রণবকে খবর দিয়েছিল, 'শোন, তোর দাদাকে কটা দিন একটু সাবধানে চলাফেরা করতে বলিস। ওরা কি একটা মতলব আঁটছে।'

'কেন, রাঙাদা আবার কি করল?'

'অত জানি না, আমার কানে এলো কথাটা, তোকে বললুম।'

'ভালই করেছিস, আমিও বলব ওকে, কিন্তু জানিসই তো, হেসে উড়িয়ে দেবে ও।'

'ওদের তুই চিনিস না প্রণব, ওরা করতে পারে না, হেন কাজ নেই। রঙ্গাটাই ওদের মধ্যে হারামি দি গ্রেট।'

'রাগের কারণটা জানিস তুই? শুনিস নি কিছু?'

'কি একটা করছিল যেন ওরা, তোর দাদা বোধহয় বাধা দিয়েছে, বলেছে টলেছে কিছু।'

'ইস, কি আমার সব ধম্মপুত্তুর এলো যে কেউ কিছু বলতে পারবে না।' হেসে প্রণব উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কথাগুলো, কিন্তু পারল না। কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরেছিল সেদিন।

রাত্রে একসঙ্গে খেতে বসে প্রণব প্রসঙ্গটা তুলেছিল। আস্তে আস্তে বলেছিল, 'কদিন একটু সাবধানে চলাফেরা করিস।'

চন্দন আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল, তারপর মৃদু হেসে হেসে শুধোলো, 'কেন রে?'

'কেন আবার কি, বললুম, এত রাতফাত করিস না।'

'উঁহু, কোত্থেকে শুনেছিস আগে বল।'

'দেবু বলল, রঙ্গারা তোকে মার দেওয়ার নাকি মতলব করছে।'

'সাহস তো কম নয় ওদের!'

'ওদের সঙ্গে অনর্থক লাগতে গেলি কেন? ওদের তুই চিনিস না?'

'অনর্থক, কি বলছিস তুই! চোখের সামনে যা-তা করবে, আর মুখ বুজে সয়ে যাবো, বলিস কি!'

'ঠিকই বলছি। একা পারবি তুই ওদের সঙ্গে?' একটু থেমে আবার বলল ও, 'এদের ঠাণ্ডা করা একার কম্ম নয়।'

'কই, এ নিয়ে পাড়ার একটা লোকও তো কিছু উচ্চবাচ্য করে না।'

'একদিন টের পাবে।' একটু চুপ করে থেকে খেতে খেতে চন্দন একসময় বলল, 'আজকাল পাড়ার বুকেই ছিনতাই সুরু করেছে। কত বড় সাহস। সেদিন ফিরছি, দিন মেঘলা বলে বেশী লোকজন ছিল না রাস্তায়, দেখি একটা লোককে ঘিরে ধরেছে দু-তিনটে ছেলে। আমায় দেখে লোকটা চীৎকার করে উঠল। কাছে যেতেই ছেলেগুলো চট করে সরে পড়েছে। ভয়ে তখনও কাঁপছে লোকটা। ছুরি বের করে নাকি ওর টাকাকড়ি হাতের ঘড়ি পাঞ্জাবীর বোতাম, আংটি সব কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কি সাহস বল। আমি চিনি ছেলেগুলোকে।'

'কিছু বলিস নি তো ওদের?'

'হ্যাঁ বলেছি, ওদের পুলিসে দেবো বলেছি। কি পেয়েছে ওরা, সাপের পাঁচ পা দেখেছে!'

'সেজন্যেই তো সব রাগটা এখন তোর ওপর গিয়ে পড়েছে।'

'রাখ তো, ওসব রাগফাগের ধার ধারি না আমি।'

'অনেকেই যে ধারে, রীতিমতন খাতির করে ওদের।'

'করুক, আমি করি না, করবোও না; এই করে করেই তো লাই দিয়েছে।'

'ওদের ভয়ে তো অনেকেই মুখ খোলে না দেখি, হাতে রাখার চেষ্টা করে।'

'এ না হলে আর এত সাহস হয় ওদের? নিজের ওপর যখন পড়বে তখন বুঝবে। এভাবে গা বাঁচিয়ে বেশিদিন থাকা যায় না। চোখের সামনে ইয়ার্কি ফুক্কুড়ি মারে, একটা লোক প্রতিবাদ করে না!'

'দু-বছর আগে তো এত ছিনতাই, মারপিট ছিল না পাড়ায়।'

'এখনই কিরে, এই তো সবে সুরু। এখন রাস্তায় আছে, এরপর ঘরে উঠবে।'

'যাকগে, একটু সাবধানে থাকিস।'

'কেন ওদের ভয়ে, কি ভাবিস তুই আমায়?'

'হয়েছে, অত সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। আমিও টের পাই, ওরা আমার দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলাবলি করে।'

'এতেই এত গোঁসা?'

'আসলে ওরা ধরে নিয়েছে, থানায় গিয়ে তুই ওদের নামে বুঝি কিছু লাগিয়ে এসেছিস। সেদিন পুলিস ভ্যান এসে ওদের একজনকে তুলে নিয়ে গেছে।'

'তাই নাকি? তবে তো ওদের সবকটার নামগুলো একবার লিখিয়ে আসা উচিত ছিল। না, আমারই ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

'কিছু লাভ হতো না লিখিয়ে। তুই কি মনে করিস, পুলিসের খাতায় ওদের নাম নেই, না, ওরা এদের চেনে না?'

'চেনে না আবার, সবই জানে!'

'তবে? ওদের সঙ্গে লেগে শুধু শুধু অশান্তিকে ডেকে আনা, কি দরকার। পাড়ার লোকগুলোকে তো ভাল করেই চিনিস, বিবাদের সময় কেউ এগিয়ে আসবে না। আমার হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গেছে সেবার।'

'আমার জন্যে দেখছি ভীষণ ভাবনা তোর।'

'হবে না! আর দেবু অত ফালতু কথা বলে না; ও এখনও আমায় খুব ভালবাসে।

'ঠিক আছে রে, ঠিক আছে, সাবধানে থাকবো, হয়েছে?'

এরপরও প্রণবের কটা দিন বেশ অস্বস্তিতে কেটেছে। কিছুই বিশ্বাস নেই, ওদের, কি করতে কি করে বসে, কে জানে। ফিরতে একটু রাত হলো কি চন্দনের, এক অযাচিত দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা প্রণবকে ঘিরে ধরত চারপাশ থেকে। তখন এক ধরনের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য বোধ করত সে। রাস্তায় এসে দাঁড়াত, মোড়ে এসে দেখত শিরীষের দোকানে রঞ্জারা কি করছে। কারা কারা তখনও বসে আছে সেখানে। কিন্তু কিছুই হলো না। সব কিছুই একদিন স্বাভাবিক, শান্ত হয়ে এলো। অন্তত ওদের আচার-আচরণে কথাবার্তায় ভয়ের আর কিছু ছিল না যেন। যেমন, চন্দন অনেকদিন একা একা ফিরেছে; পথ নির্জন, ওরা

তখনও শিরীষের চায়ের দোকানে, হুল্লোড়বাড়ি করছে, ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে কোন কোন সময়, কিন্তু কেউ কিছু বলে নি তাকে। ফিরে এসে প্রণবকে হাসতে হাসতে বলেছে চন্দন, 'কিরে, কিছু তো বলল না ওরা। ওদের সামনে দিয়েই তো এলাম!'

'কি জানি, কখন কোন মেজাজে থাকে ওরা বোঝা মুশকিল।' প্রণব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

কিন্তু আজ যে এমন হবে, ঘুণাক্ষরেও তা টের পায় নি প্রণবরা। এখন বুঝতে পেরেছে সে, ওদের ভেতরের আগুন নেভেনি। আসলে সাময়িক একটা প্রলেপ দিয়ে তাদের প্রতারণা করেছে। আপাত শান্ত স্থির ভদ্র আচরণের তলায় একটা কদর্য নোংরামি, আক্রোশ পুরোমাত্রায় গোপন রেখেছিল। সুযোগ বুঝে আজ তা ব্যবহার করেছে। ওদের এই ধূর্তামো আদৌ বুঝতে পারেনি তার দাদা। এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে। আজকের ঘটনা তো একটা উপলক্ষ্যমাত্র। যদি এমন হতো, আজ যা ঘটেছে তা ঘটল না, বা ঘটলেও তার দাদা সে সময় অনুপস্থিত, তাহলেও, প্রণবের এখন বিশ্বাস, তার দাদা এদের হাত থেকে রেহাই পেত না। সামান্য উত্তেজনার মুখে যে কেউ এরকম নৃশংস নির্মম হত্যাকাণ্ড করতে পারে, তা ধারণার অতীত। ওদের এই নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণের কোন তুলনা হয়? ধীরে ধীরে সব কথাই প্রণব শুনেছে।

'স্বাতীকে চিনিস তো?' প্রণবের বন্ধু প্রবাল তাকাল একবার।

প্রণব মাথা নেড়েছে, কেন চিনবে না। অমলেন্দুর ছোট বোন। তার সঙ্গে পার্ট ওয়ান পাশ করেছে এবার। মাঝে মাঝেই তাদের বাড়ি আসে স্বাতী। মীরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে ওর। ওদের সঙ্গে প্রণবদের পরিচয় অনেকদিনের। অমলেন্দু বহুবার তাদের এখানে এসেছে। চন্দনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, একসঙ্গে শুধু স্কুলে নয়, কলেজেও পড়াশুনো করেছে। সুতরাং স্বাতীকে না চেনার তার কোন কারণই ঘটে নি।

'ওকে নিয়েই আসলে গণ্ডগোলটা বাধে।' একটু চুপ করে থেকে পরে প্রবাল ফের বলেছিল, 'ওই রাস্কেল শঙ্করটাই সব কিছুর মূলে।'

স্বাতীর ওপর যে শঙ্করের বদ নজর পড়েছে এটা অনেক আগেই শুনেছিল প্রণব। পথেঘাটে ওকে নানাভাবে বিরক্ত করে, শুধু ওরাই নয়, আরো অনেকে। ওর উপচানো ঢলনামা রূপযৌবন যুবকমহলে আলোচনার বস্তু। এ নিয়ে পাড়ায় আগেও ছোটখাট একটা বিবাদ হয়ে গেছে। অমলেন্দু ওদের শাসিয়েছে, ওরা ভ্রূক্ষেপ করেনি তার কথা; বরং উপহাসের হাসি হেসেছে। অমলেন্দু এজন্যে থানায় গিয়েছিল, কোন ফল নি। ঘরে এসে স্বাতীকে সাবধান করে দিয়েছিল বোধ হয়। যে কারণে স্বাতী ইদানীং রাস্তাঘাটে প্রয়োজন ছাড়া কদাচিৎ বেরোয়, তাদের বাড়িও আসে খুব কম।

প্রণব শুনেছে, 'রমা স্টোর্সে' টুকিটাকি কিছু কিনতে এসেছিল স্বাতী। বাস স্ট্যান্ডে অনেক লোক দাঁড়িয়ে, দোকানপাট সব খোলা। শব্দ চীৎকার কোলাহল লোকজনের যাতায়াত সবকিছু মিলিয়ে জায়গাটা তখন চঞ্চল। গায়ে-মাখা সুগন্ধি সাবান, টুথপেস্ট আর কুমকুমের একটা শিশি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল স্বাতী। ক'পা এগোতেই, সাইকেলে চেপে শঙ্কর ওর সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল, 'এই শোন।'

স্বাতী দাঁড়িয়ে পড়েছে, প্রথমটায় একটু বিব্রত ও অবাক হলো সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়েছে নিজেকে। সোজাসুজি ওর চোখের দিকে চাইল একবার, পরে বলল, 'আমায় কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমায় বলছি। এখানে আর এমন কে আছে যে বলবো?'

এরকম অভিজ্ঞতা স্বাতীর এই প্রথম। যাতায়াতের সময় পাড়ায় কোন কোন উচ্ছল যুবক তাকে উদ্দেশ করে খুচখাচ সরস কিছু মন্তব্য করত; কিছু কিছু কথা তারও কানে এসেছে। কিন্তু এভাবে যে কেউ তার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াবে, সরাসরি কিছু বলবে, এটা কোনদিনও ভাবেনি সে, একটু যেন বাড়াবাড়ি। শঙ্কর তাকালো, হাসি ভাল লাগছিল না স্বাতীর। এবার একটু সংযত অথচ রুক্ষ গলায় বলল, 'বলুন, কি বলবেন।'

'আমার কথার কোন জবাব পাইনি এখনও।'

'কি কথা?' স্বাতী চোখে চোখে কঠিনভাবে তাকাল।

'বলেছি তো।' একটু থেমে ওকে দেখল খানিকক্ষণ, পরে রগড়-করা গলায় বলল, 'আহা, ন্যাকামি ছেড়ে আসল কথাটি বলে ফেল না মাইরি।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ঠিকই বুঝতে পারছ, ঢঙ ছেড়ে সাফ সাফ বলে দাও।'

স্বাতী কোন জবাব দিল না কথার। তার চোখ মুখ আবার রূঢ় ও শক্ত হয়ে এলো। ওকে এভাবে চুপচাপ থাকতে দেখে কি ভেবে নিয়ে শঙ্কর শুধালো, 'কেন, বাসু কিছু দিয়ে আসেনি তোমায়?'

'বাসু—!' স্বাতী একটু আশ্চর্য হলো, কিন্তু পরক্ষণই বুঝতে পেরে বলল, 'হ্যাঁ, সেদিন একটা ছেলে আমার হাতে একটা খাম দিয়েই পালিয়ে এসেছিল।'

'ওই তো, পেয়েছো তাহলে।' শঙ্কর যেন উৎফুল্ল ও আশ্বস্ত হলো।

'এসব তবে আপনারই কাজ?' একটু ভেবে স্বাতী এবার কিছুটা কৌতুক ও ঠাট্টার সুরে বলল, 'কিন্তু এত কথা লিখছেন, আর তলায় নিজের নামটাই লিখতে ভুলে গেলেন, কেন, ভয়ে না কি?

'ভয়! ওসব ভয়ফয় আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি।'

'হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাক গে, মোড়ের ওই পেল্লাই বাড়িটা তো আপনাদেরই, না?'

'হ্যাঁ।'

'এবার পথ ছাড়ুন।'

'সে তো ছাড়বই, কিন্তু এখনও জবাব পাই নি।'

'বেশ তো, আপনি তো লিখেছেন আমায় ভালবাসেন, বিয়ে করবেন; দাদাকে বলেছি, ও আপনার বাবার কাছে একবার যাবে। তখনই যা হবে শুনবেন।'

'তোমার দাদাকে আবার এসব বলেছো?' কেমন শক্ত হয়ে এলো মুখের চেহারা।

'বারে, আমায় বিয়ে করবেন, আর আমার দাদা, আপনার বাবা জানবে না, এটা কখনো কি হয়?'

'দেখা যাবে তোমার দাদা আমার কি করে। বাবার কাছে লাগিয়ে লাভ নেই কিছু।' ক্রমশঃ উত্তেজিত হচ্ছিল শঙ্কর। একটু থেমে এবার স্বাতীর চোখে চোখে তাকাল সে, একটু চড়া গলায় বলল, 'ওসব লাগানো ফাগানো বারণ করে দিও, কেস খারাপ হয়ে যাবে তাহলে, এই বলে দিলুম।' শঙ্কর গম্ভীর হলো, ভেতরের রাগ অসন্তোষ ফুটে উঠেছে চেহারায়।

এমন সময় রঞ্জা বুলন বাসু এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

'এতক্ষণ ধরে মাইরি কি অত ফুসুর ফাসুর করছো ওস্তাদ?' শঙ্করের ওপর থেকে

পলকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে স্বাতীর দিকে চাইল। পরে কুৎসিত ইঙ্গিত করে হাসল, হেসে চোখ নাচাতে নাচাতে বলল, 'কি খুলতাই মারছে দেখেছো একবার ওস্তাদ?'

'আরো মারবে, সবে তো একমেটে রে।' একটু চুপ করে থেকে একসময় শঙ্কর বলল, 'কিন্তু কিছু তো বলছে না।'

'বলবে বলবে, আলবাৎ বলবে, না বলে পার পাবে ভেবেছো ওস্তাদ?' রঞ্জা সরস ভঙ্গীতে হাসল।

'কি গো কন্যে, অত দেমাক কিসের তোমার?' বুলন ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে শুধালো।

'ছোটলোক কোথাকার।' স্বাতী যে ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু হয়েছে তা তার চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

'হ্যাঁ, বলে কি ওস্তাদ, ছোটলোক আমরা?' রঞ্জা তখনও হাসছিল।

'অ্যাঃ, এ যে আবার ফোঁস করে উঠছে। জাত কেউটে দেখছি।' বুলন রগড় করে আবার হেসে উঠেছে।

'ভালই তো রে, আমরা এর মোক্ষম মন্তর জানি, কি বলো ওস্তাদ?' বলেই চোখ টিপল রঞ্জা।

'পথ ছাড়ুন।'

'কি ওস্তাদ, ছাড়ব? কথা-টথা হয়ে গেছে?' রঞ্জা তাকাল শঙ্করের দিকে।

'ওর দাদা আমার নামে বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করবে।'

'তাই নাকি?' রঞ্জার চোখ মুখ এবার অন্যরকম হয়ে গেল ধীরে ধীরে। সে মুখের দিকে তাকালে বুক দুরু দুরু করে, কেমন চোয়াড়ে বীভৎস মনে হয়। একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে স্বাতী।

শক্ত রুক্ষ গলায় বলল রঞ্জা, 'ওই শালাই না আর একবার লাগতে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। এবার এলে জম্মের মতন দাওয়াই দিয়ে দেবো।' হঠাৎ কি একটা মনে পড়ে গেল রঞ্জার, উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আর এক শালা ওই চন্দন, এখনও আমার রাগ পড়েনি, সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, মনে হয় দিই শালাকে বসিয়ে, বড় সমাজসেবী এলেন আমার। বাগে পেলে হয় কোনদিন!'

'মনে থাকে যেন আমার কথা।'

'অসভ্য ছোটলোক ইতর।'

'এই—, মুখ সামলে কথা বল।' রঞ্জা বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল। বলেই ওর কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিল, 'এই চু-প, আর একটি কথা বলবি তো—' সঙ্গে সঙ্গে ছুরি বের করেছে রঞ্জা, 'সতীপনা হচ্ছে?' বলেই কুশ্রীভাবে হো হো করে হেসে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে চন্দন আসছিল এ-পথ দিয়ে। ভিড় এবং স্বাতীকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এগিয়ে এসে শুধলো, 'কি হয়েছে রে স্বাতী?'

স্বাতীও যেন এতক্ষণে সাহস পেয়েছে, তার চোখে জল এসে গিয়েছে, বলল, 'দেখ না, তখন থেকে যেতে দিচ্ছে না, আর যা তা বলছে।'

চন্দন আরো এগিয়ে এসে বুলনের গায়ে ধাক্কা দিল, বলল, 'এই, যেতে দিচ্ছিস না যে।'

'একটু সামলে গায়ে হাত দিও বলছি।'

'যা যা, একে অন্যায়, তার ওপর আবার গলাবাজি!'

'খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।'

'চুপ—, ইতর লুম্পেনের দল, পাড়ার ওপর এসে রংবাজি, বেলেল্লাপনা? ছাড়, পা ছাড়'—বলেই জোরে ঠেলা দিয়ে রঞ্জাকে সরিয়ে দিল চন্দন।

'তবে রে, সেবার ছেড়েছি বলে, এবার আর ছাড়ছি না'—বলে এগিয়ে এসেছে রঞ্জা।

'খুব পাখা গজিয়েছে দোস।'

'আজই শেষ করে দেবো শালাকে। বড় বেড়েছে।'

'আয় না, শেষ কর।' চন্দন চারদিকে তাকাল একবার, সবাই মজা দেখছে, আশপাশে ভিড়, কৌতূহলী দৃষ্টি।

ওরাও ঘিরে ধরেছে চন্দনকে। শঙ্কর সামান্য দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। আরও কিছুক্ষণ ওদের কথা কাটাকাটি বচসা হয়েছিল চন্দনের সঙ্গে। তারপরই একটা আর্ত চীৎকার। রক্তে ভিজে গেল রাস্তা।

'রমা স্টোর্স'-এর সুহাস প্রণবের সঙ্গে এসেছে; ও বলেছিল, 'তোর দাদা ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল বলে মেয়েটা বড় রকমের একটা অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু নিজে আর বাঁচল না।' বলে চুপ করে গিয়েছিল সুহাস। আসলে কেউ ভাবতে পারে নি, সামান্য তুচ্ছ কথা কাটাকাটি এরকম একটা অপ্রীতিকর শোকাবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

প্রবাল বলেছিল, 'ওদের সঙ্গে এভাবে লাগতে যাওয়াটাই বোকামো হয়েছিল তোর দাদার। যখন দেখছে, ওরা দলে ভারী, রঞ্জার হাতে ছুরি, তখন চুপ করে যাওয়াই তো উচিত ছিল।'

প্রণব কোন জবাব দেয় নি এসব কথার। কি বলবে সে! এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়াটা তার দাদার অনুচিত হয়েছে, এটা ওরা বলবে কি, ও-ও বোঝে। আর অনুচিতই বা বলে কি করে! প্রণবের একবার বলতে ইচ্ছে হলো, হ্যাঁ, আমার দাদা বোকামো করেছিল, আর একটু ভাবা, সমীহ করা উচিত ছিল ওদের। কিন্তু চোখের সামনে একটা অসহায় মেয়েকে অপদস্থ করছে, তার গায়ে হাত দিচ্ছে, পথ আটকে বদ নোংরা রসিকতা করছে, এসব দেখে, যার সামান্যতম মনুষ্যত্ব আছে, চুপ করে থাকতে পারে? কোন প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করে সে অনায়াসে চলে যেতে পারে? এটা যদি নিজের মেয়ে বা বোনের ক্ষেত্রে হতো, তখনও কি নির্বিকার নিশ্চেতন থাকা যায়? এত তো লোকজন ছিল ওখানে, কই, একজনও এগিয়ে এলো না, উপরন্তু দাদার পাশেও এসে দাঁড়াল না। তবে কি আর এত সাহস পায় ওরা? এটা স্বার্থপরতা নয়, কতদিন আর তোমরা এভাবে গা বাঁচিয়ে থাকবে? আদৌ সম্ভব কি থাকা? ওদের এই দূষিত কুৎসিত থাবা কি তোমাদের ওপর পড়বে না কখনো? ভেবেছো, রেহাই পাবে? মনুষ্যত্ব, সহানুভূতি, বিবেক, কর্তব্য এগুলো কি আজ অচল, বেঁচে থাকার পক্ষে বাড়তি, অপ্রয়োজনীয় কিছু? এরপরও কি বলবে, দাদার এ-কাজটা বোকামো, অনুচিত হয়েছে?

মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে প্রণব। বুকের ভেতরটায় অসহ্য যন্ত্রণা। কাউকে কিছু বলতে পারছে না। বিকেলের দিকে পাড়ায় এলো, সঙ্গে প্রবাল। আরো কিছু ছেলের দরকার, মর্গ থেকেই শ্মশানে নিয়ে যাবে।

বাড়ি ফিরে প্রণব দেখল, তার বাবা, হারাধনবাবু একটা ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। সব শুনেছেন তিনি। তাঁর এমন নির্লিপ্ত নির্বিকার চেহারা আর কখনো দেখে নি সে। কাউকে যেন ভাল করে চিনতেও পারছেন না তিনি, তার দিকে দু একবার তাকিয়ে আবার

চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রণবের চকিতে একবার মনে হলো, এই আকস্মিক শোক তার বাবাকে আরো স্থবির, অনাসক্ত করেছে, শুধু তাই নয়, স্নেহমমতাতুর নম্র এক জগৎ থেকে তিনি এখন বিচ্ছিন্ন, নির্বাসিত। কেমন একটু অস্বাভাবিক, অপরিচিত সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। একদিকে এই, অন্যদিকে তাকে দেখে মীরার কান্না আরো জোর হলো। 'আমার বড়দাকে কোথায় রেখে এলে, বল না।' বলতে বলতে আরো ভেঙে পড়ল মীরা। কি সান্ত্বনা দেবে সে? একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে হারাধনবাবুর কাছে এলো প্রণব। আস্তে আস্তে কোনরকমে সে বলল, 'আমরা যাচ্ছি, প্রবাল থাকল, আপনি ওর সঙ্গে সোজা নিমতলায় চলে যান।'

হারাধনবাবু এ-কথায় চোখ তুলেছিলেন, কিছু বললেন না। এখনও যেন তাঁর কাছে সবটাই দুর্বোধ্য, জটিল। দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে, আচ্ছন্ন।

রাস্তায় নেমে অনেক কথাই সে শুনেছে। আরো কিছু ছেলে এসেছে, শ্মশানবন্ধু, অমলেন্দুও রয়েছে এদের মধ্যে। পাড়াটা যেন শোকে, বেদনায়, ম্রিয়মাণ। তার দাদাকে ঘিরেই আলোচনাটা আজ এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় ঘোরাফেরা করছে।

এমন জোয়ান তরতাজা ছেলেটাকে মেরে ফেলল, একেবারে খুন? দিনে দিনে হলোটা কি, কথায় কথায় ছুরি? মোড়ের ওই চায়ের দোকানটায় যত রাজ্যের গুণ্ডা বদমায়েসের আড্ডা, ওটাকে তুলে দাও এবার। কে তুলবে মশায়, যান না একবার তুলতে, মজাটা টের পাবেন। এই করেই তো সব উচ্ছন্নে গেল। দেশে আর আইন-কানুন বলে কিছু থাকল না। এত বাড়তে দেওয়া হচ্ছে কেন ওদের? মেয়ে বউ ঝি-রা হাঁটতে পারবে না ওদের জ্বালায়? আরে মশায়, আপনার আমার ঘরের ছেলেও তো আছে এসব দলে। ছেলে-পিলেকে মানুষ করতে হয়, জন্ম দিয়েই সব শেষ হয়ে যায় না। কি হয়েছিল মশায়, মারল কেন? এর আবার কেন আছে, ইচ্ছে হয়েছে, মেরেছে। আজ একে মেরেছে, কাল আর একজনকে মারবে। তাই বলে দিনে দুপুরে খুন? কেউ বাধা দিল না? কে বাধা দেবে? কি জানি, এখনই এসব বেড়েছে, আমাদের সময় দেখেছি, গাঁয়ে একটা খুন হলো কি, সাত গাঁয়ের লোক তটস্থ, ভয়ে রীতিমতন কাঁপত। আচ্ছা, একটা প্রাণের দাম কি এতই সস্তা? শেয়াল কুকুরের মতন আকছার মরছে।

এ ধরনের বহু কথাই শুনে গেছে প্রণব। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই ভেবে পেল না, এখন যারা এসব কথা বলছে, তাদের অনেকেই এই নারকীয় হৃদয়হীন ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত, অথচ কেউ এগিয়ে আসে নি। পাড়ার লোকগুলোকে এখন তার ভীষণ স্বার্থপর, নীচ, কীটের মতন মনে হচ্ছিল। সবার চোখের ওপর তার দাদাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শেষ করেছে! উঃ! ভাবলে শরীরটা শিউরে ওঠে। কেমন গা-গুলোনি, বমি-বমি ভাব।

প্রণব অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছিল। তার মাথাটা ঘুরছে। চোখের কোণে ভীষণ জ্বালা। গা হাত পা সব যেন জ্বলছে। সারা শরীরটাই যেন তার দগ্ধ হয়েছে, যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হয়ে পড়েছে প্রণব। অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না তার এই কষ্ট, কাউকে বোঝানো যাচ্ছে না। কেমন এক ধরনের আচ্ছন্নতা ও ঘোরের ভেতর দিয়ে সে চলছে। যেন, তার চোখের ওপর দিয়ে দ্রুত একটার পর আর একটা দৃশ্য, কতগুলো অস্পষ্ট অর্ধস্ফুট ছায়া ফেলে সরে যাচ্ছে। একটার অর্থ পুরোপুরি তখনো বোঝা যায় নি, তার ওপরই আর একটা এসেছে, পরে আরও। ফলে, মনের ওপর কতগুলো জটিল হিজিবিজি দাগ পড়েছে।

মর্গ থেকে বেরোতে বেরোতে তাদের সন্ধ্যে হয়ে গেল। কোন হরিধ্বনি নয়, নীরবে মৌনভাবে একসময় গিয়ে তারা শ্মশানে পেঁছিলো। শোকযাত্রা। এই মৌন শান্ত শোক-মিছিলের গাম্ভীর্য পবিত্রতা গাঢ় বেদনা সকলকেই স্পর্শ করেছে। একটা কথা ভেবে প্রণব নিজেকে মনে মনে বারংবার সান্ত্বনা দিচ্ছিল, একজনকে বাঁচাতে গিয়ে, কতগুলো গুন্ডা বদমায়েসের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে তার দাদা। এ পাড়ায় আর একজনেরও এ সাহস নেই। কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা সংশয়ও উঁকি দিয়েছে তার ভেতরে, দাদার এই মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ কজন মনে রাখবে, কজন এর প্রতিকারের জন্যে সক্রিয় হবে? প্রণব যেন ক্রমশ নিজের মধ্যে ডুব দিচ্ছে। সাগুর দানার মতন বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছে কপালে মুখে গলায়।

ওরা যখন ফিরে এলো পাড়ায়, ভোরের আলো সবে কালো ধূসর বর্ণের ঢাকনা সরিয়েছে। শিরীষ কয়লা ভাঙছিল; উনুন ধরাবে। তার দিকে একবার চোখাচোখি হলো প্রণবের। যে জায়গাটায় তার দাদাকে খুন করেছিল, প্রণব সেখানটায় এসে নিজের অজ্ঞাতেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখনও রক্তের দাগ রাস্তায়। তাকে দেখে একজন বয়স্ক লোক কাছে এলো। প্রণব তাকে চেনে, কাছে এসে বলল, 'এ পাড়াটা আগে এমন ছিল না, দিন দিনই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'যা হবার তা তো হয়েছেই, কি আর করবে।' তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, 'এসব নিয়ে আবার পুলিস কাছারি করো না; ওই গুন্ডাগুলোর পেছনে বুঝলে না, হাত আছে। কি দরকার, শুধু শুধু আরো বিপদ ডেকে আনা।'

প্রণব কিছু বলল না। সকালের নরম সামান্য-ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগছিল। ভিজে কাপড় শরীরে। ঝটিতে একটা প্রশ্ন বিদ্যুতের মতন খেলে গেল মাথায়, খুনটা কি তাহলে একমাত্র রঞ্জা বুলান বাসুরাই করেছে? আর কেউ নেই পেছনে? এ পাড়ার আর কারো হাত নেই তো এতে? কেমন একটা খটকা লাগল তার। দু পা যেতে যেতে আচমকা কেন যেন প্রণবের মনে হলো, এমন নয়ত, এর আড়ালে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র, ফাঁদ পাতা আছে, যেখানে একজন নয়, দুজন নয় বহু, এ পাড়ার বৃদ্ধ প্রৌঢ় আধাবয়সী যুবক তরুণ কিশোর সবাই অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

জনসংখ্যা সমস্যা ও অর্থনৈতিক প্রগতি

অনুপম গুপ্ত

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রগতির প্রচেষ্টায় জনসংখ্যা সমস্যা যে একটি বিপুল বাধা একথা সুবিদিত। জনবহুল দেশে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকতর পরিমাণে প্রয়োজন সেইজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূত্রপাত করা এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনা অধিকতর কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি একাধিকবার ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, সরকারী প্রস্তাবে এই সমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক ব্যবস্থা দেশজুড়ে চালু করা হয়েছে। জনসংখ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক পারস্পরিক। একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক পরিমাণে জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল অন্যদিকে জনসংখ্যাও কিছুটা আর্থিক উন্নতির মানের উপর নির্ভর করতে পারে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টায় জনসংখ্যার কথা খুব সহজেই এসে পড়ে। জনসংখ্যা সেখানে সমস্যার আকার নিয়েছে কি না জানা প্রয়োজন এবং সমস্যা হয়ে উঠলে সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন এবং সমস্যার তীব্রতা পরিমাপ করা আবশ্যক।

কোনও দেশে জনসংখ্যা সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে হলে প্রথমেই তিনটি বিষয় জানতে হবে—বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পরিবর্তন-সম্ভাব্যতা। যে সব দেশে সভ্যতার ইতিহাস বহুপ্রাচীন সেখানে জনবসতিও দীর্ঘকালস্থায়ী। এই দীর্ঘকালব্যাপী সভ্যতার ফলে মোট জনসংখ্যাও বেশী হবার কথা। ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষির উন্নতির জন্য জনসংখ্যা প্রথম থেকেই বেশী এবং জমি-প্রতি বসতি অত্যন্ত ঘন। এই কারণেই, এশিয়ার যেখানে গড়ে জনপ্রতি কৃষিযোগ্য জমি ১·৫ একর, দক্ষিণ আমেরিকায় ৬·৯ এবং আফ্রিকায় ১০·৬। মাথাপিছু চাষযোগ্য জমি বা প্রাকৃতির সম্পদ জনবহুলতা বা জনসংখ্যার আধিক্য সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। তবে এছাড়াও উৎপাদনব্যবস্থার স্তর এবং শ্রমিকের দক্ষতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাজন আরও সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। অধিকতর জনসংখ্যা উন্নততর অর্থনৈতিক প্রতিদানে সহায়ক হতে পারে এবং দেশের মধ্যে বিপুল বাজারের সৃষ্টি করে বৃহৎ হারে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন অর্থনৈতিক দিক থেকে সঙ্গত হতে পারে। জনবহুলতা কোন কোন দিক থেকে উপযোগী মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও অনগ্রসর দেশে উন্নতিপর্বের সূচনায় বহুর জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সংস্থান যে সমস্যার সৃষ্টি করে এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অনগ্রসর দেশগুলি প্রধানতঃ কৃষি বা প্রাথমিক স্তরের উৎপাদনব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, উৎপাদনকৌশল সেখানে প্রাচীন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাণু। এই অবস্থায় মাথাপিছু জাতীয় আয় সাধারণতঃ কম। এই আয় বাড়াতে হলে জাতীয় সঞ্চয় আরও বাড়ানো প্রয়োজন। এর উপর দেশ জনবহুল হলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অত্যধিক চাপ পড়বে। একমাত্র উন্নতমানের উৎপাদনপদ্ধতির নিয়ত নিয়োগেই এই চাপকে অতিক্রম করা যেতে পারে।

নিঃসন্দেহে জনসংখ্যার পরিমাণ সমস্যার কিছুটা ধারণা দিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পর্যালোচনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মাথাপিছু জাতীয় আয় যদি কম হয় সঞ্চয়ও কম হবে। সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারকে নির্ধারিত করে। জাতীয় আয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যদি জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে তাহলে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে স্বচ্ছন্দ্যের মান উন্নত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে। এবং সর্বোপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করে যায় তবে সব উন্নয়ন প্রচেষ্টাই ক্রমশঃ নিম্নগামী জীবনযাত্রার মানের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফলে জনবহুল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার শুরুতে বেশ কিছুকাল যদি জনসংখ্যা স্থির রাখা যেত তাহলে উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে চিন্তা করবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু জনসংখ্যাকে আর্থিক প্রগতির প্রথম যুগে স্থির রাখা একেবারেই অসম্ভব। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ভর করে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যের উপর। অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর, উৎপাদনপদ্ধতি প্রাচীন এবং আধুনিক বিচারে নিম্নমানের এবং সামাজিক ব্যবস্থা আঞ্চলিক গণ্ডিতে আবদ্ধ। মৃত্যুহার সাধারণতঃ আজকের আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ দেশের তুলনায় অনেক বেশী—গড়ে শতকরা চার। কৃষক পরিবারে মৃত্যুহার বেশী হওয়ার জন্য জন্মহারও যথেষ্ট বেশী রাখতে হয়, এবং প্রধানতঃ এই কারণেই অধিকসংখ্যক সন্তান প্রজননকে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। অধিকাংশ অনগ্রসর দেশেই বার্ষিক জন্মহার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সীমা শতকরা চার-এ পৌঁছে গেছে। দেশের অর্থনৈতিক মান এবং দেশবাসীর জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য উপকরণের প্রাপ্যতার উপর মৃত্যুহার বিশেষভাবে নির্ভর করতে বাধ্য। চরম দারিদ্র্যে অপুষ্টি এবং এর ফলে রোগ মৃত্যুহার বাড়াবে এবং সম্পদবৃদ্ধি ঘটলে সচ্ছল জীবনযাত্রায় মৃত্যুহার কমবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন অনগ্রসর দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে মাথাপিছু জাতীয় আয় যথেষ্ট না বাড়লেও এবং কৃষি অর্থনীতি ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য কারণে মৃত্যুহার কমে যেতে পারে। তাইওয়ান, মালয়, চিলি, মিশর, মেক্সিকো, সিংহল, হংকং প্রভৃতি একুশটি অনগ্রসর দেশে এই ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে ঘটতে দেখা গেছে।

বিভিন্ন জনসংখ্যাবিদের আলোচনায় মৃত্যুহার কমার কারণ হিসাবে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপস্থাপনা করা হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি হলে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু হলে স্থানীয় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূর হবে। তাছাড়া সম্ভবতঃ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আদানপ্রদান সহজ হওয়ায় জাতিবিদ্বেষ এবং অকারণ সংঘর্ষ বন্ধ হবে। এই কারণে মৃত্যুহার শতকরা একভাগ কমে যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হলে এবং জীবাণুনাশক ব্যবহারে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ প্রচুর পরিমাণে কমে গেলে মৃত্যুহার আরও শতকরা একভাগ কমতে পারে। এবং তৃতীয়তঃ চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপকতর প্রসার ঘটলে ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে এবং মৃত্যুহার শতকরা আরও একভাগ কমবে। ফলে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য জন্মহার যদি গড়ে শতকরা চার হয় এবং বর্তমান মৃত্যুহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় চার হয় তাহলে আধুনিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটলে মৃত্যুহার কমে শতকরা এক হবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে শতকরা তিন। জনসংখ্যাবিদদের মতে এটাই জনসংখ্যাবৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা। ঔপনিবেশিক দেশগুলি উপনিবেশকে প্রধানতঃ শাসক দেশের প্রয়োজনে ব্যবহার করে, কিন্তু

ঔপনিবেশিকদের সুবিধার জন্য শাসিত দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সংক্রামক ব্যাধি দূর হয়। এই কারণে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ রাজত্বকালে মৃত্যুহার অনেক কমে গেছিল। তাইওয়ানে জাপানী শাসনকালে মৃত্যুহার ১৯০৬-১৯ সালে শতকরা ৩·৩৪ থেকে ১৯৪১-৪৬-এ শতকরা ১·৮৫-এ হ্রাস পায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রথম কারণ দেখা যাচ্ছে মৃত্যুহার হ্রাস। বর্তমান পৃথিবীতে কোনও অনগ্রসর দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পশ্চিমের শিল্পোন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল অতি অল্প সময়েই আজকের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। তার ফল বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের হয়েছে। মৃত্যুহারের একটি বিশেষ শতকরা হ্রাসের জন্য অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতকের ইউরোপে যত বছর সময় লাগত বর্তমান যুগের কোনও অনুন্নত দেশে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। সিংহলে ডি, ডি, টি প্রয়োগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমে যাওয়ায় ১৯৪৫ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে মৃত্যুহার শতকরা ২·২ থেকে শতকরা ১·২-এ কমে এসেছে। এই পরিমাণ পরিবর্তন আনতে ইংলন্ড ও ওয়েল্‌স্‌-এ প্রায় সত্তর বছর সময় লেগেছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অথবা ঔপনিবেশিকদের উন্নততর শাসন, যোগাযোগ ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে বিভিন্ন অনগ্রসর দেশে মৃত্যুহার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নেমে এসেছে। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশগুলিতে শতকরা দু-এর নীচে মৃত্যুহার নেমে গেছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশগুলিতেও মৃত্যু-হার শতকরা দুই-এর কাছে কমে এসেছে।

মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়াটা যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির একটি প্রত্যক্ষ ফল, জন্মহার হ্রাস পাওয়া ততটা প্রত্যক্ষ সম্পর্কে যুক্ত নয়। ফলে উপনিবেশ স্থাপন বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনাকালে জীবনযাত্রার মান-এ সামান্য উন্নতি জন্মহারকে একেবারেই প্রভাবান্বিত করে না। জন্মহার স্থির থেকে মৃত্যুহার দ্রুত কমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ফলে জনবিরলই হোক বা জনবহুলই হোক প্রায় প্রত্যেকটি অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি জনবহুল দেশেই জন-সংখ্যাবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মাথা-পিছু জাতীয় আয় অত্যন্ত কম হলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুন্নত হলে জনবিরল দেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ঊর্ধ্বগতি জীবনযাত্রার মানকে বিপর্যস্ত করবে। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা মন্থর করতে হলে জন্মহার কমানো প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দেশের ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক কাঠামো জন্মহারকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। কালক্রমে জন্মহার কমে আসার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু যেহেতু, অর্থনৈতিক অবস্থা, মূলধনের ক্রমস্ফীতি বা শিল্পোন্নয়নের ধারার সঙ্গে জন্মহারের হ্রাস-বৃদ্ধির কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্দেশ করা যায় না জন্মহার সহসা কমে যাবার ঘটনাও আশা করা যায় না। জন্মহার হ্রাস পাওয়াটা সাধারণতঃ একটি দীর্ঘকালব্যাপী মন্থর প্রক্রিয়া।

জনসংখ্যার পরিমাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পরিবর্তনের সম্ভাব্যতাও বিবেচ্য। অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আধুনিকী-করণের ফলে মৃত্যুহার ক্রমশঃ কমে শতকরা একের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। এবং এই কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বাড়বে। তাছাড়া মৃত্যুহার কমলে শিশুমৃত্যুহারও কমবে।

সাধারণতঃ অনগ্রসর দেশে শিশুমৃত্যুহার অত্যন্ত বেশী। বৃহৎ জন্মহার এবং শিশুদের আরও আয়ুষ্মান হবার ফলে ভবিষ্যৎ পিতামাতার সংখ্যা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। বহু আলোচিত ইংরাজ যাজক এবং অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার বৃদ্ধিরও আশঙ্কা করেছিলেন। ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্বের একদেশ-দর্শিতা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। অর্থনৈতিক প্রগতিমূলক বিভিন্ন ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার হ্রাসের কার্যকারণ সম্বন্ধে নির্দেশ করেছেন অনেকে, তাছাড়া পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতাও ম্যালথাসের সংশয়কে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে মৃত্যু-হার অধোগামী হবে, ফলস্বরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বেড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটবে। এর উপর যদি ভাবা যায় যে অধিকতর আয়ে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি অধিকতর হারে বাড়ে তাহলে সঞ্চয় আরও দ্রুতগতিতে বাড়বে। এই ক্রমবর্ধমান সঞ্চয় বিনিয়োগ ঘটলে জাতীয় আয় ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে পারে। মৃত্যুহার যেহেতু ক্রমে একটি নিম্নসীমার দিকে নেমে আসবে, জন্মহার স্থির থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ক্রমশঃ একটি উচ্চসীমার দিকে যাবে। এই অবস্থায় ক্রমবর্ধমান সঞ্চয় এবং তার ফলে ক্রমবর্ধমান হারে আয় বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে একসময় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করতে বাধ্য। সেই অবস্থায় কালানুক্রমিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু জাতীয় আয়ও ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারা অবশেষে এইরকম আশাপূর্ণ পথে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু এই ধারার নাগাল পেতে হলে যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতিক্রম করতে হবে। এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগযোগ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তাছাড়া জনবহুল দেশে কৃষি উৎপাদন বিস্তৃত করার সুযোগ থাকে অত্যন্ত কম। উৎপাদন পদ্ধতিকে আরও উন্নত না করলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির বন্ধনে প্রগতি সংকটাপন্ন হতে পারে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে বিভিন্ন বৃহৎশিল্প স্থাপন সম্ভব। বিপুল জন-সংখ্যার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহৎ বাজার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সবই নির্ভর করছে সূচনায় মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থাপনের উপর। এত প্রচুর লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্যসংস্থানে ঘাটতি মিটানোর জন্য আমদানীর উপর নির্ভর করে থাকা যায় না। কিন্তু এদিকে চাষযোগ্য জমি সম্প্রসারণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত সেইজন্য ক্ষেত্রপরিধি বাড়ানোর থেকেও ক্ষেত্রপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বেশী নজর দিতে হবে। এবং এই কারণেই উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তন করা আবশ্যক।

অধিকাংশ অনগ্রসর দেশেই জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ কৃষিনির্ভর। ফলে দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামীণ সমাজে বাস করে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল ধরে এক স্থির অবস্থায় আছে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজে যৌথপরিবার একটি উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই উৎপাদন কার্যে অংশ নিতে পারে। বিদেশী উপনিবেশে খনিজ সম্পদ আহরণের কাজ অথবা বাণিজ্যিক আবাদের কাজ ব্যবসায়ভিত্তিকভাবে বৃহৎহারে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময়েই যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে না। তাছাড়া কাঁচামাল শাসকদেশে চলে যায় ফলে উপনিবেশে শিল্পায়ন ঘটে না। উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার পাশে থেকেও এশিয়া আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। কৃষিতে নিয়োজিত

অধিকাংশ লোক পুরাতন ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন পরিচালিত করে এবং প্রাচীন সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাস করে। শিল্পায়নের অভাবে শিল্পভিত্তিক সাধারণ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের ধাক্কা অনেক সময়েই গিয়ে পৌঁছয় না। ফলে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ও যৌথপরিবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

যৌথপরিবারে একটি নবজাত সন্তানের ব্যয়ভার যথেষ্ট প্রকট হয়ে নাও উঠতে পারে। এর ফলে কৃষিতে জনসংখ্যা ক্রমশঃ অত্যধিক হয়ে ওঠে এবং প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা অর্ধবেকারত্ব জমে ওঠে। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে যদি নতুন শিল্পভিত্তিক নাগরিক সভ্যতা গড়ে ওঠে তবে গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে শহরের দিকে কিছু লোক চলে আসবে। শহরের নতুন এবং ভিন্ন সমাজব্যবস্থার যৌথপরিবারের পরিবর্তে ছোট ছোট পরিবার গড়ে উঠবে। ছোট পরিবারে নবজাত সন্তানের জন্য ব্যয় স্পষ্টতর হবে। তাছাড়া গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার যৌথ-পরিবারে যে দীর্ঘকালের সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা গড়ে উঠেছে শহরে তার অস্তিত্ব নেই। এখানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আর একটি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। গ্রাম থেকে শহরে লোক যেতে শুরু করলে এবং শিল্পভিত্তিক শহরের ধ্যানধারণা নিয়ে গ্রামে ফিরে এলে গ্রামের উৎপাদন কাঠামোতেও কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার যত আধুনিকীকরণ ঘটবে উৎপাদন পদ্ধতিতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনও তত বাড়বে। দক্ষতা অর্জন করবার কারণেই কিছুটা অক্ষর পরিচিতি প্রয়োজন। ফলে একটি সন্তানের ব্যয়ভার আরও কিছুটা পরিমাণে বেড়ে যাবে। এইভাবে সন্তান লালনের ব্যয় ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে জন্মহারের বৃদ্ধি কিছুটা রোধ করতে পারে।

উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমউন্নতিতে মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমশঃ বাড়তে পারে। মাথা-পিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটা সম্ভব। এবং কিছুকাল ধরে এই উন্নতমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলে জীবনযাত্রার মান রক্ষা করার জন্য পরিবারের আকার পরিকল্পিত হতে পারে। তবে এইসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে জন্মহার হ্রাস পাওয়া অত্যন্ত সময়সাধ্য ব্যাপার কারণ উৎপাদনের স্তর, বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জন্মহারের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আজও নির্দেশ করা যায় নি। বর্তমানযুগে মৃত্যুহার অত্যন্ত দ্রুত কমে যেতে পারে একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দ্রুত মৃত্যুহার কমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত বাড়বে এবং জনসংখ্যা সমস্যা প্রায় আকস্মিক-ভাবেই এসে পড়বে। জীবনযাত্রার মান হঠাৎ পড়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মান উন্নয়নের চেষ্টা সক্রিয় ও জোরদার হতে বাধ্য। অনুন্নত দেশের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে এই অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হওয়া স্বাভাবিক। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জন্মহার কমাবার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও আচরণকে প্রভাবান্বিত করা প্রয়োজন। উৎপাদন ব্যবস্থা নির্দিষ্টভাবে জন্মহারকে নিয়ন্ত্রিত করে না।

ভারতবর্ষে জন্মহার অনেককাল থেকেই শতকরা চার-এর বেশী। ১৮৯১ থেকে ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে জন্মহার চার বা তার অধিক। তবে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত জন্মহার ক্রমশ হ্রাস পেয়ে এসেছে। মৃত্যুহারও ১৯২১ সালের লোকগণনা পর্যন্ত চার-এর বেশী দেখা গেছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুব কম। ১৯২১-৩০ দশক থেকে মৃত্যুহার দ্রুত কমে আসছে এবং সেইসঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী জন্মহার শতকরা ৪·২ এবং মৃত্যু-

হার শতকরা ২·৩। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় শতকরা ১·৯। মৃত্যুহার এখনও সর্বনিম্ন সীমায় পৌঁছয় নি সেইজন্য ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও কিছুটা বাড়বার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া শিশুমৃত্যুর হার ক্রমশঃ কমে যাওয়ার ফলে মোট জনসংখ্যায় পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়স্ক শ্রেণীর লোকের অনুপাত ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এই কারণে মোট জনসংখ্যার তুলনায় কার্যক্ষম লোকের অংশ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে পনেরো বছরের নীচে জনসংখ্যার অংশ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসাম, গুজরাট, কেরল, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বভারতীয় হারের চেয়ে বেশী। ১৯৬১ সালের লোকগণনায় গ্রাম থেকে শহরে যাবার ধারা ১৯৫১ সালের তুলনায় অনেক কম। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত যেখানে ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চল থেকে মোট ৭৪ লক্ষ লোক শহরে বাস উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে মোট ৫২ লক্ষ লোক শহরে চলে গেছে। শহরের দিকে যাবার ধারা কমে যাবার একটা কারণ হতে পারে শহরে কর্মসংস্থানের অভাব। তাছাড়া একই কারণে মাঝারী আকৃতির শহরগুলি থেকে বৃহৎ নগরে জনসংখ্যা প্রবাহিত হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব এবং অর্ধ বেকারত্ব কাজের সন্ধানে মানুষকে শহরের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাব শহরে বেকারের সৃষ্টি করেছে, এবং কালক্রমে এর ফলে শহরাঞ্চলে গ্রাম ছেড়ে উঠে যাবার সুযোগও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে।

১৯১১ সাল থেকে লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে জন্মহার ক্রমশঃ কমে আসছিল, কিন্তু ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে জন্মহার আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দশকে পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও আসামে বিশেষ করে জন্মহার বেড়েছে। কিন্তু আসাম, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে মৃত্যুহার সর্বভারতীয় মৃত্যুহার থেকে বেশী। ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে মৃত্যুহার দ্রুত কমে আসবে ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৬১ সালের হিসাবে ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় আঠারো জন শহরবাসী। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে শহরবাসীর সংখ্যা শতকরা প্রায় চারজন বেড়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আসামে শহরবাসীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা দ্রুত হারে বেড়েছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর ও রাজস্থানে শহরবাসীর সংখ্যা এই এক দশকে কমে গেছে। আরও লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে সংজ্ঞা অনুযায়ী শহরের সংখ্যা ৩০৬০ থেকে ২৭০০-তে কমে এসেছে। এর একমাত্র কারণ যে, দশ হাজারের কম জনসংখ্যা সমন্বিত শহরের সংখ্যা দ্রুত কমে গিয়েছে। একক রাজ্য হিসাবে শহরের সংখ্যার সর্বাপেক্ষা বেশী অবনতি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে যেখানে বাংলাদেশে শহরের সংখ্যা ১২০ থেকে ১৮৪ বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরপ্রদেশে ৪৮৬ থেকে ২৬৭-তে হ্রাস পেয়েছে। প্রধানতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে ছোট শহরের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নাগরিক সভ্যতার ব্যাপকতা ক্রমে জন্মহার কমিয়ে আনতে পারে। কিন্তু গ্রামে ও শহরে কর্মসংস্থানের অভাব থাকলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে না। নাগরিক জীবনযাত্রা বিস্তৃত হতে পারে একমাত্র ব্যাপক শিল্পায়নের

ভিত্তিতেই। অন্যথায় গ্রামের দৈন্যের চাপে উদ্বৃত্ত জনতা শহরে চলে আসতে পারে কিন্তু এভাবে নগরবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি কোনওদিক থেকেই উন্নয়নের সহায়ক হবে না। তাছাড়া ভারতবর্ষে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ দশকে নাগরিকতার পশ্চাৎগতি অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে। শহরে কর্মসংস্থান এবং কৃষি থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে জনসংখ্যার গতি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। তবে বিরাট এবং জনবহুল দেশ ভারতবর্ষে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। নিয়মিত খাদ্যদ্রব্যের যোগানের উপরই শিল্পের প্রসার ক্ষমতা নির্ভর করে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, কৃষিতে উৎপাদন কৌশল পরিবর্তন, শিল্প ও বাণিজ্য সমৃদ্ধ নাগরিক সভ্যতার প্রসার এবং সব মিলে জীবনযাত্রায় অধিকতর স্বচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত জন্মহারের নিম্নগতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

কালো কোট

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওয়ায় জানলা খুলে গেল। কিছু বৃষ্টির ছাঁট এসে ঘর ভিজিয়ে দিল। কে যেন এখন ও-বাড়ির উঠোনে কলতলায় যাচ্ছে। হাওয়ায় কিছু পাতা উড়ে উড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পাতাবাহারের গাছগুলো বৃষ্টির জলে ভিজছে। এই বৃষ্টিতে কিছু পাখী ভিজছিল, উড়ে উড়ে ইতস্ততঃ পাখীরা ডাল থেকে ডালে এবং পাতায় আশ্রয় নিচ্ছিল। টিপটাপ বৃষ্টির শব্দ। এক হলুদ রঙের পাখী ডাকছে। পাতাবাহারের গাছটার বড় ডালটাতে পাখীটা বসে ডাকছে। হাবুল জানলা দিয়ে চুপি দিল। পাখীটাকে হাত বাড়িয়ে ধরার ইচ্ছা। বৃষ্টির ছাঁটে হাত পা মুখ ভিজে যাচ্ছে। তবু কি যেন আছে এই পাখীর ডাকে. নিঃশব্দ দ্রুত এক নির্জনতা এই ঘরে, জানলায়, মায়ের শীর্ণ শরীরে আকাশের মতো ছায়া ফেলছে।

হাওয়াটা ক্রমে অন্য মোড় নিল। জানলা তেমনি খোলা। বৃষ্টির ছাঁট আর আসছে না। হাবুল জানলা পর্যন্ত এগোতে পারল। ভালো করে সে পাখীটা দেখতে পাচ্ছে। পাখীর এই ডাক কেন, মা কেন চুপচাপ বিছানায় বসে, মা কেন রোদ উঠলে পিঠে রোদ দিয়ে বসে থাকে, মা ক্রমে কেন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; মার চোখে এমন দুঃখ ঝুলে আছে কেন—হাবুল পাখীটা দেখতে দেখতে ভাবলো। পাখীটা বুঝি টের পেয়েছে হাবুল এসে জানলায় দাঁড়িয়েছে, সে বুঝি ভয় পেয়ে উড়ে যেতে চাইল—কিন্তু কতদূরে যাবে—এই তো সামনে পদ্মফুলের গাছ, স্থলপদ্মের ফুলে এখন গোলাপী রঙ, পাখীটার হলুদ রঙ গোলাপী রঙের ভিতর ডুবে গেলে মনে হল—কোথায় যেন সে একবার জলসত্র দেখেছে। কোন মেলায় যেতে যেতে সে দেখেছে গাছতলায় ব্যাজ পরে কারা যেন ক্লান্ত মানুষকে জলদান করছে। ওর যখন মন ভালো থাকে না, যখন মা ঘর থেকে বের হতে দেন না, সদর দরজা বন্ধ করে রাখেন—এখন হাবুল কোথাও যাবে না, রাস্তায় বের হবে না—এই যে রাস্তা দেখছ, কত মোটর গাড়ী, ট্রাম গাড়ী দেখছ—ওরা কেবল কোথাও না কোথাও চলে যাচ্ছে। তুমি একা বের হলে ওদের মতো তুমি কোথাও না কোথাও চলে যাবে, ঘর চিনে ফিরে আসতে পারবে না—তখন কেবল হাবুলের মনে হয় মা তাকে এই ঘরে সারাদিন বন্দী করে রাখতে চান। সামান্য এই গাছের পাখী, বৃষ্টি এবং যেসব পাতা ঝড়ে উড়ে নিরুদ্দেশে চলে গেল তাদের মত ওর কোথাও না কোথাও কেবল চলে যেতে ইচ্ছা হয়—গেলেই বুঝি সেই মেলা, মেলার পথে জলসত্র. সে একটা পাত্র দিয়ে কাকে যেন জলদান করার মত হাত বাড়াল।

মা দেখলেন হাবুল জানলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির জল হাবুলের হাতে পড়ছে। সে জল হাতের অঞ্জলিতে জমা করে রাখতে পারছে না। মা ডাকলেন, হাবুল, বাবা লক্ষ্মী, তুমি বৃষ্টির জল ধরবে না। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

মা এই বড় শহরে এসে যেন কেমন হয়ে গেলেন। এমন বৃষ্টির দিনে হাবুলের মনে হয় ওর মা বড় দুঃখী মানুষ—সেই কবে কোথায় যেন কে একবার কার হাত ধরে বড় মাঠে গিয়েছিল। মাঠের ভিতর প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, গাছ পার হলে ছোট্ট নদী। নদী থেকে কিছু পাখী উড়ে যেত। বিকেল হলেই পাখীরা উড়ে উড়ে সেই বড় বটগাছটার উদ্দেশে চলে যেত। রেল-লাইন পার হলে হাবুলের মনে হত একটা খয়েরী রঙের বাড়ি, সামনে

বারান্দা, মা বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রয়েছেন। সে পাখী দেখার জন্য কার হাত ধরে রোজ চলে যেতে যেতে একদিন একা চলে গিয়েছিল। তারপর সন্ধ্যা হলে মনে হল—কোথায় কোন দিকে গেছে সেই রেল-লাইন, সে একা একা হাঁটতে হাঁটতে কাঁদতে কাঁদতে যখন ক্লান্ত তখন কি যেন এক জাদুর খেলাতে মা বাবা, সে মা-বাবাকে দেখে তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে দিয়েছিল। মা বলেছিলেন, হাবুল, তুমি এই মাঠে?

বাবা বলেছিলেন, হাবুল, কে তোমাকে এত বড় মাঠে নিয়ে আসে?

হাবুল ঠিক কিছু বলতে পারত না। কে সেই মানুষ যে তাকে বিকেল হলেই ডাকে। সড়ক পার হয়ে বিদ্যালয়ের কোয়ার্টার। হাবুল মা-বাবার সঙ্গে সেই কোয়ার্টারে থাকে। বিকেল হলে বারান্দায় মা বাবা বসে গল্প করতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা চলে যেত। হাবুল একা একা বিদ্যালয়ের মাঠে খেলা করতে নেমে গেলেই মনে হত—সামনের রেল-লাইন পার হলে কি এক বিস্ময়ের জগৎ রয়েছে—সে একা একা কার হাত ধরে চলে যেত মনে করতে পারছে না।

মা বলেছিলেন, হাবুল, তুমি দেখবে একদিন ঠিক হারিয়ে যাবে।

বাবা বলেছিলেন, হাবুল, বলো আর কোনদিন একা এত বড় মাঠে নেমে আসবে না?

—আসব না বাবা।

—এলে তুমি আর কোনদিন আমাদের খুঁজে পাবে না।

—কেন বাবা?

—আমরা হারিয়ে যাব।

সেই থেকে কি এক ভয় হাবুলের। যেন সামনের গাছ ফুল পাখী সবই রহস্যময়। সবই হাত বাড়িয়ে হাবুলকে বলছে, এস। তুমি আসবে না? গাছ ফুল পাখীর জগতে হাবুলের কেবল হারিয়ে যাবার ইচ্ছা।

এই বৃষ্টির দিনেই কেন যেন হাবুলের সব মনে পড়ছিল। ওর মনের ভিতর গ্রাম্য এক ছবি ভাসছিল। সামনে ছোট পুকুর, পার হলে রেল-লাইন, তারপর সেই বড় মাঠ। মাঠে যেতে বড় পদ্মদীঘি। কত পদ্মফুল ফুটে থাকত। বিল থেকে বালিহাঁস উড়ে আসত। নদীর ওপার থেকে খাঁচা ঝুলিয়ে আসত মজিদ। ওর দু খাঁচায় বালিহাঁস থাকত, জলপিপি থাকত। কিছু স্নাইপ-জাতীয় পাখী। বাবা গলা টিপে পেট টিপে পাখী কিনতেন। পাখীর মাংস রান্না হলে রহমান দপ্তরী একটা ছোট বাটি নিয়ে আসত, দিদিমণি একটু মাংস। সে বারান্দায় বসে বসে কোনদিন ঝিমোত। পাখীর মাংস একবার কেন যেন সেদ্ধ হল না—সব দোষ মজিদের উপর, মজিদ তুমি কি পাখী দিলে—পাখীর মাংস সিদ্ধ না হলে কার দায়। বাবা নিরীহ মানুষ, তবু কেন যেন সেদিন কে দায়ী এ-প্রশ্ন মজিদকে করেছিলেন।

হাবুল একবার দুটো বালিহাঁসের পেট থেকে তাজা শক্ত ডিম পেয়েছিল। মাকে না জানিয়ে বাবাকে না বলে ডিম দুটো তুলো দিয়ে গরম করার চেষ্টা—যেমন মুরগীগুলো ডিমের উপর বসে থাকত, সে খড়কুটোর ভিতর সেই ডিম লুকিয়ে মুরগীর পেটের নিচে রেখে দিয়ে বসে থাকত। মুরগীটা কিছুতেই বসতে চাইত না, সে সন্তর্পণে মুরগীর ঘরে ঢুকে নিজে মুরগীটার উপর চেপে বসে থাকত এবং একদিন বাবা দেখলেন—হাবুল কোথাও নেই—খোঁজ খোঁজ, মুরগীর ঘরে হাবুল, মুরগীটা মরে গেছে। সে মুরগীর উপর চেপে ডিমে তা দিচ্ছিল। বাবা, এমন নিরীহ বাবা পর্যন্ত সেদিন মেরেছিলেন হাবুলকে।

এখন এই বড় শহরে না আছে মুরগীর ঘর, না আছে সেই বড় মাঠ, পদ্মদীঘি। মজিদ মিঞা আর এখানে আসবে না—কি গো বাবু, পাখী চাই? কি-পাখী লাগবে। একবার দুটো বনমুরগী দিয়ে গিয়েছিল। হাবুল মুরগী দুটোকে খাওয়াত। পারে বাঁধা থাকত। যেদিন মুরগী দুটোকে কাটা হবে—সেদিন হাবুল মুখ ভার করে থাকল সারাদিন। সন্ধ্যার ট্রেনে বাবার এক উকিল বন্ধু আসবে। কালো কোট গায়ে দেখলেই কেমন রাগ হত হাবুলের। বাবা না থাকলে কতদিন দেখেছে মা খুব হেসে হেসে কথা বলেছেন। মা-র কপালে বড় ফোটা থাকত সিঁদুরের। সে বুঝতে পারত না, কালো-রঙের-কোট-পরা মানুষটা বাবার বন্ধু না মা-র বন্ধু। সে সেদিন মুরগীর পা দুটো দড়ি থেকে খুলে দিয়েছিল। কেউ টের পায় নি। উকিল মানুষটা পেটে হাত রেখে বলেছিল, একটা কেস ঠুকে দাও হে।

—কার নামে!

—মজিদের নামে।

খেতে বসে কি আফশোস। সারাক্ষণ বনমুরগীর কলিজা অথবা বা দিকের ঠ্যাঙ খেতে কি সুস্বাদু, এইসব বলাবলি করতে করতে চোখ গোল গোল করে হাবুলকে দেখছিল। যেন টের পেয়ে গেছে—এই নচ্ছার শিশু এমন কাজ করেছে হে অজিত। মজিদের নামে না হয়, ছেলের নামেই এক নম্বর ঠুকে দিয়ে এস। হাবুল ভয়ে তাকাতে পারছিল না। লোকটা খুনী আসামীকে গলা বাঁচিয়ে দিয়েছে, কি এক জাদুর মতো ওর মন্ত্রশক্তি জানা আছে। বস্তুত হাবুলের যখনই ভয় হয় তখনই সে দেখতে পায় এক কালো-কোট-পরা মানুষ তার হাত ধরে মাঠে নিয়ে যাচ্ছে অথবা নদীর পারে এবং ঠেলা দিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে।

বৃষ্টির দিনে সেই কুৎসিত লোকটার মুখও জলের ভিতর ভেসে উঠল। সে দেখল এখন জল ভেঙে কারা পথ ধরে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্য পথে জল জমছিল। মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে হাঁটছে। একটা বুড়ো মানুষের ছাতা উল্টে গেছে। ঝড়ো হাওয়া ছাতাটা অনেক দূরে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। মানুষটা ছাতা ধরতে গিয়ে জলের ভিতর পড়ে গেল। হাবুলের কেন যেন হাসি পাচ্ছিল। বাবাও ছাতা মাথায় আসবেন। জল ভাঙতে হবে বলে এখন কাপড় পরে অফিসে যান। এই বড় শহরে এখন মনে হয় বাবা সেই কালো-কোট-পরা মানুষটার ভয়ে গোপনে চলে এসেছেন। কারণ সে দেখেছে সেই মানুষটা আর এ-বাড়ি আসে না। খোঁজ পায় নি হয়ত। খোঁজ পেলে বুঝি মানুষটা ঝড় জল ভেঙে ছুটে আসত। আর কেন যেন সেই থেকে মা বড় একা নিঃসঙ্গ। মা ওকে যেন তেমন ভালবাসে না। মা ক্রমে ক্ষীণাকার হয়ে গেল। বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওর বলতে ইচ্ছা, মা তুমি ভালো করে হাসো না কেন। মান্টুর মা কি জোরে জোরে হাসতে পারে। মান্টুর মা আমাকে পিঠে পায়েস দেবার সময় কি জোরে গম গম করে কথা বলছিল। প্রাণপ্রাচুর্যের অভাবে তার মা যে কি হয়ে গেল। মনে হয় বাবা মা-কে এক মরুভূমির ভিতর টেনে এনেছে। জল নেই, গাছপালা বৃক্ষ নেই, সেই রহমানের গল্প যেন, এক রক্তশোষক দৈত্য তার মায়ের জীবনের সব প্রাণপ্রাচুর্য হরণ করে নিচ্ছে। সে জানলার ধারে বসে বলতে পারত, মা আমি কোথাও চলে যাব, সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের মত চাঁপাফুল গাছটির সন্ধানে চলে যাব। ওর গল্প মনে হত রহমান দপ্তরীর, মা, আমি সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের সন্ধানে আছি। কি চাই খোকা, চাঁপা ফুল চাই। পাহাড়ে পর্বতে এক ঝরনা, জলে জলে মাঠ নদী বন ভেসে যাচ্ছে। দূরে অনেক দূরে, মাগো, শস্য নেই, গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে,

পত্রপুষ্পহীন মাঠ ঘাট সব। মানুষেরা গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পালিত পুত্র, মাগো, জাদুকরকে বলল, কি হবে? তিনি বললেন, মাগো, তুমি যাও, মাঠ বন নদী পার হয়ে চলে যাও, পাহাড়ে পর্বতে সোনার চাঁপাগাছটি আছে, চলে যাও, ফুল নিয়ে এস, সেই ঝরনার জল নিয়ে এস। ফুলের জল মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে দাও। সব আবার ফুলে ফুলে ভরে যাবে। মানুষেরা আবার গ্রামে ফিরে আসবে।

মাগো, রহমান দপ্তরী বলত, জাদুকরের পালিত পুত্র তার প্রিয় পোষা ময়না পাখী নিয়ে বের হয়ে গেল। পাখী যেদিকে উড়ে যায় পালিত পুত্র সেদিকে যায়। নাম তার মা, জয়নাল। জয়নাল এক পাখীয়ালা মা। সে তার প্রিয় পোষা পাখীটারে নিয়ে উড়ে গেল। কতদূরে কত বন মাঠ পেরিয়ে, কত দিন যায় রাত্রি যায় মা। জয়নাল আর পেঁছাতে পারে না। হাত পা স্থবির হয়ে আসছে। চোখে ঘুম। যেখানে সে বসে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় মনে হয় সে আজ হোক কাল হোক মরে যাবে। কিন্তু জয়নালের মনে, মা, এক কি যেন স্বপ্ন। রহমান দপ্তরী বলত, মানুষের ভালোর জন্য, শস্য ফলানোর জন্য, ফুল ফোটানোর জন্য সে চলে যাচ্ছে। আমিও বড় হলে চলে যাব। সেই জাদুকরের পালিত পুত্রের মত মা আমি চলে যাব। তোমার জন্য, তুমি মা কি যে চাও বুঝি না, আমি বুঝি সেই চাঁপাফুলের সেই জল নিয়ে আসতে পারলে, মা, তুমি ভালো হয়ে যাবে।

মাগো, রহমান দপ্তরী বলত, ঝরনার পাশে গিয়ে দেখল জয়নাল—কি উঁচু জমি, খাড়া পাহাড়, ওঠা দায়, প্রাণ হাতে করে উঠতে হয় মা, পালিত পুত্র মা প্রাণ হাতে করে উঠে গেল। পাহাড়ের মাথায় একটা চাঁপা ফুল গাছ, গাছে একটা ফুল ফুটছে মা আর ঝরনার জলে ঝরে পড়ছে। কোন ফুল ফুটে গাছের ডালে থাকছে না। ফুটছে আর ঝরে যাচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর স্রোত মা জলে। রহমান দপ্তরী বলত মা, জলে পড়ে দুপারের গাছপালা তীরবেগে ছুটছে। কার সাধ্য সেই জলে নেমে যায়। ময়না পাখী জয়নালের মাথায় উড়ছে। জয়নাল হাত তুলে বলল, পাখী আমি কি করি? পাখী বলল, ওপরে উঠে যাও, ডালে উঠে যাও। ফুল নিয়ে জল নিয়ে এস। যেখানে যা কিছু মরুভূমি—জল ছিটিয়ে উর্বরা করে দাও।

জয়নাল গাছের গোড়ায় পেঁছে দেখল, ডালে এক পাখীর মত ফ্রক-পরা মেয়ে। সে গাছের ডালে ফুল তুলতে উঠে গেছে। পড়ে যাবে বুঝি। আর একটু গেলেই ডাল ভেঙে মেয়েটা জলে পড়ে যাবে। কি করি পাখী? ময়না মাথার উপর উড়ছে। তুমি গাছে উঠে যাও জয়নাল। জয়নাল গাছে উঠে গেল। প্রাণ হাতে নিয়ে উঠে গেল। মেয়েটির ফ্রক টেনে ধরল। পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল। নীচে নেমে সেই মেয়ে বড় হয়ে গেল। বনদেবী হয়ে গেল। হাতে চাঁপাফুল। ফুল নাও, জল নাও—যেখানে যা কিছু দুঃখ আছে এই জল নিয়ে ছিটিয়ে দাও। সব দুঃখ উবে যাবে। ভিতরের ময়না পাখীটা কথা বলতে থাকবে। মা, রহমান বলত, এই ভিতরের ময়না পাখী কখন যে কার কোথায় উড়ে যায় বলা দায়। খোকাবাবু, ময়না পাখী উড়ে গেলে আর ফেরে না। খোলা আকাশে উড়ে যাবার লোভ সব পাখীর। মাগো আমি তোমার জন্য চাঁপা ফুল নিয়ে আসব। আজ হোক কাল হোক মাগো তোমার জন্য ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসব।

বস্তুত হাবুলের এই ঘর ভাল লাগত না। বড় শহরে আসার পর থেকেই সে বন্দী হয়ে গেল। স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য ঝি মঙ্গলা আসে। সে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। চারটা বাজলে মা ওকে মাথা আঁচড়ে দেবেন। ফুল-ফল-আঁকা জামা গায়ে দিয়ে দেবেন। তখন দাওয়ায় চুপচাপ সে বসে থাকে। কিছুদূর গেলে পার্ক। সে এখান থেকে সেইসব

পার্কের গাছ-গাছালী দেখতে পায় না। মনে হয় বুঝি পার্কে গেলেই কালো-কোট-পরা মানুষটার সাক্ষাৎ পাবে। সাক্ষাৎ পেলেই বলবে, যাবে একবার আমাদের বাড়ি। আমার বড় দুঃখী মা কেন যেন আর হাসে না। তুমি গেলে মা আমার নিশ্চয়ই হাসবে।

অথবা এও মনে হয় রেল-লাইন পার হলে বড় মাঠ এবং মাঠ পার হলে দীঘির মত পদ্মপুকুর। কত পদ্ম ফুল ফুটে থাকে সেখানে। তারা আর সেখানে যেতে পারবে না। তারা এখন এই বড় শহরের ছোট গলির অপরিসর এক বাড়ির ভিতর। দিনের বেলাতে পর্যন্ত রোদ ও ঠেলা। মার শরীরে যেন ঠাণ্ডা লেগেই থাকে। সারাদিন মা চাদর গায়ে শুয়ে থাকেন। মা রুগ্ন। বাবা সারাদিন বাইরে। একটু পথে চুপি চুপি বের হয়ে গেলেই, বাবার কাছে মার নালিশ, খোকা একা একা আবার পথে বের হয়ে যায়।

মা রুগ্ন। বাবা সারাদিন বাইরে, সন্ধ্যায় বাবা আসেন—তখন বাবাকে দেখলে খুব কষ্ট হয়। বাবা যেন কেবল কি খুঁজছেন। এই সংসারের সব কিছুতে সেই ঝরনার জল ঝরে পড়ুক, বাবা বুঝি মনে মনে এমন চাইছেন। সে একদিন বলেছিল, বাবা তুমি সারাদিন কোথায় থাকো। আমরা এখানে কেন? সেই বড় মাঠ কোথায়? পদ্মবন কোথায়?

বাবা বলতেন, হাবুল, আমরা আর সেখানে যাব না।

—কেন যাবো না বাবা?

বাবা বলতেন, আমরা নূতন বাসা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। বাবা বাকিটুকু বলতেন না।

পাখীটা জলে ভিজছিলো। স্থলপদ্ম গাছটা থেকে পাখীটা ফের উড়ে এসে পাতাবাহারের গাছটায় বসেছে। এই পাখী, হলুদ রঙের পাখীর মতো এক পাখী বুঝি জয়নালের —নাম তার ময়না। সে একবার এই পাখী নিয়ে কোন এক রাজার দেশে চলে গিয়েছিল— রহমান এমন সব গল্প তার কাছে করেছে। এখানে রহমান নেই, স্কুল ছুটি হলে অথবা সন্ধ্যায় যখন গ্রাম মাঠ ডুবে যেত, বাবা যখন হারিকেনের আলোতে পরীক্ষার খাতা দেখতে বসতেন, মার ছাত্রীরা যখন পড়াশোনা করে গ্রামের পথে নেমে যেত তখন রহমান গল্প করে বলত, হাবুল বাবু এবারে খেতে যান, কাল আবার হবে। রহমান যেন তার কাছে সেই জাদুকর, এবং সে নিজে মাঝে মাঝে জয়নাল হয়ে যেত—এবং পাখী দেখলেই পোষ মানানোর ইচ্ছা, সে কতবার রহমানকে বলেছে, আমাকে একটা পাখী দেবে, টিয়াপাখী। আমি পাখী নিয়ে বনে ঢুকে যাব। এখন এই বৃষ্টির দিনে হলুদ রঙের পাখীটা তার কাছে কোন শুভ বার্তার মত। পাখীটা এত কাছে, আর একটু কাছে এলেই হাতের কাছে এসে যায়, সে চুপি চুপি যেন বৃষ্টির জল ধরছে এমন অভিনয় করতে থাকল। সে পাখী দেখছে না, পাতা দেখছে না, ডালপালা এত যে জানলার কাছে—সে-সব কিছুই যেন দেখছে না—কেবল বৃষ্টির জল পড়তে দেখছে। তার দৃষ্টি বৃষ্টির জলের ভিতর। সে পাখীটাকে খপ করে ধরার জন্য প্রায় একটা পুতুল সেজে জানলায় বসে থাকল। কত ছোট পাখী—কি নাম তার, হলুদ রঙ কেন গায়ে—এমন ছোট পাখী টুনটুনি হবে হয়ত, কিন্তু টুনটুনি পাখীর তো হলুদ রঙ হয় না—কেমন ছাই ছাই রঙের। সে একবার দুটো ডিম, লাল নীল রঙের, সংগ্রহ করেছিল। ওরা চড়াইয়ের ডিম কি টুনটুনি পাখীর ডিম সে জানত না। মা ডিম দুটো দেখে চিৎকার করে উঠেছিল, দ্যাখো দ্যাখো হাবুলের কাণ্ড দ্যাখো—কোত্থেকে সাপের ডিম হাতে করে এনেছে। সে সেদিন কিছুতেই মাকে বোঝাতে পারল না, মা সাপের ডিম নয়, পাখীর ডিম। আমি বেগুন গাছের পাতার ভিতরে খুঁজে পেয়েছি। কে কার কথা শোনে, মা তেড়ে এসে

হাত ঝাড়লে ডিম দুটো হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। বালতি বালতি জল ঢেলে সব পরিষ্কার হলে মার কি কান্না। আমার কি হবে! হাবুলের মনে হল মার কেমন সেই থেকে ভয় প্রাণে—মা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করতেন। তবু হাবুলের মনে হয় সে একা একা বেশীদূর না যেতে পারলেও সড়ক পর্যন্ত একা যেতে পারত। সে সেখানে দাঁড়িয়ে মালগাড়ীর শব্দ শুনত—টংলিং টংলিং। সেই শব্দই হাবুলকে কোন্ এক সুদূরের স্বপ্ন দেখাত। সে কোথাও আজ হোক কাল হোক চলে যাবে এমন ভাবত।

পাখীটা জলে ভিজছিল। হাবুলের ইচ্ছা হল পাখীটার মত জলে ভিজতে। সে দুবার চেষ্টা করেছে খপ করে ধরার জন্য, কিন্তু সে ধরতে পারেনি। পাখীটা উড়ে গিয়ে এমন ডালে বসেছে যে হাতের নাগালে আর তা কিছুতে আসে না। ওর মনে হল বরং দুটো পাট খুলে দিলে, কিছু খুদকুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে খাবার লোভে পাখী ভিতরে চলে আসবে। সে বিছানার দিকে চোখ তুলে তাকাল, মা চাদর দিয়ে চোখমুখ ঢেকে রেখেছেন। সে তাড়াতাড়ি সামান্য চাল এনে ছড়িয়ে দিল, তারপর হাত তুলে যেমন পোষা ময়নাকে জয়নাল হাতে তালি বাজালে পাখী উড়ে এসে মাথায় বসত, বুঝি এই পাখী হাতে তালি বাজালে মাথায় এসে উড়ে না বসুক, অন্তত চাল খেতে ঢুকে পড়বে। ঢুকে পড়লেই জানলা বন্ধ করে দেবে, আলো জেবলে দেবে এবং আলো জবাললেই চোখে ধাঁধা দেখবে পাখীটা।

কিন্তু হলুদ রঙের পাখীটা গাছের ডালেই নাচতে থাকল। বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে গান গাইতে থাকলো। চিরিপ চিরিপ। চড়ুই পাখীর মত ডাকছে। ওর হাতের তালি অথবা খাদ্যবস্তু কিছুই দেখল না। এখন একমাত্র পথ দরজা খুলে বাইরে বের হওয়া। তারপর সামনে থেকে তাড়া করলে পিছনের জানলা দিয়ে পালানোর জন্য ফুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু দরজা খোলা যাবে না। মা দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। ভয়ে, কারণ হাবুল দরজা খোলা পেলেই পালিয়ে সেই পার্কটার উদ্দেশে যাবার জন্য—অথবা তার সেই ফুল ফলের দেশ এখন কোথায়—কতদূর গেলে সেই টংলিং টংলিং শব্দ শুনতে পাবে—তার জন্য হাবুল চুপি চুপি ঘর থেকে পালাতে চায়। দরজা খোলা থাকলে হয়ত হাবুল হেঁটে হেঁটে বড় রাস্তায় চলে যাবে। মোড় পার হলেই বড় রাস্তা—তারপর, ট্রামগাড়ী, বাসগাড়ী। হাবুল খুব ছোট, সে শহরের বড় রাস্তা একা পার হতে পারে না। মা বুঝি তাই কেবল দরজা বন্ধ করে রাখেন। হাবুল জানালায় বসে থাকে। তখন হাবুলকে বড় দুঃখী হাবুল মনে হয়।

সেই পাখীটা উড়ে চলে গেল—হাবুল মাকে উদ্দেশ করে চেঁচাল, মা বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

মা চাদর থেকে মুখ বার করে বললেন, জানলায় বসো না হাবুল। বৃষ্টির ছাঁট এসে তোমায় ভিজিয়ে দেবে।

হাবুল বলল, জানো মা, মোড়ের ওদিকটায় একটা শিবমন্দির আছে। তার পাশে বড় একটা শিমুল গাছ আছে। সেখানে হেঁটে গেলে—জানো মা, একটা বড় পুকুর আছে।

মা বললেন,—তাই বুঝি!

—হ্যাঁ মা। কাল আমি আর সান্টু গিয়েছিলাম।

মা এবার ধমক দিলেন,—হাবুল তোমাকে কতবার বলেছি তুমি সান্টুর সংগে যাবে না। জলে নামবে না।

—কেন মা? জলে গেলে কি হবে? সান্টু জল থেকে বড় দুটো কাঁকড়া ধরেছিল।

হাবুলের ফের সেই বড় পদ্মবনের কথা মনে পড়ছিল। মা দুপুরে ঘুমোচ্ছেন, বাবা

স্কুল ছুটি বলে ট্রেনে চড়ে ছোট শহরে গেছেন। হাবুল চুপি চুপি দরজা খুলে বারান্দায় নেমে যেত। তারপর উঁকি দিত চারপাশে—না কেউ নেই, হাবুলকে কেউ দেখছে না। সে পাশের বাড়ির বড় বিনুকে নিয়ে মাঠ পার হয়ে ছুটত। পথে নগেন মাঝি দেখে বলত, ও বাবা তোমরা। এ-পথে! নগেন মাঝি ওদের ধরে নিয়ে আসত। বলত, দিদিমণি, দ্যাখো তোমাদের ছেলেরা এই ভরদুপুরে লাইন পার হয়ে কোথায় যাচ্ছিল।

মা বলতেন, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে হাবুল?

—মা আমরা পদ্মপুকুরে যাব ভাবছিলাম।

—সেখানে কি আছে?

—বিনু বলেছে, মা, সেখানে পদ্মফুল আছে, ফুলে মধু আছে।

—কিন্তু বিনু বলেনি, জলে বড় একটা শেকল আছে?

—কিসের শেকল মা?

—এক দৈত্যের শেকল। বড় এক দৈত্য, তার দুই শিঙ। জলের নিচে স্ফটিকের স্তম্ভ। সে তার ঘরে বড় শেকল নিয়ে বসে থাকে। জলে নামলে ধরে নেয়।

—দৈত্য কি মা! রহমান দৈত্যের কথা বলেছে। কিন্তু সে কি বস্তু রাক্ষসের মত, না ভূতের মত! রাক্ষস অথবা ভূত সে যেন চিনতে পারে, দৈত্য চিনতে ওর কষ্ট হয়।

—দৈত্য দেখতে রাক্ষসের মত। রাক্ষসের শিঙ থাকে না। দৈত্যের দুই শিঙ থাকে। বড়ো বড়ো দাঁত। মানুষ পেলে ধরে খায়।

—বাবাকে দৈত্যরা ভয় পাবে না, মা?

—তোমার বাবাকে পায়। কিন্তু তোমাকে পাবে কেন হাবুল। তুমি কোনদিন একা বিনুর সঙ্গে পদ্মপুকুরে যাবে না। সেখানে পদ্মবনের দৈত্য এক শেকল ছেড়ে দিয়েছে। জলের ভিতর শেকলটা চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। কচিকাঁচা কেউ জলে নেমে গেলে, চুপি চুপি শেকলের মুখটা পারের দিকে উঠে আসে। তারপর ধরে নিয়ে যায় তাকে। জলের তলায় ওদের ঘর আছে।

—আমি সাঁতরে চলে আসব মা।

মা-র মুখে কেমন বিষণ্ণ করুণ হাসি ফুটে উঠল। হাবুল মাকে দেখছিল—মা, তার মা রুগ্ন এবং দিন দিন কি এক ভাবনা যেন মাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই লোকটাকে খবর দিলে হয়, সে চলে এলে মা আবার হা হা করে হাসতে পারবে। কালো-কোট-পরা মানুষটার হাতে পায়ে অথবা মুখে কি এক জাদুর খেলা—সে এলেই বুঝি নিরাপদ এ-সংসার—সে মাকে বলল, মা আমাকে সান্টু বলেছে, দীঘির পাড়ে বড় এক হরতকী গাছ আছে, গাছের নিচে হরতকী পড়ে থাকে, সান্টু রোজ দীঘির জল সাঁতরে পার হয়ে যায়, ওর পিসিমা হরতকী খায়। হরতকী খেলে কোন রোগ হয় না, রোগ থাকলে তা সেরে যায়।

মা এবারে হাসলেন। সেই এক বিষণ্ণ হাসি। এটা হাসি কি কান্না মাঝে মাঝে হাবুল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মা এবার চাদরে মুখ ঢেকে দেবার সময় বললেন, আগে সাঁতার শেখো। সাঁতার না শিখলে দীঘির জল পার হওয়া যায় না।

হাবুল কতদিন ভেবেছিলো সাঁতার শিখবে। ওর জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটার ইচ্ছা কতদিনের। কতদিন সে বাবাকে বলেছে, বাবা, আমাকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যাবে? বাবার মুখ তখন বড় বিব্রত দেখাতো। হাবুলের মনে হয় এখন, বাবা নিজেই সাঁতার শেখেনি। সাঁতার শিখলে বুঝি নিরাপদ সংসারে সাপ বাঘের মুখ উঁকি দেয় না। এখন তো বাবা

সারাদিনই বাইরে থাকেন। ঝি মঙ্গলা কাজ করে দিয়ে চলে যায়। মা সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকেন। রাত্রে মাস্টারমশাই এসে হাবুলকে পড়িয়ে যান। ভোরে, হাবুল মা-র কাছে বসে থাকে, মা তাকে অঙ্ক দেন, হাবুল অঙ্ক শেষ করে ফের এসে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের পাতাবাহারের গাছ পার হলে স্থলপদ্মের গাছ, রাজ্যের পাখীরা খেলা করতে আসে, বন্দী হাবুল এই জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের যাবতীয় অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখতে দেখতে—এই যেমন রোদ ওঠা, সূর্য ডুবে যাওয়া, পাখ-পাখালির শব্দ শোনা এবং আকাশ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাওয়া; বাবা কিছু কিছু নক্ষত্রের নাম জানত, বাড়ি ফিরে হাবুলকে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বলত, এস হাবুল, আমি তোমাকে আজ ধ্রুবতারা দেখাব। সংসারে বিচ্ছিন্ন ঘটনা সব ঘটে যাচ্ছে, তবু বাবা হাবুলের হাত ধরে জানলায় দাঁড়িয়ে বলতেন, দ্যাখো ঐ হচ্ছে আমাদের ধ্রুবতারা। অথবা হাবুলের বইয়ে যে কালপুরুষ রয়েছে সেই ছবি আবিষ্কার করার সময় আকাশের সারা গায়ে নক্ষত্র খুঁজে খুঁজে বাবা যেন সময় কাটিয়ে দিতেন। হাবুলের বড় কষ্ট হত তখন, বাবা, মা ভাল হয়ে উঠছে না কেন, মা-র কি হয়েছে প্রশ্ন করার ইচ্ছা জাগত।

বিকেলে ছুটির দিনে বাবা হাবুলকে গড়ের মাঠে নিয়ে যান। অন্যদিন এই বিকেলে, জানলায় শুধু সামনের পাতাবাহারের গাছটায় একটা হলুদ রঙের পাখী দেখতে দেখতে কেমন সে শুধু তন্ময় হয়ে যায়। তার সেই ছোট্ট গ্রাম মাঠের কথা মনে হয়। ফুল ফলের কথা মনে হয়। আর জল দেখলে মা-র সেই ভয়ের শেকলটার কথা মনে হয়। যেন মা সব সময় তার চোখের ওপর একটা কালো কোটের ছবি ঝুলিয়ে রাখতে চান। একবার নদীতে নৌকায় সে মা-র সঙ্গে অনেকদূর গিয়েছিল, সেখানেও মা হাবুল জলে উঁকি দিলে বলতেন তুমি হাবুল জলে পড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রঙের শেকলটা তোমাকে টেনে নেবে। হাবুলেরও সেই ঘন কালো রঙের জলের গভীরে মনে হয়েছিল—বুঝি পাতালে ডুব দিলেই সেই দৈত্যপুরী চোখে ভেসে উঠবে। সে ভয়ে জলে আর হাত ডোবায়নি। কেবল মনে হচ্ছিল পাতালের দৈত্যপুরীতে শেকলটা শুয়ে আছে, যেন দেখছে জলের ধারে কোন কচিকাঁচা কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে কিনা।

রাত হলে সে বাবাকে বলেছিল, বাবা, আমাদের স্কুলের পুকুরটাতে শেকল ছিল?

বাবা বলেছিলেন, শেকল কি আবার?

—মা যে বলে, জলের নিচে দৈত্য থাকে, তার এক পোষা শেকল আছে।

বাবা বুঝেছিলেন, হাবুলকে মা ভয় দেখাচ্ছে। হাবুল সাঁতার জানে না। একা একা হাবুল কেবল নিরুদ্দেশ হতে চায়। একা একা হাবুল যেন পুকুরে চলে না যায়—তাই বাবা গম্ভীর সুরে বললেন, হ্যাঁ হাবুল, তুমি একা একা যাবে না। পুকুরে মস্ত বড় শেকল থাকে।

আর কিনা সে এই বড় শহরে এসে পর্যন্ত একটা পুকুর আবিষ্কার করে ফেলেছে। সান্টু একদিন শিবমন্দিরের পথ ধরে বড়ো এক পুকুরের পাড়ে এনে হাজির করেছিল। কি কারণে সেদিন সকাল সকাল ছুটি। সান্টু দারোয়ানকে বলে হাবুলকে বের করে এনেছিল। পুকুরটায় যেতে হলে প্রথম এক রাজবাড়ির দেউড়ি পড়ে। তারপর পুরোনো ভাঙা দেয়াল, ভিজে মাটি, কিছু বিদেশী ফুলের গাছ এবং লতাপাতা—যেন ওরা ইচ্ছা করলে এখন এক বনঝোপের ভিতর ঢুকে লুকোচুরি খেলতে পারে। হাবুল এই বড় শহরে এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়ে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিকেল হলেই সে ছটফট করত।

মা আমি যাব, এখন আর বৃষ্টি নেই। মা, সান্টু বলেছে, সে আমাকে একদিন দূরের পার্কটায়ও নিয়ে যাবে।

—না, তুমি যাবে না হাবুল। সান্টুর সঙ্গে গেলে বাবা রাগ করবেন।

—মা, সান্টুরা কতদিন ধরে এই শহরে থাকে। সান্টু পথ চিনে হাঁটতে পারে। সান্টু আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে।

—তোমার বাবা এলে বলে দেব হাবুল। তিনি খুব রাগ করবেন।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল। হলুদ রঙের পাখীটা উড়ে গেছে। এখন ভাদ্র মাস। কখনও বৃষ্টি, কখনও মেঘ। কখনও আকাশে এতটুকু মেঘ থাকে না। আবার কোথা থেকে সব মেঘেরা উড়ে আসে। আকাশ ঢেকে দেয়। ঘন বৃষ্টি হয়। গাছগুলো বৃষ্টির জলে স্নান করে বড় তকতকে হয়ে ওঠে। তখন পথ-ঘাট বড় পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সারা শহরময় রোদ। মনেই হয় না—কিছুক্ষণ আগে জল পড়ে এই শহর ডুবে ছিল। তখন বাইরের পৃথিবীতে ছুটতে পারে না বলে হাবুলের বড় অভিমান হয়, মা-র ওপর অভিমানে ওর চোখে জল আসে। যেন মা-র এই অসুখ—যা কিছুতেই সারছে না, যা সেরে গেলে মা তাকে নিয়ে যেতে পারত সামনের পার্কটায় অথবা সেই রাজবাড়ির দেউড়ি পার হয়ে—কত যে বনঝোপ আছে, সেখানে—যেন অসুখ সেরে গেলেই সে আর এই ঘরে বন্দী থাকবে না, মা-র মনে হবে—সব সময়ই কোথাও না কোথাও ফুল ফুটছে সুতরাং হাবুল এবার ঘর ছেড়ে রোদ্দুরে বের হয়ে পড়ুক। মাকে সে আজ হোক কাল হোক নিরাময় করে তুলবে। এই যে হলুদ পাখীটা এসে পাতাবাহারের গাছটায় বসে থেকে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়—যেন এই পাখীটা ইচ্ছা করলেই জয়নালের সেই জাদুর পাখী হয়ে যেতে পারে এবং চাঁপাফুল নিয়ে আসতে পারে, চাঁপাফুলের গন্ধে মা তার এই সৌরভময় সংসারে হাসিমুখটি তুলে ধরলে বুঝি বাবার আর কোন কষ্ট থাকত না। সে মনে মনে বলল, পাখী, তোমাকে আজ হোক কাল হোক নিয়ে চলে যাব। সেই রাজবাড়ির দেউড়ি পার হলেই চাঁপাফুলের গাছটি আছে। আমি সেখান থেকে মায়ের জন্য ফুল তুলে আনব। মা-কে নিরাময় করে তুলব।

মা বিছানায় শুয়ে দেখতে পেলেন, হাবুল বড় একা, নিঃসঙ্গ। সে জানলা দিয়ে শুধু এখন আকাশ দেখছে। চারিদিকে আনন্দ, চারিদিকে ফুল ফল পাখীর মেলা, মানুষের মিছিল। শুধু হাবুল চুপচাপ ঘরের ভিতর বসে আছে। মা-র ভিতরে ভিতরে বড় কষ্ট হতে থাকল। তিনি বললেন, যাও হাবুল, দ্যাখো আমার শিয়রে চাবি আছে, দরজা খুলে চলে যাও। কিন্তু সান্টুকে বলবে, তোমাকে যেন সে সাবধানে পথ পার করে দেয়। তোমরা কিন্তু সেই পুকুরে যাবে না।

—না মা, আমি পুকুরে যাব না। বলে, দরজা খুলে ছুট। ঠিক রাস্তার মোড়ে মৃত এক দেবদারু গাছ, গাছের নিচে সান্টু দাঁড়িয়ে আছে। সে দূর থেকেই চিৎকার করে বলল, সান্টু, আমি এসে গেছি।

সান্টু বলল, যাবি? সেই রাজবাড়িতে, সদর দেউড়ি পার হলে ভিতরে পুরানো দেয়াল, ভাঙা পাঁচিল, ফাঁকে ফোঁকরে ইঁদুরের গর্ত—যাবি? ঝোপজঙ্গলে আমরা হারিয়ে যাব। অথবা যেন বলার ইচ্ছা সান্টুর সেই চাঁপাফুলের গাছটা সদর দেউড়ি পার হলে অনেক ভিতরে বড় এক দীঘির মত জলাশয়, জলাশয় পার হলে চাঁপাফুলের গাছ, গাছ থেকে নিরন্তর এক দুই করে চাঁপাফুল ঝরে পড়ছে।

হাবুল বলল, মা জলে যেতে বারণ করেছে। জলে শেকল আছে। জলে নামলেই

শেকল এসে আমার পা জড়িয়ে ধরবে।

—শেকল! সে আবার কিরে?

হাবুল প্রায় বিস্মিত হল। এত বড় একটা সত্য ঘটনা সান্টুর জানা নেই, সে এতবড় শহরের সব জায়গায় চলে যেতে পারে—আর এমন খবর সে রাখে না—ভাবতে অবাক, হাবুল সুতরাং সবটা খুলে বলল, জলের নিচে স্ফটিকস্তম্ভ, ভিতরে ভ্রমর, তার অন্তরে এক পাখীর মত প্রাণ বাস করে। আরো কি সব বলতে সান্টু এক ধমক, দূর বোকা, তোর মা তোকে অযথা ভয় দেখিয়েছে। চল যাবি। আমি জলে নেমে দেখাবো, জলে শেকল থাকে না, দৈত্য থাকে না। দেখবি দীঘির অন্য পাড়ে কত রকমের গাছ আছে, ফুলের গাছ, ফলের গাছ। আমি পিসিমার জন্য হরতকী ফল নিয়ে আসি।

—হরতকী আনবি?

—হরতকী খেলে শরীর ভাল থাকে। আমার পিসিমা রোজ খেয়ে উঠে হরতকী খান। ও'র কোন অসুখ নেই।

—আমাকে একটা দিবি? মাকে আমি একটা হরতকী দেব। তবে আমার মা-ও হরতকী খেলে ভাল হয়ে উঠবে।

ওরা রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এল, দেউড়িতে দারোয়ান। সান্টু দারোয়ানকে বলল, আমরা ভিতরে যাব।

দারোয়ান বলল, ভিতরে কি আছে?

—ভিতরে একটা হরতকী গাছ আছে। আমরা দুজনে দুটো হরতকী নেব। ওর মা-র অসুখ, হরতকী খেলে ওর মা ভাল হয়ে যাবে।

হাবুল ভয়ে বলতে পারল না, সেই চাঁপাফুল গাছটা আছে না, আমরা সেখানেও যাব। চাঁপাফুল তুলে আনব।

চাঁপা ফুল নেবে—এ-কথা জানতে পারলেই আর দারোয়ান ঢুকতে দেবে না—ওরা শুধু হরতকীর কথাই বলল।

দারোয়ান লোহার দরজা খুলে দিল। চোখে কালো চশমা, উর্দিপরা দারোয়ান, মাথায় লাল পালকের টুপি, হাতে গাদা বন্দুক, কোমরের পাশে তরবারি ঝুলছে।

হাবুল বলল, সান্টু, আমার ভয় করছে।

—ভয় কি রে? এখানে কেউ এখন থাকে না। রাজা মোকদ্দমা করতে সেই যে বিলাতে গেছে আর ফিরে আসেনি।

—আর আসবে না?

—মোকদ্দমা শেষ না হলে আসে কি করে?

ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল সেই সব পুরানো ভাঙা দেয়ালের মাথায় বড় বড় সব অশ্বত্থ গাছ, গাছে রাজ্যের সব পাখী এসে জড় হয়েছে। বাড়ির ইঁট কাঠ সব ভেঙে পড়ছে। শার্শি দিয়ে প্রাসাদের ভিতরটা দেখা যায়। বড় বড় আয়নায় সূর্যের আলো এসে পড়ছে আর সব বাড়িটা যেন আগুনে জ্বলছিল। ওরা ছুটে ছুটে পিছনের দিকে যাচ্ছিল। যাবার সময় দেখল—বাড়ির পিছন দিকটাতে একটা ঈগল পাখী বসে রয়েছে।

সান্টু বলল, বুঝলি হাবুল, এই পাখী উড়ে গেলেই রাজার মোকদ্দমা শেষ হয়ে যাবে।

—কি যে আজগুবি বলিস না তুই।

—তোকে সেই সাপের ডিম, বাঘের ডিম এসব গল্প কে বলে রে?

—কে বলবে আবার, আমার মা বলে।

—পাখী উড়ে গেলে মোকদ্দমা শেষ—আমার পিসিমা বলে।

হাবুল ঠোঁট ওল্টাল। ওর মন্দ লাগছিল না। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের পাশে ছোট ছোট ঘর। ঘরের ভিতর এখনও দু' একজন প্রবাসী পুরুষের মুখ, লম্বা দাড়ি। ওরা কিছু হলঘর পার হয়ে এল। কোন মানুষ নেই। তারপর সেই ঝোপের মত জায়গাটা, পাশে বড় দীঘি। দীঘির উত্তর পাড়ে শুধু একটা কাঠের বেড়া। বেড়ার ফোকরে একটা কালো-কোট-পরা হাত। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা হাত। হাতে বঁড়শি। যেন বেড়ার ও-পাশ থেকে চুরি করে মাছ ধরছে।

হাবুল এবার চেঁচিয়ে উঠল, আমি বলে দেব। তুমি চুরি করে মাছ ধরছ, আমি বুঝি মনে কর কিছু বুঝি না।

আর কি অবাক সে, হাতের আঙুলগুলো নড়তে চড়তে দেখল এবং হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সান্টু বলল,—কিরে তুই চিৎকার করছিস কেন?

—একটা হাত দেখলি কেমন পালিয়ে গেল।

সান্টু বলল,—কোথায়?

—ঐ যে ও দিকটায়।

—ওমা ওটা একটা কালো বেড়াল। লাফ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

হাবুলের বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপছে। কে যেন আবার ওকে বড় মাঠে নিয়ে যেতে চায়। হাবুল কিছুতেই আর পুকুরের পাড়ে পাড়ে হাঁটছে না। এই কালো জলের ভিতর থেকে একটা শিকল ঠিক সাপের মত উঠে আসবে এবং পায়ে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু অবাক, সান্টু প্যান্ট খুলে জলে নেমে গেছে। সে কেমন চিৎ হয়ে উপুড় হয়ে সাঁতার কাটছে। কোথায় সেই শেকল, কালো বেড়ালের মুখ অথবা......অথবা—এই কি হচ্ছে, কি রে তুই, কি করছিস? সান্টু জল থেকেই চিৎকার করতে লাগল।

তুমি বড় বাহাদুরি নিচ্ছ সান্টু। আমিও জানি। তুমি পানকৌড়ির মত ডুবে ডুবে বাহবা দেখাবে আর আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখব। হাবুল ডাকল, আমিও সাঁতার কাটতে জানি। ওপারে গেলেই আমি হরতকী পাব। চাঁপাফুলের গাছ পাব। হাবুল সেই কবিতার কথা মনে করতে পারল। 'জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার।' সব এতদিন তাকে ভয় দেখিয়ে ঘরে বেঁধে রেখেছিল। জলের ভয়, কালো কোটের ভয় এবং দূরে এক মাঠ আছে, মাঠ পার হলে ফেরা যায় না এমন ভয় দেখিয়ে ঘরের বার হতে দেয়নি। হাবুল এবার ভয়ের কথা ভুলে গেল, ঘরে ফেরার কথা ভুলে গেল। সে জলে নেমে গেল ওপারে ওঠার জন্য। ওপারে গিয়ে উঠতে পারলেই সেই অমৃতফল। ফল নিয়ে যেতে পারলে মা-র আর কষ্ট থাকবে না। মা-র জন্য জলের ভিতরে সে হরতকী ফলটা ধরতে গেল। ফলটা ফুল হয়ে গেল, চাঁপা ফুল, তারপর কালো বেড়ালের মুখ হয়ে গেল এবং মনে হল অবশেষে একটা কালো-কোট-পরা হাত ওর দুপায়ে জড়িয়ে ধরেছে। ওকে জলের নিচে ক্রমে সকলে মিলে টেনে নিচ্ছে। সে ক্রমশ কিছু আর দেখতে পাচ্ছিল না। কেবল বিকেলের হলুদ পাখীটা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—সে বিকেলের হলুদ পাখীটাকে জলের নিচে ধরার জন্য ছটফট করতে লাগল।

আধুনিক সাহিত্য

যে কোনো দেশের কবিতার মতোই সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতাও প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত। প্রথম ধারাটি অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রাভিমুখী, এবং আপাতদৃষ্টিতে নিস্তরঙ্গ; দ্বিতীয় ধারায় শুধু নানা ধরনের টানাপোড়েন, স্রোতোবিভঙ্গ, উৎকেন্দ্রিকতা। যাঁরা দ্বিতীয় ধারাটিকে ফেনোচ্ছ্বল কবিত্বচর্চা বলে সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দেন, তাঁরা যেমন একদেশ-দর্শী, প্রথমোক্ত কবিতাকে যাঁরা রক্ষণশীলতার সঙ্গে এক করে ফেলেন, তাঁরাও সমানুপাতিক-ভাবে দোষী। কবিতা যখন শুধুমাত্র বাঁধা-বুলির ময়না হয়ে ওঠে, তখন দ্বিতীয় ধারার কবিতাকে ভালোমনে গ্রহণ না করে উপায় থাকে না; পক্ষান্তরে, মাইক-ফাটানো বালালোল বা তাল-মান-ছাড়া, হাত-পা-ছোঁড়া কবিতা যদি ফ্যাশন-দুরস্ত সংস্কৃতির নামে চলে যায়, তাহলে অপেক্ষাকৃত শান্তশিষ্ট কবিতাই সমধিক শ্লাঘনীয় মনে হবে। বস্তুত, কবিতা যে একই সঙ্গে দ্বিধারায় প্রবাহিত হতে পারে, এবং তাতে ক্ষতির বদলে লাভের অঙ্কই যে বেশি, তার প্রমাণ আমাদের সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা। আরো একটি প্রমাণ হলো হাল আমলের আমেরিকান কবিতা।

পল ক্যারল সম্পাদিত সংকলন-গ্রন্থটি* পড়ে আমার এই ধারণা আরো দৃঢ়মূল হলো। যাঁরা প্রথমোক্ত ধারায় বিশ্বাসী, তাঁরা কেউ নীতিবাগীশ, নিয়মতান্ত্রিক কবি নন;—এঁরা যে নিম্নস্বর, সংকেতনির্ভর কবিতা লিখছেন তার পেছনে একধরনের বিশ্বাস এবং কবিতার আদর্শ কাজ করছে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ধারায় যাঁরা সফল লেখক, তাঁরাও শুধু উপপ্লবের জন্যে উপপ্লবে বিশ্বাসী নন। অর্থাৎ, তাবৎ বিদ্রোহ ও অনিয়মকে এঁরা কবিতায় পৌঁছে দিতে পেরেছেন, এবং এখানেই এঁদের কৃতিত্ব। অবশ্য, এই দুই ধারায় এমন অনেক কবিযশঃপ্রার্থী আছেন, যাঁরা এই বিভাজিত-আদর্শকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ ক'রে হতশ্রী যা-খুশি-তাই রচনা করেছেন। ফলত, এঁদের শান্ত কবিতা শুধু নিরুপদ্রব শব্দসমষ্টি, এবং—এঁদের অস্থির কবিতা হাফ-আখড়াইয়ের সঙ্গে চৌখস চালিয়াতির সমাহার।

এই বইটি সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, আমন্ত্রিত চুয়ান্নজন কবির মধ্যে বারো আনা কবিতালেখকের বয়স আটাশ থেকে ত্রিশের অন্তর্বর্তী; ত্রিশের ওপরে এবং পঁচিশের নিচে যাঁরা আছেন, তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। সবাই নবীন, এবং অনেকেই নবাগত। এক কথায়, আমেরিকার ষাটের কবি। বইটি উল্টোতে উল্টোতে, দুজন কবিতালেখকের (?) রচনাসমষ্টি প্রথমেই চোখে পড়েছিলো। এঁদের মধ্যে একজন হ'লেন সারোয়েন-নন্দন অ্যারাম সারোয়েন, যাঁর প্রথম তিনটি কবিতা পুরোপুরিই আপনাদের উপহার দেয়া চলে। প্রথম কবিতাটিতে শুধু একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: oxygen। একটি শাদা পৃষ্ঠার প্রায় মাঝখানে এই শব্দটি বা কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রায় একইভাবে দ্বিতীয় কবিতাটি সুবিন্যস্ত: wire air। চতুর্থ কবিতাটিতে দুটি শব্দ ওপর নিচে সাজানো, এবং শব্দ দুটি হলো 'table' এবং 'ambulance'। অ্যারামের দীর্ঘতম কবিতাটির দৈর্ঘ্য অবশ্য একপৃষ্ঠা কিন্তু প্রস্থ তুলনামূলকভাবে অকিঞ্চিৎকর; পুরো পৃষ্ঠাটির একেবারে

ডানদিকে বল্মীকপুঞ্জ বা গ্রীক স্তম্ভের মতো সাজানো আছে 'cricket' শব্দটি। কবিতায় মিতকথনের ঐতিহ্য অবশ্য যথেষ্টই পুরনো; জাপানি তান্‌কা বা হাইকু থেকে উনগারেত্তির কবিতা, পাউন্ডের 'মেট্রো' বা 'গংগুলা', আপোলেনিয়রের ও আরাগঁর কোনো কোনো কবিতা, এমনকি রবার্ট ক্রিলির মিতায়ত কবিতাও আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু অ্যারামের কবিতায়(?) কোনো ঘটনাংশ, স্মৃতি বা নাটকের ছায়াপাত নেই—এমন কোনো বীজ-মন্ত্র নেই যাকে অনুরণিত ক'রে নেয়া যায় আমাদের অন্তঃস্থলে। সব মিলিয়ে মনে হয়, কেমন যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি। অ্যারাম সারোয়েন তো তবু শব্দ রচনা করেছেন, রিচার্ড কোস্তেলানেৎস আবার বাহুল্যবোধে এই বিষয়টিকেই পুরোপুরি বর্জন করেছেন। কোস্তেলানেৎসের প্রতিটি রচনার নামই হলো 'Tribute to Henry Ford'—প্রথমটি রচিত হয়েছে "T" অক্ষরটিকে তিন সারিতে ছড়িয়ে, দ্বিতীয়টিতে "T"-র বদলে 'A', এবং তৃতীয়টিতে এই দুটি অক্ষর বিভিন্ন রেখায় ও আবর্তে সমস্ত পৃষ্ঠায় আস্তীর্ণ হ'য়ে আছে। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে—এই ব্যাপারটিকেই কি কোস্তেলানেৎস শব্দচিত্রে বোঝাতে চাইছেন, নাকি তৃতীয় কবিতার (?) সাহায্যে বলতে চাইছেন 'AT"-শব্দটিই কতো বিভ্রান্তিকর? তা যদি হয়, তাহলে কবিতা হিসেবে তাঁর রচনা ব্যর্থ তো বটেই, ছবি হিসেবেও ততোধিক ব্যর্থ। জার্মান কবি মর্গেনস্টাইনের 'মাঝরাত্রে মাছের গানে'-ও একই ভঙ্গীতে লেখা, কিন্তু পুরো কবিতাটাই যে ব্যঙের ছলে তৈরী, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন? যা কিছু চৈতন্যের উন্মীলক, তাই তো বরণীয়, এবং তাই তো কবিতা—হোক না তা দুলাইনের সংকেত, রেখারঙের ডিগ্‌বাজি, পর্দার ডিজাইন, বা টেবিলের ওপরে চায়ের পেয়ালা। উত্তর হলো—হ্যাঁ, কিন্তু সব কিছুতেই যে চৈতন্যের উন্মীলন ঘটে তা বলা চলে কিভাবে? আর কবিতা বা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে এই দাবিটি যিনি সর্বাগ্রে জানাবেন, সেই লেখক বা শিল্পী তো অনায়াসেই ভণ্ডামি ক'রে আমাদের ঠকাতে পারেন। অর্থাৎ, কার চৈতন্যের উন্মীলন? দ্বিতীয়ত, চৈতন্যের উন্মীলন হয়তো সমস্ত অভিজ্ঞতার শেষ কথা—কিন্তু ক্ষেত্রভেদে তার অভিব্যক্তিভেদ ঘটবে না কেন? আমরা তো ধ্যানযোগেও এই উন্মীলন ঘটাতে পারি। তাহলে আর শিল্পচর্চা কেন? কেন ললিত-কলা অ্যাকাডেমি? কেন পত্রিকা? কেন কবিতা প্রকাশ এবং শিল্প-প্রদর্শনী? তৃতীয়ত, শব্দের ক্ষমতা বা শব্দসমষ্টির ক্ষমতা কি নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে? এখনো কি শব্দগুচ্ছ থেকে বেরিয়ে আসে না অমোঘ ব্যঞ্জনা, বা অব্যর্থ অভিঘাত? যদি কেউ শব্দার্থের বিরোধিতা ক'রেও মালার্মের মতো শব্দনির্ভর, প্রতীকী কবিতা লেখেন, কেউ যদি বাক্যাংশের হাত-পা এপাশ-ওপাশে সরিয়েও কামিংসের মতো প্রেমোজ্জ্বল পদ্য রচনা করেন, তাহ'লে আমাদের আপত্তি নেই। এই মুহূর্তে বলে নিই যে, অ্যারাম সারোয়েন বা কোস্তোলানেৎসের রচনাকর্ম এবং আরো দু-একটি অনুরূপ পদ্যকে দ্বিতীয় ধারার নঙর্থক উদাহরণ হিসেবেই আলোচনা করা হলো। এই ধারাতেই এমন অনেক কবিতা স্থান পেয়েছে যেখানে নানাবিধ নিরীক্ষা শেষাবধি কবিতায় উৎরে গেছে। যেমন, ধরা যাক, ডায়ান ওয়াকস্কির কবিতা। এই তরুণীটির ফোটোগ্রাফ দেখে ওঁকে সঙ্গে সঙ্গেই হিংস্র, অত্যাধুনিক, কোনো বীটবংশীয়া ব'লে মনে হ'তে পারে, ওঁর 'A child, a wasp, and an apricot tree' কবিতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় তিনটি ছোটো ছোটো ছবির ব্লকও ছাপানো হয়েছে, এতৎসত্ত্বেও, কবিতাটি যে সর্বাংশেই কবিতা তা খুব সহজেই বোঝা যায়। উদাহরণ:

What is there we do not know about death

that cannot be pulled out of our mouths
like a long white ribbon, stretching
and stretching
out
beyond our own senses?
A bird pulling a worm out of the ground.
It is burrowed there inside,
living alone in the dark.'

উল্‌টো দিকে, প্রথমোক্ত ধারায় যাঁর প্রায় সব কবিতাই আমার ভালো লাগলো, তিনি হ'লেন জেমস টেইট। আগাগোড়া মার্জিত শব্দ, এবং প্রায় বাঁধা-ধরা ছন্দ ব্যবহার ক'রেও যে প্রথম শ্রেণীর কবিতা লেখা চলে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জেমস টেইটের কবিতা। 'The Lost Pilot' কবিতাটিতে, যুদ্ধে নিহত নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গে অভিমান-শ্রদ্ধা-বিচ্ছেদ-মেশানো এক আশ্চর্য অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে:

But your face did not rot
like the others—it grew dark,
and hard like ebony;
the features progressed in their

distinction. If I could cajole
you to come back for an evening,
down from your compulsive

orbiting, I would touch you,
read your face as Dallas,
your hoodlum gunner, now,

with the blistered eyes, reads
his braille editions. I would
touch your face as a disinterested

scholar touches an original page.'

এই ধারারই আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন চার্লস সিমিক। উল্লেখ করতে বাধা নেই যে সিকিমের ফোটো দেখে মনে হ'তে পারে যে তিনি কোনো মাংসের দোকানের কসাই বা দশাসই পালোয়ান, কিন্তু তাঁর কবিতাগুচ্ছ আশ্চর্য শীতল, এবং চিত্রকল্পরঙিন। সিমিকের 'Stone' কবিতার একটি অংশ:

'From the outside the stone is a riddle:
No one knows how to answer it.
Yet within, it must be cool and quiet
Even though a cow steps on it full weight,
Even though a child throws it in a river,

The stone sinks, slow, unperturbed
To the river bottom
Where the fishes come to knock it
And listen.'

আমি দুটি ধারার স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে এই কবিদেরই বিশেষত বেছে নিয়েছি, নইলে অন্য একাধিক প্রসঙ্গে মার্ভিন বেল, জেমস অ্যাপেলহোয়াইট, রবার্ট কেলি, জেরাল্ড মালাগ্না, সেইন্ট জেরোদ, এবং হাওয়ার্ড ম্যাকর্ডের কবিতা নিঃসন্দেহে আলোচনার অন্তর্গত হতো। এই সমালোচনায় বিস্তৃততর ভাষ্যের অবকাশ নেই।

আমেরিকান কবিতার সঙ্গে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের কবিতার—বিশেষত, ইংল্যান্ডে-রচিত কবিতার আকাশপাতাল পার্থক্য। একেবারে হালে, ইংল্যান্ডের পিটার পোর্টার, টেড হিউজ, রেডগ্রোভ, লারকিন, এবং ডম মোরায়েস ছাড়া অধিকাংশ পদ্যকারের রচনাকর্মই ক্লান্তিকর, এবং আড়ষ্ট। অন্যদিকে, আমেরিকান কবিতায় কোথায় যেন মুক্তি ঘটে গেছে। কিন্তু কেন? কিভাবে? প্রথম কারণ · জাগতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম ব'লে, অধিকাংশ আমেরিকান কবিতালেখকই স্বচ্ছন্দে কবিতা রচনায় মন দিতে পারেন—এবং কথঞ্চিৎ মুক্তভাবে জীবনকে দেখবার দৃষ্টি অর্জন করেন, যা অন্যান্য দেশে বিলাসিতার নামান্তর। এই যে ষাটের কবিদের পাঁচশো-পৃষ্ঠাব্যাপী ছবি-সমেত সংকলনগ্রন্থ বেরোলো, এই যে এ'দের মধ্যে অনেকেই কবিতা লেখবার জন্যে বা রচনার্থে বিদেশ ভ্রমণের জন্যে ইতোমধ্যেই জলপানি পেয়ে গেছেন, তা বাংলাদেশের কোনো নবীন কবির পক্ষে নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ দিবাস্বপ্ন। অন্যদিকে, আরেক দল কবি যে দিবারাত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন, বা আউল-বাউল-ফকির-মুরশেদ সেজে বিশ্বময় বিবাগী হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাও এই স্বাচ্ছন্দ্যেরই বিপরীত প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া, দীর্ঘদিন আগে আলেক্সি টোকভিল আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ফিউডাল-তন্ত্রহীন আমেরিকায় শিল্প ও সাহিত্যও হবে সমানুপাতিকভাবে ক্রমরেখাচিহ্নহীন (ungraded)। মূর্ত ও বিমূর্ত অভিজ্ঞতা এদেশে যতো সহজে মেলে, পাশ্চাত্যের অন্য দেশে ততোটা নয়। আমেরিকান কবিতার উৎকর্ষের অন্যতম কারণও এখানে নিহিত।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

*The Young American poets. Edited *By* Paul Carroll. Follett Publishing Co. New York. $ 3.95

স মা লো চ না

Tunc. *By* Lawrence Durrell. Faber & Faber. London. 25*s.*

লরেন্স ডারেলের *Alexandria Quartet*-এর শেষ গ্রন্থ *Clea* প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ন'বছর আগে। তারপর মাত্র কয়েক মাস আগে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসটি। *Tunc* কথাটি তারপর, পরবর্তী, পরেরটি—এই ধরনের অর্থবাহী। সময়ের ধাবমানতা বিষয়ে বিষণ্ণ চেতনা দ্বারা এই গ্রন্থের তাবৎ ভাবনা ও ঘটনা আক্রান্ত। সুতরাং প্রথমে চমক লাগলেও, পরে স্বীকার করতে হয়, নামনির্বাচনে কুয়াশা নেই।

আবেগ, ইন্দ্রিয়াঘাত ও ভাবনার মিশ্রণ ডারেলের উপন্যাসে; এই তিন সুতো এমন পরস্পরসম্পৃক্ত যে কোন একটিকে অপর দুটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। লেখকের ব্যক্তিত্ব সর্বত্র এমনভাবে উপস্থিত যে মনে হয়, প্রত্যেকটি বাক্য লেখকের অদৃশ্য স্বাক্ষরযুক্ত। পটভূমি ইংল্যান্ড, তুরস্ক, এথেন্স হতে পারে, তথাপি তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপিত দেশটির অথবা দেশগুলির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। ডারেলের উপন্যাসের এইসব লক্ষণ বছর দশেক আগেই যত্নবান পাঠক লক্ষ্য করেছেন। এইসব লক্ষণ আলোচ্য বইটিতে আবার দেখা গেল। তবু বলা দরকার, *Justine* যেমন একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল, তেমন *Tunc* একটি নতুন দিক অবারিত করল।

অনেকেই বইটি একটানা পড়ে যেতে পারবেন না। তেমন টান, বলা বাহুল্য, নেই। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের জন্য শব্দবাছাই দায়ী। নাহলে তো ভাবনাগুলো চেনা-চেনা, কাহিনীতে প্রায়শই এমনকি রূপকথার সুদূরতা। রহস্যগল্পের গন্ধও অন্তত দুবার বেশ তীব্র। তখন গ্রেহাম গ্রীনের লেখার সেই বিন্দুগুলি মনে পড়ে যেখানে তাঁর মনোরঞ্জনের রহস্যকাহিনী তাঁর উপন্যাসকে ছুঁয়ে যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র চার্লকের সঙ্গে গোয়েন্দা শার্লকের ধ্বনির মিলও এক জায়গায় দেখানো হয়েছে। তবে তার পুরোনাম ফেলিক্স চার্লক, শার্লক হোমস নয় এবং ফেলিক্সের সঙ্গে Phallic-এর ধ্বনিগত সাদৃশ্যও ইঙ্গিতবহ। এই ইঙ্গিত অনিবার্য এবং তখন ফেলিক্সকে আত্মস্থ করে নায়িকা বেনিডিক্টার সন্তানলাভ প্রসঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতির পুরোন ভাবনা পাঠকের মনে আসবে। এখানে আমার বক্তব্য: লেখকের আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিতে নতুনের যত চমক, বিষয়বস্তুতে তত নয়।

বইটির কাহিনীর প্রায় সবটুকুই চার্লকের অন্তর্মনের সংলাপ থেকে উৎসারিত। চার্লক বৈজ্ঞানিক। নতুন আবিষ্কারের স্বপ্নে অথবা কখনো সঙ্গিনী আইয়োলেন্থের শরীরে ডুবে থেকে তার দিনরাত্রি কাটে এথেন্সের দরিদ্র পাড়ায়। সারা পৃথিবীতে নানা বিচিত্র কারবারের জাল ছড়ানো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মার্লিন্স তাকে কাজে নিয়োগের প্রস্তাব করল। ব্যাপারটি রূপকথায় ভাগ্যবদলের মতন। তবু সেই উদার প্রস্তাব গ্রহণ করতে চার্লকের দ্বিধা, কারণ যে-কোন ফাঁদে পা দিতে, স্বাধীনতা খোয়াতে তার মনের অসম্মতি, কারণ দার্শনিকের মন বিজ্ঞানী চার্লকের। তার প্রতিরোধ ভাঙল বেনিডিক্টার শরীরের আঘাতে। মার্লিন্সে যোগ দিল চার্লক। তার পর থেকেই, প্রাত্যহিক জীবনে সাফল্যের চুড়োয় উঠলেও,

জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করার দাপাদাপির যন্ত্রণা।

চরিত্রগুলো পেয়ে গিয়ে, তাদের কথা শুনে, তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে, তাদের ভাবনা-বাসনার শরিক হয়ে পাঠক যা তৈরি করে নেবেন তা-ই এই উপন্যাসের কাহিনী। এসবের মধ্যে প্রতিফলিত একালের এবং সর্বকালের মানবসভ্যতা। প্রতিভার নিজস্ব ভূমিতে অবাধে বিকাশের মুক্তি নেই, প্রতিভা সভ্যতার হাতে পণ্য। পণ্যপ্রদর্শনীর বিচ্ছুরিত আলোয় কালের সভ্যতা অন্ধ। চার্লকের মৌলিক প্রতিভা প্রাত্যহিক জীবনের আরামের উপকরণ তৈরির কারিগরি দক্ষতায় সীমিত। মার্চেন্টের মতন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্র বানিয়ে, নতুন চোখে যুদ্ধের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে; যুদ্ধ প্রাত্যহিকতার গ্লানিকীর্ণ একঘেয়ে মৃত্যু থেকে দারুণ জীবন্ত হিংস্রতায় উত্তরণের সিঁড়ি। স্ট্রীট ওয়াকার আইয়োলেন্থ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর রহস্যলোকে পেঁছে গিয়ে বুকের ডৌল বাঁচাতে প্যারাফিন ইঞ্জেকশন নিয়ে ভয়ঙ্কর অসুস্থ। সুতরাং জাল থেকে মুক্তির জন্য ডানা ঝাপটানি চার্লকের, স্থপতি ক্যারাডকের, কবি কয়েপগেনের।

প্রতিভা সভ্যতার ক্রীতদাস—এই বক্তব্য বারংবার সাহিত্যে উপস্থাপিত। দাসত্ব থেকে মুক্তির আর্তি যে রোমান্টিকতা, ডারেলের লেখা সেই রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাসে আক্রান্ত। মার্লিন্স এমন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাকে বলা যায়, একালের সভ্যতা, বরং এই পৃথিবী; তাহলে মুক্তির অবকাশ কোথায়! মার্লিন্স নামটির সঙ্গে রাজা আর্থারের কাহিনীর জাদুকর মার্লিনের নামের মিল লক্ষ্যণীয়। মার্লিন্সের উদার প্রস্তাব মেনে নিতে চার্লকের দ্বিধা এবং মেনে নেবার সিদ্ধান্তের পর দাসত্বের যন্ত্রণা পাঠককে সার্ত্রের দর্শন স্মরণ করিয়ে দেবে। এত সব মিল, বলা যায়, ডারেলের উত্তরাধিকার।

পাতার পর পাতা প্রকৃতিবর্ণনা, নারীর রূপবর্ণনায় ইদানীং লেখকদের উৎসাহ কম। ডারেলের এই উপন্যাসে রোমান্টিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রকৃতিবর্ণনার দৃষ্টান্ত অজস্র। অবশ্য সেই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মাঝে মাঝেই অতিসপ্রতিভতা, এমনকি সিনিসিজম, জড়িয়ে আছে।

উপমাপ্রয়োগেও কিছু সংখ্যক তরুণ লেখকের উৎসাহ নেই। আমাদের দেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন লেখায় এই লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তারপর এদেশের দু-চারজন তরুণ লেখকের রচনায় এই সচেতন নিরাভরণতা দেখা গিয়েছে। ডারেলের এই উপন্যাসে উপমাপ্রয়োগ অকৃপণ এবং আমার মনে হয়েছে, প্রায়শই সার্থক।

অশ্লীলতা বিষয়ে এদেশে সম্প্রতি প্রচুর বিতর্ক উঠেছে। বলা যায়, সরল বলিষ্ঠতায় নগ্ন সত্যকে মেনে না নিয়ে, পাতলা কাপড়ে কিছু কিছু অঙ্গ ঢেকে, চোরের শঙ্কিত সতর্কতায় নগ্নতাকে উপস্থাপন এর জন্য মূলত দায়ী। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে 'মরা নেংটি ইঁদুর' অথবা 'জ্বলন্ত কয়লার চাংড়া' লেখার প্রবণতা ডারেলের নেই। নগ্নতা বিষয়ে তাঁর যা কিছু বলার তা বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতার বালাই না রেখে অবলীলায় বলেছেন এবং মনে হয়, তা পুরোপুরি স্বাস্থ্যকর। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যেমন

All at once a hatch in his robe flew open and he thrust out a beautifully hand-painted penis the length of a sermon. . . . Can you wonder that my only wish was to retreat, not only into the sheltering maternal pouch, but right back into the testes of the primeval ape for whom my father merely acted as agent, as representative?

একদা লন্ডন ম্যাগাজিনের এক সংখ্যায় ইংরেজ বা আমেরিকার কবিদের মধ্যে কার কার

প্রভাব এখনো তাঁর কবিতায় আছে—এই প্রশ্নের উত্তরে ডারেল এলিঅট এবং অডেনের নাম দুটি লিখে ইত্যাদি কথাটি বসিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু কবিতায় নয়, তাঁর গদ্যেও ওই প্রভাবের নজির প্রচুর। যেমন

The basic three points are birth-love-death.

বিদেশী সাহিত্যের বিদগ্ধ প্রেমিকদের কাছে শুনেছি, প্রুস্ত পড়তে হলে তাঁকে আক্রমণ করা দরকার। যেমন : Let's attack Proust during this vacation। বলেছি, ডারেলের আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটি নতুন। কিন্তু যাঁরা প্রুস্তকে 'আক্রমণ' করে সফল, তাঁদের কাছে ডারেলের ভঙ্গিটি খুব নতুন মনে হবে না।

Alexandria Quartet-এর কিছু কিছু ভাবনা *Tunc* বইটিতে আবার এসেছে। মনে রাখা দরকার, এই প্রতিধ্বনি ইচ্ছাকৃতভাবে সংযুক্ত।

সুধাংশু ঘোষ

Myra Breckinridge. *By* Gore Vidal. Anthony Blond. London. 35*s*.

শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে অনেক বাজে তর্ক হচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগে এক বাঙালী ঔপন্যাসিক অশ্লীলতার অভিযোগে আইনত অভিযুক্ত হলেন। তবে সেখানে—যেমন হয়, এ-ধরনের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আজকাল—প্রশ্নটা ততটা লেখকের নৈতিক মানসিকতা নিয়ে নয়, যতটা এক বিরাট ও সর্বগ্রাসী ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির অঙ্গ। যে-নেপো প্রকাশক, সেই নেপোয় মারে দই। এবং শুধু নেপোই বা কেন? একবার অশ্লীলতার তকমাটা গায়ে আঁটতে পারলে তাঁর বইয়ের প্রচুর কাটতির কারুণ্যে লেখক নিজেও কি আর্থিকভাবে কম লাভবান বা জনপ্রিয়তায় কম অভিনন্দিত? তাই সকলেরই মুখ রক্ষা করছে বলেই জয়, অশ্লীলতার জয়।

কোনটা শ্লীল আর কোনটা অশ্লীল, সে তর্কে না নেমেও বলব, গোর ভিডালের এই বর্তমান উপন্যাসটির (তিনি নাকি আরো দুটি উপন্যাস আগে প্রকাশ করেছেন—'শতহস্তেন বাজিনঃ', এই শাস্ত্রীয় প্রবচনটি তাঁর লেখার প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে মনে রাখা সমীচীন হ'তে পারে) মত অশ্লীলতার এমন চরম উদাহরণ ছাপার অক্ষরে (যা অশ্লীলতার অন্যতম ও হয়তো সর্বপ্রধান আশ্রয় আজ) অন্তত এ-অধমের চোখে আগে কখনো পড়েনি। অতএব বলা বাহুল্য, লেখক স্বয়ং তো বটেই, বিশেষত যে-নেপো প্রকাশক, সে-নেপো এখানে হাঁড়ি-হাঁড়ি দই মারবে। উপরন্তু, এ তো আর বাংলা ভাষার ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর নয়, এ আ মরি ইংরেজী (আসলে আরো ভালো, আমেরিকান—বর্তমান সংস্করণটি যদিও লন্ডন হ'তে প্রকাশিত) ভাষা। একই বইয়ের নেপো-প্রকাশকও তাই এক নন, বহু, দেশে-বিদেশে বিস্তৃত। আমাদের অনেকের পক্ষেই পুস্তক-প্রকাশের জগতে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি অকল্পনীয় যে, আজ যখন মুদ্রণ-পারিপাট্যে এমন যুগান্তকারী উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে (বিশেষত পশ্চিমের কয়েকটি দেশে)—বই দূর থেকে দেখতে যেমন, হাতে তুলতেও সমানই আনন্দ, অন্যমনস্কভাবে পাতার পর পাতা ওল্টাতে কী পরম পরিতৃপ্তি—তখন এত আগ্রহে-যত্নে ছাপার বিষয় যা, তার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী কেতায় পশ্চাদ্দেশ

প্রক্ষালনের উপযুক্ত।

আরো একটি মজা। লেখার যে-নিছক শৈল্পিক দিকটা, কারুকার্যের দিকটা, উৎকর্ষ সেখানেও কিছু কম নয়। আজকের ঔপন্যাসিকদের অস্ত্রগুলির ধার সাংঘাতিক—যেমন চতুর ভাষার, তেমনি চতুরতর আঙ্গিকের। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করছি বর্তমান উপন্যাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ, যা মাত্র একটি লাইনে শেষ: Where are my breasts? *Where are my breasts?* উক্তিটি নায়িকা (না অর্ধনারীশ্বর হিজড়া নায়ক?) মায়রার। বলুন, এর পরে না বলে পারা যায়: বলিহারি ভাই? যে-বোদলেয়ার সারা জীবন পাপের সাধনা করেছিলেন, চমকে দিতে চেয়েছিলেন, পাপবোধ ও চমকে দিতে পারার শক্তিকে মহৎ আর্টের অন্যতম ও অনিবার্য প্রধান লক্ষণ বলে প্রমাণ করতে প্রাণপণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, আজ বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই হয়তো চমকে উঠতেন দেখে যে সুযোগ্য উত্তরসূরীদের হাতে তাঁর সাধনা কোন ক্লেদাক্ত মাছিবহুল নর্দমার পথ নিয়েছে। আর্টের নামে, সাহিত্যের নামে আজকের পাঠকসমাজ প্রায়ই আমন্ত্রিত এই নর্দমার পুণ্যস্নানে।

কিন্তু সবিস্তারে সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা না ক'রেও অশ্লীল বলছি কাকে, তার একটু আভাস দেওয়া যেতে পারে। মনে হয়, অশ্লীলতম সেই বস্তুই যা প্রেম ও কামের মত মানুষের দুটি সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির শুধু বিরুদ্ধেই যায় না, তাকে শুধু পরিহাস ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, সেই প্রেম বা কামের জীবন্ত আধারকে নৃশংস শারীরিক অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত জর্জরিত ক'রে ভাবে, যাক, এতক্ষণে একটা কাজের মত কাজ করা গেল। গোর ভিডালের বর্তমান উপন্যাসটির লক্ষ্য এইরকমই। পাতার পর পাতা দৌড়োন, মরুচারীর এক-বুক তৃষ্ণা নিয়ে সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি চরম তাচ্ছিল্য ও বাহাদুরি-বোধ-ভরা অবজ্ঞার এই জ্বলন্ত ঊষর ধূসর প্রান্তর চ'ষে বেড়ান, তবু বাজি রেখে বলব, সারা বইয়ে একটা বাক্য পাবেন না, হয়তো একটা শব্দও পাবেন না, যা মনে স্নিগ্ধতার আমেজ আনে বা যাতে ঘৃণায় ও ন্যক্কারবোধে প্রতিক্ষণে কুঁকড়ে না উঠতে হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সত্যিই, ভিডালের কীর্তি শুধু অভাবনীয়ই নয়, অবিস্মরণীয়ও। বিদেশী ছায়াছবি ও দেশী-বিদেশী সাহিত্যের বহু সাম্প্রতিক অভিযানের ফলে আমাদের অনেক বালাই জলাঞ্জলি দিয়ে ইদানীং বেশ ঝাড়া-হাত-পা হয়েছি, আমরা আর ততটা নরম চামড়া নই, সমকাম (homosexuality) বা ইতররতির (heterosexuality) দৃষ্টান্তে প্রথম-রজস্বলা বালিকার মত মুখ লজ্জায় গোধূলির মেঘ ক'রে তুলি না আর (তবু এ নয় যে সেই তথাকথিত সমকাম বা ইতররতির উদাহরণবহুল সবিস্তার গুণপনায় এ-বই কিছু কম মুখর)—ভাই যদি ভাইয়ের প্রতি, বা বোন বোনের প্রতি, অথবা ভাই কখনো ভাইয়ের প্রতি কখনো বোনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তো হোক, তার মধ্যেও আমরা সমাজকে খুঁজব, মনে মনে বলব যে সাহিত্য যেহেতু সমাজেরই প্রতিফলন, নাক সিঁটকে লাভটা কী। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যদি ইয়ার্কির পর্যায়ভুক্ত হয়, যোনি যদি জ্বলন্ত সিগারেট নেভানোর জন্য অ্যাশট্রে-র মত ব্যবহৃত হয়, কোনো ছলনাময়ী যদি ছলে-বলে-কৌশলে এক সমর্থ কিশোরকে বন্ধ ঘরে উলঙ্গ করে ও পরে তার হাত-পা বেঁধে তাকে উপুড় ক'রে তার পশ্চাদ্দেশে কঠিন শলাকা পুরে দেয় চরম চরিতার্থতায়, শেষে অসহায় সন্ত্রস্ত রক্তাক্ত কিশোরের ক্ষতস্থানে সেবা করতে বসে মায়ের মত স্নেহে—এবং সবার উপরে সেই ছলনাময়ী যদি ছলনাময়ী না হ'য়ে আসলে ছলনাময়ই হয়, কারণ জন্মকালে তার লিঙ্গটা ছিল বিপরীত এবং জন্মকালীন সেই বিপরীত লিঙ্গেই সে অচিরে আবার ফিরে যাচ্ছে, উদ্ধত ফাঁপা রবারের বেলুনের মত তার এত গর্বের

মহামহিম স্তনযুগল আসলে এক অসামান্য অস্ত্রোপচার ও প্ল্যাস্টিক সার্জারির সাফল্যেরই কীর্তি, তো বলুন, সাহিত্যের নামে এই অকথ্য ব্যভিচার-অত্যাচার কে সহ্য করতে প্রস্তুত? আমি নই।

Myra Breckinridge যে-নারকী আগুনে উদ্ভাসিত, তার কিছু আভাস মাত্র দিলাম। শোনা যায়, লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নাকি হলিউডকে শ্লেষ করা—অর্থাৎ বইটি শুধু শ্লেষোক্তি, আর কিছু নয়। কিন্তু এমন অদ্ভুত শ্লেষ বা পরিহাস করতে চেয়ে সাহিত্য ফাঁদার চেষ্টা কেন? ইচ্ছা ছিল, কাহিনীর বিশ্লেষণ করি বা অন্যান্য প্রসঙ্গ পাড়ি, সে-বাসনা সানন্দে অসম্পূর্ণ রেখে দিলাম। লেখকের এত পরিশ্রমের ফসল যা, তাতে নেই আত্মার ঘামের এক বিন্দু নির্যাস—যা পাওয়া গেল এবং যা পেয়ে এবার আমাদের মত অসহায় পাঠকেরা মানে মানে ফিরি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বসন্তরাঙিন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ডি. এম. লাইব্রেরী। কলকাতা ৬। মূল্য ৩·৫০ পয়সা।

অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলা উপন্যাসের আকাল চলছে। উপন্যাস-নামধেয় প্রত্যেক বছর প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলীর অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু প্রচ্ছদের অভ্যন্তরে দ্রুত দৃষ্টি-পাতেও একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এ নামেই উপন্যাস। এসব রচনা পড়ে পড়ে কোনও জিনিসকে তলিয়ে দেখবার ও বোঝবার ক্ষমতা আর অভ্যাস দুটোই চলে যাচ্ছে।

"বসন্তরাঙিন" অসামান্য অথবা মহৎ উপন্যাস নয়, কিন্তু একটি সৎ উপন্যাস। এর বক্তব্যে কোনরকম উচ্চতা নেই, যা আছে তা হলো উপস্থাপিত চরিত্রগুলোর বিশেষ প্রদত্ত পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। ছোট উপন্যাস, চরিত্রসংখ্যাও নগণ্য; সমগ্র কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে রেবতী ও মুকুন্দের দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। ভালো ঘরের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছিল মুকুন্দ, কিন্তু সে বৌ তার ঘরে থাকেনি, এক ছুতোর মিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যায়। এরপরে মুকুন্দ বিয়ে করে আনল রেবতীকে। ভালো ঘর বা ভালো জায়গা থেকে আনেনি, কলকাতার বৌবাজার থেকে রেবতীকে সে নিয়ে গেছল।

এখান থেকেই 'বসন্তরাঙিনে'র কাহিনীর শুরু। আমরা যাকে ভালো বলি তা যে আসলে ভালো নয় আর যাকে মন্দ বলি তা যে আসলে ভালো এরকম একটা চমকপ্রদ প্রতিপাদ্য বিষয় অনায়াসে জ্যোতিরিন্দ্র রাখতে পারতেন। কিন্তু বারাঙ্গনাকে বিয়ে করা সমর্থনীয় কিনা, অমন বিয়েতে মুকুন্দের মহানুভবতা প্রমাণিত হয় কিনা, অমন বিয়ের সাফল্য কতখানি অথবা সামাজিক যাথার্থ্য কতখানি এসব আপাত জরুরি প্রশ্নকে লেখক স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গেছেন। তাঁর কাহিনী এগিয়েছে ধীর ও দৃঢ় গতিতে একটিমাত্র লক্ষ্য অভিমুখে। লক্ষ্যটা কী?

মুকুন্দ ভালোবাসে রেবতীকে এবং ভালোবাসা দিয়েই রেবতীকে সে আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়; যেহেতু সে গ্রাম্য পুরুষ তাই আরও খেটে ফসল ফলিয়ে, আরও নজর রেখে মুদির দোকানটা বাড়িয়ে তার ভালোবাসা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে রেবতীও ভালোবাসে মুকুন্দকে এবং বৌবাজার থেকে ঘরের বৌ করে এনেছে বলে মুকুন্দর প্রতি কোনও ভাবপ্রবণ

কৃতজ্ঞতা মেশেনি তার ভালোবাসায়। দুজনে দুজনের ভালোবাসাকে নিয়েছে এমন সহজে যেন এরকমটাই হবার কথা ছিল আর জন্মান্তরের সে-কথাটা যেন তাদের পরিষ্কার মনে আছে। তাদের ভালোবাসার স্বাভাবিকতাকে জ্যোতিরিন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বসন্ত-রঙিনে'র অর্ধেকেরও বেশি জায়গা নিয়েছেন লেখক এই দুটি চরিত্রকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে তোলার জন্যে।

তারপর কখন যে পাঠকের অলক্ষে মুকুন্দ ও রেবতীর সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে বলা মুশকিল। দুজনে যখন দুজনের মুখোমুখি দাঁড়ায় দুটো যুযুধান পক্ষের মতো তখন হঠাৎ পাঠক চমকে ওঠে, হঠাৎ বুঝতে পারে যে কিছুদিন ধরেই এই পরিবর্তনটা ঘটতে শুরু করেছিল বটে। এই পরিবর্তনের মূল কোথায় ছিল? মুকুন্দর প্রথম বিবাহের অভিজ্ঞতায়? রেবতীর পূর্ব পরিচয়ে? বলা বাহুল্য হাঁ বা না বলে এসব প্রশ্নের সরলীকৃত উত্তর জ্যোতিরিন্দ্র খোঁজেননি। তিনি পুঙখানুপুঙখ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তাদের সম্পর্কের পরিবর্তনের মূলে আছে মনুষ্যচরিত্রের অব্যক্ত অজ্ঞেয় রহস্য। জ্যোতিরিন্দ্র এই রহস্যের প্রতীক হিসেবে রেখেছেন একটি তালা-আঁটা সিন্দুক যার চাবি মুকুন্দর কাছে কখনই থাকে না। মুকুন্দ বলেছে রেবতীকে যে ওই সিন্দুকের মধ্যে পুরনো ভারি ভারি বাসনকোসন আছে, কিন্তু কুসুমের মা বলেছে যে ওতে আছে ভারি ভারি সোনার গয়না। কার কথা সত্য? এখানে কার কথা সত্য কার কথা মিথ্যে তাতে কিছু এসে যায় না।

তাহলে আমাদের লক্ষ্য রাখব কোথায়? সিন্দুকের মধ্যে কী আছে তা আমরা কখনই জানি না, বলাইয়ের কাছ থেকে মুকুন্দ সেটার চাবি কখনই জোগাড় করে এনে রেবতীর কাছে তার কথা প্রমাণ করতে পারে না, ফলে মুকুন্দর কথায় ও তার থেকে মুকুন্দর প্রতি রেবতীর অবিশ্বাস জাগে, অবিশ্বাস ক্রমশ বাড়তে থাকে আর সে-সঙ্গে কুসুমের মায়ের কথায় তার বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে। কুসুমের মা কে? বলাইয়ের মতো সে-ও এ বাড়িতেই থাকে, কিন্তু তাকে যেন চোখে দেখা যায় না। 'তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, সবটাই এ বাড়ির আর সব মানুষদের অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু তারা ঠিক দেখছে, অনুভব করছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষের নাড়িনক্ষত্র তাদের মুখস্থ।' এই যে রহস্য এটা গোয়েন্দা কাহিনীর নয়, মানবজীবনের রহস্য। বইয়ের নামটি সুপ্রযুক্ত হয়নি।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়— মণীন্দ্র রায়। অনুভব প্রকাশনী। কলিকাতা ২৯। মূল্য তিন টাকা।

আধুনিকতার যে আন্দোলন বর্তমানে নিঃশেষিত, মণীন্দ্র রায় তার শৈশবে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। যেমন সাধারণতঃ হয়, সে আন্দোলনেও কবির চেয়ে অকবির সংখ্যা বহুগুণ বেশি ছিল, তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, ক্ষয় এবং নেতিবাদ ছিল। শুধুমাত্র রবীন্দ্রবিরোধিতাকে যাঁরা আন্দোলনের পীঠভূমি মনে করে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরা সেই নেতিবাদের নিম্নগামী টানে নিঃশেষিত হয়েছেন। আন্দোলন যে অবশেষে জয়ী হয়েছিল তার কারণ তার প্রগতি-

শীল ধারা। তখনকার যে কজন কবি প্রগতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং এখনো আছেন মণীন্দ্র রায় তাঁদের একজন। গত তিরিশ বছর ধরে অক্লান্তভাবে লিখছেন তিনি। তাঁর এই ক্লান্তিহীনতা যে অকবি বা যেসব সূর্যমুখী আয়নার মতো ধার করা রৌদ্রচ্ছটা বিকিরণে পারদর্শী তাঁদের অক্লান্ত সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয় তা বলাই বাহুল্য। বহু স্মরণীয় কবিতার লেখক মণীন্দ্রবাবু। তাঁর দৃষ্টি এমনই একান্তভাবে জীবনলগ্ন যে তাঁর কবিতায় কখনো ফিন্‌ফিনে ভাবালুতার স্পর্শ লাগতে পারেনি। ফ্যাকাশে রক্তশূন্যতা উপমা, বর্ণনা বা বিষয়ে কখনো বিচরণ করেন না তিনি। তাঁর কল্পনার নভোচারণ কখনোই জীবনবিস্মৃত নয়, জীবনের মধ্যেই মূলবন্ধ।

অথচ, জীবননিষ্ঠ কবি হয়েও মণীন্দ্রবাবু ততটা খ্যাতি পাননি যতটা তাঁর প্রাপ্য। এর অন্যতম কারণ তাঁর কবিতার কঠিন বহিরঙ্গ। বলশালী, কখনো কখনো কর্কশ শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁর কবিতাকে আপাতমাধুর্যহীন করেছে, ফলে এক শ্রেণীর পাঠক যারা বাংলা কবিতার ললিত ধ্বনিবিন্যাসে অভ্যস্ত তারা তাঁর কবিতার রসে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সহজ হিসেব মণীন্দ্রবাবুও নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু তবু তিনি খ্যাতির জন্য নিজের চারিত্র্য বিসর্জন দেননি। অথচ খ্যাতি প্রধান কাম্য হলে মণীন্দ্র-বাবু তাঁর প্রতিভা এবং ছন্দবন্ধনে অসাধারণ দক্ষতাবলে মধুর শব্দের নূপুর বাজিয়ে অত্যন্ত অনায়াসেই তা পেতে পারতেন। তার দৃষ্টান্তও মণীন্দ্র রায়ের অগোচর নয়।

"নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়" মণীন্দ্র রায়ের সম্প্রতি লিখিত সাতান্নটি কবিতার সংকলন। কয়েকটি মর্মস্পর্শী কবিতায় বইটি সমৃদ্ধ। 'মর্মস্পর্শী' কারণ জীবনের বেদনার দিকটিই যেন বার বার ঘুরে ঘুরে দেখা দিয়েছে, অনেক অনস্বীকার্য সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তিনি এবং জীবনের প্রতি টান গভীর বলেই বেদনা অনুভব করেছেন। যেমন 'টিকটিকি', 'মাকড়শার প্রতি', 'নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়' 'সংক্রমণ', ইত্যাদি। 'টিকটিকি' যেন মৃত্যুর প্রতিরূপ, কুৎসিত, অশ্লীল, ইতর, কিন্তু তবু সে আছে, চোখ বুঁজে থাকলেও, তাকে না দেখার ভান করলেও, সে থাকবে, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

............তুমি
কাকে করো উপহাস? কার্টুনের মতো
আমার প্রেমের আয়োজনে
হেলানো বর্তুল ছ্যাঁচা কোণাচে ছবির
এতো প্রহসনে কেন দৃশ্যের উদর
করো বিস্ফোরণ? আমি ভুলে যেতে চাই
অশ্লীল জিহ্বার ওই ভেজা অন্ধকারে
বোমারুর মতো ক্রুর আনাগোনা। তবু
সব স্বপ্নে, কবিতায়, টেবিলের রজনীগন্ধার
উপরে রয়েছ কেন স্থির
আদিম ক্ষুধার মুণ্ডে টিকটিকি, তুমি
দগ্ধ হীরকের কালো চোখ!

'শৃঙ্গজয়ের ইতিকথা'য় স্রষ্টার আমৃত্যু ব্যর্থতা প্রকাশিত। শিল্পসৃষ্টি বা যে কোন সৃষ্টিই যেন কোন কাল্পনিক পাহাড়ে ওঠার মতো। পাহাড়ের 'ত্রিকোণ ধবল চূড়া' স্রষ্টাকে, কবিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কবিও প্রতিদিন সেই পাহাড়ে ওঠেন—

আমিও এ পাহাড়ে উঠি প্রতিদিন, পিছল পথের
পতনের প্রতিটি দিন খ'সে পড়ি খাদে।
তুষার-কুঠার নেই, শিখরে ওঠার
লাঠি দড়ি জুতো নেই, পাহাড়ও উধাও।
শুধু আছে আরোহণ; বিজয়-বিহীন
চূড়ায় দাঁড়ানো; দ্রুত পটক্ষেপ; আর
রক্তাক্ত আবার আরোহণ॥

শিল্পসৃষ্টিতে সাফল্যের ধবল চূড়া কল্পনাপ্রসূত কিন্তু বারবার আরোহণের রক্তাক্ত চেষ্টা অত্যন্ত বাস্তব।

জীবনের বেদনার দিককে অস্বীকার করে যে মূর্খ আশাবাদ মণীন্দ্র রায় তার প্রভাব থেকে মুক্ত করেছেন নিজেকে। এক সময়, অতিপ্রগতিশীলতা যখন ভয়ংকর সর্বগ্রাসী হয়েছিল তখন বেদনার স্বীকৃতি অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। আশার কথা, সংগ্রামের কথা বলতেই হবে এই অলিখিত, কিন্তু রক্তচক্ষু নির্দেশনামা তখন বিভ্রান্ত করেছিল কবিদের। তাঁরা তখন আশার উল্লাস ব্যক্ত করে কবিতা শেষ করতেন। আমি যেমন এ-মতের বিপরীত বিভ্রান্তিতে বিশ্বাসী নই তেমনি জীবনের কিছু কিছু বেদনাদ্যোতক সত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতো নির্বোধ আশাবাদেও আস্থাবান নই। 'নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়'-এর মতো বেদনার কবিতাও তাই আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

যা ভাবো তা নয়। নদী
ঢেউ ঝিলিমিলি নয়;

...

কাল
রক্তে জিহ্বা দিতে চায়; আমি
মিনিটের পরে অন্য মিনিটে শতাব্দী লাফ দিয়ে
শূন্যে বাজি ধরি॥

মণীন্দ্র রায়ের কবিতার যে কঠিন বহিরঙ্গের কথা আগে বলেছি ওপরের উদ্ধৃতিগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। এক ধরনের ইচ্ছাকৃত লালিত্যহীন শুষ্কতা যে কোন পাঠকেরই নজরে পড়বে। 'সংক্রমণ', 'শৃঙ্গজয়ের ইতিকথা' নামগুলিও তার নজির।

"নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়" গ্রন্থে বেদনাবোধের সঙ্গে হাস্যরসের একটি তির্যক ছটাও বিচ্ছুরিত। বিশেষতঃ 'শিল্প নেই এ ভঙ্গরেখায়' নামক কবিতায় প্রেয়সীর সঙ্গে দূর টেলিফোনে বাক্যালাপ শুরু হতে না হতেই মস্ত বড়বাজারের ক্রস্-কানেকশান 'হ্যাল্লু' 'হ্যাল্লু' গেরিলা লাফায়'—খুবই উপভোগ্য।

মৃগাঙ্ক রায়

উত্তর বসন্ত— আবদুল কাদির। ২১, জয়নাগ রোড। ঢাকা। মূল্য ২·৫০ পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থ উনিশ শ সাতষট্টিতে প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি রবীন্দ্রযুগের কবিস্বভাবকে

স্মরণ করিয়ে দেয়। আবদুল কাদির রবীন্দ্রযুগেরই কবি, যুদ্ধপূর্ব জলবায়ু কাদিরের কবিতায় অনুভব করা যায়। দ্বিধাহীন আত্মনিষ্ঠ এই কবির কাব্যসাধনা আধুনিক জটিল মানসিকতার ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিরলস ঐতিহ্যচারণে অগ্রসরমান। গত ত্রিশ বছরের বাংলা কবিতায় আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রতিফলনে বিচিত্র এবং বিমিশ্র ভাবধারার যে সমন্বয়, দুরূহ চিন্তাপ্রবাহ ও আঙ্গিকচর্চার ঐতিহ্য সৃষ্টির যে প্রয়াস ও সার্থকতা কাব্য-পাঠকের কাছে কখনো আদৃত, কখনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বিতর্কিত ভূমিতে অবস্থানরত, কবি কাদিরের রচনায় সেই জটিল ও সংশয়ী চিত্তবৃত্তির সামান্যতম প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। তিনি রোমান্টিক, নিসর্গপ্রেমিক,—এক পরিণত হৃদয়ের অধিকারী। মননের চেয়ে মনই এখনো তাঁর কবিস্বভাবের নিয়ন্ত্রক। বলা যায় উনিশ-শতকী এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগের ঐতিহ্যবাদী কবিদের তিনি যোগ্য উত্তরসাধক,

আমন্ত্রণ পেয়েছিনু বসন্তের পূর্ণিমা-বাসরে
বাঁশীখানি হাতে লয়ে এসেছিনু চুপে সন্তর্পণে।
স্বর্ণকুরঙ্গিনী ছোটে স্বপ্নধূলি ছিটাইয়া মনে,—
কস্তুরীসুবাসে তারি রচিলাম সঙ্গীত আসরে॥

উদ্ধৃত স্তবকটি কাদিরের কবিচরিত্রের অন্তরধর্মকে তুলে ধরছে। বসন্তের পূর্ণিমা-বাসরেই তিনি আমন্ত্রিত, কোনো নৈরাশ্যময় অন্ধকার তাঁর পৃথিবীতে দেখা যায় না, চুপে সন্তর্পণে হাতে বাঁশী নিয়ে বাজাবারই তিনি পক্ষপাতী, রোমান্টিক স্বপ্নস্বর্গে কস্তুরী-সুবাসে সুরভিত সঙ্গীতসাধনাই কাদিরের উচ্চাভিলাষ।

স্বপ্নজগতে অন্তরীণ এই প্রবীণ কবির নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে, শব্দনির্বাচনে তিনি উনিশ-শতকী বিশুদ্ধবাদীদের অন্যতম মনে হলেও, তাঁর কবিতার বিষয় যেহেতু ঐতিহ্যগত নিসর্গ-সন্দর্শন ও রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস. অতএব পূর্বোক্ত অভিযোগ এ প্রসঙ্গে বর্জন করা চলে। আধুনিকরা যে কাব্যিক শব্দ বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, কাদিরের কবিতায় তার অজস্র প্রয়োগ এই কবির কবিস্বভাবের বিশেষ প্রবণতাকে সমর্থন করে। এমন কি বাক্যগঠনে কিংবা ছন্দব্যবহারে তিনি কোথাও সন্ধানী মনের পরিচয় দেননি, বরং রবীন্দ্রপূর্ব ও সমসাময়িক কবিতার অখণ্ড জলবায়ুতে তিনি পরিক্রমণ করেছেন স্বচ্ছন্দে।

এসব কথা অভিযোগ বলে মনে হলেও, আসলে কাদিরের বিশিষ্ট চরিত্রটির মৌলিকতার কথা জেনে নিলে একালের পাঠকের কাছেও তিনি আদৃত হবার যোগ্য। অনুভূতির আন্তরিকতা ও গভীরতা প্রায় কবিতারই সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। কাদিরের কবিতা সেন্সুয়াস, মোহিতলালের উক্তি 'রূপ-রস-বিহ্বলতা তোমার কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ'।

"উত্তর বসন্তে"র অধিকাংশ কিংবা প্রায় সব কবিতাই আত্মলীন প্রেমিককণ্ঠের স্বগত ভাষণ, প্রকৃতি এখানে দিব্যপ্রেমের আবহ সৃষ্টির সজীব উপাদান বা বিকাশের অবলম্বন-স্বরূপ। ভাবাবেগ সমতলের নিস্তরঙ্গ নদীর মতন স্থিরপ্রবাহ এবং পরিপূর্ণ।

চন্দ্রের মতন হাস্যে সমুদ্রের তরঙ্গের উচ্ছল—
ফোটে শত শ্বেতপদ্ম আকাশের নীল সরোবরে।
কপোলে চিবুকে তব জ্যোৎস্নাধারা ঝরে লাস্যভরে,
ফুটায় স্বপ্নের কলি মোর বুকে জ্যোতিষ্কমণ্ডল;

অতঃপর সারারাত্রি বধূমুখে স্বপ্ন-প্রসাধন—
মুদ্রিত পদ্মের পাশে মধুপের ব্যথা নিবেদন।

প্রকৃতির লীলারাজ্যে প্রীত-প্রাণ আমি পুণ্যবান্
সুন্দরের পাদপীঠ প্রেমপুষ্পে করেছি রচন।

ইত্যাদি উদ্ধৃতিযোগ্য পংক্তিতে কাদিরের কবিত্ব-শক্তি এবং মানসিকতার স্থিরভূমির পরিচয় স্পষ্ট বলে মনে হয়। একথা স্বীকার্য, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বৈচিত্র্য, প্রসার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামান্যতম প্রভাবও কাদিরের রচনায় দুর্লক্ষ্য। কিন্তু তিনি আপন স্বভাবে স্থিত থেকে যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে এক সৎ কবির পরিচয়ই মেলে। এই প্রাপ্তি নেহাত কম মূল্যবান নয় বলেই মনে করি।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

'চতুরঙ্গে'র তিরিশ বছর পূর্ণ হল। একত্রিশ বছরের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬) আষাঢ়ের শেষে প্রকাশিত হবে। গ্রাহকদের কাছে আমাদের নিবেদন তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা (৫·৫০ প.) 'চতুরঙ্গ' কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। যাঁরা গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক তাঁরাও যেন অনুগ্রহ করে জানান।

যাঁদের চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যাবে না, তাঁদের সকলকেই ভি. পি. যোগে (ভি. পি-তে পত্রিকা পাঠালে গ্রাহকদের অহেতুক বেশী খরচা পড়ে) পত্রিকা পাঠানো হবে। ভি. পি. ফেরত দিয়ে বর্তমান সময়ে কেউ যেন আমাদের আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, এই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

* * * * * * * * *

ছাপা কাগজ প্রভৃতির দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এ বছর 'চতুরঙ্গে'র বার্ষিক চাঁদার কোন পরিবর্তন করা হল না। কিন্তু আগামী বছরে (১৩৭৭) অনিবার্য কারণে 'চতুরঙ্গে'র বার্ষিক চাঁদা হবে ৬·৫০ প. এবং প্রতি সংখ্যার দাম ১·৫০ প.। অবশ্য ১৩৭৬ সালে যাঁরা গ্রাহক থাকবেন, তাঁদের বেলায় ১৩৭৭ সালেও বার্ষিক চাঁদা অপরিবর্তিত (অর্থাৎ ৫·৫০ প.) থাকবে।

চতুরঙ্গ ॥ ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩

ত্রিংশত্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

প্রথম আবির্ভাবের দিন থেকেই ভারতবর্ষের নতুন জাতীয়তাবোধ দোটানার মধ্যে পড়ে গেল। একদিকে ইয়োরোপের নবীন সভ্যতার দুর্জয় আহ্বান, অন্যদিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং বহু ক্ষেত্রে কালজীর্ণ সংস্কৃতির বহু শতাব্দীর আকর্ষণ। তার ফলে যে অনিশ্চয়তা, তা জীবনের প্রত্যেক স্তরে যুগ-মানসকে প্রভাবিত করেছে। এ অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য যে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দেবে, তাতেও বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। তরুণ চিরদিন নূতনের সন্ধানী, পুরাতনকে অতিক্রম করে অভিজ্ঞতার নব নব দিগন্ত খোঁজে। অন্য দেশে অন্য কালে সে সন্ধানের ফলে নতুন সমাধান, নতুন সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়, ভারতবর্ষে নানা ঐতিহাসিক কারণে তা আজো সম্ভব হয়নি। তার একটি প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষে এ অনিশ্চয়তা জনমানসে প্রায় স্থায়ী রূপ নিল। ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, তখন পৃথিবীর অর্থনীতি ও রাজনীতি জাতীয়তাবাদের স্তর অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার উপকূলের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। জনমানসে তার প্রতিফলন আজো স্পষ্ট নয়, অথচ জাগতিক পরিস্থিতি আজ জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পৃথিবীর কোন সমস্যারই সমাধান খুঁজে পায় না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের বেলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ইয়োরোপ কয়েক শতাব্দী ধরে যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, সেই পথ ভারতবর্ষকে কয়েক দশকের মধ্যে অতিক্রম করতে হচ্ছে। বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগের সামাজিক বিপ্লব ও পরিণতি ভারতবর্ষে একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্বেই দেখেছি যে ধনতন্ত্রবাদ যেভাবে ইয়োরোপে বহুদিন ধরে বিকাশের ফলে আজ সেদেশে নতুন সমাজচেতনা, ধনতন্ত্রের সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে সমাজের সমস্ত মানুষের জন্য কল্যাণ-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, ভারতবর্ষে তা হয়নি, এখানে ধনতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার পূর্বেই কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ ও কার্যক্রম রূপ নিতে সুরু করেছে। যে অর্থসঞ্চয় ও ধন-সম্পদের ভিত্তিতে কল্যাণ-রাষ্ট্র রচনা সম্ভব, ভারতবর্ষে তা আজো রচিত হয়নি, যে পরিমাণ শিল্পকৌশল ও যান্ত্রিক উৎকর্ষের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনমান উন্নত হতে পারে, তারও একান্ত অভাব, অথচ যুগধর্মের টানে ভারতবর্ষ আজ কল্যাণ-রাষ্ট্র স্থাপনে

উন্মুখ, ভারতবর্ষের শ্রমিক ইয়োরোপ-আমেরিকার শ্রমিকের মতন অধিকার ও সুখ-সুবিধার দাবীদার।

ঠিক যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ একই সঙ্গে বিভিন্ন যুগের সাধনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করছে। জাতীয়তাবোধ সর্বস্তরে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হওয়ার পূর্বেই বিশ্বমানবতার আহ্বানে সাড়া দিতে হল, গণতন্ত্র সমাজের সকল মানুষের মনে বাস্তব হওয়ার পূর্বেই সমাজবাদের দায়িত্ব মেনে নিতে হল। বহুভাষাভাষী বহু-ধর্মাবলম্বী বহু মানুষের বাস এই বিরাট ভূখণ্ডে। গোষ্ঠীপ্রীতি, জাতীয়তাবাদ ও বিশ্ব-মানববোধ একই সঙ্গে আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দখল করতে চেয়েছে বলেই আজও ভারতবর্ষে সংকীর্ণতা ও উদারতা, অগ্রাভিযান ও পশ্চাদ্বর্তিতার বিচিত্র সমাবেশ।

ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতির ফলে সমগ্র পৃথিবী এক অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ধনতান্ত্রিক দেশ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে পৃথিবীতে একচেটিয়া অধিকার চায়। তখন এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের লাভালাভ বণ্টন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ সম্পদ একলা ভোগ করতে চাইলে সংঘর্ষ অনিবার্য, অন্তত স্বদেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে সম্পদ ছড়িয়ে দিয়েই ধনতন্ত্র টিকে থাকতে পারে। কার্ল মার্কস এ কথা বোঝেননি, তাই তিনি বলেছিলেন যে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য দিনদিন বেড়ে যাবে, ধনিকের বিলাসিতার সীমা থাকবে না এবং শ্রমজীবীর অনাহার, দুঃখ ও যন্ত্রণা দিন দিন বাড়বে এবং তার ফলে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠবে। বস্তুত তা হয়নি। ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমজীবীর জীবনের যে মান, অধনতান্ত্রিক দেশে শাসকশ্রেণীর পক্ষেও তা দুর্লভ। আমেরিকায় কুলিমজুর মেথরের কাজ যাঁরা করেন, তাঁদেরও নিজেদের মোটরগাড়ি, নিজেদের বাড়ি, নিজেদের রেডিও টেলিভিশন। তাঁরা যে আরামে থাকেন, এশিয়া আফ্রিকায় অনেক রাজামহারাজা সুলতান আমিরের ভাগ্যেও তা জোটে না। বরঞ্চ বলা চলে যে কালক্রমে ধনতান্ত্রিক দেশের সকল মানুষই অন্তত আংশিকভাবে ধনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। তখন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয় দেশে দেশে, ধনতান্ত্রিক দেশের সচ্ছল বিত্তশালী মানুষের সঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্পবিমুখ দরিদ্র দেশের মানুষের সংঘাত লাগে। কার্ল মার্কস যাকে শ্রেণীসংগ্রাম বলেছিলেন, তা আর তখন শ্রেণীসংগ্রাম থাকে না, দেশের সঙ্গে দেশের সংঘর্ষে বিশ্বসংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এ প্রসঙ্গে আরো দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কার্ল মার্কস সমাজকে যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, বাস্তবে তার পরিচয় মেলে না। ধনিক বা শ্রমিক বলে কোন স্বয়ং-সম্পূর্ণ শ্রেণী নেই। শ্রমিকের মধ্যেও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ এবং সেই সমস্ত শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে যুধ্যমান। শিল্পের ক্ষেত্রে যারা দক্ষ কারিগর, তারা শ্রমসর্বস্ব মজুরের সঙ্গে হাত মেলাতে চায় না। দক্ষ কারিগরের মধ্যে যারা একটু বেশী উপার্জন করে, তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বললেও অন্যায় হবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ঠিক তেমনি শতবিভক্ত। নীচের স্তরের মধ্যবিত্তের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর কোন তফাৎ নেই, আবার বিত্তবান মধ্যবিত্তশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর অন্তর্গত বললেও অত্যুক্তি হবে না। ধনিকের মধ্যেও যাদের কারবার বিশ্বব্যাপী, যারা হাজার কোটির হিসাবে ব্যবসায় করে, তাদের সঙ্গে লক্ষপতি বা কোটিপতির পার্থক্য কম নয়। এ সমস্ত বিভিন্ন স্তরের স্বার্থ কখনো মেলে, কখনো মেলে না। সে মিলন কখনো দেশ-ভিত্তিক, কখনো শিল্পভিত্তিক, কখনো শ্রেণীভিত্তিক। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতখানি প্রবল, সহযোগিতা ও সমাবেশও সমান প্রবল। কখন কোন

গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন গোষ্ঠীর সংঘাত বাধবে, কখন তারা মিলিত হয়ে একযোগে অন্য গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমষ্টির সঙ্গে দ্বন্দ্বে মাতবে, তার হিসাব রাখা কঠিন।

কেবলমাত্র সম্পদের ভিত্তিতে কার্ল মার্কস যেভাবে মানবসমাজকে শ্রেণীবিভক্ত করেছিলেন, তা-ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বোধহয় সর্বযুগেই মানুষের বুদ্ধি, বিচার ও সাহস সম্পদসৃষ্টির নতুন নতুন পথ খুলে দিয়েছে। বর্তমান যুগে একথা বিশেষভাবে সত্য। কার্নেগী বা ফোর্ড ধনীর সন্তান ছিলেন না, কিন্তু উদ্যোগ ও উদ্যমের সঙ্গে অসাধারণ প্রতিভার সম্মিলনে তাঁরা এ যুগের ধনিকশ্রেষ্ঠের মধ্যে নিজেদের আসন করে নিয়েছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধন নয়, ভগবৎদত্ত প্রতিভাই যে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মূলধন, এ কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিককালে মালিকানা-স্বত্ব এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা যেভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পুরাকালের ইতিহাসে তার নজীর মিলবে না।

পুরাকালে অর্থনীতি যখন প্রধানত মানুষের শ্রমনির্ভর, বড় জোর কোন কোন ক্ষেত্রে জান্তবশক্তির ব্যবহার সবেমাত্র সুরু হয়েছে, তখন পরিবার, গোষ্ঠী বা উপজাতিকে ভিত্তি করে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন চলত। বাড়ির কর্তা তখন চাষ করতেন, গিন্নী রান্নাবান্না ছাড়াও কাপড় বুনতেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা কেউ বাপকে, কেউ মাকে সাহায্য করত। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকটি পরিবারই অনেকখানি স্বনির্ভর, সমস্ত সমাজের একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলা চলে। অর্থনীতির পরিসর যত বাড়তে লাগল, ধীরে ধীরে পরিবারের বদলে গ্রাম তার ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবার বিভিন্ন ধরনের কাজে পারদর্শী হয়ে উঠল, সমাজে শ্রমবিভাগ অনিবার্যভাবে বাড়তে সুরু করল। কালক্রমে গ্রাম বা অঞ্চল ছাড়িয়ে দেশের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন সুরু হল। বাষ্পচালিত যন্ত্র যেদিন উৎপাদনের বহর আকস্মিকভাবে বাড়িয়ে দিল, সেদিন দেশ-দেশান্তরে শিল্পবাণিজ্য ছড়াতে সুরু করল। তারপরে বিদ্যুতের আবির্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের বিপ্লবকারী প্রগতি এবং বর্তমান যুগে আণবিকশক্তি, রেডিও, টেলিফোন, এরোপ্লেনের কল্যাণে দেশভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তিও টলে উঠেছে। আজ সামগ্রিকভাবে সমস্ত পৃথিবীর হিসাবেই উৎপাদন-বণ্টন, কেনা-বেচা, লেন-দেন। মানুষের মানসিক সংগঠন কিন্তু আজো বহুক্ষেত্রে পরিবার বা বড়জোর গোষ্ঠীর স্তরে আবদ্ধ—জাতীয়স্তরে পৌঁছেচে এ ধরনের মানুষ আজও বিরল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ভিৎ নড়ে গিয়েছিল। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি—উভয়ের মধ্যেই যে আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব তা আরো প্রকট হয়ে উঠল। যাদের মন সংবেদনশীল, বুদ্ধি যাদের সজাগ, নতুন নতুন ভাবনা, নতুন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাদের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত পৃথিবীতে যে প্রচণ্ড আলোড়ন, তাতে প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার আমূল বদলাতে সুরু করল। রুশ দেশে সোভিয়েট বিপ্লব এই আলোড়নের চরম প্রকাশ। তারপরে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেছে, তবু সেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের দূর-প্রসারী প্রভাব আজো নিঃশেষ হয়নি। অন্যসব কথা ছেড়ে দিলেও সে বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যেভাবে ব্যক্তিসম্পত্তি লোপের এবং মুনাফার বদলে সামাজিক প্রয়োজনে কৃষিশিল্প উদ্যোগের পুনর্গঠনের চেষ্টা হয়েছিল, সব দেশের সকল ধরনের সমাজকেই তার মোকাবিলা করতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে একচেটিয়া ব্যবসায়ের লক্ষ্য ব্যক্তির মুনাফা বৃদ্ধি। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রসার ঘটল, কিন্তু কাজে সর্বত্র না

হলেও নীতিগত ভাবে তার লক্ষ্য হল সমাজকল্যাণ।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরে আজ পৃথিবীর সকল দেশেই যুবসম্প্রদায়ের মনে ধনতন্ত্রের প্রতি বিরাগ। যে অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলে লক্ষ লোক বেকার হয়, অনাহার-মৃত্যুর বিভীষিকা সমাজে দেখা দেয়, আদর্শবাদী তরুণ যে তাকে বিসর্জন দিতে চাইবে, তাতে আশ্চর্য কি? ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রও পুরোপুরি বিকাশ লাভ করেনি। এখানে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের যে দোআঁশলা সমাজ সংগঠন, তাতে মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, ধনিক বা শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা সে পরিমাণে বাড়ছে না। মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে বলে সমাজে আজ সম্পদ ও নিরাপত্তা দুয়েরই অভাব। আজো ছাত্রসম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকেই আসে, তাই ছাত্র-জীবন থেকেই তাদের সামনে বেকার সমস্যা, অন্নকষ্ট এবং ফলে তাদের মনে সমাজবিদ্রোহ।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজ মধ্যবিত্ত সমাজে সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, সর্বত্রই তাদের মনে ভয় যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যেসব দেশে ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে, সেখানে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে তবু খানিকটা আশা। সম্প্রসারণশীল সমাজব্যবস্থায় তাদেরও একটা গতি হবেই। ভারতবর্ষে সে সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। এদেশে যতদিন ইংরেজের শাসন ছিল, সরকারী অনুশাসন দিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানের দ্বারা ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ রোধ হয়েছে। স্বাধীনতা যে পরিপ্রেক্ষিতে এল—বিশেষ করে পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ায় সামরিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিল—তার ফলে আজো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ পদে পদে ব্যাহত।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ থামেনি। যে দেশে শতকরা নব্বুই জন মানুষ অভাব অশিক্ষা ক্ষুধায় জর্জরিত, সে দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাগে যেটুকু সম্মান ও আরাম তা যে লক্ষ লক্ষ লোককে প্রলুব্ধ করবে, এটাও স্বাভাবিক। যে বিরাট মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংগঠনে তাদের সঙ্কুলান হবে না, অথচ নতুন কাঠামো ও পদ্ধতি গড়বার জন্য যে দূরদৃষ্টি, নিষ্ঠা ও অভ্যাসের প্রয়োজন, তারও একান্ত অভাব। যারা মধ্যবিত্তশ্রেণীতে পৌঁছে গেছে, তারা আর শ্রমিককৃষক শ্রেণীতে ফিরে যেতে নারাজ। অথচ তারা যে নতুন নতুন সৃষ্টিতে সমাজে পর্যাপ্ত সম্পদ সৃষ্টি করে নিজেদের এবং সমাজের কল্যাণ করবে, তারও কোন পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ ও বিদ্রোহী মনোভাব সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভারতীয় যুবসমাজের মনে আজ যে ব্যর্থতাবোধ এবং বিক্ষোভ, সমাজের এ অব্যবস্থা তার প্রধান কারণ। সমাজবাদের আদর্শ যে সকলেই সমান সুযোগ পাবে, সামাজিক বৈষম্য দূর হয়ে সকলে সমসমাজে একই ধরনের সুখসুবিধা পাবে, একই ধরনের কর্তব্য পালন করবে। এ আদর্শ যে তরুণ মনকে উদ্বুদ্ধ করবে তাতে বিচিত্র কি? কিন্তু বাস্তব জীবনে যে পরিস্থিতিতে তাদের বাস, তাতে এ সমস্ত আদর্শ আকাশকুসুম মনে হয়। একদিকে আদর্শের উজ্জ্বল আহ্বান, অন্যদিকে পরিবেশের দৈন্য ও গ্লানি—এ দুয়ের মধ্যে তারা সামঞ্জস্য করতে পারে না। তার ফলে কারু কারু মনে জাগে বিদ্রোহ, কিন্তু অধিকাংশ হতাশায় হাল ছেড়ে দেয়। বিষণ্ণ অবসাদ এবং তারই প্রতিক্রিয়া সব কিছুকে তাচ্ছিল্য করবার মনোবৃত্তি সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আদর্শকে রূপায়িত করতে হলে যে সাহস ও উদ্যম, যে সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, মুষ্টিমেয় তরুণের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে। যুবসম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ হতাশায় এলিয়ে পড়ে, বর্তমানের ক্ষণিক সুবিধা পেলেই

তারা খুসী, মুহূর্তের উত্তেজনায় দেয়াশলাইয়ের মতন জ্বলে ওঠে, আবার দেয়াশলাইয়ের মতনই নিভে যায়। ভবিষ্যতের আশা নেই বলে যারা বর্তমানকেও ধ্বংস করতে চায়, সেই ভাগ্যহত যুবসম্প্রদায়ের অসংলগ্ন এবং সামঞ্জস্যহীন অসরল চিন্তাধারায় যেসব উপাদান ভেসে বেড়ায় তার মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তাবাদের আহ্বান তাদের একদিকে টানে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের জাতীয়তাবিরোধী আহ্বানও তারা অস্বীকার করতে পারে না, এবং এই দোটানাকে আরো জটিল করে তোলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের নৈরাশ্য এবং তারই আনুষঙ্গিক লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি।

ভারতবর্ষে যেদিন ইংরেজ রাজত্বের পত্তন হয়েছিল, সেদিনই এ সর্বনাশের বীজ এদেশের মাটিতে বপন হয়। দেশের পুরাতন কৃষিপদ্ধতির উন্নতি হল না, সঙ্গে সঙ্গে কৃষিভিত্তিক কুটীরশিল্প ধ্বংস হতে চলল অথচ নতুন কোন ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে উঠল না, এ পরিস্থিতিতে যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে সমাজে দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। তবু কিন্তু বহুদিন সমাজের ব্যাধি আমাদের চোখে পড়েনি। তার অন্যতম কারণ যে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে যারাই ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছে, তারাই হয় সরকারী অথবা সওদাগরী অফিসে কাজ পেয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল এবং দশকের পরে দশক এ নবশিক্ষিত শ্রেণী ইংরেজের সহায়ক ও অনুচর হিসাবে আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা পেয়েছে। সহরে যাদের বাস, তারা সেকালে মোটামুটি সুখেই থেকেছে। যারাই শিক্ষিত, তারাই সরব, তারাই সমালোচনায় মুখর। তারা যখন পরিতৃপ্ত, তখন অসন্তোষ বা বিদ্রোহের কথা কে বলবে? মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী এ নতুন সমৃদ্ধিতে ভাগ পায়নি সত্য কিন্তু সেদিন তারা আর্থিক হিসাবে দুর্বল এবং বুদ্ধি ও চিন্তার জগতে প্রায় দেউলিয়া। ইংরেজের নিরন্তর অত্যাচারে তাদের মনোবলও সেদিন ভেঙে গিয়েছিল, কাজেই দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করেও তারা সরব প্রতিবাদ করতে পারেনি। গ্রামের লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান কৃষকের অবস্থা আরো কাহিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তারা নতশির দাঁড়িয়ে থাকে, মূক মুখে শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী লেখা, শুধু দুটি অন্ন খুঁটে কোনমতে কণ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে। তাদের মুখে কিভাবে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হবে?

ইংরিজিশিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্ত সমাজ সেদিন ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। তাদের সে নিষ্প্রশ্ন প্রত্যাপূজা কিন্তু বেশী দিন টিকল না, অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মনেও নানা সমস্যা ও সন্দেহ দেখা দিল। অর্থনৈতিক সংকট যত জটিল হতে লাগল, তাদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহও ঠিক সেই পরিমাণে সোচ্চার হতে সুরু করল। ইংরিজি-শিক্ষিতের সংখ্যা যতদিন মুষ্টিমেয় ছিল, তারা প্রত্যেকেই জীবিকানির্বাহের উপায় পেয়েছে, কিন্তু তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন অর্থনৈতিক সংগঠনে তাদের সকলের সঙ্কুলান সম্ভব হল না। ভারতবর্ষে যদি সেদিন ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ দেখা দিত, তবে হয়তো তারা সকলেই নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোয় নিজ নিজ স্থান খুঁজে পেত। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ পদে পদে ব্যাহত। শুধু তাই নয়, কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক কুটীরশিল্পকে নির্ভর করে যে সনাতন অর্থনীতি এদেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলির ধ্বংসের ফলে তাও ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে পড়ল। উনবিংশ শতকে ইয়োরোপে শিল্প-উদ্যোগের উৎকর্ষের ফলে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ মানুষের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমেছে, সহরবাসী শ্রমিকের সংখ্যা অনবরত বেড়েছে, আর

ভারতবর্ষে এই একশো বছরে কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা বাড়ল প্রায় শতকরা দশজন। যে দেশে শতকরা আশীজনেরও বেশী ভূমিনির্ভর, সে দেশে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করবে এ আশা দুরাশা। সে দেশের নবশিক্ষিত সমাজে যে বেকারের সংখ্যা অনবরত বাড়বে, তা-ও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ১৭৫০ সালের পরে প্রায় দেড়শো বছর ধরে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের শিল্প-উদ্যোগ বাণিজ্য ক্রমাগত কমেছে কিন্তু যতদিন নবশিক্ষিত সমাজ সরকারী বা সওদাগরী অফিসে কাজ করে অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে ভূমিরাজস্ব আহরণ করে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করেছে, ততদিন এ ক্ষয়ের দিকে কেউ বিশেষ দৃষ্টি দেয়নি। নবশিক্ষিত সমাজে যখন বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপে দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর চাপ বাড়তে লাগল—বিশ শতকের গোড়ায় বিভিন্ন মধ্যস্বত্ব নিয়ে একই জমির উপার্জন থেকে পঞ্চাশটি পরিবারের জীবিকার সংস্থান হয়েছে—তখন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংকটকে অস্বীকার করা কারুর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আরো একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। দিন দিন দেশের দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে জীবনমান বাড়াবার ব্যাকুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে। গরীবের এ ঘোড়া রোগ কেন হল তাও সহজেই বোঝা যায়। ইয়োরোপের যেদিন এ দেশে আবির্ভাব, তখন সেখানে ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা সুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের বিপুল ধনসম্ভারের ব্যবহারে ধনতন্ত্রের অগ্রগতি কিভাবে দ্রুততর হল, তার বিশদ আলোচনার এখানে স্থান নেই। ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্রের বিকাশে রাজনীতি ও সমাজ-নীতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিস্ময়কর পরিবর্তন, সে আলোচনাও আমাদের পক্ষে অবান্তর। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে অর্থনীতির তাগিদে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন মোড় নিল।

প্রথম সংঘাত বাধল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। এদেশের অপরিণত ও মুখ্যত গ্রামভিত্তিক শিল্পউদ্যোগ ইয়োরোপের নবজাগ্রত ধনতান্ত্রিক শিল্পউদ্যোগের মোকাবিলায় পরাজিত হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আকবরের রাজত্বকালে প্রাথমিক ধনতন্ত্রের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা নষ্ট হয়ে ভারতবর্ষ আবার গ্রামভিত্তিক কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দিকে ফিরতে বাধ্য হল। কৃষিনির্ভর সমাজে সকলের কাজের সংস্থান কেবলমাত্র অনগ্রসর অথবা জনবিরল দেশেই সম্ভব। ভারতবর্ষে একদিকে শিল্পবাণিজ্যের অবক্ষয়ে মানুষের কর্ম-সংস্থানের সম্ভাবনা কমে এল, অন্যদিকে ইংরেজ শাসনে দেশে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হয়ে যে শান্তি স্থাপিত হল, তার ফলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে সুরু করল। রুজির পথ কমছে অথচ রোজগারের উমেদারের সংখ্যা বাড়ছে, এ পরিস্থিতি যে কোন যুগে যে কোন দেশের জন্য বিপজ্জনক।

বহিরাগত ইয়োরোপের উন্নততর জীবনমানের সংস্পর্শে এসে ভারতীয়দের মনে জীবিকা সম্বন্ধে নতুন ভাবনা, নতুন দাবী আসায় ভারতবর্ষে সে সংকট আরো তীব্রভাবে দেখা দিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপ্রতি জমির হার কমতে লাগল, শিল্প-বাণিজ্য অবক্ষয়ের ফলে মানুষ আরো বেশী করে ভূমিনির্ভর হয়ে পড়ল, অথচ সেই সঙ্গে উঠল উন্নততর জীবনযাত্রার দাবী। সরকারী বা সওদাগরী অফিসের চাকুরেরা নিজেদের বাড়িতে খানিকটা ইয়োরোপীয় ঢঙ এনে ফেলল এবং তাদের দেখাদেখি পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সকলের মধ্যেই নতুন নতুন জিনিসের দাবী বাড়তে লাগল। ইংরিজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শও সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। যাদের সঙ্গতি কম, তারা

পূর্বেকার মতন অল্পে তুষ্ট না হয়ে যাদের সংগতি বেশী তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। পূর্বে নবাববাদশা রাজারাজড়া যে বিলাসিতায় জীবনযাপন করতেন, সাধারণ লোকের অধিকাংশ তার খবর পর্যন্ত রাখত না। বর্তমান যুগে চলাচলের সুবিধা, খবরের কাগজ পত্র-পত্রিকা টেলিফোন রেডিওর মারফৎ প্রায় সব খবর প্রায় সকলের কাছে পেঁছে। পুরাকালে ভবিতব্য বলে মানুষ অনেক অন্যায় অত্যাচার অসাম্য সহ্য করেছে। বর্তমান যুগে মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। বিধির বিধান বলে দারিদ্র্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। নিজের শক্তিতে নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য যে পুরুষকার ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা কিন্তু সকল সমাজেই বিরল। তাই স্বকীয় চেষ্টায় নিজের ভাগ্য ফেরানোর বদলে অধিকাংশ মানুষ অন্যের সৌভাগ্যকে হিংসার চোখে দেখে, নেতিবাচক পরনিন্দা ও ঈর্ষা সমাজকে কণ্টকিত করে।

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ একদিকে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের আকর্ষণে প্রলুব্ধ, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জর ও বিভ্রান্ত। এই দুই শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন, তাকে স্বীকার না করলে বর্তমানের সমস্যার সমাধান হবে না। ইয়োরোপ যে জীবনছবির সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলেছে, দরিদ্র ভারতবর্ষে তার রূপায়ন সম্ভব নয়। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান যত বাড়ছে, অসন্তোষের মাত্রাও ততই তীব্র হয়ে উঠছে। চলাচল ও ভাবের আদানপ্রদানের উৎকর্ষের ফলে সে অসন্তোষ কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত দেশে সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই তাদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। একথা কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়, আজ পৃথিবীর সকল দেশেই চাওয়ার সংগে পাওয়ার ব্যবধান বৃদ্ধির ফলে সব দেশের সব সমাজেই বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত। ধনতান্ত্রিক শিল্পউদ্যোগে অগ্রণী দেশেও এ সমস্যা দেখা দিয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি রাজশক্তির ব্যবহারে ব্যাহত হয়েছে বলে সমস্যার তীব্রতা এদেশে—এবং প্রায় সমস্ত প্রাক্তন উপনিবেশ ও অধুনা স্বাধীন দেশে—আরো তীব্র।

ইতিহাসের গতি অন্য মোড় নিলে কি হত, তা বলা বোধহয় অসম্ভব। তবু মানুষ ইতিহাস নিয়ে বিচার করে, আলোচনা করে, বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা ভাবে। মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের পরেও ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হিসাবে ইয়োরোপের সংস্পর্শে আসত, তাহলে এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ স্বাভাবিক হত এ কথা মনে করা অন্যায় হবে না। জাপান স্বাধীন দেশ হিসাবে ইয়োরোপকে গ্রহণ করেছিল, সেদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ কোন কোন ক্ষেত্রে ইয়োরোপ অথবা আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে তা হল না কিন্তু তবু প্রথম দিকে ইংরেজের শাসন এদেশের পুরাতন বিশ্বাস ও আচারের বন্ধনকে শিথিল করেছিল বলে তাকে প্রগতিশীল শক্তি বলা চলে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রগতিবাদী রূপ কিন্তু বেশী দিন টেকেনি। স্বকীয় স্বার্থে তা যেদিন ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করল, তখন থেকে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি না বলে উপায় নেই। একবার সুরু হলে পরিবর্তনের গতিকে কিন্তু আর রোধ করা যায় না। ভারতবর্ষেও তাই বহু পরিবর্তন এসেছে এবং ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হওয়ায় ক্রমস্ফীতমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর এ অসমঞ্জস প্রসারের মধ্যে ইংরেজ এদেশে নিজের স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করেছে। ইংরেজের লক্ষ্য ছিল যে মধ্যবিত্তশ্রেণী মনে প্রাণে ইয়োরোপ-ঘেঁষা হবে, ইয়োরোপের ভাবধারা এদেশে প্রচার করতে সাহায্য করবে, ইংরেজের পণ্যসামগ্রী সুদূর পল্লী পর্যন্ত পেঁছে দেবে। পরিবর্তে ইংরেজ কিন্তু তাদের সহকর্মী বা অংশীদার করতে চায়নি।

নিজেদের বিরাট মুনাফার এক ভগ্নাংশ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেছে। ইংরেজের এ স্বপ্ন বেশীদিন টেঁকেনি। তাদের করুণার দানের ছিটেফোঁটা নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বেশীদিন পর্যন্ত থাকেনি, অল্পদিনের মধ্যেই নবসৃজিত সম্পদের ন্যায্য ভাগের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য, তারও অংশ দাবী করতে সুরু করল। ইংরেজ আমলের পূর্বে মধ্যবিত্তশ্রেণী হয় অর্থবান মুসলমান অথবা হিন্দু-সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরিজি শিক্ষার কল্যাণে যে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠল, সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত শ্রেণীর মানুষই তাতে কমবেশী স্থান পেল। মিশনারীদের উদ্যোগে কোন কোন ক্ষেত্রে দরিদ্রতম এবং সমাজের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ শিক্ষা ও সম্পদের ভিত্তিতে মধ্যবিত্তের মর্যাদা লাভ করল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নতুন ভাবধারা সঞ্চারিত হওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর চিন্তাধারাই ভারতীয় সমাজের নবজীবনের বাহক ও প্রতীক হয়ে উঠল।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই অস্বাভাবিক ও অসমঞ্জস স্ফীতিই সাম্প্রতিক যুগের ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর সব দেশেই মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমালোচামুখর এবং অশান্ত। মধ্যবিত্তশ্রেণীর যে সংগঠন, তাতে আর্থিক স্থিতিশীলতার স্থান নেই। উপরে উঠবার যে নিরন্তর প্রয়াস, অনেকের ক্ষেত্রেই তা সফল হয় না। শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকেই মধ্যবিত্তের সুখসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দরিদ্র শ্রমজীবীর পর্যায়ে নেমে আসে। সঙ্গতি না থাকলেও বাইরের ঠাট বজায় রাখতে তাদের প্রাণান্ত, বাইরের জাঁকজমকের জলুষ ভিতরের দৈন্যদারিদ্র্যকে আরো নিষ্ঠুরভাবে ফুটিয়ে তোলে। "ভদ্রজীবন" যাপনের এই যে নিরন্তর সংগ্রাম, তার ফলে তাদের উদ্যম ফুরিয়ে যায়, মন বিষিয়ে উঠে। যারা অভিজাত, সমাজে নিজেদের স্থান সম্বন্ধে তারা এত নিঃসন্দেহ যে নেতৃত্ব নিয়ে তারা কখনো কোন প্রশ্নই তোলে না। যাদের কোনই সঙ্গতি নেই, মেহনত বেচে কোনরকমে রুজির সংস্থান করে তাদের মনেও মিথ্যা মানসম্ভ্রমের কোন বালাই নেই। মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্পদ নেই কিন্তু মর্যাদাবোধ ষোল আনা। নিজেদের দৈন্যে তারা লজ্জিত এবং সেই লজ্জা ঢাকবার জন্য প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। পৃথিবীর সব দেশেই তাই মধ্যবিত্তশ্রেণী স্পর্শকাতর, অভিমানী এবং সোচ্চার। নিজে উপরে উঠতে না পারলে যারা উপরে আছে তাদের টেনে নীচে নামিয়ে সমান হতে চায়। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এই যে অন্যকে সমালোচনা—বহুক্ষেত্রে নিছক পরনিন্দা—তা যে শুধু অন্য শ্রেণীর মানুষের জন্য তা ভাবাও ভুল হবে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষকে যত সমালোচনা করে, নিন্দা করে, অন্যকেও বোধ হয় তত করে না। একেই তো মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই নানা স্তরবিভাগ। যারা উচ্চমধ্যবিত্ত, তারা বহুক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে পাল্লা দিয়ে চলে। অন্য প্রান্তে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেও যারা নিম্ন, তাদের দিন-মজুরের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। তাই মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রত্যেক স্তরই নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন, প্রত্যেক ব্যক্তি ভাবে অন্যে বুঝি তাকে অবহেলা বা অপমান করল। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের মনে ভয় তার প্রতিবেশী বুঝি তাকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেল। ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষা, বোধহয় আর কোন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তার পরিচয় মিলবে না। মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক বললেই সবখানি বলা হবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সমাজে যখন মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা বাড়ে, তারাই যখন সমাজমানসকে চালিত করে, তখন

সমাজে ভাঙন সুরু হয়।

ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণ ইয়োরোপীয় প্রভাবের একটি দিক। অন্যভাবেও ইয়োরোপের প্রভাবে ভারতীয় মানসে নানা পরিবর্তন এসেছে। ইয়োরোপের সমাজসংগঠন ভারতীয় সমাজদৃষ্টির সঙ্গে বহু ব্যাপারে মেলে না, অথচ ইয়োরোপের ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করারও উপায় ছিল না। ফলে ভারতীয় চিন্তাধারাকে অস্বীকার করেও যে উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়া যায়, এ কথা মানতে বাধ্য হল। আদিকাল থেকেই এদেশে বারবার নতুন নতুন অভিযাত্রী নতুন নতুন জীবনদৃষ্টি এনেছে কিন্তু পূর্বে বহুক্ষেত্রেই অভিযাত্রী সংখ্যায় অল্প এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সভ্যতা-সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ বলে সামরিক বিজয় সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এদেশের ভাবধারাকেই গ্রহণ করেছে। যুদ্ধবিগ্রহ এবং পরাধীনতার ফলে এদেশের সমাজেও রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুনকে অস্বীকার যেখানে করতে পারেনি সেখানেও তাকে নিজের মত করে মানিয়ে নিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে সমস্ত সংস্কার প্রয়োজন, বহুক্ষেত্রে সমাজের রক্ষণশীল তাকে বাধা দিয়েছে। হয়তো রাজধানীর আশেপাশে নগরে শহরে গঞ্জে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু চলাচলের অসুবিধা এবং দেশের বিপুল আয়তনের ফলে দেশের বিরাট অংশে পরিবর্তনের কোন নিশানা মেলেনি। ইসলামের আবির্ভাবে জনমানসে যে আলোড়ন, যাতায়াত ও ভাবের আদান-প্রদানের অসুবিধার জন্য তাও সমস্ত দেশে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত হয়নি। ইয়োরোপের প্রভাব সে তুলনায় আরো বেশী ব্যাপক। ইংরিজি শিক্ষার ফলে দেশের সমস্ত অঞ্চলে সমস্ত সমাজের মানুষের মনে নতুন চাঞ্চল্য, নতুন চেতনা এল। রেল স্টীমার ডাক টেলিগ্রাফের কল্যাণে শুধু পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনা নয়, ভাবজগতে লেনদেনও অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ল। সহরের প্রভাব আর সহরে সীমাবদ্ধ রইল না—গ্রাম এবং সহরের দূরত্ব দিনদিন কমে এল।

[ক্রমশঃ]

আপনার কীর্তি

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? না, আপনি আমায় দেখেননি, দেখবেন কী করে? তবু রাস্তায় রাস্তায় যে-কয়েকজন ঘোরে আপনার পিছনে পিছনে, নীরব অনুসরণে, ততটা কৌতুকের ভংগীতে পিছু নেওয়ায় নয় (যদিও সেরকম লোকও ছিল, মানছি, আসলে অধিকাংশই তাই), যতটা অভিভূত চেতনার এক যাত্রায় সংগী হতে চেয়ে (অন্তত কথাটা সত্য আমার নিজের ক্ষেত্রে), সেই দলে যে আমিও ছিলাম, আর তাই বলছি--হ্যাঁ হ্যাঁ, কান্ডটা আপনিই করলেন, এখন আমার দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে কী হবে বলুন তো? আর বলুন তো, কী অমানুষ দেশে বাস করি আমরা, কী ভয়াবহ এক অসভ্য যুগে, নইলে কী এমন আপনি করেছেন যা নিজে করেও আপনার নিজেরই কাছে এখন মনে হচ্ছে সত্য নয়, স্বপ্নের মত (আশা করি দুঃস্বপ্নের মত নয়, তা হলে আপনার অসামান্য অর্জনের সবটুকুই এতক্ষণে নিষ্ফল তো হয়ে গেছেই, আমিই বা কেন এই আশ্চর্য টুকটুকে গোধূলিতে খামাখা পথ ভেঙে আপনার যুঁই-গোলাপ-হাস্নাহানা মুখরিত উঠানে এসে বসব, আপনারই বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে আপনারই চা ধ্বংস করব), আর আমি এসেছি গদগদ হয়ে আপনারই কৃত কীর্তিতে আপনার প্রতীতি জন্মাতে। ইচ্ছা হয়, ফেলে দিই এই বসন, গায়ের এই অসভ্য সভ্যতার অলঙ্কার, সর্বাংগে সিঁদুরের টিপ পরা আজকের এমন একটি আকাশে নীড়ের পথে শেষ যাত্রায় যে-কটি বিহংগ দ্রুত পাখার ঝাপটে এখনো উড়ন্ত, তাদের মত মুক্তিচারী হই—যেন শুদ্ধতার, মানুষিকতার একটি অনন্য অপরিহার্য নীড় আমার জন্য আজো লুকানো কোন দুর্গমের গহনে, ছায়ায় ঢাকা নীল সরোবরের কাকচক্ষু কিনারে, ঘন অর্কিডের দুর্লভ কোন পাতার-ফুলের আড়ালে, যার ঠিকানা জানিনি।

তবু নিজের কথা তো বলতে বসিনি, আপনাকে শোনাতে এসেছি আপনার কথাটাই। আমার মুস্কিলটা কী জানেন---যে-মুস্কিল আমার একলারই নয়, আমার মত সকলের—অনর্থক ফটাফট কাব্য করতে বসে যাই, যেন জীবনে কাব্যটাই সব, যেন সত্যের সংগে কাব্যের কোনো সম্বন্ধ নেই, যেন সত্য পাইনি বলেই কাব্য করছি ও করে ভাবছি কিছু একটা করলাম। আসলে জানেন, ভিতরে আমাদের সকলের বহু গ্যাস জমে আছে, যে-গ্যাস সত্যকারের কোনো কিছুই অর্জন না করতে পারার, দিন-রাত্রি-সকাল-বিকাল-দুপুরের প্রতিটি মুহূর্ত ধরে তুচ্ছ হওয়ার ও বৃথাই তুচ্ছাতীত হতে চাওয়ার অসহ্য গ্লানি সর্বক্ষণ বহন করার। আমাদের কাব্য সেই গ্যাসেরই সাময়িক ও পৌনঃপুনিক উদ্গিরণ, পচা ডিমের স্বাদ-ভরা চোঁয়া ঢেকুর হঠাৎ হঠাৎ—অর্থাৎ এখনকার এই সূর্যাস্ত অথবা সেই নীড়ের এত যে-প্রসংগাত্মক বক্রোক্তি, তাও হুবহু তাই। নীড়ের কথা বলছিলাম না? সে-নীড়ে আমি নই, আমরা নই, আপনিই পৌঁচেছেন, না পৌঁছোলেও নীড়াভিলাষী সেই মুক্তিচারী বিহংগ আপনি হয়েছেন, অন্তত একটি বার, এবং সেটা কি কিছু কম? আরে মশাই, মুখ গোমরা করে ভাবছেন কী, বলে উঠুন না, হিপ হিপ হুররে! অন্তত আমি হলে তো বলে উঠতামই, কারণ আমরা যখন পাঁয়তাড়া কষছি নদীর এই কিনারে, গৃহপালিত ছাগলের মত খুঁটির সংগে সভ্যতার-সংস্কারের লম্বা রঙবেরঙের দড়ি দিয়ে আমাদের গলা বাঁধা, তখন কত সহজে

আপনি সেতুটা পেরিয়ে গেলেন, এক মুহূর্তের একটি প্রকাণ্ড লাফে, এতটুকু দ্বিধা পর্যন্ত না করে—কোন ভাষায় বলব আপনার ঈর্ষণীয় কীর্তির কথা? আমার, দাদা, তাই ঐ কাব্যটাই আছে, মার্জনা করবেন, যে-আপনি পারে পৌঁছে গেছেন, পৌঁচেছেন অন্তত একটি বারের জন্যও। আমাকে তাই বলতে চান তো বলুন—না কি আপনি কিছুই বলবেন না এই আসন্ন সন্ধ্যায়, যখন আশপাশের বাড়ীগুলোয় কমলা রঙ, হাওয়ায় দূরে গন্ধবহ নিশ্বাস (শুধু দোহাই আপনার, আবার ভাবতে বসবেন না, যা করলেন তা ভালো কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, ও-দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে আর নাই বা গেলেন)—হ্যাঁ, তাই বলতে চান তো বলুন, এটা আমার একটা আত্মরতিই, আপনার কীর্তি আপনাকে শুনিয়েই একটা নামহীন আনন্দে মদির হওয়া, নিজে যেটা পারিনি (এবং জানি, কোনোদিন পারব না), কিন্তু পারলে বর্তে যেতাম, সেটা একজন তো করেছে এবং সেই একজনের কাছে কথাটা পাড়তে আমি এসেছি, এটা ভেবেই আপাতত ধন্য হওয়া।

অবশ্য এই মুখ-গোমরা ভাবটা, আপনার এই মানসিক দ্বন্দ্বটা (যদি সেই দ্বন্দ্বতেই ভুগছেন আপনি এখন) যে একেবারে অস্বাভাবিক নয়, তা মানি। দেখছেন তো, আমি আপনার সব কথা ধরে ফেলছি, বুঝতে পারছি আপনার ভিতরের সব গোপন সত্যটাকেই। আর তা পারব নাই বা কেন বলুন? আমরা যে গড়া একই ধাঁচে, আমাদের অস্তিত্বও সংজ্ঞা পায় একই দুর্লঙ্ঘ্য সীমার বাঁধনে—এমন কি যে-বাহ্যিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বেশ তোফা আছি বা যে-নীরব গ্লানির স্ফুলিঙ্গে আমাদের নির্জন রাত্রির আকাশ হঠাৎ হঠাৎ অনন্ত তারকায় খচিত হয়, বুকে আগুন জ্বলে, আমাদের মনটা পড়ে থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ক্রুশবিদ্ধ, তাও আপনার যেমন, আমারও তেমনি। তফাৎ শুধু—এবং সেটা কিছু কম তফাৎ নয়, মানছি—আপনি ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড করে বসে আছেন, এক অজানা রাজ্য পাড়ি দিয়ে এলেন, যে-কাণ্ড আমি করিনি, যে-রাজ্যে আমি যাইনি, যাবও না। তাই কী বিচিত্র নিসর্গ সেখানে আপনি দেখে এলেন ও যার স্মৃতিতে আপনার মুহূর্ত এখনো দ্যোতনাময়, তা আমি কোনোদিন জানব না। আর সেটা জানিনি বা কোনোদিন জানব না বলেই তো এসেছি আশায় আশায়, কে জানে যদি একটু প্রসাদ পেয়ে যাই, একটু আভাস মাত্রও পাই এই নীরবে চেয়ে থাকা আপনার অন্তরের অন্তরীক্ষের, তার কিছু মহান তোলপাড়ের, কিছু স্পন্দনের।

দেখছেন তো, কেমন একটা কথা ধরে আরেকটা কথা আসছে, আজ আমার এত কথা, এমন বাচাল আমি, যখন আপনি একলাই শুধু নীরব নন, আশপাশও সমস্ত কথা বিদায় দিয়ে রাত্রির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, শেষ পাখি সব ডেকে গেছে, রাস্তায় লোক চলাচলও ক্রমশই ক্ষীণ—আর এ-সহরে এমনিতেই কেই বা হাঁটে, বিশেষত সন্ধ্যার পরে। আকাশেও দেখুন কী করে গাঢ় প্রলেপ পড়ে চলেছেই, সিঁদুর কী করে তামাটে হল, তামা কী করে ইতিমধ্যেই প্রায় কয়লাটে, এবং সেই কষ্টিপাথর হতেই অচিরে আবার কী করে অসংখ্য তারার ফুলঝুরি জাগল বলে। এক কথায়, সর্বত্রই আমন্ত্রণ এক ভিতরে যাবার, আত্মার অবগাহন স্নানের—যেমন এই উঠানে, উঠান পেরিয়ে রাস্তায়, রাস্তা পেরিয়ে আকাশে, তেমনি পায়ের উপর পা তুলে আপনার বসে থাকায়, মৃদু মন্দ হাওয়ায় ধাক্কা-খাওয়া আপনার থুতনিতে, আপনার চোখের চাওয়ায়। তবু চেয়ে তো আপনি রয়েছেন আমারই দিকে, যেন আমি কী বলছি তা শুনতে চান, যেন শোনার সত্যিই আগ্রহ আছে আপনার, যেন চান—যা আমিও চেয়েছি, যার জন্য এসেছি—আজ দুপুর হতে যা কিছু ঘটেছে, অর্থাৎ যা কিছু আপনি একমাত্র নিজেই করেছেন, চান যেন তা আমি এখন আপনার চোখের সামনে পড়া পাতার মত একটির

পর একটি তুলে ধরি, আপনাকে মগ্ন করি এমন একটি গল্পে যা কোনো গল্পই নয়, বরং যার আদ্যোপান্ত আপনার মত করে এমন কেউই জানে না (অর্থাৎ এ-গল্পটা আমি আপনাকে নয়, আপনিই আমাকে করতে পারতেন, যদি অবশ্য এরকম মুখ-গোমরা না করে বসে থাকতেন), কারণ সে-গল্পের নায়ক আপনিই, তার প্রতিটি ঘটনা আপনারই সৃষ্ট, সোজা কথায়, গল্প নয়, আজকের দুপুরের কাণ্ডটা আপনার, একমাত্র আপনারই, নয় কি? আমি বলতে এসেছি, ঠিকই, বলতে আমার ভালোও লাগছে, তাও ঠিক—কিন্তু আমার বলায় অনেক গোঁজামিল থাকতে হয়তো বাধ্য, কারণ আপনি কী করলেন, যেমন হাত-পা-নাড়া-গান-গাওয়া বা বাড়ী থেকে বেরোনো বা বাড়ী ফিরে আসা বা মাঝখানের সময়টা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা ইত্যাদি, আমার মোল্লার দৌড় তো ঐ মসজিদ পর্যন্তই, সেই নিছক চোখে দেখার ব্যাপারটাই তো আমার একমাত্র সম্বল। কারণ আমি কেমন করে জানব বলুন কী কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর বা কী করে গানটা আপনি তোলেন বা ভিক্ষুকের সঙ্গে ঠিক কোন কথাটি আপনার আজ হয় বা তার সঙ্গে আগে কখনো কোনো কথা আপনার হয়েছে কি না। বা ধরুন না আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর সম্পর্কটাই, সেটা সম্বন্ধেই বা আমি কী জানি বা জানতে পারি। তাই বুঝতেই পারছেন, অনেক ফাঁক পূরণ করে নিতে হচ্ছে আমায়—তবে কি কৌতুকেই আপনি এ-মুহূর্তে মগ্ন, দেখতে চান আমি জেনেছি কতটা, আমার গল্পটা কেমন দাঁড়ায়? এবং ভাবছেন, সব সত্য না হলেও সত্যে-অসত্যে মেশা আমার কাহিনী হয়তো আপনাকে পৌঁছে দিতে পারে প্রার্থিত তীরের আরো কাছে? বেশ, তবে তাই হোক, সত্য-মিথ্যা জানি না, জিনিসটাকে আমি যেভাবে খাড়া করেছি, বলে যাই, এখন আপনি তাকে মিলিয়ে নিন মনে মনে।

কিন্তু আরম্ভ করব ঠিক কোনখানটি দিয়ে? আজ সেই দুপুরের গেট নাড়ায়, ঐ বেলা আড়াইটে নাগাদ, যখন আপনি এই আমারই মত উঠানে বসে, আপনার এই উঠানটাতেই, হয়তো আমারই এই বেতের চেয়ারটাতেই, অর্থাৎ আপনার যে-চেয়ারটাতে এখন আমায় বসতে দিয়েছেন, এবং আপনি বসেছিলেন হয়তো এখনকার এই আমারই মত মুখ করে, রাস্তার দিকে চেয়ে, আপনি এভাবে একা বসেছিলেন, কারণ আপনার স্ত্রী তখনো আসেননি, মানে তিনি বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু রোজকারের মত তখনো উঠানে এসে হাজির হননি? না কি আরো একটু পিছনে যাওয়া দরকার, বলা দরকার, আমার মত আপনিও এই শৌখিন পাড়ার বাসিন্দা হয়েও এ-পাড়ার উপযুক্ত জীবনের অনেক কিছুর সঙ্গেই নিজের মনটাকে এখনো কিছুতেই খাপ খাইয়ে উঠতে পারেননি, পাড়ার কাউকে চেনেনও না তাই, চিনতে চানও না, যদি কেউ কখনো এসে থাকে আপনার কাছে আলাপ জমানোর জন্য, প্রতিবেশী হিসেবে নেহাৎই সৌজন্যের খাতিরে, তো তার বাড়ীতে ফিরে আপনি যাননি একটি বারের জন্যও, সে-ভদ্রতা রক্ষা আপনি করেননি? কী রকম আপনারই মত এই আমিও দেখুন—কই, আমি তো কখনো আসিনি আপনার দরজায়, কতবার চোখোচোখি হয়েছে রাস্তায়, এবং রাস্তা সব সময় এমন ফাঁকা বলেই সেটা প্রতিবারই দুজনের পক্ষে রীতিমত বিড়ম্বনার বিষয় হয়েছে (বুকে হাত দিয়ে বলুন, সত্যি বলছি কি না), কারণ জনবহুল রাস্তায় এসব ঝক্কি নেই, চাইলে (যেমন আমরা সব সময় চেয়েছি) একে অন্যকে অনায়াসে এড়াতে পারে। এবং সেই বিড়ম্বনা সত্ত্বেও একবারও কি মাত্র সিকি সেকেন্ডের জন্যও আপনার দিকে চেয়ে মিষ্ট একটু হাসি হেসেছি, বা আপনি হেসেছেন আমার দিকে চেয়ে? বরং হাসির সময় আজই, এই এখনই—আসুন, এবার প্রাণ খুলে হো হো করে হাসা যাক,

কারণ অবশেষে বোঝাই যাচ্ছে, আর লুকোচুরিতে দরকারটা কী, দুজন দুজনকে ঠিক চিনে ফেলেছি, এবং এই দেখুন তাই, আমি আজ সটাং নিজেই আপনার দরজায় এসে হাজির, কোনো নিমন্ত্রণের ধার না ধেরে, ভদ্রতা বা অভদ্রতাবোধের সব বালাই ঘুচিয়ে। আরো একটা মজার ব্যাপার, মুখে আমায় চেনেন, কারণ একাধিকবার রাস্তায় দেখেছেন, কিন্তু আমার নাম কী বলুন তো? বাজী রাখছি, বলতে পারবেন না—অতএব আসুন, আবার একটু প্রাণ খুলে হো হো করে হাসা যাক। আমিও মুখে আপনাকে চিনতাম, কিন্তু নামটা জানতাম না, এখন জানি, কারণ আপনার বাড়ীতেই যে বসে আছি, আর গেটে আপনার নেমপ্লেটটাও দেখেছি, সুতরাং মনে মনে এক আর একে দুই করছি। আমার নামটাও জানতে গেলে তাই আমার বাড়ীতে একবার আপনাকে যেতে হবে, অবশ্য তার আগে যদি চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই নিজের পরিচয়টা দিয়ে না বসি, এই ধরুন এই মুহূর্তেই—কিন্তু সেটা আমার অভিপ্রেত নয়, নিশ্চয় আপনারও নয়, এবং সেটায় আমার-আপনার কারুরই কোনো লাভও নেই। মোদ্দা কথাটা হল, আমরা উভয়েই ভারতের রাজধানীর এই বাহারে পাড়ায়, রাজধানীর সুখের চাকরির সম্ভোগে-সম্ভারে-নিরাপত্তায় রঙচঙের পোশাকে-পরিচ্ছদে মোটরগাড়ীতে যাকে বলে রীতিমত বেশ তোফা আছি। তবু (এই তবুটাই বড্ড গোলমেলে, হাসুন দাদা আরো একবার) জানেন, কেমন একটা অস্বস্তির ভাবও আমাদের আছে, সমাজের সামনে কেমন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব, যেটা বিছের মত যেন কামড়ে ধরে থাকে আমাদের, কিছুতে ছাড়ে না, না আমাদের আপিসের শীততাপনিয়ন্ত্রিত আরামে, না সন্ধ্যায় এট-ওটা নানান পার্টির পানভোজনে, না উইকএন্ডে দিল্লীর বাইরে মোটর হাঁকিয়ে পালিয়ে যাওয়ায়। শেষে কখন বলে উঠি, কীই বা করার আছে আমাদের, কেন আমরা এভাবে নিজেদের দোষী মনে করে চলব, এ-সমাজের জন্ম তো আমরা দিইনি, বরং আমরা তার ফলমাত্র, হোক না সে-ফল বিষবৃক্ষে সোনার আপেলই, কিন্তু তা বলে তো গাছটার শিকড় ওপড়াতে ফল পারে না। বলি নিজেদের, কাজ করছি, পয়সা পাচ্ছি, সে-পয়সা ভোগ করছি, ব্যস, ফুরিয়ে গেল--তা নয়, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, যত সব! আসলে কী জানেন, এই প্রবাসী নবাবিপনায় এক পাড়ায় আমরা দুজন শুধু বাঙালীই নই (অবশ্য এ-প্রসঙ্গ তোলাই বা কেন আপনার কাছে আজ, আপনি তো কত বেড়া পেরিয়ে গেলেন, নির্বিশেষ মানুষকে আলিঙ্গন করতে হঠাৎ কী লাফটাই না মারলেন), আমাদের শৈশব বলেও যে একটা বস্তু ছিল, যার স্মৃতি আজো জীবন্ত ও যা কেটেছে দুঃখী বাংলায়--জীবনের সত্যকার তাগিদগুলো যে কী, সব লতার আলোকাভিমুখী হওয়ার সেই যে-প্রাণান্ত অভিনিবেশ, তার কিছুটা পরিচয় তো পেয়েছি একদিন, বলুন, পাইনি আমরা? মানুষ কথাটা মিশে আছে তাই আমাদের রক্তে, নিজেকে কত ধাপ্পা দেব আর? তাই ভিক্ষুক, ইত্যাদি—বলুন, ঠিক ধরছি কি না। অতএব বুঝছেনই, ভূমিকা তো হয়ে গেল, মনটাকে তো দেখানো গেল, এবার এসে পড়লাম বলে আসল ঘটনায়।

না, ভিক্ষাবৃত্তি আমারই মতন আপনারও একেবারেই পছন্দ নয়, কারণ ভিক্ষা কোনো সমাধানই নয়, এবং ভিক্ষুকদের আস্কারা দেওয়ার প্রথা যে-ব্যক্তি গ্রহণ করে, সে শুধু দুর্নীতিপরায়ণই হয় না, ভিক্ষুক-সমস্যার সমাধানের পথটাও আগলে দাঁড়ায়। বলুন, এই যুক্তিরই জের আমরা মনে মনে কত না অজস্র বার টেনেছি—কারণ পথেঘাটে বাড়ীর দরজায় এ-দেশে ভিক্ষুক সর্বত্র, সর্বদা—এবং এই যুক্তি আমাদের রোজই সহায় হচ্ছে পকেটে পয়সা নিয়ে ভিক্ষুক এড়াতে, তাড়াতে, দরকার হলে তাদের প্রতি রূঢ় পর্যন্ত হতে, কখনো

কখনো ভাগো বলে চেঁচিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমক পর্যন্ত দিতে, এবং সে-চেঁচানোর বা রূঢ় হওয়ার (কী আপদ বলুন তো, ইচ্ছে করে কে চায় এ-জগতে রূঢ় হতে, শুধু মিষ্টি কথায় সব কাজ হাঁসিল হলে আমাদের হজমটাও অনেক ভালো হত) দরকারটাও প্রায়ই পড়ে, কারণ ধমক না দিলে নড়ে না যে, অনেক সময় ধমক দিলেও নড়ে না, শেষে বলপ্রদর্শনের ভয় দেখাতে হয়, উদ্ধত প্রস্তুত মুষ্টি শূন্যে তুলতে হয়, এবং ভাগ্যিস আয়নাটা থাকে না সামনে, কারণ থাকলে তাতে নিজেদের মুখখানা দেখে কী লজ্জাই না পেতাম। তবু সেই ধমক দেওয়ার, ভিখিরী তাড়ানোর অকাট্য যুক্তিটা আমাদের আছে, তা করছি বলেই পরক্ষণে নিজেদের আমরা অপরাধী সাব্যস্ত করতে উঠে পড়ে লাগি না। অথচ দেখুন, কই, আজকের ভিখিরীটিকে তো আপনি তাড়ালেন না, উল্টে কী কাণ্ডটাই করলেন। অবশ্য এখানে আপনার-আমার মত দুর্বলচিত্তদের কথা যদি বাদও দিই (বিশ্বাস করুন, আপনার ঐ দৌর্বল্যে আমিও সমানই ভুগি—নইলে গদগদ হয়ে এসেছি কেন—শুধু আপনার সৃষ্টিছাড়া সাহসটা আমার নেই), শাদা চোখেও ভিখিরীটার স্বপক্ষে পাল্টা যুক্তি পাড়া চলে, বলা চলে; ভিক্ষা না করে ওর উপায় কী, ওর একটা পা নেই, এত কষ্ট করে ওকে হাঁটতে হয়, ও বৃদ্ধ, হয়তো মুখে একটুকরো রুটী জোগানোর মত কেউ নেইও সংসারে—এবং সবার উপর, গলার আশ্চর্য স্বরটা তো ছেড়েই দিলাম, লোকটার চাউনি কী সম্ভ্রান্ত (ওর চোখটার দিকে ভালো করে তাকাবার অবকাশ আপনি অবশ্য মাত্র আজই পেয়েছেন, তবু লোকটার অবি-সংবাদিত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আপনি সচেতন না হয়ে পারেননি প্রথম হতেই—কী, যা বলছি, তার সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে নিচ্ছেন তো মনে মনে?), তার প্রতি কি রূঢ় আচরণ চলে, তাকে কি ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া যায়? অতএব আপনি তাকে কখনো ধমক দেননি, বরং প্রথম দিন হতেই ভিক্ষা দিয়ে এসেছেন—বলুন, সত্যি কি না। এবং কেনই বা সে-ভিক্ষা তাকে আপনি দেবেন না, তাকে যা দিচ্ছেন, সে যখন এত কষ্টে তা অর্জন করে নিচ্ছে (এখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বললে নিতান্তই কম বলা হবে), কারণ কই, আপনাকে সে গান শোনাচ্ছে না, এবং যে-সে গানও নয়, এমন গান শুনেছেন কখনো? বলুন বুকে হাত দিয়ে, প্রথম দিন শুনেই আপনি বিচলিত হননি, আকাশ বাতাস কাঁপানো সেই স্বরে সচকিত হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেননি, কে গাইছে এমন করে? এবং তখন আপনার স্ত্রীও আশ্চর্যের ভাবে গেটের দিকে উঠে যাননি, আপনিও তখন অনুসরণ করেননি স্ত্রীর, এবং পরে আপনারা দুজনে গেট খুলে বাইরে এসে তাকাননি রাস্তার দিকে? তা ছাড়া, ভিক্ষাও তো সে চাইছে না আপনার কাছে, মুখ ফুটে ভিক্ষা দাও পর্যন্ত বলছে না একবার—সে তো প্রাণান্ত-করা অন্য ভিখিরীদের মত নয়—শুধু তার বাঁ হাতে কোনোরকমে একটি মরচে-পড়া টিনের কৌটো ধরা, কী করে যে সেটাকে ধরে আছে সে-ই জানে, কারণ দুটো হাতই তো নিযুক্ত খঞ্জের যষ্টিতে, এক-পা সত্ত্বেও সেই যষ্টির উপর সজোরে ভর দিয়ে কী হন হন করেই না হেঁটে চলেছে রাস্তা দিয়ে, কাঁধে ঝোলা, মাথায় বহু ধূলিতে ধূসর একটা পাগড়ি কোনো-রকমে জড়ানো, এবং শীতের সময় বলেই একটা শতচ্ছিন্ন কম্বল তেমনি অবিন্যস্তভাবে কাঁধ থেকে বুকে। মুখে গান, সব সময় নয়, যদিও প্রায় সময়ই, মাঝে মাঝে দুয়েক মিনিটের নীরবতা শুধু নিশ্বাসটা ভালো করে ফিরে পেতেই। এমন কি সে আসছে না আপনার গেট পর্যন্ত (অবশ্য আজ এসেছিল, কিন্তু আজকের কথাটা আলাদা—কারণ কই, আজকে কি তাকে অন্যদিনের মত ভিক্ষা আপনি দিলেন? হাসুন দাদা এবার), কারুর বাড়ীর ধারে-কাছে ঘেঁষছে পর্যন্ত না, সে চলেছে তার আপন পথে, হাতে কৌটোটি নিয়ে—অতএব

সে-কৌটোয় আপনি কিছু দিলেন, প্রথম দিন বোধ হয় এক টাকার একটা নোট (ঠিক বলছি তো? প্রথমে যেন পঁচিশ পয়সার একটা সিকি হাতে নেন, তাতে সম্ভবত আপনার স্ত্রী আপত্তি করে ওঠেন, বলে ওঠেন, সে কি, আরো দাও), পরেও অন্যান্য দিনে ঐরকমই কিছু। এবং এ-ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি তো শুধু আমাদের এই অভাগা দেশেই নয়, পশ্চিমের বহু সভ্য শিক্ষিত সচ্ছল সুসজ্জিত দেশেও চালু আছে, যার সাক্ষাৎ পরিচয় বিদেশে থাকাকালীন যেমন আমিও পেয়েছি, আপনিও পেয়েছেন। কারণ এ-দেশে জন্মেও আস্কারা আমাদের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন তো কিছু কম পাইনি, বলুন তো, বিধাতা আমাদের দিকে চেয়ে কত আদরের হাসিই না হেসেছেন, বালাই যাট, এখনো হেসে চলেছেন—কামনা, যতদিন ভবলীলা সাঙ্গ করে না চলে যাই, এভাবেই তিনি হাসতে থাকুন। ইচ্ছামত সব কিছু পাওয়া-না-পাওয়া বা চরিতার্থ বোধ করতে পারা বা না পারা, সেটা দেখুন অনেক গভীরের ব্যাপার, এবং সেই গভীরে যেতে চাওয়া মানেই সাধ করে জীবনে বিস্বাদ ডেকে আনা, সব মনে যে-অনিবার্য অতৃপ্তিবোধের বীণা ঘুমন্ত থাকেই (সব, সব মানুষের মনে, কারণ যথার্থ চরিতার্থ কে কোথায় বলুন তো?), সেটার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অকারণ ঝঙ্কার তোলা, এবং সে-ঝঙ্কার তোলা মানেই যেখানে না চেয়ে পাওয়া যেত অনেক আরাম ও শান্তি, সেখানে চেয়ে-চিন্তে জোর করে নিজেকে খামাখা বিপর্যস্ত করে তোলা, নিজেরই ছোঁড়া বাণে নিজের হৃদয়টাকে তীরবিদ্ধ করার খেলায় মাতা—নয় কি? আপনি তো ভুক্তভোগী (যেমন আমিও), বলুন না? তাই কখনো কখনো উজানে যাওয়ার দুর্নিবার ইচ্ছা চাপলেও আমি তো মনে মনে প্রায়ই বলি, অন্তত অতৃপ্তিবোধটাকে প্রাণপণে ধামা চাপা দিয়ে বলে উঠতে চাই (আসলে হয়তো কোনো কুলই রক্ষা হয় না আমার—আপনার সাহসটা যে আমার নেই, আর তা তো দেখতেই পাচ্ছেন) যে দূর ছাই, এ-সব ঝামেলায় গিয়ে দরকারটা কী—বরং বালাই ষাট, আমরা বেঁচে-বর্ত্তে থাকি, মোটর হাঁকিয়ে ঘোরাফেরা করি, ভালো চাকরি-বাকরি করি, ভালো বিছানায় শুই, আমাদের ছেলেমেয়ে চোখা-চোখা কনভেন্ট বা পাব্লিক ইস্কুলে যাক, পরে জানাশোনার সূক্ষ্ম সূত্র ধরে একে-ওকে তদ্বির করে তাদেরও একটা হিল্লে করে দিই, তাদেরও জন্য আমেরিকা-টামেরিকার কোথাও একটা বৃত্তি যোগাড় করে ফেলি, তারপর সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-ফিয়ারিং রপ্ত করে তাদের পরের হিল্লেটা তারা নিজেরাই করে নেবে, এবং তখন আমরা তো স্বামী-স্ত্রী দুজন মাত্র, জমি কেনা আগেই রয়েছে, একটা বাড়ী-ফাড়ী তোলা, বাগান-টাগান করা, পেনশন আর প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেই ছেলেমেয়ে ইত্যাদি সংক্রান্ত পরের চিন্তা যদি পরেও রাখতে চাই, শুধু বর্তমানটা নিয়েও তো অসুখী বোধ করার মারাত্মক কোনো কারণ দেখছি না, বুঝতে পারছি না কেন সুখিজনোচিত নিশ্বাস ফেলে ঘাড় দুটোকে বিদেশী কেতায় ঈষৎ উপরে তুলে বলে উঠতে পারব না 'কে সেরা সেরা'—যা হবার হবে। এসব কথায় আমি আপনাকে ভয়ংকর ক্লান্ত করছি দেখছি—বিশ্বাস করুন, আমি নিজেও সমানই ক্লান্ত, কারণ কথাগুলো শুধু অপ্রীতিকরই তো নয়, সত্যও যে—কিন্তু কী করি বলুন, কথাগুলো যে আমাদের মনের কথা, এবং বিশেষত এই মুহূর্তে সেগুলো বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে আরো এই কারণেই যে আমি-আপনি যদি এমন মানসিক আওতার মধ্যেই নিজেদের আচ্ছাদিত করে এতদিন সুখের প্রয়াসী ছিলামই, তো সেই আপনিই আজকের কাণ্ডটা কী করে করলেন, করতে পারলেন—এ-সন্ধ্যায় বিস্ময় রাখবার জায়গা আমার কোথায়। হ্যাঁ, বলছিলাম ছাত্রাবস্থায় বিদেশেও ভিক্ষাবৃত্তির কী অস্তিত্ব দেখেছি না-দেখেছি—লন্ডন-

পারীর ভূগর্ভের সেই সুড়ঙ্গ-ট্রেনে ম্যান্ডোলিন বাজানো অন্ধদের দেখিনি আমরা, বলুন, ভিক্ষা তাদের দিইনি? এবং শুধু অল্প বৃত্তিভোগী আমাদের মত বিদেশী ছাত্রেরাই বা কেন, সেখানকার দেশবাসীরাও কি ভিক্ষা দেয়নি তাদের, দিত না, আজও দেয় না? তবে? আর অতদূরে যাওয়ার দরকারই বা কী, ভিক্ষা কি আপনি নিজেও করেন নি (আলংকারিক অর্থে কোনো ভিক্ষার কথা বলছি না, যেমন চাকরি-ভিক্ষা, বা এর-ওর কাছে ভদ্রোচিত ছলে-কৌশলে এটা-ওটা সুযোগ-সুবিধা ভিক্ষা—সে-ভিক্ষা তো করেছেনই, না করে কার উপায় থাকে? কিন্তু এখন বলছি একেবারে নগ্ন ভিক্ষার কথা, হাত পেতে অসংখ্য অপরিচিতের কাছে বেমালুম পয়সা চাওয়ার কথা), এই এখানেই, আমাদের অভাগা দেশের রাজধানী দিল্লীতেই, মাত্র কিছুদিন আগেই? এবং একবারও নয় বা একদিনও নয়, বরং বহুবার, দিনের পর দিন, হেঁটে হেঁটে ঝোলা কাঁধে গান গেয়ে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ার রাস্তায়? এত তাড়াতাড়ি ভুলে নিশ্চয় যাননি—কারণ সেটিও এমন একটি অভিজ্ঞতা যার জুড়ি আপনার জীবনে নেই—উপলক্ষ্যটা ছিল উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা, আপনারা তাই রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে গান গেয়ে (সেবারও আমি দলে ছিলাম এবং আপনাকে দেখি—যদিও আজকের মত সেবারও আমি আপনার নজর এড়াই, কারণ আমার দাদা গলাটি নেই, গাইতে পারি না, আর আপনি শুধু গাইতে পারেনই নয়, আপনার গলা সমবেত সকলের গলা ছাপিয়ে ওঠে, আপনাকে লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না সেদিন কারুর) ত্রাণ-তহবিলে এন্তার টাকা-কম্বল তুলতে থাকেন। শ পাঁচেক লোকের সেই ভিড়ে দুয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন, মনে পড়ে? বলতে চান তো বলুন (আপনি বলবেন না জানি), মন্ত্রীর ভিক্ষাটা ভিক্ষা নয়, সাধারণ ভিখিরীর ভিক্ষাটাই ভিক্ষা। এবং এটাতেও আপত্তি করার কোনো কারণ থাকবে না যদি কেউ বলেন যে সে-ভিক্ষাটা অন্তত সাধারণ ভিক্ষা নয়, কারণ সঙ্গে পাঁচশো লোক, সকলেই একই রকমের ভিক্ষার্থী, তা ছাড়া উদ্দেশ্য কত মহৎ, ভিক্ষাটা নিজের জন্য নয়, অন্যের কারণে (সবিনয়ে বলব কি, আজকের ভিক্ষাটাও তো কই আপনি নিজের কোনো স্বার্থে করেননি, এর উদ্দেশ্যও কিছু কম মহৎ নয়, বরং এতে সমস্ত সামাজিক রীতি-নীতির যে-প্রচণ্ড উজান বইতে হল আপনাকে এবং তা বইতে গিয়ে যে-অভূতপূর্ব সাহসের পরাকাষ্ঠা আপনি দেখালেন, তার মহিমার তুলনা খোঁজা বৃথা হবে?), তাই গায়ে লাগার কথা নয়। কিন্তু এটাতে কি গায়ে লাগল আপনার? বলুন। বুঝেছি, হয়তো ভাবছেন, বন্যাত্রাণের জন্য গান গাওয়া আর আজকের গান গাওয়াটায় প্রভেদ আছে, কারণ আজ বেরোলেন একা, পাঁচ শো লোকের সঙ্গে নয়, এবং বেরোলেন সত্যিকারের একটা ভিখিরীকে নিয়ে—এবং শুধু বেরিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, আরো কী কী করলেন, তা তো নিজেই জানেন। আর তাই বুঝি এই মুখ-গোমরা ভাব, তাই বুঝি এখন অনুশোচনা হচ্ছে? অবশ্য এ-প্রশ্নের উত্তরটাও আমার জানা (আমার তো সবই জানা, দেখছেন তো, কী করে হাটে হাঁড়ি ভাঙছি একের পর এক, সব বলে দিচ্ছি), তবু প্রশ্ন করছি প্রশ্নেরই খাতিরে, কে জানে যদি এই একটার পর একটা প্রশ্নের চাপে অবশেষে আর থাকতে না পেরে কখন কিছু একটা আপনি বলে ওঠেন, মৌন ভঙ্গ করেন।

হায়, সে-গুড়ে বালি, কারণ মৌন দেখছি ভঙ্গ করার লোক আপনি নন, অন্তত এ-সন্ধ্যায় নন, এবং মনে হচ্ছে, যেন হঠাৎ আপনার ঠোঁটের কোণে শ্লেষের একটু তির্যক হাসিও ফুটে উঠছে—হয়তো ভাবছেন, আসল ব্যাপারটা কিছু জানেনি বা বোঝেনি বলেই লোকটা শুধু ইনিয়ে-বিনিয়ে গৌরচন্দ্রিকাই চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব হে শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আজ সন্ধ্যায় আমার পরম সম্মানিত প্রতিবেশী, আপনাকে বেশিক্ষণ আর সন্দেহে দোলানো উচিত নয়—এখন এক-যে-ছিল-রাজার মত কথনের চিরাচরিত পদ্ধতির নকলে ঘটনাগুলো একটার পর একটা বলে যাওয়া যাক। আমার আগের প্রস্তাবটা মনে আছে তো? সুতরাং ধরেই নিচ্ছি, সত্যাসত্য মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছেন।

সূত্রপাত মাসখানেক আগে, নয় কি? একটা রবিবারে, কারণ ছুটীর দিন ছাড়া তো আপনার বাড়ীতে থাকা হয় না, তাই দুপুরের খাওয়ার পর রাস্তার ধারে বাড়ীর উঠানে বসে শীতের সুন্দর রৌদ্র এমনভাবে উপভোগ করার অবকাশ অন্য দিন পান না। সেদিনও বসেছিলেন, সস্ত্রীক, চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন আপনার বাগানের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপগুলোর দিকে, হয়তো ভাবছিলেন এত বড় গোলাপ এই গাছটায় ফুটতে আগে কখনো দেখেননি। কখনো বা অন্যমনস্কভাবে তাকাচ্ছিলেন আশপাশের উঁচু-নিচু সুদৃশ্য বাড়ীগুলোর দিকে—ভাড়া এদিকে সাংঘাতিক বলেই বাসিন্দা অধিকাংশই বিদেশী ভাড়াটে, নানান এম্ব্যাসির কর্মচারীরা, অথবা এক-আধজন সেই সব ভারতীয়ই যাঁরা হয় ব্যবসার প্রসাদে শারীরিক ও আর্থিক ক্রমবর্ধমান স্ফীতিতে রয়েছেন নয়তো চাকরি করেন বড় বড়। সেদিন দেখছিলেন মাথার উপরে আকাশের সেই আশ্চর্য নীলিমা—মনে পড়ে যায় ভূমধ্যসাগরের সুনীল নীল—দেখছিলেন আকাশের নিচে স্নিগ্ধ রৌদ্রস্নানে নগ্ন বাড়ীগুলোকে। এমন সময় হঠাৎ—কত হঠাৎ বলতে পারব না, কারণ তা হয়তো আপনাকে চমকে তেমন দেয়নি, ততটা চিন্তামগ্ন হয়তো আপনি ছিলেন না—হঠাৎ কানে এল সেই প্রথম বার, 'কহো রামা পাপী লে ডুবে পাহাড় উখাড়ে'। গানের কথাগুলো অবশ্য ঠিক বললাম কি না জানি না, এবং যদিও তা আপনি গেয়ে এলেন এমন মহানুভব প্রেরণায়, আজই রাস্তায় রাস্তায়, জানি আপনিও সমানই অনিশ্চিত তাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে, এমন কি কথাগুলো যদি ঠিকও হয়, তবু তাদের উচ্চারণও যে আপনার নির্ভুল হয়েছে এ-কথাও বুকে হাত দিয়ে বলার যো আপনার নেই। এবং এখানেও আপনার সঙ্গে আমার মিল, কারণ ভাষাবিদ তো দূরের কথা, এ-সহরে এতদিন রয়েছি, হিন্দীটা পর্যন্ত ভালো করে শিখিনি, সে-চেষ্টাই করিনি—না আমি, না আপনি। যেটুকু না বললে নয় বা যেটুকুতে কাজ চলে যায়, সেই অশুদ্ধ হিন্দীটুকুতেই আমি-আপনি দুজনে সন্তুষ্ট। তা ছাড়া, এ-গানের ঐ কথাগুলো তো হিন্দী পর্যন্ত নয় হয়তো বিহারের কোনো ভাষা, বা উপভাষা (বলেইছি তো, ভাষাবিদ আমরা নই)?—এমনকি যথার্থ হিন্দীভাষী যারা, তারাও সেটা বুঝতে পারে না, আমি-আপনি তো কোন ছার। বোঝা তো দূরের কথা, তাদেরও সন্দেহ ঠিক আপনার মতনই, অর্থাৎ এই কথাগুলোই ঠিক কি না, তা পর্যন্ত তারা হলপ করে বলতে পারবে না, এবং তাই কথাগুলোর মানে তো জানেই না, বলা বাহুল্য। কই, আপনার চাকরের যে-মেয়েটির শরণাপন্ন হন—দেখছি, এবার আপনার হাসি পাচ্ছে, আপনার সেই অদ্ভুত কৌতূহল দেখে মেয়েটারও সে কী খিলখিলে হাসি, লজ্জায় মুখ ঢাকে, কৌতুকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে, মনে পড়ে (ঠিক বলছি কি না, মিলিয়ে নিন দাদা, মিলিয়ে নিন)?—সেই খাস হিন্দীওয়ালী, কারণ একে আলমোড়ার লোক তায় এখন হিন্দী ইস্কুলে যায়, কই, সেই মেয়েটিও কি কিছু সাহায্যে আসতে পারল? অবশ্য সাহায্যে যে একেবারেই আসেনি, তা নয়, কারণ ভুল হোক নির্ভুল হোক, একমাত্র তারই কল্যাণে কথাগুলো তো আপনি পেলেন, নইলে তো পেতেনই না, বুঝতেই পারতেন না। কিন্তু কথাগুলো ঠিক কি না, বা তাদের মানে কী, সেটা অন্য প্রশ্ন, এবং সে-প্রশ্নের কোনো সুষ্ঠু জবাব মেয়েটিও আপনাকে দিতে পারেনি। এমন কি সে

এটাও বলে—মনে পড়ছে দাদা? মিলিয়ে নিন—বলে, এই কথাগুলোর পরেও ভিখিরীটা নাকি আরো একটা লাইনের মত কিছু গায়, এবং যেটা সে ধরতে পারেনি। আর তখন আপনি তাকে বলেন, সে যেন কান খাড়া করে থাকে পরের বার, কারণ সে তো রোজ বাড়ীতেই থাকে (যেটা আপনি পারেন না), আর ভিখিরীটা আসে দুপুরের দিকে, হয়তো রোজই আসে—তাই বলেন, ভিখিরীটা যেমন যা যা গায়, মেয়েটি যেন সেটি তেমন তেমন তুলে নেয় (এবং শুনে তখনো মেয়েটার কী হাসি, কী লজ্জা, কী কৌতুক, মনে পড়ে?), অন্তত চেষ্টা করে—এবং একটু চেষ্টা করলেই সবটা সে তুলে নিতে পারবে নাই বা কেন, বিশেষত প্রথম লাইনটা সে যখন এত সহজে তুলে নিয়েছে। তবু কই, বার বার চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত সেই দ্বিতীয় লাইনের কথাগুলো কি সে ঠিক ধরতে পেরেছে? তাকে অবশ্য এমন পর্যন্ত বলেছিলেন আপনি (বলুন, বলেননি?), দরকার হলে সে যেন ভিখিরীটাকে দাঁড়ও করায়, পরে কথাগুলো ঠিক ঠিক টুকে নেয়। তবু আপনার এমন ছাড়পত্র পাওয়া সত্ত্বেও সেটা সে আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি—হয় লজ্জায় বেধেছে (মেয়েটি বড় লাজুক, ঐ এক দোষ—অথবা কে জানে, হয়তো সংকোচেও বেধেছে, কারণ তার বাপ আপনার বাড়ীর চাকর হলেও সেও তো থাকে এই নাকউঁচু পাড়ায়, অর্থাৎ আপনাদেরই বাড়ীর সংলগ্ন সার্ভেন্টস' কোয়ার্টারে, তার মা-বাবার সঙ্গে, এবং তারও তো তাই একটা সামাজিকতা বোধ থাকা স্বাভাবিকই, সে শরমের সব মাথা খেয়ে কী করে বলুন এ-পাড়ায় এমন সব বড় বড় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে একটা চলমান ভিখিরীকে খামাখা হঠাৎ থামিয়ে ফেলে, তার সঙ্গে কথা বলে, এবং সবার উপর মনোযোগী ছাত্রীর মত খাতা-পেন্সিল হাতে গানের কথাগুলো টুকে বসতে গিয়ে? এবং তখন তাকে কত লোকের কত টিপ্পনী শুনতে হবে বলুন তো—এই যেমন, এ-বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক থাকেন রে বাবা, বা যা খুশী হচ্ছে আজকাল এ-পাড়ায়, ভিখিরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পর্যন্ত পাতানো হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি—এই দুঃসাহস তার কী করে তাই হবে বলুন তো, সবাই তো আর আপনার মতন নাককানকাটা নয়), নয়তো স্রেফ সুযোগই পায়নি, যোগাযোগটা ঘটেনি। অবশ্য মেয়েটাকে আপনি তুলতে বলেছিলেন গানের কথাগুলোই, অর্থাৎ যে-কথাগুলো ভিখিরীটা গায়, এবং যেটা গানের সব কথা নিশ্চয় নয়, অন্তত ভাষা সম্পূর্ণ না জেনেও যেটুকু আপনার পক্ষে আঁচ করা সম্ভব, তাতে আপনার মনে হয় না তা—সঙ্গে সঙ্গে সুরটাও সে যথাযথ তুলে নিক (কারণ কপালগুণে এমন ঘরে জন্মালেও মেয়েটি বেশ গুণী, অন্তত নানান প্রতিশ্রুতি ছিল, গাওয়ার গলা আছে, ছবি আঁকার হাত আছে, খড়ি দিয়ে আঁকা তার কেমন চমৎকার রাম-লক্ষ্মণ-হনুমান তো একবার আপনার নিজের কন্যাটিই নাচতে নাচতে এনে দেখায়, মনে নেই?), এমন কোনো নির্দেশ তাকে আপনি দেননি। এবং সে-রকম নির্দেশ দিতে আপনি যাবেনই বা কেন, কারণ সুর তো আপনার মুখস্থ, অন্তত অন্তঃস্থ, কত না অবসরে মনে মনে গুন গুন করছেন সেই একেবারে প্রথম দিন হতেই। আর সুরটা আপনাকে এইভাবে পেয়ে বসেছিল বলেই তো কথাগুলো যোগাড় করার চিন্তা আপনার মনে আসে—জানি, শুধু একটা কৌতূহল পূরণই তখন উদ্দেশ্য ছিল আপনার, কারণ মনে হয়েছিল হয়তো বিহারী কোনো ভাষা, শব্দগুলো কেমন অচেনা-অচেনা, তাই চেয়েছিলেন, দেখা যাক তো কথাগুলো কী, পরে কথাগুলো পেলে সুর বসিয়ে সময়ে অসময়ে ঘুরতে ফিরতে গুন গুন করা যাবে। অর্থাৎ, একদিন যে নিজেকেই গানটা গাইতে হতে পারে, একেবারে ঐ রাস্তায় রাস্তায়, এমন আশ্চর্য কোনো কল্পনা বা পরিকল্পনার কথা আপনি গোড়ায় ভাবেননি। এবং পারুন তো অস্বীকার করুন,

আমি বাজী রেখে বলব, তেমন পরিকল্পনার কথা গোড়াতেই মনে এলে আপনি নিজের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠতেনই, পরে বলা যায় না হয়তো সশরীরে কোনো মনস্তাত্ত্বিকের চেম্বারে গিয়েই হাজির হতেন। চেম্বারে যান বা না যান, যেটা অন্তত করতেনই, তা এমন একটা কথা যে আপনার মনে আসতে পারল, সেইটে ভেবে পরক্ষণেই হো হো করে হেসে ওঠা। কিন্তু আজ কোথায় গেল সেই হাসি আপনার, কোথায় গেল নিজেকে পাগল মনে করা, কোন ভূত (না দেবতা?) আপনি হঠাৎ দেখলেন? থাক, সে-প্রসঙ্গে আসছি, আপাতত পাছে ভাবেন ধাপ্পা দিয়ে অজ্ঞতা ঢাকতে চাই বা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই, তাই শেষ করে নেওয়া যাক কথাগুলো যোগাড় করার ব্যাপারটা। আপনি প্রথমে বলেন আপনার দশ-এগার বছরের কন্যাটিকেই, ঐ চাকরের মেয়েটিরই সমবয়সী সে এবং সেই কারণেই দুজনে মাঝে মাঝে একসঙ্গে খেলাধুলোও করে-- আপনার কন্যাকে আপনি বলেন, হ্যাঁ রে, তুই তো শুনেছিস গানটা, কথাগুলো যেন কী, ইত্যাদি। প্রায় জন্ম থেকেই এখানে বলেই মেয়ে আপনার স্বভাবতই হিন্দীতে কম-বেশি রপ্ত, তাই ভেবেছিলেন কথাগুলো সে মনে রাখতে পারে বা সেগুলো সে ঠিক ঠিক ধরে থাকতে পারে। মেয়ে কিন্তু পারেনি, শুধু সে সঙ্গে সঙ্গে চাকরের মেয়েটির প্রসঙ্গ পাড়ে, বলে, ও জানে, তুলে নিয়েছে, এই তো খানিকক্ষণ আগেই গুনগুন করছিল, ডাকব ওকে বাবা? এবং মনে নিশ্চয় পড়ছে আপনার, পিতার এই অদ্ভুত খেয়ালে আপনার কন্যাটির চোখও তখন অবিমিশ্র কৌতুকে দীপ্ত, সারা মুখে হাসি উপচে উঠছে, এবং আপনার সম্মতি পেয়েই সে দৌড় দেয় সার্ভেন্টস' কোয়ার্টারের দিকে। পরক্ষণেই কন্যার পিছু পিছু এসে হাজির চাকরের মেয়ে—তার মুখও ইতিমধ্যেই কিছু কম কৌতুকে উদ্ভাসিত নয়, কারণ কী আপনি চান, তা তো সে আগেই শুনে ফেলেছে আপনার কন্যার মুখে, এবং তাই এখন এসে হাজির—এবং অচিরেই সুরু তার হেসে গড়িয়ে পড়ার পালা (এবং আপনার পক্ষেও হাসি চাপা দায় হয়, মনে পড়ে? ওদের দুজনের হাসির ছোঁয়াচে রোগ তো লেগেছিলই, সারা ব্যাপারটাও হয়তো আপনার নিজের কাছেই হাস্যজনক ঠেকছিল, হয়তো আপনার নিজেরই মনে হতে সুরু করেছিল, সত্যিই তো, কোথাকার কোন ভিখিরীর একটা গান নিয়ে এত আগ্রহ দেখানো কী উদ্ভট পাগলামি একটা), অবশেষে তার লাজুক মুখ থেকে ধীরে ধীরে বার করে নেওয়া—'কহো রামা পাপী লে ডুবে পাহাড় উখাড়ে'।

কিন্তু এই দেখুন, এও এক অমার্জনীয় দোষ আমার, যেচে কথা দিই, পরে রাখতে পারি না, কারণ আপনার কথাগুলো যোগাড় করার ব্যাপারটা তো অনেক পরে ঘটল -মানে হপ্তাখানেক আগে মাত্র, অর্থাৎ গত রবিবার, বিশেষত গত রবিবার গানটা যখন আপনি আবার শোনেন, কারণ ভিখিরীটা যথারীতি আসে—তাই সে-পর্যায়ে আসার আগে একেবারে সেই প্রথম দিনের ঘটনাটার (এবং তার পরের দিনগুলিরও, অর্থাৎ আজ ও সেই প্রথম দিনের মধ্যবর্তী সেই সেই ছুটীর দিনগুলি যেদিন আপনি বাড়ী ছিলেন এবং ভিখিরীটাকেও যেতে দেখেছেন) আরো একটু ব্যাপক আলোচনায় যাওয়া কি উচিত নয়? নইলে পরম্পরা বজায় থাকছে না, এবং এক-যে-ছিল-রাজার কথনভঙ্গীর সেই যে-প্রতিশ্রুতি আমার, সেটাও যে রক্ষা হচ্ছে না। অথ প্রথম দিন প্রসঙ্গ। গানটা শুনে আপনি আশ্চর্য হয়েছিলেন, এমন গলার পরিচয় আপনি খুব কমই পেয়েছেন—তাকে মার্গসঙ্গীতে ওস্তাদরা কতটা সুরেলা বলবেন জানি না, বরং চিরাচরিত স্বরগ্রামে তার ওঠা-নামার উঁচু-নিচু পর্দা মেলানো মুস্কিলই হতে পারে, তবু কার আস্পর্ধা তাকে বেসুর বলে? তার সুর স্বরগ্রামের অতীত

কোন সুর-সংগীতির সঙ্গে মিলনে বন্ধ, সে যেন সুরে সুর দিচ্ছে এই হাওয়ার সঙ্গে, এই পথের সঙ্গে (হোক না নাকউঁচু পাড়াই, তবু এর পথটা তো পৃথিবীরই এক পথ), এই ভূমধ্যসাগরের নীলে আত্মহারা আকাশের সঙ্গে। এবং গলাটা শুধু অস্বাভাবিক জোরালোই নয়, পরুষই নয়—পাড়াটা কাঁপিয়ে তুলছে মশাই—তার কী বেদনাময় মাধুর্যও। এক কথায়, গানটার সঙ্গে, সুরটার সঙ্গে, এই আকাশ-বাতাস-পথটার সঙ্গে, এমন কি আপনার ঠিক এই মুহূর্তের মানসিক অবস্থাটার সঙ্গে পর্যন্ত ভিক্ষুকের ঐ গলাটা যেন কোন অপূর্ব সুর-সংগীতির দ্যোতনাময়—অন্তত ঠিক এইরকমই আপনার সেই প্রথম দিনটিতে মনে হয়েছিল, বলুন, হয়নি? 'কহো রামা' বলে টান, পরে 'পাপী লে ডুবে' বলে আবার টান, শেষে 'পাহাড় উখাড়ে'-তে এক অনবদ্য টানের তরঙ্গ। কথার দৌড় আর কতদূর বলুন, তাই গানের যথাযথ মানে বুঝুন আর নাই বুঝুন, সেটা অন্য কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক, এ-গান এমন গলায় গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রার্থিত তীর্থে পেঁছে গেছে, এবং সেটা সে যে পেঁছে গেছে, তার সব যুক্তিতর্কাতীত প্রমাণ আপনার মত শ্রোতার হৃদয়ই, কারণ ভাষা সম্পূর্ণ না জেনেও দেখুন কী আকুল আপনি হলেন, কী একটা নাড়া খেলেন সংগীতির—যে-নাড়া একমাত্র সব নাগালের বাইরের এক নাম-না-জানা না-বুঝতে-পারা একতানই দিতে পারে। এবং নাড়া শুধু আপনিই নন, আপনার স্ত্রীও খান (জানেন, এ-অধমও খায়, শুধু সেদিনই নয়, তার পরের প্রতিটি দিনেও—এবং যে-প্রথম দিন আপনি শোনেন, ভিক্ষুকটির গানের সঙ্গে আমার পরিচয়েরও সুরু সেইদিন হতেই, কারণ তার আগে বোধহয় এ-পাড়ায় সে কখনো আসেনি), তাই ব্যাপারটাকে শুধু আপনারই একটা নিছক ক্ষণিক মানসিক দৌর্বল্য বলে চালানো সংগত হবে না। কারণ স্ত্রীও তো আপনার বসেছিলেন সেদিন পাশেই, তিনিও কি হঠাৎ আপনারই মত কোলের বই-পত্রিকা হতে চোখ তুলে সচকিত ভাব দেখাননি? পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা উভয়েরই চোখ নীরবে প্রশ্ন করতে থাকে, কে এমন করে গাইছে, লোকটি কে? তারপর আপনাদের দুজনের গেটের দিকে এগোনো, রাস্তায় বেরোনো, লোকটিকে আবিষ্কার করা, এবং শেষ পর্যন্ত এক টাকার একটি নোট হাতে আপনার তাকে অনুসরণ করা (কারণ ততক্ষণে আপনার বাড়ী ছাড়িয়ে সে হাত বিশেক দূরে চলে গেছে), ইত্যাদি ইত্যাদি—সে-প্রসঙ্গ তো আগেই পেড়েছি।

এখন বুঝছি, শ্লেষের ভাবটা আর ততটা আপনার চোখে নেই, কারণ দেখছেনই তো, যা বলছি তা সব কেমন হুবহু মিলে যাচ্ছে। আরো এগোতে দিন, দেখুন না, এবারও যা বলব, তাও কেমন সত্যের সঙ্গে মিলে যায়। ভাবছেন, বুঝি কোন ধুরন্ধর গণৎকারই বা আমি, নইলে চাকরের মেয়েটার ইতিবৃত্ত, এটা-ওটা-সেটা, সব এমন অনায়াসে কী করে বলে যাচ্ছি একটার পর একটা। না ভাই, গণৎকার-টার নই, শুধু আমার তদন্ত গোপন এবং সে-তদন্ত এত পাকা যে তাতে খুঁত ধরতে গেলে আপনি বিড়ম্বনায় পড়বেন—অতএব ছেড়ে দিন না দাদা, এমনিতেই তো এ-মুহূর্তে বিড়ম্বনার অভাব নেই আপনার (অন্তত আমার বিশ্লেষণে তো তাই বলছে, এবং কতকটা সেই কারণেও আমি এসেছি, পারি যদি তুলব আপনাকে আবার মনের শক্তিতে, নাককানকাটা যখন হয়েছেনই, থাকুন না কেন তাই), যেচে অন্য বিড়ম্বনা ডেকে আনেন কেন? তার চেয়ে পরের ঘটনাগুলো বলি এবার, অ্যাঁ? দ্বিতীয় রবিবার (অর্থাৎ প্রথম দিনের এক সপ্তাহ পরে) আপনি আবার যথারীতি বাড়ীতে এবং ভিক্ষুক আবার রাস্তায়। এই সাত দিনের মধ্যে শীতটা আরো বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে বলেই পিঠের রোদ্রটা সেদিন যেন আরো আরামদায়ক ঠেকছে, আকাশও যেন আরও নীল,

বাড়ীগুলোও আরো ঝকঝকে—হাওয়ায় হাল্কা স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা আমেজ। আর রাস্তা তো জনশূন্য চিরকালই, পাড়াও নীরব—রবিবার বলেই অন্য দিন থেকে যেন আরো নীরব, যে-দুয়েকটা মোটর গাড়ী সোম থেকে শনিতে হঠাৎ কখনো এসে চিন্তার জাল ছিন্ন করে দেয় এবং গৃহপালিত ভয়ংকর-ভয়ংকর উঁচু জাতের কুকুরগুলো (আপনারও একটা আছে, আমারও আছে—উপায় কী বলুন? হাসছেন তো দাদা? হাসুন) আশপাশের বাড়ীগুলোর বন্ধ গেটের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে সেই ধাবমান মোটরগাড়ীর দিকে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে (কী দুর্দশাজনক ক্লান্তি এই কুকুরগুলোর বলুন তো, রাস্তার লোক দেখে যে বেচারারা একটু চেঁচাবে, ফুসফুসে একটু ব্যায়াম হবে, সে-উপায়ও নেই—তাই ভিখিরীটা এসে তাদের সেদিক থেকে বাঁচায়, তখন তারা একটু চেঁচায়), এবং মোটরগাড়ীগুলোও আপনার বাড়ীর অদূরেই রাস্তায় মোড় নেওয়ার আগে ক্যাঁ-কো ক্যাঁ-কো করে হর্ন বাজায় (বিশেষত একটা গাড়ী মনে পড়ে? সেটার আবার খুব সখের হর্ন, বাজে মিলিটারি ভেরীর মত, বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে -পয়সাওয়ালাদের কত খেয়ালই কখনো কখনো চাপে) - এবং সে-হর্ন না বাজিয়ে তাদের উপায়ও নেই, কারণ রাস্তা ফাঁকা ও চওড়া বলেই সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়ায় টেনে লাগাম লাগানোর মত করে ছোটে, আর তাই দুর্ঘটনাও মাঝে মাঝে বেশ হয়, বিশেষত ঐ মোড়টাতেই, কতবারই তো দেখেছেন অজস্র ভাঙা কাঁচ-ফাঁচের গুঁড়ো একাকার হয়ে পড়ে আছে জায়গাটায় - সে-সব কোনো শব্দই সেদিন ছিল না। এবং সেই নীরবতা কাঁপিয়ে হঠাৎ 'কহো রামা' ইত্যাদি। আসলে প্রথমে গানটাকে শোনা যায় বহুদূর হতে ভেসে আসা (লোকটার গলা অমন চড়া বলেই) অস্ফুট কোন সুর-তরঙ্গের মত, কথাগুলো কানেও আসে না—তারপর যতই এগোয়, যেন বাড়ীগুলো কাঁপতে থাকে, প্রতীক্ষার মুহূর্তও ঘনিয়ে ওঠে আপনার মনে, কান পেতে ধরতে চান কথাগুলোকে, তবু তা যেন পিছলে পিছলে যায় (কারণ, পুনরুক্তি হলেও বলি, গানের কথাগুলোর প্রতি এই আগ্রহ-কৌতূহল আপনাকে প্রথম দিন হতেই নিবিষ্ট করে)। এবং সেদিনও বসেছিলেন সস্ত্রীক, এবং সেদিনও তখনি-তখনি স্ত্রী আপনার দিকে মুখ তুলে তাকান, হাসেন। পরের কথাটায় আসার আগে হয়তো এটুকু বলে নেওয়া ভালো, আপনার স্ত্রীর দরাজ হৃদয়ে আপনি চিরকালই খুশী (সব সুখই আপনার আছে, ছিল, তবু আজকের বেড়াটা আপনি যে কী করে ডিঙোলেন, আমি তো ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না) - কারণ কই, চাকরের মেয়ের সঙ্গে আপনার কন্যার খেলাধুলায় তিনি তো কখনো আপত্তি তোলেননি (আর জানেনই তো, এ-পাড়ার স্ত্রীদের এসব বিষয়ে মতামত কত উল্টো ধরনের), বরং উৎসাহই দিয়েছেন, বিবাহিত জীবনের এই তের বছরে ছোটখাটো আরো কত নানান উপলক্ষ্যে তাঁর উদার পন্থার কত পরিচয় আপনি পেয়েছেন, এবং বেশি কথার দরকারই বা কী, মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ঐ ভিখিরীর উদ্দেশে আপনি যখন সিকিটা হাতে তুলতে যান, তখন সম্পূর্ণ রবাহূত হয়ে কে আপনাকে বলতে আসেন ছুটে যে না, ও কি, গোটা একটা টাকা দাও--তিনি কি আপনার স্ত্রীই নন? আর বিশেষত সেই কারণেই সেই দ্বিতীয় রবিবার তাঁর একটি উক্তি আপনার একটু খটমট লাগে (বুকে হাত দিয়ে বলুন, সত্যি কি না), সেই যখন ভিখিরীটির গলা আবার শোনা গিয়েছে এবং শুনেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আপনারা দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়েছেন। স্ত্রী হাসেন, নিশ্চয়, তবু বলেন, এবার লোকটা রোজই আসতে সুরু করেছে এ-পাড়ায় (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় সেই রবিবার দুটির মধ্যবর্তী দিনগুলিতেও সে নিয়মিত এসেছে, আপনি ছিলেন না বলেই শোনেননি, কিন্তু আপনার স্ত্রী তো শুনেছেন), দেখছি শীগগিরই নাম খারাপ করবে। শুনে আপনিও

কুণ্ঠিতভাবে হাসেন (কারণ আমার কাছে এ-সন্ধ্যায় কথাটা স্বীকার করুনই না, লোকটার প্রতি কেমন একটা মায়া আপনার পড়ে গিয়েছিল—জানি, সম্পূর্ণ অমূলক সেই মায়া, তবু মায়াই), জানতে চান, তুমি কি রোজই তবে ভিক্ষে দিচ্ছিলে নাকি? তিনি বলেন, না—বলেন, রোজ রোজ অত পারি নে বাবা, আজ তুমি দিতে চাও তো দাও। এ-পাড়ায় এত আসে, কারণ বুঝেছে লোকের পয়সা আছে—এমন একটা ইঙ্গিতও তিনি করে বসলেন। আবার তাই আপনার বিড়ম্বনার হাসি, ওঠা, ঘর হতে এক টাকার একটা নোট নেওয়া, ও গেটের দিকে এগোনো (এমন সেই আপনিও কিন্তু তৃতীয় রবিবার—অর্থাৎ আজ হতে মাত্র এক সপ্তাহ আগে ও যেদিন বিকালের দিকে চাকরের মেয়ের শরণাপন্ন হলেন—সেদিন ভিখিরীকে সেই আপনিও একটি পয়সা দিলেন না, কারণ ন্যায্যতই হয়তো ভেবেছিলেন, দিলে এবার স্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন)। এবং সে-উষ্মা প্রকাশ করলে তাঁকে আপনি দোষ দিতেন না, আমিও দিতাম না, কারণ সে-ক্ষেত্রে তাঁর কাছ হতে একমাত্র সেই ব্যবহারই প্রাপ্য, এমন কি হয়তো কাম্যও, নইলে সবাই যদি আপনার মত এভাবে নিজের নিজের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে থাকে তো সমাজটা কেমন করে চলে বলুন তো (এবং এত গ্লানি সত্ত্বেও আমারও সান্ত্বনা তো সেইটাই, যে-আমি কিছু করিনি, সর্বদাই নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলেছি)? না, দোষ তাঁকে আপনি আজও দিচ্ছেন না, যে-আপনি এত কাণ্ড সেরে বাড়ী পৌঁচেছেন প্রায় ঘণ্টা খানেক হল, তবু এখনো বাড়ীতে ঢুকতে পারেননি, স্ত্রীর মুখোমুখি হতে চাননি, এখনো চাইছেন না, নানান ভয়ে-ভাবনায় (আশা করি ঠিকই বলছি, মিলিয়ে নিন) আপনার হৃদয় দুলছে—শুধু আমি আসার পর এই উঠানে বসেই (এবং যদিও ইতিমধ্যে বেশ আঁধার নেমেছে, সেই তারার ফুলঝুরি সুরু হয়েছে, আর খোলা জায়গা বলেই ঠাণ্ডাটাও রীতিমত ঠেকছে—নিউমোনিয়ার কি ভয় নেই মশাই আপনার, সে-ভয় কিন্তু আমার আছে—তবু, তবু আপনি বাড়ীর ভিতরে ঢুকছেন না) চেঁচিয়ে চাকরকে চায়ের আদেশ পাঠান। জানি, এটাও আপনি ভাবছেন, ফিরেছেন তো অনেকক্ষণ, আপনার উপস্থিতি ফলাও করে জাহিরও করেছেন—কারণ চাকর যদি আপনার গলা শুনে থাকে তো স্ত্রীও নিশ্চয় শুনেছেন—তবু তিনি এই দু-ঘণ্টার মধ্যে একবারের জন্যও বাইরে এসে একটু খোঁজখবর নিলেন না? এই যে এত দিনের এত স্নেহ-প্রেম-উদ্বেগ তাঁর আপনাকে নিয়ে, তবু এখন আপনার এমন ঠাণ্ডা লাগছে জেনেও এতটুকু শঙ্কিত তিনি হলেন না, একটি বার দরজা খুলে বেরিয়ে বললেন না, সে কি, যা করেছ করেছ, এখন এই ঠাণ্ডায় অন্ধকারে এভাবে বসে না থেকে দয়া করে ভিতরে চল, আমাকে উদ্ধার কর? এবং এমনও নয় যে তিনি বাড়ীতে নেই বা কাছাকাছি ফলের দোকানে (যে-ফল কিনতে তিনি প্রায়ই বেরোন, নিজেই, একলাই—কারণ চাকরটিকে এসব ব্যাপারে বিশ্বাস একেবারে নেই, ফলের ভালোমন্দ সে কিচ্ছু বোঝে না) কি অন্য কোথাও বেরিয়েছেন, যেহেতু বাড়ীর ভিতর হতে তাঁর কণ্ঠস্বর আপনি নিজেই শুনেছেন একটু আগেই, আপনার কন্যাকে চেঁচিয়ে তিনি কী যেন বলছিলেন (ভাবছেন, জানি, আপনার সেই কন্যারত্নটিই বা কী রকম, একবার বাবা বলে বেরোতে পারল না—না মা তাকেও ধমক দিয়েছে, বারণ করেছে সেরকম কিছু করতে?)। তবে কি আমি ইতিমধ্যে এভাবে হঠাৎ এসে পড়েছি বলেই তিনি বেরোচ্ছেন না (এটাও আপনিই ভাবছেন, কারণ সন্দেহে আপনিই দুলছেন, যদি অবশ্য আমার ধারণাটা ঠিক হয়, আশা করি সেটা ঠিকই—না না, আমার কোনো সন্দেহই নেই, যেহেতু বলা বাহুল্য, সব প্রশ্নেরই উত্তর আমার জানা) বা বেরোতে ইতস্তত করছেন (হাজার হলেও সম্পূর্ণ অপরিচিত তো আমি তাঁর কাছে,

যেমন আপনারও কাছে), বা ভাবছেন ভদ্রতার খাতিরে কতক্ষণই বা একটা লোক বাড়ী-চড়াও হয়ে বসে থাকতে পারে, অর্থাৎ আমি হয়তো এই উঠলাম বলে, এবং সেটুকুরই অপেক্ষা তিনি করছেন, আর আমি গেট পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরজা খুলবেন, উঠানে বেরোবেন, আপনাকে ভিতরে ডাকবেন? কিন্তু (এ-সন্দেহেও আপনিই দুলছেন) আপনি তো আপনার স্ত্রীকে জানেন, এত সঙ্কোচ তাঁর নেই—অর্থাৎ যদি আসতে চাইতেন তিনি, এতক্ষণে নিশ্চয় আসতেন। তবে কি সত্যিই তিনি......থাক, অত তাড়া করেন কেন মশাই, আসল ঘটনাটা বলতে দিন।

অতএব আজ সেই বেলা আড়াইটে, অথবা তার কাছাকাছি। একলাই বসেছিলেন, বোধ হয় সবে এসে বসেছেন মাত্র, আপনার স্ত্রী তখনো এসে পেঁছোননি, মানে বাড়ীর ভিতর হতে উঠানে—যদিও জানেন, তিনি আসবেনই, এই এলেন বলে, আপনি তাঁর প্রতীক্ষাও করছেন। এমন সময়- এবার এত যে-বাচাল আমি এই সন্ধ্যায়, সেই আমিরও কথা আটকে যাচ্ছে, কারণ এমন একটা কাণ্ড বর্ণনা করার মত কোনো ভাষা তো সমাজ আমায় দেয়নি, এমন একটি না-কাটা পেন্সিল ব্যবহারের জন্য আমার হাতে আপনি তুলে দিচ্ছেন আজ যা কাটবার উপযুক্ত কোনো ছুরি আমার ভাণ্ডারে নেই, উপরন্তু আজই বুঝছি কী ভয়ংকর এক ভোঁতা ছুরি এই ভাষা আমার যাই হোক, সেই আড়াইটে নাগাদ কে যেন হঠাৎ আপনার গেটটা ধরে অল্প জোরে বার দুয়েক নাড়া দিল। তবু আপনি তখনো চমকে ওঠেননি— কারণ ভেবেছিলেন, হয়তো রুটিওয়ালা এসেছে, বা টোঙ্গায় চাপানো কাশ্মীরী কার্পেট বিক্রি করতে বা কেউ, কিংবা হয়তো খবরের কাগজওয়ালা তার বিল নিয়ে হাজির, অথবা কে জানে পাড়ার নেপালী চৌকিদারই বুঝি তার মাসিক প্রাপ্যের জন্য সেলাম জানাচ্ছে—না, গেটের শব্দটা শুনেই আপনি চমকাননি, চমকালেন তখনই যখন উঠে এগোলেন, এবং এগোতেই অচিরে তাকে নজরে পড়ল। হ্যাঁ, সেই ভিখিরীটাই, সেই ঋজু দীর্ঘ দেহ, রোগাটে, তবু শক্ত সমর্থ, সেই ময়লা পাগড়ি মাথায়, ইত্যাদি— কিন্তু কেন, কী ব্যাপার? প্রথমে শুধু একটু কৌতূহলই হয়েছিল আপনার (কী দাদা, মিলিয়ে নিচ্ছেন?), তাকে কিছু প্রশ্ন করার অবকাশও আপনি পাননি, যখন সে নিজেই কিছু একটা বলে ওঠে বা বলার চেষ্টা করে, এবং যেটা আপনি বুঝতে পারলেন না। তাই আরো একটু এগোলেন, তার যথাসম্ভব কাছাকাছি এলেন, এবং লোকটার মুখটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করার অবকাশ এবারই প্রথম পেলেন। এই প্রথম নজরে পড়ল সেই বহু কুঞ্চিত গাল-কপাল, একটা গভীর কাটা দাগও যেন বাঁ ভুরুটার উপরেই— দেখলেন, ছানির মতও যেন কী একটা পড়েছে চোখে, অর্থাৎ একটা চোখে, অন্যটা পরিষ্কার। লোকটা আবার কথা বলল, দেখলেন গলাটা ভাঙা, এবার তার হিন্দীটাও বুঝতে পারলেন। দেখুন, কী আশ্চর্য সম্ভ্রমজ্ঞানটা তার, সে কিন্তু তখনো ভিক্ষা চায়নি, হাত পাতেনি, অন্যান্য ভিখিরীদের মত ঠোঁটের কাছে আঙুল ঠেকানোর ভঙ্গীতে জানায়নি যে তার খাওয়া হয়নি, বা কুৎসিতভাবে পেট চাপড়াতেও বসেনি—শুধু বলে, গলাটা তার আজ একেবারে ভেঙে গেছে, তাই গান গাওয়ার উপায় নেই। অর্থাৎ—সেটা সে বলেনি, শুধু আপনিই সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন—ভিক্ষা পাওয়ারও আজ উপায় তার নেই, কারণ রাস্তা দিয়ে আজ তাকে এত কষ্টে এক পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে নীরবে, কেউ জানবে না সে এসেছিল বা এখনি বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং জানলেও কেনই বা ভিক্ষা তারা দেবে, কারণ কই, ভিক্ষা তো সে চাইছে না, আজ সে গানও করছে না, একমাত্র যে-গান শুনেই অন্যান্য দিনে কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়, যেচে এসে কৌটোটায় কিছু একটা ফেলে দেয়।

ভাগ্যিস, এর পর হঠাৎ যে-কাণ্ডটা আপনি করে বসলেন, সেটা আমি শোনাতে এসেছি আপনাকেই, অন্য কাউকে নয়, অন্যে হলে সবটাকেই একটা বিশুদ্ধ ঠাট্টার মত মনে করে হয় হো হো করে হেসে উঠত, নয় বলত, কী, ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি, এমন কখনো হয়? কিন্তু এ-পৃথিবীতে কোনটা হয় আর কোনটা হয় না, মানুষ বস্তুটার সম্ভাবনার সীমাটা কোথায় বা কোনো সীমা আছে কি না, বলুন তো তার কী বুঝবে সেই অন্যেরা? আপনার কাছে কবুল করতে দ্বিধা নেই (এমন কি এতদূর পর্যন্ত যেতে আমি রাজী আছি, বলতে প্রস্তুত আছি যে আপনি নিজে না করে কাণ্ডটা যদি অন্য কেউ করত এবং কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যদি সে-কাণ্ডটার ইতিবৃত্ত আপনাকে শোনাতে আসত তো হাজার মহানুভব হয়েও আপনি স্বয়ং সেটা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন না), আমি নিজেও তা বুঝতাম না যদি যা-কিছু আপনি করলেন, তার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের অন্যতম না হতাম। এবং শোনার পর কেউ যদি তা সম্ভব বলে মেনেও নেয় (অর্থাৎ সে যদি কাণ্ডটার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী না হয়ে থাকে আগে), তবু বলবে, তা হলে লোকটা পাগল, কারণ সুস্থ মস্তিষ্কে এমন জিনিস সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি তো পাগল নন—না নিজেকে পাগল বলেই অবশেষে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন এতক্ষণে? সমাজ কাকে বলে সুস্থমস্তিষ্ক আর কাকে বলে বিকৃতমস্তিষ্ক, সে-দায় সমাজের, এবং সে-সমাজকে কলা দেখাতে আপনাকে দেখলাম বলেই বলছি, আমার সামান্য বিচারে আপনি পাগল নন, আপনার নিজের বিচারেও নন। থাক দাদা, সে-তর্কে গিয়ে কাজ নেই, এখন যা করলেন, সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাই বলি। হয়তো কয়েক সেকেণ্ড, বড় জোর মিনিটখানেক আপনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ভিখিরীটার দিকে, পরে কী মনে করে হঠাৎ (বেড়াটা ডিঙোলেন তো? সেই আপনিই যে-আপনি ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করেন না, যে-আপনি এই ভিখিরীটাকেও মাত্র দুবার ভিক্ষা দিয়েছেন আগে, তাকে দেখেছেন আপনার চল্লিশটি বসন্ত পার-হওয়া জীবনে সবশুদ্ধ চারবার, অর্থাৎ আজকের দেখাটাকে ধরে, এবং প্রতিবারই মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যই, কারণ সে তো দেখতে না দেখতে আপনার বাড়ি ছাড়িয়ে হন হন করে চলে যায়) আপনার ভাঙা হিন্দীতে তাকে বলে বসলেন, চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। সে বোঝেনি কথাটার তাৎপর্য, খুব সম্ভব সেটা আপনি নিজেও বোঝেননি সে-মুহূর্তে, এবং অচিরেই যখন তাকে নিয়ে রাস্তায় নেমে তারই গানটা ধরলেন, বাজী রেখে বলব সে প্রচণ্ড ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়ই, এমনকি অন্তত ক্ষণেকের জন্য আপনাকে নিশ্চয় পাগলও মনে করে বসে। এবং পাগল যে আপনি নন, সে-কথা তাকে নিশ্চিত করে কেউ তো তখনো জানাতে পারেনি, কারণ আপনারই মত সেও আপনাকে দেখেছে এর আগে মাত্র তিন বার—কিম্বা ভালো করে একবারও দেখেনি—আপনার কাছ হতে ভিক্ষা পেয়েছে দুবার, তাই এমন ঝকঝকে পাড়ায় এমন ঝকঝকে বাড়িতে বাস করেও আপনার যে আসলে মাথায় গাদা গাদা ছিট নেই বা আপনি যে ইতিমধ্যেই দু-এক বার পাগলা গারদ ঘুরে আসেননি, সে-স্থিরতা সে পাচ্ছে কোত্থেকে? অথবা বলা যায় না, এমন অসহায় পেয়ে হয়তো নিষ্ঠুর কোনো ঠাট্টাই আপনি করতে চান তাকে নিয়ে, এমন ধারণাও তার মনে জেগে থাকতে পারে। মনে পড়ে, একবার (ঐ আপনি গানটা ধরার অল্পক্ষণের মধ্যেই) কাকুতি-মিনতি করে আপনাকে এমন পর্যন্ত বলে (তার হিন্দীতেই, এবং সেটা আপনি বোঝেনও), এ আপনি কী করছেন, আমায় ছেড়ে দিন? কিন্তু তখন গেয়ে উঠেছেন আপনি—ঐ তারই যথাসম্ভব অনুকরণে 'কহো রামা' ইত্যাদি—রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, এখন সে আপনাকে ছাড়তে চাইলেও আপনি তাকে ছাড়েন কী করে? শুধু তাই নয়, আপনার

গলার স্বর চিনে আপনার স্ত্রীও ইতিমধ্যে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন গেটের কাছে (অবশ্য ততক্ষণে আপনি ভিখিরীর সঙ্গে রাস্তায়, আপনার বাড়ি হতে বেশ কয়েক হাত দূরে), আপনার কন্যাটিও বেরিয়েছে, পাশের বাড়ির একটি ছেলের নজরেও পড়েছেন এবং সে তৎক্ষণাৎ পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে তার মা-বাবাকে খবর দিয়েছে, আর খবরটা এমন বলেই ঝড়ো হাওয়ায় আগুনের মত তা এক বাড়ি হতে আরেক বাড়িকে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করেছে—এক কথায়, এই অভাবনীয় নতুন রূপে আপনি পরিচিত হয়ে গিয়েছেন আশপাশের ছোট জগতের বিস্মিত হতবাক দৃষ্টির সামনে, এখন ফিরতে চাইলেও ফিরে আপনার লাভ কি আছে? এবং কোথায়ই বা ফিরবেন? সেই পুরানো পরিচিত জগতে? সে-ফেরার দরজা তো চিরকালের মত নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন ভাই—কারণ পরে যাই করুন না কেন, এখন হতে পাড়ার সকলের কাছে (যেমন আপনার বাড়িরও প্রত্যেকের কাছে) আজকের এই ঘটনাটির স্মৃতির সঙ্গে আপনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবেনই। অর্থাৎ, একটা তীর ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে—এবং কী তীর একখানি!

জানি আপনার ভয়টা অন্য, কিন্তু বুঝছেন কি না বলতে পারব না, এই বিবরণে শেষরক্ষা করতে পারছি কি না, সে-ভয়টা আমার—বলেইছি তো আগে, এমন কাহিনী বলার ভাষা আমার নেই। তাই কেবলি সব গোলমাল করে ফেলছি, বারে বারে আগেরটা-পরে-পরেরটা-আগে হয়ে যাচ্ছে, কারণ ঐ দেখুন, বললাম আপনার স্ত্রীর হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরোনোর কথা, অথচ বললাম না সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে তাঁর চীৎকার করে ওঠার কথা, চেঁচিয়ে শাসনের ভঙ্গীতে আপনাকে নাম ধরে তাঁর ডাকার কথা, আপনাকে প্রাণপণে ফেরানোর সেই দুর্দম প্রয়াসটা তাঁর। আপনি সে-ডাক শুনেও শোনেননি (এবং আপনার স্ত্রীও রাস্তা হতে সজোরে টেনে বাড়িতে এনে ঢোকাতে পারেননি আপনাকে—সে-চেষ্টাই তিনি করে উঠতে পারলেন না, কারণ ছি ছি, দিনদুপুরে রাস্তার মাঝখানে স্বামী-স্ত্রীতে এই টানাহেঁচড়া দেখলে লোকে কী বলবে?), শুধু গেটে পাংশুমুখ (যেহেতু এমন কাণ্ডের পরই বা স্ত্রী কেমন করে মুখ দেখাবেন? জানি সে-ভয় যতটা তাঁর, তার চেয়ে বেশি আপনার, যদিও ভয় আপনার নয় স্ত্রীর সম্মানহানির জন্য, বরং স্বামীর কারণে যে-স্ত্রীর সম্মানহানি হয়েছে, তার সামনে স্বামী দাঁড়াবে কোন্ মুখ নিয়ে, ভাবছেন অনেকটা সেইরকমই—কী দাদা, কেমন গণৎকার আমি, দেখছেন?) স্ত্রী-কন্যাকে রেখে (আপনার স্ত্রী অবশ্য অল্পক্ষণই এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এ-দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারেননি, অচিরেই কন্যাকে টানতে টানতে বাড়ীর ভিতরে অদৃশ্য হন) আপনি এগিয়ে যেতে থাকেনই, গাইতে গাইতে, ভিখিরীটাকে নিয়ে। তার মত গলা আপনার নেই—কারণ এমন বাহারে টুইড জ্যাকেট (সেই কোন্ মান্ধাতার আমলে লন্ডনে কিনেছিলেন, আজো দিব্যি চলছে) পরে গলায় ঐ রুক্ষতা আপনি পাবেন কোত্থেকে—তবু বিনয় নাই করলেন, আপনার গলাটাও কিছু কম চোস্ত নয়। কৌতুকে উচ্ছল বেশ কয়েকটি ছেলে-যুবার দল পিছু নিয়েছে, ছুটির দিন বলেই প্রতিবেশী এক-আধজন ভদ্রলোকও গম্ভীর মুখে (সমীহের ভাবে কি?) সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন—এও এক মিছিল, তবু উত্তরবঙ্গের সেই ত্রাণ-তহবিলের জন্য গান গেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা হতে কত পৃথক, এতদিন এ-পাড়াতে বাস করেও পাড়াটা আশ্চর্যভাবে যেন হঠাৎ কত নতুন, এ-বাড়িগুলো যেন আপনার সেই চেনা বাড়ি নয়, এ-পথ সেই আপিসে যাওয়া-আসার গাড়ী-হাঁকানো পথও নয়, এমন কি আপনার বাড়িটাও সেই আপনার বাড়ি আর নয়, বরং চোখে যেন সব বন্ বন্ করে ঘুরছে, কী ভয়ঙ্করই না বদলে যাচ্ছে, নতুন এক অসম্ভব পরিচয়ের জগতে যেন আদিম কোন গিরির অগ্নুদ্গারী

গর্জনে আপনার সব সত্তা-সম্বিৎ-অভিজ্ঞতা লুপ্ত হতে চলেছে—এমন কত কথাই না তখন মনে হচ্ছিল আপনার। এক কথায়, পথই যে অন্তিম আত্মীয় আমাদের, আমরা সেই নীড়াভিলাষী, আপনি তা বুঝেছিলেন। আমি তো সাবাস বলব ভাই, বলবই—কারণ কী সেই জঞ্জাল যা আপনাকে হঠাৎ এত ক্লান্ত করল, আপনাকে তুলল এমন অমানুষিক সাহসের শিখরে? হ্যাঁ, অমানুষিকই বটে (আমার কাব্যটা বাদ দিন ভাই, আমি যে পাইনি কিছুই, তাই কাব্য), নির্বিশেষ মানুষকে (শেষে কি না ঐ ভিখিরীটাকে নিয়ে?—অনেক লোকে তাচ্ছিল্যের ভাবে বলাবলি করবেই, এ-মুহূর্তে ঘরে ঘরে করছেও, অনুমান তো সহজেই করা চলে) আলিঙ্গনের এমন প্রয়াসকে আর কী বলব বলুন।

বলা বাহুল্য, ভিক্ষাও প্রচুর পেলেন, অর্থাৎ আপনার দৌলতে ঐ ভিখিরীটা পেল--এক দিনে আজ তার যা উপার্জন, হয়তো গোটা একটা মাসেও সে কখনো তা পায়নি। আর সেটা তো হবেই, কারণ সে কি, তার হয়ে আপনি রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন, যে-আপনাকে সকলে চেনে এই পাড়ায়, যে-আপনি এত সম্ভ্রান্ত, আর সবাই যেচে এসে যথাসাধ্য ফেলবে না কৌটোয়—তা কি হয়? মনে আপনার পড়ছে নিশ্চয়, সামান্য কৌটোটা কত শীঘ্র পূর্ণ হয়ে যায়, চলার সময় ঝন ঝন করে আওয়াজ করতে থাকে (যেহেতু মুদ্রাও পড়ে বহু), শেষে আপনাকেই বেশ কয়েকটা নোট লোকটার জীর্ণ শীর্ণ কম্বলের আঁচলে বাঁধতে হয়। এবং মনে পড়ে আপনার বাড়ির সামনের সেই গুজরাটি ভদ্রলোকটিকে (ঐ দেখুন, আবার হাঁ করে তাকাচ্ছেন, কী হল আপনার বলুন তো। আরে মশাই, এই সামনের বাড়িটায় যিনি থাকেন, বাড়িটা যিনি সম্প্রতি কিনেছেন, গৃহপ্রবেশে আপনাকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করতে আসেন-- আপনি অবশ্য যাননি, সেটা আলাদা কথা—ঐ যাঁর কিসের যেন বিরাট ব্যবসা আছে, বাড়ির একতলাটায় আপিস করেছেন, ওপরে নিজেরা থাকেন), সে-ভদ্রলোকটি তো দশ টাকার দুখানা নোট পর্যন্ত গুঁজে দিলেন। আর মনে পড়ে, টাকাটা দিয়েই কেমন একটা পিঠ চাপড়ানোর ভঙ্গীতে ভদ্রলোক হেসে বলে ওঠেন (ভাঙা বাংলাতেই, কারণ ভদ্রলোক নাকি বহুকাল কলকাতাতে ছিলেন, সেখানেই ব্যবসা করতেন, পরে ঘেরাও-ফেরাও-এ নাকাল হয়ে সম্প্রতি নাকি পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে এসেছেন এখানে—মনে পড়ছে না, ঐ প্রথম দিনই তো বলেন, যেদিন একগাল হেসে গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ জানাতে আপনার বাড়ি চড়াও হন?), খাসা কাজ করছেন স্যার, এইরকমই তো হওয়া চাই? অন্য সময় হলে তাঁর এই কথায় আপনার পিত্তি জ্বলে যেতই (কারণ জানেনই তো, ভিখিরীদের তিনি কত ভিক্ষে দেন, গেটের কাছে কোনো অভাগাকে দেখলে তাঁরই কুকুরের মত কী রকম খেঁকিয়ে তেড়ে আসেন), তবে তখন মনের যা অবস্থা আপনার, তাতে আপনি ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এবং আপনার একেবারে পাশের বাড়ির পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটিও (ঐ যিনি অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী অফিসার, এবং সেই কারণেই চুরুট খেতে খেতে এমন সাংঘাতিক উঁচু জাতের ইংরেজী বলেন যা একমাত্র ভারতীয় আর্মির অফিসারদের পক্ষেই সম্ভব—তাঁকেও তো চেনেন, কারণ তিনিও তো আসেন আপনার বাড়ি গত দীপাবলীর সন্ধ্যায়, যেচেই, শুধু সৌজন্যের খাতিরেই) সেইরকমই একটা মোটা ভিক্ষা দেন, দিয়েই সুড়ুৎ করে আবার বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েন।

আপনি যে পাগল নন, তা ভিখিরীটা এতক্ষণে বুঝেছিল নিশ্চয়, নইলে কেন গুজরাটি ভদ্রলোক ওভাবে এসে কথা বললেন, অন্যেরাই বা কেন এমন ব্যবহার করতে যাবে? সে তাই মুখ নিচু করে পথ হাঁটতে থাকে লজ্জায় (লোকটার আত্মসম্মানজ্ঞান আছে বলেই—এবং

এটাও বাজী রেখে বলে রাখছি, আর কখনো এ-পাড়ার ধারে-কাছে সে ঘেঁষবে না, কারণ কে জানে, পাছে আবার আপনি এ-ধরনের একটা কাণ্ড করে বসেন), হয়তো আপনার প্রতি এক অস্বাভাবিক শ্রদ্ধার বোধেও, যেহেতু ভূভারতে এমন ঝক্কি কে কাকে কবে নিতে দেখেছে একটা ভিখিরীর জন্যে? এবং সে আপনাকে এমন পর্যন্ত বলে (মনে পড়ছে? ঐ যখন এত রাস্তা ঘুরে আপনি তাকে বিদায় দিলেন মাত্র কিছুক্ষণ আগে, অদূরের ঐ নালাটার মোড়ে?), এত পয়সা আমি কোনোদিন পাইনি বাবু, এ তো আমার উপার্জন নয়, আপনার, কারণ আপনিই গান করেছেন—এ আমি কী করে নিই? শুনে লোকটির প্রতি কেমন সম্ভ্রম জাগে আপনার, এক চরম লজ্জা ও ধিক্কারবোধে বাক্যও রোধ হয়ে আসে, কারণ সত্যিই তো, আপনি বলেই লোকে হঠাৎ এমন দরাজ, ভিখিরীটার জন্যে তো তাদের ভারী বয়েই গেল। জানি, তখন আপনি তাকে বলতে চান (কথাটা মুখে প্রায় এসেও গিয়েছিল), লজ্জাটা তোমার স্বাভাবিক ভাই, তবু দোষটা তোমার নয়, কারণ এ-লজ্জা আজ যে দিচ্ছে তোমায়, সে-পাপ আমার, আমাদের সকলের, এই অমানুষিক সমাজের। এমন কি চকিতে এই ভাবনাও আপনার মনে জাগে একবার যে ছুটে যান ফিরে বাড়িতে, আরো কিছু টাকা এনে তার হাতে তুলে দেন সে-পাপের অতি আংশিক প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। তবু ভাগ্যিস (এবং এখানেও আপনার মাত্রাজ্ঞানে আমি সমানই অভিভূত), সে-সব কিছুই বলেননি-করেননি, বরং অতি-নাটকীয় হবার সব সস্তা প্রলোভন কী অনায়াসে দমন করলেন, শুধু ছোট্ট একটু নমস্কার করে হেসে তাকে বিদায় দিলেন যখন সূর্য পশ্চিম কোণে বেশ ঢলে পড়েছে, দিনের কিছু শেষ শব্দ ধিকোতে ধিকোতে থামছে—পরে একলা একলা কিছুটা সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

আমিও ফিরি আপনার প্রায় পিছন-পিছনই, এবং যাত্রাতেও আপনাদের দুজনের সঙ্গী হই (শুধু কিছু তফাতে ছিলাম, নামহীনের অনুগামী ভিড়ে) একেবারে গোড়ার দিকেই। আমার কেবল দাদা ভিক্ষাটাই দেওয়া হয়নি, তবু স্বপ্নাবিষ্টের মত আপনার অনুসরণ করেছি রাস্তায় রাস্তায়—দুই অসম ভাষার, অসম বয়সের, সম্পূর্ণ অসম ও বিপরীত দুটি জগতের দুটি প্রাণীকে দেখলাম (চোখ বুঁজে এখনো দেখছি) মানুষের পৃথিবীর পথে।

না, আপনি দেখছি কিছুতেই মুখ খুলবেন না। বেশ ভাই, তবে তাই হোক, চা আমি অনেকক্ষণ আগেই শেষ করেছি, আপনার কত সময়ও নিলাম, গল্পটা শোনার জন্যে ধন্যবাদ। এবার উঠি, রীতিমত ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে (যেমন আমার, তেমনি আপনারও নিশ্চয়)—আপনিও উঠুন, সংগ্রামটা অনিবার্যই (কারণ স্ত্রী-কন্যাকে তো আপনি ফেলতে পারবেন না, তারা চাইলেও পারবেন না—কিন্তু তারাও কি চাইবে?), ফেলে রেখে লাভটা কী। আসুন, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিই আপনাকে, ঠেলে নিজেই ভিতরে যান, স্ত্রীর মুখোমুখি হোন—আজ যা করে এলেন রাস্তায় রাস্তায়, তারপরে আসল যাত্রাটা তো আপনার সুরু হচ্ছে আজকের এই রাত হতেই। তাই আমিও আপনাকে ছেড়ে দিতে চাই আপনার রাত্রিরই হাতে। আমার একলারই নয়, আমার মত সকলের এক অনন্ত বিশ্বাস আপনার প্রতি, দুই তীরের সেই প্রায় অকল্পনীয় সেতুটা বাঁধুন তো দেখি ভাই—এক রাত্রিতেই এর নিষ্পত্তি যদিও সম্ভব নয় (অন্তত আমার মনে তো তা হয় না—দেখছেন তো, অমন গণৎকারী বিদ্যাটাও আর তত সহায় হচ্ছে না, জোর করে কিছুই বলতে পারছি না), তবু কী হল-না-হল, যাত্রায় কতদূর এগোলেন-না-এগোলেন, তা না হয় কাল ভোরে এসে একবার খোঁজ করে যাব।

জাঁ পল সার্তরের নব্য মার্কসবাদ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জাঁ পল সার্তর্ একাধারে সাহিত্যিক, সমালোচক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং এক বিশেষ মেজাজের নিরীশ্বর এক্সিস্টেনশিয়াল দর্শনের প্রবক্তা। এক্সিস্টেনশিয়াল দর্শনের যে ধারায় ঈশ্বর স্বীকৃত অনেকদিন ধরেই সে ধারা ইউরোপে প্রবাহিত। সার্তর-এর নিরীশ্বর দর্শন অতিসম্প্রতিকালে ভদ্রলোকের পাতে উঠেছে। শুধু কাফে-বিলাসী উঠ্‌তি-সাহিত্যিক মহলে নয়, অধুনা নানাদেশের জ্ঞানীগুণীমহলেও এই দর্শনের অনুশীলন হচ্ছে।

মননশীলতার ঐশ্বর্যে দীপ্যমান, সাহিত্যকৃতিতে নতুনের পথিকৃৎ সার্তর-এর প্রধান পরিচয় এই যে তিনি এ যুগের অন্যতম প্রধান দার্শনিক। একথা স্বীকার করা ভাল যে, স্পিনোজা কিম্বা কান্টের মতো সার্তর-কে ঠিক স্থিতধী বলা হয়তো চলে না। শুধু তত্ত্বজ্ঞান কিম্বা তত্ত্বদর্শনেও তাঁর আস্থা নেই। গজদন্তমিনারে অবস্থান করে বাস্তবের মালিন্যমুক্ত স্বপ্রকাশ সত্যের সাধনাতেও সার্তরের নিরতিশয় অনাগ্রহ। সার্তর আজীবন জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগকে মেলাতে চেয়েছেন। একদিক থেকে তিনি ফেনোমেনোলজির (phenomenology) উত্তরসাধক, জ্ঞানমার্গী। অন্যদিকে আবার ব্যবহারিক রাজনীতির পতন—অভ্যুদয়ক্ষুব্ধ লৌকিক জগতেও তাঁর স্বচ্ছন্দবিহার। সার্তরদর্শনের একবিন্দুতে মানুষ, অন্য বিন্দুতে ইতিহাস। দেকার্ত (Descartes), হুশারেল (Husserel) ও অন্যান্য দার্শনিকের চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি যেমন সার্তর-দর্শনে লভ্য তেমনি হেগেল ও মার্কসের প্রভাবও সার্তর-মানসে বিদ্যমান। মানুষ ও তার মুক্তস্বরূপকে বুঝবার জন্য সার্তর এক বিশেষ মেজাজের এক্সিস্টেনশিয়াল দর্শন প্রতিপন্ন করেছেন। আবার ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে বুঝবার জন্য হেগেলদর্শন, বিশেষত মার্কসবাদের শরণাপন্ন হয়েছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যদিচ সার্তরের পক্ষপাত বরাবরই মার্কসবাদের দিকে তবুও দর্শনের দিক থেকে এক্সিস্টেনশিয়াল দর্শন ও মার্কসবাদ দুই মেরুতে অবস্থিত। সার্তর পূর্বাপর মনে করেছেন যে 'মার্কসবাদী পদ্ধতি' ছাড়া সমকালীন সমাজপ্রবাহের গতি-প্রকৃতিকে বুঝবার আর কোনও দ্বিতীয় পথ নেই। অথচ সার্তর দীক্ষিত মার্কসবাদী নন এবং ভক্তিমার্গের পথ ধরে চলাতেও তিনি অভ্যস্ত নন। সার্তর্-মানসের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মার্কসবাদের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে তিনি বরাবরই অনুরাগ-বিরাগের মধ্যে আন্দোলিত হয়েছেন। একদিকে আদিগুরু কার্ল মার্কসের পদ্ধতির প্রশংসা, অন্যদিকে মার্কসবাদ-ব্যবসায়ী পার্টি-পালোয়ানদের নির্বিচার, যান্ত্রিক মতামতের কঠোর সমালোচনা, এই দ্বৈত-আবেগের ফলে সাম্যবাদী মহলে সার্তর্ কোনদিনই নিকটআত্মীয় হয়ে ওঠেন নি। কমিউনিস্ট না হয়েও সার্তর বিশ্বাস করেছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর তথা বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য সাম্যবাদী দলের প্রয়োজন আছে, হোক না সে দলের ইতিহাস কলঙ্কে মলিন। অন্যদিকে তিনি বরাবরই বলেছেন যে সরকারী মার্কসবাদের অভিঘাতে মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে এবং 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' দর্শন হিসাবে ভ্রান্ত।

সার্তর দর্শনের মধ্যমণি মানুষ ও মানবিক পরিস্থিতি। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দেবতা ইতিহাস। ফলে এই দুই দর্শনের উৎসমুখ স্বতঃই স্বতন্ত্র। ১৯৪৫ সাল

থেকেই সার্ত্র ভেবেছেন যে এক্সিস্টেনসিয়ালিজমের জারকরসে জারিয়ে মার্কসবাদকে পূর্ণতা দান করতে হবে। *Materialism and Revolution* নামক প্রবন্ধে সার্ত্র বলেছেন যে নবীনদের সামনে এযাবৎ শুধু দুটি বিকল্প তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে,—হয় হেগেলের ব্রহ্মবাদ মেনে নাও নয়তো বস্তুবাদকে গ্রহণ করো। হেগেলের ব্রহ্মবাদের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে এই মতবাদ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, বৈজ্ঞানিকতার স্পর্শলেশহীন। ব্রহ্মবাদ যদি গ্রাহ্য না হয় তবে কোন্ মতবাদ গ্রহণ করতে হবে? উত্তরে বিপ্লবীরা বলেছেন,—'বস্তুবাদ'। আর বস্তুবাদকে যদি গ্রহণ করতেই হয় তাহলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর গতি কি? সার্ত্র বলেছেন এই বিচারধারায় নানা ধরনের দোষ স্পর্শ করেছে। সার্ত্রের মতে হেগেলীয় ব্রহ্মবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ—এই দুই মতবাদই ভ্রান্ত। দুই মতবাদের উপাত্তগুলিই (premises) অসঙ্গতিতে ভরা। সার্ত্র বলেছেন যে, ব্রহ্মবাদ কিম্বা বস্তুবাদ—কোনটাই বিপ্লবীদের দর্শন হতে পারে না। উভয় দর্শনই বিপ্লবীদের প্রতারণা করেছে। ভাববাদ বলেছে: বিশ্বজগতে কতকগুলি সনাতন কর্তব্য ও ইষ্ট অন্তর্লীন হয়ে আছে। এইসব সনাতন বিধি-বিধানের সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন কর। তবেই মুক্তির পথ অবারিত হবে। অর্থাৎ ব্রহ্মবাদে মানুষের স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সৃষ্টিশীল ভূমিকা গৌণ। মানুষই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, মানুষই ইষ্টানিষ্ঠের স্রষ্টা বিশেষ মানবিক পটভূমিতে। মানুষই স্বরাট্। ব্রহ্মবাদে এ-সব সত্যের স্বীকৃতি নেই। অন্যদিকে স্বতন্ত্রপথে বস্তুবাদও মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। বস্তুবাদ বলেছে: মানুষ প্রকৃতিরই অংশবিশেষ। অতএব পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে ইষ্টানিষ্ঠের জগৎ সৃষ্টি করতে মানুষ অক্ষম। সার্ত্র বলেছেন যে, বস্তুবাদ নিয়ন্ত্রণবাদেরই (determinism) শুধু রকমফের। বস্তুবাদকে গ্রহণ করে বিপ্লবীর দশা হয়েছে অনেকটা স্যাম্‌সনের মতো। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণে প্রস্তুত ছিলেন স্যাম্‌সন। কিন্তু একটি সর্তে। সেই সর্তটি হল, ফিলিস্টিনরাও স্যামসনের সঙ্গে নিঃশেষ হবে। ফিলিস্টিনরা যদি পরাভূত হয়, শত্রুর সেই পরাভবের আনন্দে নিজের আত্মাহুতিও স্যামসনের কাম্য। বিপ্লবীর মানসিকতা স্যামসনের মতোই। বিপ্লবী চেয়েছেন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। বস্তুবাদ মেনে নিলে নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism) যদি আসে আসুক। বস্তুবাদ তথা নিয়ন্ত্রণবাদের কবলে পড়ে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ভরাডুবি হয়তো হোক্। কিন্তু ব্রহ্মবাদ (বুর্জোয়াদের) তো বাতিল হোল। বিপ্লবী বস্তুবাদকে গ্রহণ করে ভেবেছে: যাক্ ব্রহ্মবাদের কুহেলিকা থেকে তো মুক্ত হলাম। বুর্জোয়াদের ভাববাদ তথা ব্রহ্মবাদ বাতিল হোল এতেই বিপ্লবীর আনন্দ। বস্তুবাদের কবলে পড়ে বিপ্লবীর ঈপ্সিত লক্ষ্য যদি নেপথ্যে যায়, বিপ্লবীর অপঘাত মৃত্যু ঘটে স্যামসনের মতো, তাতে বিপ্লবীর শোক করা সাজে না।

সার্ত্র বলেছেন যে বস্তুবাদ বনিয়াদ (base) ও খিলানের (super-structure) উপমা প্রয়োগ করে চৈতন্যশক্তিকে বুঝতে চেয়ে নানা অনুপপত্তির সৃষ্টি করেছে। বস্তুবাদ মনে করেছে যে চৈতন্যশক্তি শুধু খিলানেরই অন্তর্ভুক্ত। বনিয়াদকে বাদ দিয়ে যেমন খিলানকে ধরে রাখা যায় না, সুপারস্ট্রাকচার যেমন বনিয়াদের উপর একান্তভাবে আশ্রিত, তেমনি চৈতন্যশক্তিও বাস্তব সামাজিক অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। বস্তুবাদ তাই বলে যে, চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষকে বুঝতে চাও তো সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের জৈবিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিচার করো। বনিয়াদকে বাদ দিয়ে চৈতন্যরূপ খিলানকে বোঝা যাবে এ কষ্ট কল্পনা।

বস্তুবাদের সমালোচনা করে সার্ত্র আরও বলেছেন, চৈতন্য মানুষের আন্তরধর্ম।

চৈতন্যের বিচিত্র প্রকাশ ও বিস্তারের গভীর অনুশীলনই দার্শনিকের কাজ। চৈতন্যেরই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বকীয়তাকে জৈবিক কিম্বা অর্থনৈতিক এমনকি সামাজিক কোনো প্রত্যয়ের বাঁধনে বন্দী করা সম্ভব নয়। মার্কসবাদের মূল্য স্বীকার করেও ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সার্ত্র এক্সিস্টেনসিয়ালিজমের সঙ্গে মার্কসবাদের মৌলিক পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছেন। ফলে দেখা যাবে যে রোজার গারোদি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য দীক্ষিত মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা সার্ত্রকে 'কবরখানার সাহিত্যিক' 'পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর দার্শনিক', এই ধরনের নানা মনোরম অভিধায় ভূষিত করেছেন।

১৯৫০ সাল থেকে সার্ত্র-দর্শনের পর্বান্তরের সূত্রপাত। ফেনোমেনোলজি, এক্সিস্টেনসিয়ালিজম্, মনোবিজ্ঞান ও মার্কসবাদের সারবস্তু গ্রহণ করে, নানা উপাদান মিশিয়ে, তখন থেকেই এক নতুন দর্শনের রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন সার্ত্র। এই নতুন দর্শনকে বলা যায় এক ধরনের এক্সিস্টেনসিয়াল নব্য-মার্কসবাদ। প্রগতিশীল মহলে ইতিমধ্যে সার্ত্র খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর *Existentialism and Marxism* ও *Problem of Method* (১৯৫৭) প্রকাশিত হবার পর এই খ্যাতির পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। *Critique of Dialectical Reason* (১৯৬০) প্রকাশিত হবার পর তো সার্ত্রের খ্যাতি তুঙ্গে ওঠে। মার্কসবাদীরাও বলতে আরম্ভ করেন যে সার্ত্র এতদিনের শিক্ষানবিশীর পর এবার অন্ততঃ পুরোপুরি মার্কসবাদ গ্রহণ করলেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে কথাটা সত্য। আসলে এই পর্বান্তরেও সার্ত্রের দার্শনিক প্রতীতির কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে বলা চলে না। আগেও যেমন, নতুন পর্বেও তেমনি, সার্ত্র এক্সিস্টেনসিয়ালিজমের সঞ্জীবনীমন্ত্রে মার্কসবাদকে নবজীবন দান করতে চেয়েছেন। পার্টি-আশ্রিত তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' মার্কসবাদের সঙ্গে সার্ত্রের নব্য-মার্কসবাদের তুলনা করলে দেখা যাবে যে সার্ত্রের নব্যমার্কসবাদ স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া। আজও একদিকে মার্কসবাদের সারবস্তু সম্পর্কে অনুরাগ অন্যদিকে মার্কসবাদীদের 'প্রত্যয়ের দাসত্ব' সম্পর্কে বিরাগ, এই উভয়সংকটে সার্ত্র দোদুল্যমান। মার্কসবাদের প্রতি সার্ত্রের যে প্রগাঢ় অনুরাগ *Dialectical Reason*-এর পাতায় পাতায় তার পরিচয়। সার্ত্র বারবার ঘোষণা করেছেন যে, মার্কসবাদ এযুগের প্রমাণসিদ্ধ মতবাদ। একে অতিক্রম করে উচ্চতর কোন মার্গে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। দেকার্ত ও জন লকের যেমন একটা যুগ ছিল, তারপর যেমন এসেছিল কান্ট-হেগেলের যুগ তেমনি সমকালীন যুগ মার্কসবাদেরই যুগ। এক যুগে দেকার্ত ও লকের চিন্তাভাবনার পলিমাটি পড়ে ইউরোপের চিত্তভূমি সরস হয়েছিল। কান্ট ও হেগেলের মানসিক ফসলের সমারোহও এক বিশেষ যুগকে বর্ণাঢ্য করেছিল। অনুরূপভাবে আধুনিক যুগে সাংস্কৃতিক দিগন্তকে নির্দিষ্ট করতে হলে এযুগের দর্শন—অর্থাৎ মার্কসবাদকে বর্জন করা চলে না। সার্ত্রের মতে যে যুগের মানসিক ফসল মার্কসবাদ সেই যুগ আজও অতিক্রান্ত হয়নি। ফলে মার্কসবাদকে অতিক্রম করে এযুগের মানুষ সত্যে উপনীত হতে পারে না।

Critique of Dialectical Reason-এর এক জায়গায় গুরুগম্ভীরভাবে সার্ত্র এই বক্তব্যই রেখেছেন: "আমি অনেকবার বলেছি আবারও বলছি যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই মানব-ইতিহাসের একমাত্র প্রামাণিক ভাষ্য"। অন্যদিকে সার্ত্র একথাও বলেছেন: সাম্যবাদের যে বাস্তব রূপ ও অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করি তাতে স্পষ্ট যে এই মতবাদ বন্ধ্যা। নিজের উৎসমুখ সম্পর্কে উদাসীন থেকে আধুনিক সাম্যবাদ রূপান্তরিত হয়েছে এক ধরনের গুরুবাদে।

প্রগতিশীল ফরাসীদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করে সার্ত্র লিখেছেন: চাঁদের

আকর্ষণে জলের যেমন স্ফীতি দেখা দেয়, মার্কসবাদের আকর্ষণে আমরাও তেমনি স্ফীত, উদ্বেলিত হয়েছিলাম। আমাদের ধ্যান-ধারণায় রূপান্তর এনেছিল মার্কসবাদ। বুর্জোয়াদের যে-সব প্রত্যয়ের প্রভাবাধীন ছিলাম আমরা, মার্কসবাদের আলোকে সেই প্রত্যয়ের শাসন থেকে আমাদের মুক্তি ঘটেছিল। কিন্তু এত কাণ্ডের পর দেখলাম যে, মার্কসবাদ আমাদের শস্যশ্যামল প্রান্তরে পৌঁছে দিতে পারে নি—আমাদের ফেলে রেখে গেছে ধূসর অধিত্যকায়। আরও দেখলাম যে মার্কসবাদ আমাদের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করতেও সক্ষম নয়। বুঝলাম যে মার্কসবাদকে আর গতিশীল, চলিষ্ণু মতবাদ হিসাবে স্বীকার করা চলে না। এর প্রবাহ গেছে থেমে। ফলে আমরা এই বিশ্বাসে পৌঁছলাম যে মার্কসবাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু নেই।

Dialectical Reason পাঠ করলে দেখা যায় যে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে সার্ত্রের বক্তব্যের খুব বেশী ইতরবিশেষ হয়নি। মার্কসবাদকে তিনি যুগোপযোগী দর্শন বলেছেন। বলেছেন যে ইতিহাসের ধারাকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে চাই তবে মার্কসবাদকে বর্জন করলে অন্য কোন বিকল্প উপকরণ থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন: মার্কসবাদের দার্শনিক বনিয়াদ নেহাৎই কাঁচা। আর আধুনিক মার্কসবাদ তো উপযোগিতাবাদেরই (pragmatism) সগোত্র, ভূয়োদর্শনের উপর যে দর্শনের প্রতিষ্ঠা। প্রতিপক্ষের জবাব দিতে গিয়ে সার্ত্র লিখেছেন: প্রশ্ন হবে, মার্কসবাদের এতখানি মূল্য যখন আমরা স্বীকার করি তখন সোজাসুজি মার্কসবাদে দীক্ষা নিচ্ছি না কেন? তার কারণ এঙ্গেলস্ ও ফরাসী দেশের সাম্যবাদী তাত্ত্বিক রোজার গারোদি যে সব বক্তব্য রেখেছেন তাকে আমরা শুধু 'নির্দেশক নীতি' হিসাবে মানতে পারি। মনে করি কাজের সুবিধার জন্য এদের বক্তব্য শোনা প্রয়োজন। এইসব বক্তব্যে সমস্যার অল্পাধিক বিশ্লেষণ আছে তাও স্বীকার করি। কিন্তু এসব বক্তব্যকে বাস্তব, মূর্ত সত্য বলে স্বীকার করে নিতে আমরা প্রস্তুত নই।

Dialectical Reason-এর নব্যমার্কসবাদী সার্ত্র আজও তাই বলতে চান যে কর্মের ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ প্রমাণ-সিদ্ধ। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের তুচ্ছতা স্বীকার না করে উপায় নেই। সার্ত্র নানাভাবে বলেছেন যে সাম্যবাদ যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে সেই ব্যবস্থায় মার্কসের 'দর্শন' গেছে নেপথ্যে। ফলে আধুনিক মার্কসবাদ ভুলে গেছে যে পূর্বপক্ষ, খণ্ডন, উত্তরপক্ষ, আত্মসমালোচনা, এসব ছাড়া জ্ঞানকর্মযোগে স্থিত হওয়া সম্ভব নয়। চিত্তমুক্তির স্বার্থে যে অবাধ স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল একান্ত, আধুনিক মার্কসবাদে সেই স্বাধীনতার প্রশ্নও হারিয়ে গেছে। ফলে মার্কসবাদের ছত্রচ্ছায়ায় জ্ঞানের বিকাশ সুস্থ স্বাভাবিক পথে ঘটে নি। ইতিহাসও শুধু একই বৃত্তে ঘুরপাক খেয়ে ফিরেছে।

সার্ত্র তাই অভিযোগ তুলেছেন: চিত্তমুক্তির যে কর্তব্যভার মার্কসবাদেরই গ্রহণ করা উচিত ছিল সেই কর্তব্যভার গ্রহণ না করে আধুনিক মার্কসবাদ নির্বিচার মূঢ়বিশ্বাসের চোরাবালিতে আটক পড়েছে। তবে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ কি?

সার্ত্র বলেছেন, এই চোরাবালির বন্ধন না ঘোচালে মার্কসবাদ অভিশাপমুক্ত হবে না। মার্কসবাদের অন্তর্মূর্তিকাকে যদি সরস করে তুলতে হয় তবে এক্সিস্টেনসিয়াল দর্শনের সহায়তা না নিলেই নয়। এক্সিস্টেনসিয়াল দর্শন ও মার্কসবাদের যুগলবন্ধনে মার্কসবাদের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হবে। মার্কসবাদের অধুনা-স্তিমিত কিন্তু প্রাণদায়িনী ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে উচ্ছল পথে। তার জন্য মার্কসবাদকে উল্টো করে বসাতে হবে। একদা মার্কস হেগেলকে উল্টো করে বসিয়ে নতুন দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। আজ আবার মার্কস-

বাদের মুক্তির জন্য অনুরূপ প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন। মার্কসবাদকে উল্টো করে বসাবার তাৎপর্য কি? মার্কসবাদ বলেছে যে 'মানুষ'-কে বুঝতে চাও তো বিশ্বজাগতিক, জৈবিক এবং সামাজিক উপাদান সামগ্রীর বিশ্লেষণ করো। সার্তর-এর মতে এখান থেকেই মার্কসবাদের বিভ্রমের সূত্রপাত। সার্তর-কথিত নব্য-মার্কসবাদের যাত্রারম্ভ হবে মানবিক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে। এই দর্শনের মূল উপাত্ত (datum) হবে চৈতন্য,--আর ব্যক্তি হবে এই দর্শনের মধ্যমণি।

বলা হবে, ব্যক্তি তো শুধুই সমাজের তন্তুজালে ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত,—সমাজেরই সৃষ্টি, একদিক থেকে সমাজেরই দাস। তাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? উত্তরে সার্তর বলবেন: সনাতনী মার্কসবাদের সঙ্গে আমার নব্যমার্কসবাদের পার্থক্য তো ঠিক এইখানে। সার্তর তাই লিখেছেন: আমরা নিপীড়িত, আত্মচ্যুত (alienated) মানুষটিকেও 'বস্তু'র সগোত্র মনে করি না। কেননা 'বস্তু' কিম্বা বহিরঙ্গ অবস্থা কতকগুলি ভৌতিক নিয়মের (physical laws) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু অ্যালিয়েনেশনের হেতু আরও গভীরে। মানুষের কর্মের বিশেষতা (specificity) আমরা স্বীকার করি। ব্যক্তি সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয় একথা মেনে নিয়েও আমরা মনে করি যে কর্মযোগের মধ্য দিয়ে বন্ধনমোচনও হয়। অর্থাৎ সার্তর বলতে চান যে, মানুষ শুধুই জড়বস্তু নয়, কীটপতঙ্গের সমগোত্রীয়ও নয়। মেষপালকে দেখে কিম্বা মৌমাছিতন্ত্রের মৌমাছিকে দেখে সাদৃশ্যানুমান প্রয়োগ করে সমাজবন্ধ মানুষকে বোঝা চলে না। যে মুহূর্তে এটা ভুলে যাই যে মানুষ কি ভৌতিক কি জৈবিক কি সামাজিক অবস্থার সন্নিপাতে সৃষ্ট নয় সেই মুহূর্তে দার্শনিক পদস্খলন আরম্ভ হয়। হয় এই কারণে যে মানুষের স্বভাব মানুষের লক্ষণ একেবারেই আলাদা।

বিশেষ অবস্থার মুখোমুখি হয় মানুষ কিম্বা মানবগোষ্ঠী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে স্বকীয় চৈতন্যে মানুষের নানারূপ তুলে ধরে। মনের মুকুরে ভেসে ওঠে মানুষেরই নানা রূপ। মানসমুকুরে ধৃত, ক্রমবিকাশমান এই যে রূপ তাই তো মানুষের স্বরূপ। সার্তর বলেছেন সমাজবন্ধ হলেও মানুষ তাই সমাজের দাস নয়। সমাজকে অতিক্রম ক'রে চলে যায় মানুষ চৈতন্যের বিস্তারে। কোন ঐশ্বরিক বিধান কিম্বা লৌকিক ইতিহাসের কোন অনিবার্য নিয়ম তাই মানুষকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না। এ সব কথা সার্তর *Being and Nothingness* এবং *Flies*-এ আগেও বলেছেন।

Critique of Dialectical Reason-এ সার্তর এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন যে মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি 'মানুষ'-কে পুনরায় হাজির করাবেন। মানুষের যে অনির্বচনীয়ত্ব সমকালীন মার্কসবাদে নেপথ্যে চলে গেছে তাকে জ্ঞানের জগতে স্থান দিয়ে নব্যমার্কসবাদ প্রতিপন্নের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি।

অধুনা মার্কসবাদ সম্পর্কে সার্তরের যা মনোভাব, যে মনোভাবের প্রকাশ *Dialectical Reason*-এ, সেই মনোভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

প্রথম, সার্তর সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে মার্কসবাদের বস্তুবাদী মেটাফিজিক্‌স্‌ অথবা বস্তুগত ডায়ালেকটিক তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন।

দ্বিতীয়, মার্কসের অর্থনীতির বিচারধারা কিম্বা ইতিহাস-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সার্তর বলেছেন যে এসব ক্ষেত্রে মার্কস এমন সত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন যা স্বতঃপ্রমাণ। *Capital*-গ্রন্থে নানাবিভাগের খণ্ডজ্ঞানের সমন্বয় করেছেন মার্কস, সৃষ্টি করেছেন পুনর্গঠনের রূপরেখা। এই সমন্বয় ও পুনর্গঠন ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

এদের আর ভাষ্যের প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়, রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে সার্ত্রের বক্তব্য এই যে সাম্যবাদীদলের সদস্যরাই যদি 'শুদ্ধ মার্কসবাদী' হন তবে তিনি নিজে 'মার্কসবাদী' নন। কেননা ১৯৪৪ সাল থেকে সার্ত্র আধা-মার্কসবাদী হলেও কখনই সাম্যবাদী দলের সদস্য হন নি। তাৎকালিক রাজনীতির অনেক প্রশ্নে সামবাদী দলের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তবুও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের, মননের ও ভাবনার অধিকারকে তিনি সদাসর্বদা চোখের মণির মতো রক্ষা করেছেন। রাষ্ট্রদেবতা কিম্বা পার্টি-দেবতা কিম্বা অন্য কোন দেববিগ্রহের কাছে মাতা নত করাকে তিনি মনুষ্যত্বের অপমান বলেই মনে করেছেন।

চতুর্থ, *Dialectical Reason*-এ সার্ত্র 'ডায়ালেকটিক'-এর মার্কসবাদী ভাষ্য ও টীকাটীপ্পনী বর্জন ক'রে ব্যক্তিচৈতন্যাশ্রয়ী 'ডায়ালেকটিক'-কে গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রেণীসংঘাত তত্ত্ব তিনি অনেকখানি গ্রহণ করেছেন, যদিও নতুন বেশ পরিয়ে। ফলে ভাববস্তুর দিক থেকে সার্ত্র নতুন দর্শনই প্রতিপন্ন করেছেন। সার্ত্র নিজেই বলেছেন : 'ডায়ালেকটিক' আমি মানি। কিন্তু তাঁর হাতে যে পদ্ধতি ছিল সমাজের সঞ্চালক শক্তি হিসাবে কল্পিত তাই হয়ে উঠল ব্যক্তিচৈতন্যের ডায়ালেকটিক। সার্ত্র আরও বলেছেন: আমি শ্রেণীসংঘাততত্ত্ব মানি। কিন্তু ইতিহাসের সঞ্চালক শক্তি শ্রেণীসংঘাত নয়—অভাব (scarcity) ও প্রয়োজনবোধ (need)। সার্ত্র কর্মযোগের (praxis) কথা বলেছেন। মানুষ যদি ঈশ্বরের মতো আপ্তকাম হতো, অভাবখিন্ন না হতো তবে মানুষের কর্মের প্রয়োজন দেখা দিত না, ইতিহাসের ধারা যেত শুকিয়ে। অভাব আছে বলেই প্রয়োজনবোধের সৃষ্টি হয় এবং অভাব পূরণ করবার জন্যই মানুষ মনশ্চক্ষে ভবিষ্যতের রূপরেখা (project) সৃষ্টি করে। সার্ত্রের নব্যমার্কসবাদে প্রয়োজনবোধ এবং অভাব, এই দুটি প্রত্যয়ের অসামান্য গুরুত্ব। কি পেয়েছি আর কি পাইনি, কোন অবস্থায় আছি আর কোন অবস্থাকে কাম্য বলে মনে করি, এ সবের উপলব্ধি আছে বলেই মানুষের যুক্তিধারা স্বতঃই গতিশীল—ডায়লেকটিকাল। অভাব আছে বলেই জগতকে আমরা প্রয়োজনের মালা হিসাবে দেখি। অনেক কিছু পাইনি বলেই আমাদের কর্মৈষণা আছে কেননা কর্মের মধ্য দিয়েই আমরা অভাবমোচন করি, উত্তীর্ণ হই নতুন নতুন স্তরে। পথে বাধা দেখা দেয় কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মানুষ কাজ করে। কাজের মধ্য দিয়ে সার্থকতার আস্বাদ হয়তো মানুষ পায়। কিন্তু অভাবের তো শেষ নেই। কাজেই মানুষকে নিরন্তর এগিয়ে চলতেই হয়।

মানুষ কি বাস্তবজগতের, তথা পরিবেশের শুধুই নির্গুণ সাক্ষী? তা তো নয়। মানুষ বাস্তবজগতে হস্তক্ষেপ করে, যা পায়নি তা পাবার জন্য সতত চেষ্টা করে। কোন অবস্থাতেই মানুষ বলতে পারে না, আমার সব অভাব মিটেছে, আমি আপ্তকাম। ফলে মানুষের কর্মধারা ডায়ালেকটিক পদ্ধতিতে এগিয়ে চলে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে মানুষ অগ্রসর হয়।

মানুষের দুঃসাহসিক যাত্রা অভাবেরই বিরুদ্ধে। অভাবই ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অভাব আছে বলেই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সূত্র গড়ে ওঠে। আর অভাব-এর জন্যই আমরা ঠিক যা সেইভাবেই প্রকাশিত হই, আমাদের যে বিশেষ ইতিহাস তাও রচিত হয়। মানুষ ব্যবহারিক কর্মে নিযুক্ত হয় কেন? কর্মৈষণা কোথা থেকে আসে? কর্মৈষণা আসে অভাব থেকে, অভাব নিরসনের সংকল্প থেকে। শুধু তাই নয়। ইতিহাসের গতিচ্ছন্দের নেপথ্যচারী তত্ত্বটিও এই অভাব। অভাব আছে বলেই মানুষে মানুষে এত বৈরিতা। রাম মনে করে শ্যামের কাছ থেকে তার বিপদ আসবে আবার

শ্যামও ঠিক ঐ একই ভাবেই চিন্তা করে। 'Each feels in each other the principle of evil'.

ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক কি? ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু কি সমষ্টির মহাসমুদ্রে বিলীন হবে? এতেই কি ব্যক্তির সার্থকতা? মার্কসবাদ সমষ্টিরূপ সামান্যকে (universal) অসামান্য গুরুত্ব দিয়েছে, ব্যক্তিবিশেষকে শ্রেণীরূপে (class) বিলীন করে ডায়ালেকটিক-কে প্রতিপন্ন করেছে। সার্ত্র আগেও বলেছেন, *Dialectical Reason*-এও বলছেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে সংস্থিত হয়েও ব্যক্তি স্বতন্ত্র, স্বাধীন। ব্যক্তিরই অভিজ্ঞতা আছে, সুখদুঃখ আছে, আছে ইচ্ছাশক্তি। ফলে ব্যক্তির অভিজ্ঞতাই বাস্তব, মূর্ত সত্য। মার্কসবাদ যে সামান্যের কথা বলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলিয়ে গড়পরতা হিসাবে 'সমষ্টি' গড়ে তোলে, সেই সমষ্টি নেহাৎ-ই 'অ্যাবস্ট্র্যাকশন্'।

ব্যক্তি যদি মুখ্য হয় তবে ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর কিম্বা সমষ্টির কিম্বা সমাজের সম্পর্ক কি? ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সমন্বয় কেমন করে হবে? সার্ত্র বলেছেন যে 'সমগ্রীকরণ'-তত্ত্ব (totalisation) না মানলে এই সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই তত্ত্বটি মেনে নিলে বোঝা যায় কিভাবে ব্যক্তি হতে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, ব্যক্তিচৈতন্যের বিস্তার ঘটে ইতিহাসে।

সার্ত্র বলতে চান, ব্যক্তি যদি শুধুই 'স্ব'-এর খাঁচায় আবদ্ধ থাকত, ব্যক্তির স্বরূপে যদি সমগ্রীকরণের প্রবণতা অবস্থিত না হতো, তাহলে কোনভাবেই ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সেতুবন্ধন রচিত হোত না। ব্যক্তির কর্মধারা সতত গতিশীল, যা আছে তাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়াই যেহেতু এর ধর্ম, সেই হেতু ব্যক্তির উপর নির্ভর করেই ঐতিহাসিক ডায়া-লেকটিকের কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ইতিহাসের ধারার উৎসমুখের সন্ধানে বেরুলে ব্যক্তিতে না পেঁছে উপায় নেই। কোন ইন্দ্রজালের সাহায্যে কিম্বা কোন সংখ্যাগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সমষ্টির ইতিহাসগত কর্মধারার বিচার পণ্ডশ্রমই হবে। ব্যক্তির জীবনের ডায়ালেকটিক স্বতঃই সীমাকে ছাড়িয়ে যায় সমগ্রীকরণের প্রবণতার ফলে। একথা তাই মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তিজীবনের সমগ্রীকরণের প্রবণতা থেকেই যাত্রা শুরু করা দরকার। তবেই বোঝা যাবে কেমন ক'রে সমষ্টিকেন্দ্রিক ঘটনাবলীর উত্থানপতন সম্ভব হয়।

সার্ত্র স্বীকার করেছেন যে জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাঁচবার তাগিদেই মানুষ উৎপাদন ও আনুষঙ্গিক কর্মধারায় লিপ্ত হয়—অভাববোধ থেকে। এই সন্দেহাতীত সত্য মার্কসবাদ গ্রহণ করেছে বলেই মার্কসবাদ আজও তুচ্ছমূল্য হয়নি।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির কর্মধারা ঐতিহাসিক কর্মে রূপান্তরিত না হয় ততক্ষণ এই কর্মধারার সঞ্চালক শক্তি নেই। ব্যক্তি যখন পরমাণুর মতো বিচ্ছিন্ন তখন তার ইতিহাস রচনার ক্ষমতা নেই। তাকে তুলনা করা চলে বাক্স-বন্দী যন্ত্রপাতির সঙ্গে। এই যন্ত্রপাতি দিয়ে জগতকে পরিবর্তন করা সম্ভব কিন্তু যন্ত্রপাতির নিজের তো কোন উদ্যোগ নেই। যন্ত্রপাতির সুব্যবহারের জন্য কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন তাদের ব্যবহার করা চলে, যখন তাদের সমবেত শক্তির প্রকাশ ঘটে, তখনই কর্মধারার ডায়ালেকটিকের আরম্ভ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলে, বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে, যখন সামূহিক শক্তির ঐক্যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ব্যক্তির সুপ্ত শক্তি প্রকাশ পায়, ইতিহাসের ডায়ালেকটিক-এর সূত্রপাত হয়। প্রশ্ন হবে সামূহিকতার তো প্রকারভেদ আছে, স্তরভেদ আছে। সার্ত্র কোন্ সামূহিকতার কথা বলেছেন? সার্ত্র বলেছেন যে জনতার (collective) সঙ্গে সমষ্টির (group)

পার্থক্য না বুঝলে ডায়ালেকটিক-কে বোঝা যাবে না। বাসের জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। এই কিউ-এর সারিবন্ধ মানুষ নিঃসঙ্গতারই বহুত্ব (plurality of solitudes)। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে অনেকেই কিন্তু এদের মধ্যে ঐক্যানুভূতি নেই। কিউ-এ দাঁড়ান মানুষগুলি শুধুই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির যোগফল। এদের সহাবস্থান সারিবন্ধতার সহাবস্থান ঠিকই (series), তার বেশী কিছু নয়। এদের মধ্যে সকলেরই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ বাসে উঠে গন্তব্যস্থলে যাওয়া। কিন্তু এদের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যও উপেক্ষা করা চলে না। কেউ হয়তে বাড়ী ফিরে সিনেমায় যাবে. কেউ যাবে হাসপাতালে, কেউ যাবে কনসার্টে। ফলে প্রত্যেকের কাছে স্ব স্ব উদ্দেশ্যই প্রধান। বাসে সকলেই উঠতে পারল কিনা এটা এই সারিবন্ধ মানুষগুলির ভাবনার বিষয় নয়। কে আগে বাসে উঠবে, কার প্রয়োজন বেশী, কার নৈতিক যোগ্যতা বেশি. বাসে ওঠার বেলায় এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। সংখ্যা দিয়েই এখানকার সব বিচার। যে প্রথম দাঁড়িয়েছে কিউ-এ, তার দাবি সর্বাগ্রে, দ্বিতীয়র দাবি তারপর। এমনি করে বাসে ওঠার কাজ শেষ। বাসের কিউ-এ দাঁড়ান সারিবন্ধ মানুষের সামূহিকতা (serial existence) নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন মানুষেরই সামূহিকতা। রামের যেমন ক্ষমতা নেই পিছন থেকে এগিয়ে যায়, শ্যামেরও তেমনি ক্ষমতা নেই কিউ-এর লাইন ভাঙবার। সমাজজীবন যদি এই ধরনের সামূহিকতার চক্রে ঘূরপাক খেতো তবে সমাজে কোন সংস্থা, কোন নেতা, কোন সংগঠনের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। কিন্তু সমাজস্থিত ব্যক্তি বোঝে যে সারিবন্ধ মানুষের ক্ষমতা নেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই। এবং এই বোধ থেকেই সারিবন্ধ সামূহিকতার স্তর অতিক্রম করে মানুষ উত্তীর্ণ হয় গোষ্ঠী বা দলের স্তরে (group)।

সার্ত্র বলেছেন যে আধুনিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে বেঁচে থাকি তাকে সারিবন্ধ জীবনপাত (serial existence) নাম দিলে অন্যায় হবে না। সমাজজীবনের নানা ঘটনা, আমাদের আবেগ-অনুভূতি, অনেকখানি এই জীবনধারণের গতিপ্রকৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। সহরের কোন এলাকায় দাঙ্গা হোল, গুজব কানে হেটে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। 'আওয়ারা'র গান কিম্বা কোন চিত্রতারকার চুলবাঁধার স্টাইল ছড়িয়ে পড়ল সহর থেকে গ্রামের মেয়ে মহলে। এ সবই আমাদের সারিবন্ধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ। জনমত এখানে আমাদের মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা নির্দ্বিধায় বলি, এই রেকর্ডটি চমৎকার কেননা এটি খুব বিক্রী হচ্ছে। সার্ত্র বলেছেন, সারিবন্ধ জীবনপাতে যে সামূহিকতার প্রভাব কাজ করে সেই প্রভাবে প্রগতির ও স্বাধীনতার রেশ নেই। এখানে আছে শুধু গতানুগতিকতা, যান্ত্রিকতা ও স্থূলতা। এই সারিবন্ধ, মুখাবয়বহীন সামূহিকতা (collective) থেকে যখন গোষ্ঠী কিম্বা দল (group) গড়ে ওঠে তখনই ডায়ালেকটিক উৎক্রান্তির সাক্ষাৎ মেলে। সারিবন্ধতার চাপে মানুষ যে 'বস্তুর' সগোত্র হয়ে ওঠে, সেই অমানবিক অবস্থার অবসান হয়।

'কালেকটিভ' থেকে 'গ্রুপ' কেমন করে সৃষ্টি হয় সে প্রশ্ন আলোচনা করেছেন সার্ত্র *Critique of Dialectical Reason*-এ। নানা উদাহরণ দিয়ে এই সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনা করেছেন সার্ত্র। সব চাইতে উপাদেয় বর্ণনা আহরণ করেছেন ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস থেকে। ১৭৮৯-এর ১৪ই জুলাই। ফরাসী দেশ তখন সংকটে দীর্ণ। প্যারী নগরীর বাসিন্দারা তখন নানা দল, উপদল, চক্রে বিভক্ত হয়ে, বিচ্ছিন্ন থেকে, নানা ঋজুকুটিল পথে চলেছে। অকস্মাৎ শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে তারা বুঝল যে প্যারী নগরীর একাংশকে

ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যবোধ থেকে গড়ে উঠল আত্মসচেতন এক সম্প্রদায়, আদর্শের একতার রাখিবন্ধনে যাদের বিভেদ গেল ঘুচে। সৃষ্টি হোল প্রকৃত দেওয়া-নেওয়া, ভাবের আদান-প্রদান। সাধারণ এক বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি মানুষ প্রতিবেশীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠল, আত্মপর ভেদ গেল ঘুচে। অহংমমাভিমান গেল নেপথ্যে, সকলে হয়ে উঠল প্রত্যেকের আপনজন। Each, in the group, has found himself in other people —so that, other people are now the source of his liberty, not the obstacles to it. ইতিহাসের আলোচনা করে মার্কসবাদ বলেছে যে বিপ্লবী শক্তির অধিষ্ঠান সেই 'শ্রেণী' যে শ্রেণী উদীয়মান। সার্ত্র বলেছেন যে এই শক্তির অধিষ্ঠান গতিশীল গোষ্ঠী (group) যে গোষ্ঠী ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত।

গ্রুপ যদি একবার গড়ে ওঠে বেদনার ও সংগ্রামের পথে, তবে সেই 'গ্রুপ' কালক্রমে বিধি-বিধান, নিয়মকানুন সম্বলিত নতুন সংস্থার রূপ নেয়। এই সংস্থার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি হবে? সার্ত্র আগেই বলেছেন যে সারিবদ্ধ জীবন (life in series) থেকে গ্রুপজীবন গুণগতভাবে আলাদা। এ-দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। এবং এই দ্বন্দ্ব আছে বলেই সারিবদ্ধ জীবনের তামসিকতা থেকে গোষ্ঠীজীবনের সৌভ্রাত্রে উৎক্রান্তি ঘটে।

কথা উঠতে পারে ১৯৬০ সালের নব্যমার্কসবাদের দার্শনিক সার্ত্র কি ১৯৩৮ সালের *Nausea*-র লেখক সার্ত্র থেকে একেবারেই আলাদা? সার্ত্রের এই বিবর্তন কি গুণগত পরিবর্তন নয়? কিন্তু সার্ত্র-মানসিকতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই স্বীকার করবেন, এই বিবর্তনে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। যুদ্ধপূর্বকালীন ঐতিহ্যকে বহন করে যুবক সার্ত্র একদা ব্যক্তির বাধামুক্ত স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের দাবি রেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের শিল্পায়িত গণসমাজের স্বাধীনতার তুচ্ছতার দিকেও দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। দেখিয়েছিলেন, যে-স্বাধীনতা ইউরোপের মানুষ পেয়েছে, তাতে তার ভীতিবিহ্বলতাই বেড়েছে। এই ভীতি-বিহ্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে হলে চাই দায়িত্ববোধ। *Nausea*-য় এবং *Flies*-এ যেমন, *Dialectical Reason*-এও তেমনি সার্ত্র ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সে দায়িত্ববোধ ইতিহাসের জগন্নাথের রথের চাকায় ব্যক্তিসত্তাকে আজও বিলীন হতে দেয়নি।

শখ

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

অবিশ্রাম বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজছে।
কোথাও যাবার কথা ছিল, কোথাও,
দীর্ঘকাল অপেক্ষায় টান-টান—
'তোমরা কোথায় যাও, আমাকে তুলে
নেবে ঘোড়ায়, নদীতে, মশালে?'
ওরা হেসে উঠল হো-হো করে—
"গাছের আবার চলাফেরার শখ!"
চমকে তাকালাম নিজের দিকে—
'গাছের চলাফেরার শখ, গাছের
চলাফেরার শখ?' আমি তাহলে—
তাহলে এখানে জন্ম, মৃত্যু এখানেই,
মৃত্যুও?
তবে ঘণ্টা বাজায় কে, ভেতরে?
আমাকে যাবার কথা বলে কে, ভেতরে?
কাঁপায় কে ভেতরে, অবিশ্রাম?

নিজের কারখানায়

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্ আঙ্গিকে চিরন্তনকে ধরা যায়?
আমি আমার বুকের ফটো তুলে দেখলুম কেবল ফুসফুস!
মুক্তির আনন্দ বলে কিছু নেই.
আছে অনন্ত দুঃখ!
বিষণ্নতাকে ধরা যায় সনাতন গাম্ভীর্যে, দিন ফুরিয়ে ওই
পথের প্রান্তে মনের একাকিত্বে—
মনকে করেছি সার্কাসের মেয়েদের মতো দ্বিধাহীন
যাদের শরীর এইমাত্র তালগোল পাকিয়ে দুমড়ে মুচড়ে
খণ্ড খণ্ড করা যাবে, আবার ঠিক করা যাবে
একচাকার সাইকেলে দাঁড় বা জাপানী ছাতার কৌশলে!
খেলাশেষে এখন পাঁচজন ক্লাউন পোশাক খুলছে
এখন জানলা গলিয়ে অন্ধকার মুখর সৃষ্টিশীল
কিন্তু তোলা ফটোর কালো অন্ধকার কথা বলে না,
শিখে নিতে হয় মৌন ভাষা, চোখের সামনে প্লেট ধরে
যেমন ডাক্তার—
কিছু রহস্য আছে যা চিরদিন রহস্যই থেকে যায়,
পেটের ভিতর ছুরিকাঁচি চালিয়ে উদ্ধার করে ডাক্তার
এবং আমি ভেবেছিলুম সাময়িকতাকে সিঁড়ির মতো
ব্যবহার কোরবো চিরন্তনের দিকে
বুকের ভিতর ধরা পড়বে সুখ-দুঃখের অনুভূতি চিরন্তন-অচিরন্তন
ফটো তুলে দেখলুম কেবল ফুসফুস
তোলা ফটোর কালো অন্ধকার!!

দেয়ালে পিঁপড়ের সারি

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পূব ও দক্ষিণ এতো চোখের পাতার মতো কেঁপে ওঠে
কড়িকাঠ, বারান্দা, বছর,
দেয়ালে পিঁপড়ের সারি, মেঘের আড়াল,
আদিগন্ত ঝড়, উঠোনে জানলায়,
আমার নতুন কোনো বাড়ি নেই
বুকের ভিতরে শুধু কেঁপে ওঠে, মনে প'ড়ে যায়
পূব ও দক্ষিণ জোড়া বারান্দা, বছর।

ভাই ভ্রমর আমি

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে ভ্রমর আর
ভ্রমরের পাশে আমি ও আমার ভাই
মাঝে মাঝে কড়ানাড়ার শব্দ
দরজা খুলে ভারি পর্দার ওপারে দেখি
দাঁড়িয়ে আছে ভ্রমর
নরম নীল পায়ের পাতা নিয়ে
মাঝে মাঝে আলো নিভে যায়
চুলের কাঁটা খুঁজতে গিয়ে আমি
ছুঁয়ে ফেলি ভ্রমরকে বারবার
খলখল করে হেসে ওঠে ও
চুল এলো করে দৌড়ে যায় হাওয়ায়
আর ভাইএর পাশে তার ভাই
তারা শুয়েই থাকে শুয়েই থাকে শুয়ে
আকাশের ঠিক নিচের নীল বাতাস দেখে তারা
আর দিন যায়

.

একা, আনন্দিত

কালীকৃষ্ণ গুহ

দাঁড়িয়ে আছি।
তোমার অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে একটা হাত
অন্ধকারে রেখেছি।

আমার পশ্চিমের দিক পাতা ঝরে পড়বে, আনন্দিত।
আমাদের মাঝখানে পাতা ঝরে পড়লে
আমি ঢাকবো তোমাকে

নাম, সত্তা

তোমার নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে দেখবো
অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে
পরিচয় নেওয়া শেষ হয়েছে, সূর্যাস্তের মতো অন্ধকার রয়েছে চারদিক

এখন একা, আনন্দিত।

সম্পাদক সমীপেষু

বাসুদেব দেব

কত বাতিল করবেন করুন
আজ আর শিশুর জন্ম কোন রহস্যই নয়
                    সমস্যা বরং
তবু শিশুর হাসির কাছে এখনও সবাই
নতজানু অধমর্ণ   বিশ্বাস করুন
পৃথিবীর যাবতীয় কথা বহুবার বলা হয়ে গেছে
জেনেও আমার কিছু সামান্য বলার
                    ইচ্ছা আছে
ধরা পড়লে লজ্জা পাই   ঘসা পয়সা
ভিখিরির হাতে হাতে ফেরে
যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরী
চাষযোগ্য মাঠ ক্রমশই কমে যাচ্ছে
যদিও এখন আর কাছাকাছি বনবীথি নেই
করাতকলের ম্যানেজারবাবুদের দোর্দণ্ড প্রতাপ
তবু গাছ মাথা তোলে বাড়ির নিকট
গাছ থেকে পাখি ডেকে ওঠে
                    খোকা হোক

আবারও কবিতা পাঠালাম

পাহাড়প্রমাণ

দিব্যেন্দু পালিত

অরুণা ঘরে ঢুকে চলে যাচ্ছিল; বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সুধাকর ওর শাড়ির আঁচল চেপে ধরল।

অরুণা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। পাঁচ-সাত মিনিট আগেও সে এ-ঘরে এসেছিল—সুধাকর তখনো শুয়ে, পাশবালিশটা বুকের কাছে জড়ানো। মাথার দিকে জানালাটা খুলে দেবার সময় অরুণা ওর মৃদু নাকডাকার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এখন সুধাকরের আকস্মিক ব্যবহারে ও বিব্রত হল।

সুধাকর হাসছিল। অরুণার আঁচল তখনো ওর হাতের মুঠোয়, বুকের ওপর কাপড় নেই, ক' পাক ঘুরে অরুণা তখন কিছুটা দূরে। সেই অবস্থায় ক' পলক তাকিয়ে সুধাকর ওর শরীর দেখল। অরুণার চোয়াল ও চিবুক ভারি, মাঝারি কপাল, ঘাড়ে বেশি মাংস থাকার দরুন গ্রীবায় টান-টান ভাবটুকু অদৃশ্য, স্থূল কোমর সমতা হারিয়ে নিতম্বের উচ্চতায় এক হয়ে গেছে।

একটু তাকিয়ে থেকে মুঠো শক্ত করে অরুণাকে কাছে টানার চেষ্টা করল সুধাকর। অরুণা বিরক্ত হল, আঁচলটা সুধাকরের মুঠো-মুক্ত করার চেষ্টা করে বলল,—ছাড়ো।

সুধাকর ছাড়ল না। সকালের আলস্য তার চোখে, বেলা পর্যন্ত ঘুমনোর ফলে চোখ মুখ ফুলেছে। অল্প হেসে বলল,—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের গল্পটা জানো?

—কেন!

—ইন্টারেস্টিং! সেই দৃশ্য যারা দেখেছিল তারা কতো ভাগ্যবান!

—আমি দ্রৌপদী নই।

আঁচলটা এবার শক্ত হাতে কেড়ে নিল অরুণা। বিছানার ওপরেই খানিকটা গড়িয়ে এসে হাল ছেড়ে দিল সুধাকর।

—সাত সকালে কি অসভ্যতা শুরু করেছো! কাপড় গুছিয়ে তিরস্কারের চোখে অরুণা স্বামীর দিকে তাকাল,—খুকু আছে, মা আছে। দিন দিন তোমার আক্কেল যেন বাড়ছে। বয়স আছে নাকি!

—কার? তোমার, না আমার?

বিছানার ওপর বাবু হয়ে উঠে বসে বালিশটা কোলে টেনে নিল সুধাকর। স্ত্রীকে চুপচাপ দেখে বলল,—চল্লিশে আমাদের দ্বিতীয় যৌবন শুরু হয়। শুনলে না, খুকু কাল কি বলছিল?

—কি বলছিল—

অরুণা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ঘরের কোণে দেয়াল ঘেঁষে তাদের মালপত্তর সাজানো। বড় ট্রাঙ্কের ওপর দুটো বড় স্যুটকেশ, তার ওপর আবার ছোট দুটো। কথাটা আলগোছে স্বামীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছোট স্যুটকেশ দুটো নামিয়ে ওপরের বড় স্যুটকেশটার দিকে হাত বাড়ালো অরুণা।

সুধাকর ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল। একমুখ ধোঁয়া টেনে বলল,—ঐ যে

গো, জামাইবাবু, দিদির পাশে আজকাল আপনাকে কেমন বাচ্চা বাচ্চা লাগে!

—আদিখ্যেতা রাখো। তোমার সঙ্গে রসিকতার সময় নেই।

স্যুটকেশ থেকে একটা ফর্সা, পুরনো শাড়ি বের করে দু আঙুলের চাপে ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলল অরুণা। অল্প পরিশ্রমেই ও হাঁফিয়ে উঠেছিল। দূর থেকে সুধাকর ওর কপালে ঘামের বিন্দু দেখল, বুকের ওঠা-নামা লক্ষ করল।

—বড় বেরসিক তুমি হে। হালকা গলায় বলল সুধাকর,—এই সকালে রাগ করে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেললে!

স্বামীর উপহাস গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না অরুণা। চোখ মুখ তখনো কোঁচকানো, বলল,—খুকুর হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে। ধিঙ্গি মেয়ে, এখনো নিজে কিছু শিখল না! আমার হয়েছে ঝামেলা—

—ওঃ, এই! সে তো সুখবর, ঋতুমতী রমণীরে করহ যতন। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আড়-মোড়া ভাঙল সুধাকর,—তা কাপড় কেন?

—ওসব নেই। কবে কার কি হবে আমি কি হাত গুনব!

—কি আর করা! স্ত্রীকে বিরক্ত দেখে শব্দ করে হাসল সুধাকর,—এ ব্যাপারে তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের সাবজেক্ট হলে—

—তোমাদের সাবজেক্টে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। দেখি, সরো—

হ্যাঁচকা টানে সুধাকরের কোল থেকে বালিশটা কেড়ে নিল অরুণা, ব্যস্ত হাতে মশারির দড়ি খুলে ফেলল। সুধাকর ততক্ষণে বিছানা থেকে নেমে পড়েছে। রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে, পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে জানলার কাছে গেল। রৌদ্ররেখায় ধুলোর রেণু উড়ছে। পাঠকবাবু ঠিকই লিখেছিল, জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। হাওয়া আছে অফুরন্ত, প্রচুর আলো আর রোদ্দুর; ছুটিছাটায় বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ। সুধাকর খানিক রোদ দেখল, খানিক অরুণাকে।

মশারি, বালিশ ঠিকঠাক রেখে, বেডকভার বিছিয়ে, কাপড়ের টুকরোটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অরুণা বলল,—তোমার সঙ্গে এখানে আসাই আমার ভুল হয়েছিল।

স্ত্রীর যাবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সুধাকর। যেন সে জানত অরুণা এই কথা বা এইরকমই কোন কথা বলবে। সে তৈরী ছিল। কোন্ কথায় অরুণার কি প্রতিক্রিয়া হয়, অরুণা কোথায় নরম, কোথায় তার জ্বালা, অরুণার প্রতি মুহূর্তের প্রত্যেক আচরণ, এমনকি তার নিঃশ্বাস পড়ার সূক্ষ্মতম শব্দটি পর্যন্ত সে অনায়াসে বিশ্লেষণ করতে পারে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাতের সিগারেটটা শেষ করল সুধাকর।

জায়গাটা ভালই। সত্যি বলতে, চিঠিতে যা লিখেছিল, ভাল লাগার ব্যাপারে সে তার চেয়ে কিছু বেশিই পেয়েছে। যে-ধরনের চাকরি, তাতে ছুটি সে বড় একটা পায় না। বড় ছুটির মধ্যে পুজোর ক'টা দিন; শুয়ে বসে, বাজার করে, কিংবা বই পড়ে, হাই তুলতে তুলতে কেটে যায়। তার ওপর আছে টুলটুলের ভাবনা। বছরে দুবার কার্সিয়াংয়ের স্কুল থেকে তাকে নিয়ে আসতে হয়, ছুটির শেষে রাখতে যেতে হয় আবার। ওর ঝক্কি পোহাতেই অস্থির। অরুণা ঘরকুনো, অল্পেই খুশি, অভ্যাস সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সেনসিটিভ। সহজে নড়তে চায় না।

এবার সুযোগ জুটে গেল। টুলটুল গেল, তারপরেই বরুণারা এল। মা ও মেয়ে।

সঙ্গগুণে অরুণাও বদলে গেল রাতারাতি। চল, বেরিয়ে পড়া যাক। একান্নবর্তিতার বাইরে ক'টা দিন ঘুরে আসা—সুধাকরের মন্দ লাগছিল না। আঃ কতোদিন পরে সে এই মুক্ত প্রকৃতির, পরিচ্ছন্ন রোদ্দুর, সু-বাতাস ও অপরিমেয়তার সান্নিধ্য পেল!

সামনে করিডোরের মতো ফালি জায়গা, তারপর বারান্দা, কোমর-উঁচু রেলিং, রেলিংয়ের দুধারে বাগানের মধ্যে দিয়ে অপরিসর সুরকির পথ গেট পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে সুধাকর নিরাকার শালবন, পাহাড়ী রাস্তা, ঝকঝকে আকাশ, সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ছিমছাম হাওয়ায় নতুন পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। রাতে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে; রোদ উঠলেও সুরকির পথ এখনো ভিজে। ওপরে তাকিয়ে সুধাকর সেই ভিজে, ঈষৎ বনজ ঘ্রাণ নিল।

অরুণা সেই যে গেছে তারপর আর দেখা দেয় নি। বারান্দার একদিকে বেতের গোল টেবিল ঘিরে চেয়ারগুলো এলোমেলো ছড়ানো। এত নিঃশব্দ চতুর্দিক যে মনে হবে এই মুহূর্তে সুধাকর ভিন্ন বাড়িতে দ্বিতীয় কেউ নেই। অরুণা গেল কোথায়!

বুঝতে না পেরে সুধাকর ঘরের দিকে যাচ্ছিল, দেখল কেয়ারির পাশ দিয়ে হেঁটে বরুণা আসছে। সুধাকর ভিতরে গেল না। তীব্র বনজ গন্ধ ওকে বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

—গুডমর্নিং, জামাইবাবু।

—গুডমর্নিং। এসো খুকু—

বরুণার পায়ের পাতা অদ্ভুত সাদা। ছোট ও নিটোল, পায়রার মাথার মতোন গোড়ালি, হালকা পা ফেলে এগিয়ে আসার সময় ও যেন সুরকির ওপর ছোট ছোট টোকা দিয়ে আসছে। সিল্কের শাড়ি পরার দরুন বরুণার অস্ফুট স্তন, নাভির ওপর ঈষৎ উঁচু গোল পেট, উরু, হাঁটুর হাড় ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

—কোথায় গিয়েছিলে, খুকু?

—ঐ তো, টিলার কাছে। জামাইবাবু, ওখানে দুটো সাঁওতাল মেয়ে ফল বিক্রি করছে। দে আর সো লাইভলি!

—ওরা এমনিই। সুধাকর থামল একটু,—তোমার মা কোথায়?

—জানি না তো। বোধহয় পুজোয় বসেছেন।

—তুমি আজ শাড়ি পরেছ যে! সুধাকরের ঠোঁট সিরসির করছিল। সিগারেট খুঁজল, পেল না।

—দিদি বলল—, বরুণার চোখ নামানো। চাপা, পাতলা ঠোঁটে হাসলে ঠোঁটের দুদিকে কোলন ড্যাশের মতো সমান ভাঁজ পড়ে। আমার হ্যাবিট নেই, এক পলক সুধাকরকে দেখে নিচু গলায় বরুণা বলল,—মাদাররা বলেন, অ্যাট দিস্ এজ ইউ শুড্ ওয়্যার স্কার্টস্। দ্যাট কীপস্ ইওর মাস্‌ল্‌স্ ফ্রী। জামাইবাবু, আমাকে মানায়?

—চমৎকার। এসো, তোমাকে ফুল চিনিয়ে দিই। হেয়ার উই হ্যাভ প্লেন্‌টি অফ দেম।

—তোমার চা দিয়েছি—

বরুণার এক পা সিঁড়িতে, আর এক পা বারান্দায়। হাওয়ায় পুবের টান। বরুণা যাদের দেখেছিল টিলার কাছে, মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সেই ওরাওঁ যুবতীদের টিলার পাশ দিয়ে ঢালু সমতলে নেমে যেতে দেখল সুধাকর।

চায়ের কাপ হাতে অরুণা দাঁড়িয়ে ছিল। সুধাকর এগিয়ে গিয়ে কাপটা ওর হাত থেকে

নিল। অরুণা বোধহয় নিজের হাতেই চা করেছে, গরম ভাপ লেগেছে মুখে। গলায় ঘাম, খুচরো কয়েকটা চুল কপালে জড়ানো।

—রাত্রে কি তোমার ঘুম হয়নি! চায়ের কাপে আস্তে চুমুক দিল সুধাকর,—তোমাকে ক্লান্ত লাগছে! কি খুকু, আর এক দফা হবে নাকি? তোমার দিদি আজ চা'টা ভালই বানিয়েছে।

—কেন, আগে কি কখনো ভাল চা খাওনি? ক্ষুব্ধ চোখে স্বামীকে দেখল অরুণা, চাহনিতে ভ্রুকুটি ও সন্দেহ, গলায় শ্লেষ। কেমন অবলীলায় এই মানুষটি একসঙ্গে দুটো কথা, দুধরনের কথা বলতে পারে ভেবে অবাক হল ও।

সুধাকর গা করল না। অরুণাকে কিছু নতুন দেখছে না। এই মুহূর্তে বলে নয়, কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছে সুধাকর, অরুণা যেন ঠিক আগের অরুণা নেই—যে-অরুণাকে সে দেখেছে কলকাতায়, বাড়িতে, যখন সে আজকের সুধাকর হয়ে ওঠেনি তখন থেকে, লণ্ঠনের পোড়া আলোয় বা ফ্লুরোসেন্ট টিউবের নিচে, সুখে, দুঃখে, যে-অরুণা টুলটুলের মা, শান্ত ও নির্বিকার, অভিযোগহীন। আজ হঠাৎ তার এত অনুযোগ কেন! বীতরাগ কেন! কথায় কথায় এমন প্রবঞ্চনা কেন!

চায়ের কাপ হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সুধাকর। অরুণাকে কিছু বলবে কি না ভাবল। হঠাৎ-বিমর্ষতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তোমার বোন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; আমাকে সমীহ না করো, ওকে উপেক্ষা করো না। এই কথাগুলো মনে মনে ভাবল সুধাকর, বলা প্রয়োজন মনে করল। কিন্তু, মুখ ফুটে বলতে পারল না।

সুধাকরকে চুপ করে থাকতে দেখে অখুশি হল অরুণা। সব সময় মানুষের মেজাজ ভাল থাকে না, দু-চারটে বেফস্কা কথা মুখ থেকে বেরিয়েই পড়ে। তা বলে তুমি অগ্রাহ্য করবে, হেনস্তার ভাব দেখাবে, তাই বা কেমন কথা!

বিভ্রান্ত সুধাকর আস্তে হেঁটে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। কতো বেলা এখন! ঘর থেকে বেরুবার সময় দেখেছিল সাড়ে সাতটা। যাই হোক, সুধাকর ব্যস্ত বোধ করল না।

অরুণা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। বরুণার চোখ নিচু, না-দেখার মতো করে ফুলের কেয়ারি দেখছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবার উপক্রম করল অরুণা।

—যাচ্ছ কোথায়?

—কেন! যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়াল অরুণা,—কি বলবে তাড়াতাড়ি বল। আমার কাজ আছে।

—এত কি কাজ তোমার! অসহিষ্ণুর মতো সিগারেট খুঁজল সুধাকর। কলকাতায় কাজ, এখানেও কাজ! দু'দণ্ড বসলে কোন রাজ্যপাট যাবে!

—আজ তোমার কাজ নেই, তাই বলছ! রুক্ষ গলায় বলল অরুণা,—আমি আর কোন দিন হাঁফ ছেড়ে বসে থেকেছি!

অরুণা আর দাঁড়াল না।

সুধাকরের ভাল লাগল না। আজকের সকালটা ছিল সুন্দর, যত রোদ তত হাওয়া; বৃষ্টির জলে ভেজা সজীব তৃণ ও গাছ, পাতার মোলায়েম গন্ধ থেকে থেকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে; সুধাকরের মনে ক্রমশ একটা ঠাণ্ডা আমেজ ছড়িয়ে পড়ছিল। অরুণা যেন সব গণ্ডগোল করে দিয়ে গেল। বস্তুত, সুধাকর অনুভব করছিল, দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের কোথায় যেন এক অদৃশ্য ফাটল ধরেছে, সে অনুভব করে অথচ স্পর্শ করতে পারে না—

কবে, কোন মুহূর্তে বা কোন প্রশ্নে এর সূচনা বোঝা যায় না, কিন্তু, ধরাছোঁয়ার বাইরে এই ব্যবধানের চেয়ে বড় সত্য আজ আর কিছুই নেই। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা চিন্তা করে ক্ষুব্ধ হল সুধাকর। ধোঁয়ায় গলার কাছে নিঃশ্বাস কুণ্ডলীকৃত হতে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। এতক্ষণে তার খেয়াল হল বরুণা দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

—খুকু, এখানে এসো। গলায় যতোটা সম্ভব স্নেহের টান এনে সুধাকর বলল,—খুঁজে দেখ, আমার মাথায় আর ক'টা চুল পেকেছে।

—আহা, আপনি যেন কতো বুড়ো!

বরুণা কাছে এল। কানের পাশে সুধাকর ওর নরম, হালকা স্পর্শ পেল। বরুণা খুঁজছে; ঘন চুলের ভিতর দিয়ে বরুণার আঙুল ওর চাঁদির ওপর নখের মৃদু আঁচড় কাটছে। সুধাকর একটা গন্ধ পাচ্ছিল, নতুন ধানের গন্ধের মতো, রহস্যময়।

—জামাইবাবু, সেই গল্পটা আপনি ফিনিশ করেন নি—

—কোনটা ?

—কাল ইভনিংয়ে যেটা বলছিলেন। সেই যে, আপনাদের রোমান্স—

—ও, হ্যাঁ, সুধাকর হঠাৎই স্মরণ করতে পারল,—কতোটা বলেছিলাম যেন?

—সেই যে দিদিকে সাইকেলে বসিয়ে ময়দানে ঘুরছিলেন আপনি—

—দাঁড়াও, ভেবে দেখি।

চোখ বন্ধ করে কাল কতোটা বলেছে, কি বলেছে, মনে করার চেষ্টা করল সুধাকর। আবছাভাবে তার কিছু কিছু মনে পড়ছিল। পুরো ঘটনা, অর্থাৎ তার আগে ও পরে কি ঘটেছিল ঠিক স্মরণ হচ্ছিল না। একবার সুধাকরের মনে হল তখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরে, ঘন মেঘ ঝড়ের সঙ্গে মিশে আকাশ তোলপাড় করে ফিরছে, নির্জন প্রান্তরে অরুণাকে নিয়ে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে চলেছে সে। পর মুহূর্তেই ভাবল সুধাকর, যেটুকু মনে পড়ে, এরকম ভীরু পলায়নের কোন ছবি তার স্মৃতিতে নেই। তাহলে কি তখন শীতের সময়, না কি বসন্ত! সময়টা সকাল না বিকেল! বরুণার সূত্রটা এই মুহূর্তে তার কাছে কেমন হেঁয়ালির মতো মনে হল।

নিজেকে অসম্ভব বিমূঢ় লাগল সুধাকরের। এটা ঠিক, ঘটনাটা সে বানিয়ে বলে নি। বরুণাকে জিজ্ঞেস করলে সে হয়তো আগের ঘটনা, সুধাকর যে-রকম বর্ণনা করেছে, ঠিক ঠিক বলে দিতে পারবে। সে-বড় লজ্জার ব্যাপার।

অসহায়ের মতো খানিক আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল সুধাকর। অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে বরুণাকে দেখল। বরুণার আঙুল তখনো ওর চুলে; পিঠের কাছে ঘন হয়ে থাকায় সুধাকর ওর ছোট স্তনের আলতো স্পর্শ পাচ্ছে; বাহুর খানিকটা, ধূসর কনুই ও খয়েরি ব্লাউজের কিয়দংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে, কিছু বা ক্লান্ত গলায় সুধাকর বলল,—খুকু, তোমাকে আমি পুরোটাই বলব—

দুপুরে খাবার পর আলস্য লাগছিল। মনে একটা খটকা ছিল; সকালের ঘটনা, ভুলে-যাওয়া গল্পটা সারাক্ষণ মনে করার চেষ্টা করছিল সে। বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করল, একাগ্র হবার চেষ্টা করল। পারল না। যেন তার চোখের সামনে কেউ একটা মুণ্ডহীন ধড় মেলে ধরেছে, দ্যাখো, একে চিনতে পার কি না, এ তোমার পরিচিত,

হাত পা সমগ্র অবয়ব খুঁটিয়ে দেখ, চিনতে পার কি না।

জানলার পাশে টুলের ওপর বসে অরুণা উল বুনছে। যে-কোন শব্দেই ও মুখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। দুজনে অনেকক্ষণ কাছাকাছি আছে। এর মধ্যে শুধু একবার প্রশ্ন করেছিল অরুণা,—আমরা কবে ফিরছি? ওর কথার অর্থ ঠিক ধরতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল সুধাকর,—কেন?

—জানি না, একটু ভেবে অরুণা বলল,—এই ফাঁকা বড় অসহ্য লাগছে।

সুধাকর অরুণাকে দেখল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; অরুণাকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবল। অরুণার হয়তো সবই মনে আছে, ও হয়তো বলতে পারবে।

অরুণা—, খুব কাছের গলায় ডাকল সুধাকর।

নিচু হয়ে পায়ের পাতা চুলকে নিল অরুণা, শাড়িটা নামিয়ে দেখল সুধাকরকে।

—তোমার মনে পড়ে, অনেক দিন আগে একদিন তোমাকে সাইকেলে চড়িয়ে ঘুরিয়েছিলাম—

কবে! অরুণার স্বরে বিস্ময় ফুটল; কাঁটা তুলে ঘাড়ের কাছে খুঁচিয়ে নিল। হাই তুলে হাত চাপা দিল ঠোঁটে।

—আমার মনে নেই। হঠাৎ বলছ যে!

—তোমার কিছুই মনে থাকে না! বারো কি পনেরো বছর আগেকার কথা, তাও না! কি মন! হোপলেস্! লোকে গত জন্মের কথা মনে রাখে!

—অযথা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন! অরুণা বিরক্ত। কখন তোমার প্রাণ উথ্লে উঠবে, আমাকে কি সেজন্য তৈরী থাকতে হবে! আমার কিছুই মনে নেই...

—তা থাকবে কেন! তোমার মন কোথায় থাকে আমি জানি।

—ইতরের মতো কথা বলো না। তোমাকে আমি চিনেছি—

—কি বললে! আমি ইতর। তুমি কি, তুমি একটা—

—একটু আস্তে—। তোমার সম্ভ্রমবোধ না থাকতে পারে, আমার আছে। ওরা শুনতে পাবে। উত্তেজনায় গলা কাঁপছিল অরুণার,—এই তামাশা আর ভালো লাগে না!

—ভালো না লাগলে ছেড়ে দিলেই পার। কেউ তোমার আটকে রাখে নি!

—জানি, তাহলে তুমি বেঁচে যাও। অরুণা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অরুণা চলে যেতে সুধাকর কুঁকড়ে গেল। এভাবে কথাটা বলা উচিত হয় নি। অরুণার দোষ কি! সে নিজে যদি একটা জিনিস ভুলতে পারে, অরুণা কেন পারবে না! অথচ, একই সময়ে, সুধাকর এটাও বুঝতে পারছিল, কথাটা সে এভাবে বলতে চায় নি, হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। আজকাল প্রায়ই এমন হয়, নিজের ওপর কোন অধিকার থাকে না, হঠাৎই সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। অসহায়তার ভিতর পূর্বাপর অনেক কথা মনে পড়ল সুধাকরের। এতদিন তেমন করে ভাবে নি, আজ মনে হয় অরুণা চলে গেছে দূরে; এই দূরত্ব থেকে তার নাগাল পাওয়া কঠিন।

আলস্যে হাই তুলল সুধাকর। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুলো। এখন তার কিছুই করার নেই। অরুণা নিশ্চয় পাশের ঘরে গেছে। ওখানে বরুণা আছে, ওদের মা আছেন। বিকেলে পাঠকবাবুর গাড়ি নিয়ে আসবার কথা। আচ্ছন্নতার মধ্যেই বরুণাকে হাসতে শুনল সুধাকর। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সুধাকর। স্বপ্নের ভিতর টুলটুলকে দেখল—সে, টুলটুল

আর অরুণা ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। তারপরেই হঠাৎ কার্সিয়াংয়ের পাহাড়ী রাস্তায় টুলটুলকে দৌড়তে দেখল। টুলটুল ছুটছে, সুধাকর দেখছে; হঠাৎ একটা বিশ্রী তারস্বর চীৎকার শুনল সুধাকর। ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পরও পরিষ্কার স্বপ্নটা মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারল সুধাকর এবং পুরোপুরি স্বপ্নটাকে ধরে রাখতে পেরেছে ভেবে খুশি হল। পর মুহূর্তেই নতুন চিন্তা এসে বিঁধল তাকে। স্বপ্নের ভিতর, মনে পড়ে, সে একটা চীৎকার শুনেছিল। কার চীৎকার! টুলটুলের! নাকি অরুণার! ভীত, বিহ্বল, সুধাকরের হঠাৎ মনে হল, অসম্ভব নয়, চীৎকারটা তার নিজেরও হতে পারে।

বিকেল; সুধাকর নিজেই স্টিয়ারিং ধরল। গাড়িতে উঠে বরুণাকে ডাকল,—খুকু, তুমি সামনে এসো। আমার পাশে—

গাড়িটা ছোট। পাঠকও সামনে বসেছে। বরুণা একবার পাঠককে দেখল, তারপর দিদিকে। অরুণা অন্যমনস্ক, বাইরে মুখ করে বসে আছে। তারা ছাড়াও এ-গাড়িতে একজন মহিলা আছেন, পাঠকের স্ত্রী, নিতান্ত ভদ্রতা করেও তাঁর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা উচিত, অরুণা যেন তা খেয়াল করে নি। অরুণাকে দেখে এই প্রথম মনে হল বরুণার, দিদি কেমন অখুশি ও বিরক্ত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ির দরজা খুলে উঠতে উঠতে বরুণা বলল,—জামাইবাবু, আপনার অসুবিধে হবে না তো?

—না, মোটেই না। সুধাকর সরে গিয়ে বরুণাকে বসার জায়গা করে দিল। গিয়ার চার্জ করে বলল,—তুমি হলে আমার স্টেপনি। তোমার ভরসাতেই তো যাওয়া।

সুধাকরের কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল পাঠক। বরুণা অসহায়ভাবে তাকাল সুধাকরের দিকে। ঢালু রাস্তায় গাড়িটা প্রায় গড়িয়ে চলল। তারপর সমতল। সুধাকর বাঁ দিকে বাঁক নিল। দুপাশে লম্বা গাছের সারি, উঁচু-নিচু জমি, সমতলের রাস্তাও সহজ নয়। ইতস্তত ছড়ানো পাথরের টুকরোয় ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছিল।

—আই কুড'ন্‌ট্‌ ফলো—, পুরনো কথার জের টানল বরুণা,—জামাইবাবু, আপনি কি বললেন! স্টেপনি কি?

—স্টেপনি বোঝ না! শব্দ করে হাসল সুধাকর,—পাঠকবাবু, আপনার গাড়িতে স্টেপনি আছে তো? না কি চার চাকাই ভরসা!

—যা বলেছেন স্যার, চার চাকাই ভরসা। আমার কপালে ওসব জোটে নি। নিজের রসিকতায় মুগ্ধ পাঠক খানিক মোটা গলায় হেসে নিল। হাসির শব্দ মিলিয়ে যেতে, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সুধাকরের মনে হল ছায়ায় ঘন আকাশ ক্রমশ নিচু হয়ে আসছে। না কি মেঘ? বলা যায় না। এখানে কখন কি হয়, হাওয়ার চাল কখন কোনদিকে, অনুমান করা কঠিন। সুধাকর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আবার ঢালু পথ, অল্প খাড়াই থেকে থেকে হার্ডল সৃষ্টি করছে। মেঘ আছে কি না দেখবার জন্য চোখ তুলল সুধাকর।

অরুণা দেখল সুধাকর অন্যমনস্ক; বাকি সবাই চুপচাপ, এমনকি বরুণাও। গাড়িটা ঝোঁকের মাথায় নেমে চলেছে। এতক্ষণ ওরা কি কথা বলছিল, কেন হাসছিল, ওদের হাসি-ঠাট্টার কিছু মনে আছে কি না মনে করার চেষ্টা করল অরুণা। মনে পড়ে না। তাহলে কি সারাক্ষণ, এই সারাটা পথ সে অন্যমনস্ক ছিল।

গাড়ির ঝাঁকুনি ও সম্মুখের শূন্যতায় আলস্য লাগছিল বরুণার। সুধাকরের পেশির চাপ তার কাঁধের ডান দিকে অনেকটা অংশ অবশ ও শিথিল করে দিয়েছে; অনুভূতির মধ্যে মন্থর অবসাদের ভাব ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। ছোট হাই তুলে হাতে মুখ চাপা দিল বরুণা। সীটের পিছনে মাথাটা হেলিয়ে দেবার আগে ও পিছন ফিরে অরুণাকে দেখল। দিদি, তুই এত চুপ কেন, বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। সামনের দিকে তাকিয়ে ভীত, আর্ত একটা চীৎকার বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

চকিতে গাড়িটা এক দিকে কাত করে, চূড়ান্ত চেষ্টায় থামিয়ে ফেলল সুধাকর। উত্তেজনায় তখনো তার নিঃশ্বাস দ্রুত। সামনে চড়াই। জানোয়ারটা শিং দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছিল, চড়াই বলেই আগে বোঝা যায় নি। ক' মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, গাড়িটা দেখল। তারপরেই বিরাট অবয়ব নিয়ে নিমেষে পিছন ফিরে উধাও হল।

--কিভাবে চালাও! মারবে না কি!

স্ত্রীর কথায় আমল না দিয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট করল সুধাকর। উত্তেজনা কমে আসায় খুচরো ঘাম জমে উঠল কপালে।

—এত মৃত্যুভয় তোমার!

—নিজের কথা বলিনি। অরুণার গলা বেশ আর্দ্র। একটু চুপ করে থেকে বলল,—নিজের জন্যে আর ভাবি না।

সুধাকর কথা বাড়াল না। এতক্ষণে তার ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে।

কিছুক্ষণ কাটাল। দুপাশের শালবন ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। সামনের রাস্তাও আর তেমন প্রশস্ত নয়।

—স্যার, আজ আর দুর্গ দেখা হবে না। বরং বাঁ দিকে চলুন। পাঠক বলল,—কাছাকাছি একটা পাহাড়ী ঝর্না আছে। সাইট ভালো, টিলার ওপর থেকে দেখা যায়।

—কতো দূর এখান থেকে?

—কাছেই। মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখল পাঠক। মেঘ করেছে, হয়তো বৃষ্টি হবে। দূরে গিয়ে কাজ নেই।

সুধাকর জবাব দিল না। অরুণা কি বলল এবং যা বলল কেন বলল, অনুভব করার চেষ্টা করল সে। কথার ধরনেই বোঝা যায় অরুণা নিশ্চিত কিছু 'মীন' করেছে। সুধাকরের মুহূর্তের ত্রুটি ও অন্যমনস্কতা হেতু যদি তেমন কোন অঘটন ঘটত, যার ফল হত অনিবার্য ও ভয়াবহ,—অরুণা যেন বুঝিয়ে দিল সে-রকম কিছুর জন্যও সে তৈরী; তার কোন ভাবনা নেই। অরুণা কি তার জন্য চিন্তিত, না বরুণার জন্য! বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না!

মনের এই অনিশ্চিত অবস্থায় সুধাকরের হঠাৎ সেই বিস্মৃত গল্পটির কথা মনে পড়ল। বরুণা সেই ঘটনার শেষ শুনতে চাইবে। তখন কি বলবে সুধাকর; কি বলতে পারে বরুণাকে!

ব্যাস, এইখানে—

মাঠের ওপর দিয়ে খানিকটা ছুটে গিয়ে গাড়ি থামল।

—স্যার, আপনি যেন কেমন আনমাইন্ডফুল হয়ে গেছেন! আক্ষেপ করল পাঠক,—এতটা রাস্তা এলেন, কিছুই তাকিয়ে দেখলেন না!

—দেখেছি তো। গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরালো সুধাকর। প্যাকেটটা এগিয়ে

দিল পাঠকের দিকে।—চমৎকার জায়গা, ফুল অফ ন্যাচারাল বিউটি! থেকে যেতে ইচ্ছে করে।

চতুর্দিকে তাকিয়ে অনতিদূরে পাহাড়ের সারি দেখল সুধাকর। হয়তো পাহাড় নয়, ওগুলো সত্যিই টিলা—দূরে থাকার জন্য পাহাড় বলে ভুল হয়। আকাশ ঘন হয়ে আসছিল; ম্লান সূর্যালোক দিনের শেষে পৌঁছে শেষবারের মতো প্রকৃতি ও চরাচরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আকাশের ভাবগতিক ভালো নয়। সুধাকরের মনে হল যে-কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

—ঝর্না কোথায় মশাই? টিলার কাছে নাকি?

—উঠলে দেখা যাবে। খাড়াই তেমন নয়। পাঠক বলল,—কেন, শব্দ শুনছেন না?

সুধাকর কান পাতল। সত্যিই জল পড়ার কোন শব্দ শোনা যায় কিনা অনুধাবনের চেষ্টা করল। এলোমেলো, অস্থির হাওয়ায় তেমন কিছুই শোনা যায় না। সুধাকর বলল,—কই, না!

—জামাইবাবু, আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সামনে হাঁটতে হাঁটতে বরুণা বলল,—আপনি বোধহয় কালা হয়ে গেছেন—

—তোমার দিদি বলে বধির, সুধাকর হাসল,—আমি নাকি অন্ধ; তাকে দেখি না, তার কথা শুনতে পাই না। কিন্তু জলের শব্দ শুনতে পাব না এ কেমন কথা!

অরুণা কিছুটা পেছিয়ে পাঠকের বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সুধাকর একটু দাঁড়াল, অরুণার জন্য অপেক্ষা করল। অরুণা কাছে এলে জিজ্ঞেস করল,—তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ, অরুণা? ঝর্নার শব্দ?

অরুণা এমন মুখভঙ্গী করল যাতে মনে হবে সুধাকর গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিজ্ঞেস করছে, জবাব দেওয়াটা জরুরী। কান খাড়া করে শুনল অরুণা, সময় নিল। তারপর ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ 'না'।

ওরা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ল। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল কাছে এসে সুধাকর বুঝল তা নয়, এটা পাহাড়ই—রীতিমতো উঁচু। একটা নয়, পর পর প্রায় সমান-মাথা অনেকগুলো পাহাড় যেন পাঁচিল হয়ে রুক্ষ প্রান্তরকে পাহারা দিচ্ছে।

—আপনারা উঠুন, পাঠক বলল,—আমরা আগে দেখেছি। আর উঠব না।

—আচ্ছা—

বরুণা হঠাৎ দৌড়তে শুরু করল। পাহাড়ের ওপর দু-তিন ধাপ উঠে গিয়ে ডাকল, জামাইবাবু, আসুন।

—এসো, অরুণা। পিছন ফিরে সস্নেহে স্ত্রীকে ডাকল সুধাকর,—পারবে না উঠতে!

—দেখি। শান্ত গলায় জবাব দিল অরুণা।—তুমি ওঠো সাবধানে। খুকু যা দাপাদাপি করছে ভয় লাগে—

অরুণার উদ্বেগ সুধাকরকে স্পর্শ করল। একরকম আবেগে ওর গলা বুজে এল। সামনে তাকিয়ে দেখল বরুণা উঠে যাচ্ছে, খেলাচ্ছলে, কালো পাথরের ওপর ওর অসম্ভব সাদা দুটি পায়ের পাতায় দুঃসাহসিক চাঞ্চল্য, যেন যমজ খরগোশ আপন মনে খেলছে, ছুটছে। বরুণা হোঁচট খেল, পড়তে পড়তে সামলে নিল। পিছনে তাকাল সুধাকর। অরুণার চোখ নামানো, ও ওপরে কিছু দেখছে না, প্রতিটি পাথরের বাঁক লক্ষ করছে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরখ করে নিচ্ছে, যেন প্রতি পদক্ষেপে ওর জন্য দুর্বিপাক লুকানো। স্ত্রীর জন্য

করুণা হল সুধাকরের, অপেক্ষা করবে কি না ভাবল। ওপরে তাকিয়ে দেখল বরুণা অনেকটা উঠে গেছে। বরুণা ও তার মধ্যে, তার ও অরুণার মধ্যে দূরত্ব প্রায় সমান।

—খু—কু—, হাত দুটো মুখের কাছে চোঙার মতো করে ধরে চেঁচিয়ে বলল সুধাকর,—তুমি বড় তাড়াতাড়ি উঠছো! পড়ে যেও না।

—ইস্, ভয় দেখাবেন না। খুশির দাপটে থেমে দাঁড়িয়ে বরুণা বলল,—এ আপনার সাবজেক্ট নয়, জামাইবাবু; বটানি নয়। দেখুন, কি নিরেট সবকিছু, শুধু পাথর আর মাটি। একটা ঘাস নেই!

কথা শেষ না হতেই বরুণার যেন হঠাৎ চোখ পড়ল অরুণার ওপর, দেখল। তারপর বলল,—দিদি, তুই কি! তুই না স্পোর্টসে ফার্স্ট হতিস! তাড়াতাড়ি আয় না!

বরুণার অবজ্ঞা অরুণার কানে পৌঁচেছে বলে মনে হল না। কোনরকমে সুধাকরের কাছাকাছি উঠে এল ও। কপালে, গলায়, মুখের সর্বত্র ঘাম, নিঃশ্বাস দ্রুত। সুধাকর হাত বাড়াল। অরুণা উঠে আসুক।

আকাশে ক্রমশ গোধূলির রঙ ধরছে। হু হু-করা বাতাস। নিচে, সমতলের দিকে তাকাতে অপেক্ষমান পাঠক হাত নেড়ে ইশারায় উঠে যেতে বলল। সুধাকর অনুমান করল তারা প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছে; এখান থেকে নিচে পাঠকদের দেখায় শিশুর মতো। আরো দূরে ছায়া; যে-রাস্তায় এসেছিল তার কোন চিহ্নই আর দৃশ্যমান নয়।

—আমি আর পারব না। অরুণা বলল,—আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

—ওঠো! আমার সংগে এসো—

—তুমি আর কতোটা নিয়ে যাবে! হতাশ, ক্লান্ত গলায় বলল অরুণা,—চেষ্টা তো করলাম। আর পারছি না।

—কি যা তা বলছ! সুধাকর স্ত্রীর হাত ধরল,—আর একটু তো। এতটা এসে ফিরে যাবে! তুমি নিশ্চয় পারবে—

—না—

আস্তে সুধাকরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অরুণা। ক্লান্ত চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল,—আমি নামতে পারব। তুমি উঠে যাও।

আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছল অরুণা। তারপর নামতে শুরু করল।

বুকের মধ্যে হঠাৎ এক শূন্যতা অনুভব করল সুধাকর। অরুণা নেমে যাচ্ছে; ক' পলক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সে। এখানে নৈঃশব্দ্য বড় বেশি। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে ওঠায় কিছুই চিন্তা করতে পারল না। অসহ্য অবসাদে কেঁপে উঠল হাঁটু দুটো। ঘর্মাক্ত যে-হাতে অরুণার হাত ধরেছিল, সেই হাত চোখের সামনে মেলে ধরল সুধাকর; কিছু দেখল যেন। পাগল যেমন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নিজের কররেখা দেখে।

বয়কট, বোমা ও ভদ্রলোক, ১৯০৫-১৮

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সিডিশন কমিটির রিপোর্টে একটি তালিকা আছে। এই তালিকার অন্তর্গত যে ১৮৬ জন উনিশশ সাত থেকে সতের সালের মধ্যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের সংগে জড়িত ছিলেন* তাঁদের মধ্যে জীবিকার দিক থেকে ১৩৫ জন ছিলেন ভদ্রলোক (৬৮ জন ছাত্র, ২০ জন কেরানি ও সরকারি চাকুরে, ১৯ জন ভূম্যধিকারী, ১৬ জন শিক্ষক, ৭ জন ডাক্তার-কম্পাউন্ডার, বাকী ৫ জন খবরকাগজ ও ছাপাখানার লোক) এবং জন্মগত ভদ্রলোক ১৬৫ জন (৮৭ জন কায়স্থ, ৬৫ জন ব্রাহ্মণ, ১৩ জন বৈদ্য)। ধরে নিচ্ছি যে এই শেষোক্ত ১৬৫ জনের মধ্যে কেউই ভদ্রতাবিরোধী দৈহিক পরিশ্রম কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সংসার চালাতেন না। বৃত্তি কিংবা বর্ণ, যে দিক থেকেই দেখা হোক বয়কট ও বোমার আন্দোলনে ভদ্রলোকেরই ছিল প্রধান ভূমিকা।

ভদ্রলোকের অসন্তোষের কারণ বুঝতে সুবিধে হয় যদি সম্প্রদায় ধরে-ধরে আলোচনা করি। যথা খাজনা-আদায়কারী; ছাত্র; ও বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক, যেমন উকিল, কেরানি, শিক্ষক। এখানে অবশ্য স্মর্তব্য যে ভদ্রলোকেরা এইরকম পৃথকভাবে বাস করতেন না এবং এক সম্প্রদায়ের অবস্থা নিশ্চয় অন্য সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করত। বাড়ির কর্তাটি হয়তো শহরে ওকালতি করেন, গ্রামের বাড়িতে বসে তাঁর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ভাই জমিজমা দেখেন, আর এক ভাই শহরে তাঁর কাছে থেকে স্কুলমাস্টারি করেন, ছেলেরা স্কুলে পড়ছে, এবং সর্বোপরি বেশকিছু বেকার আত্মীয় তাঁর খেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে--বাংলাদেশে এই ধরনের ভদ্রলোক পরিবার ১৯৪৭-এর আগে হামেশা চোখে পড়ত।

সাধারণভাবে পরভোজী খাজনা-আদায়কারীদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তার সপক্ষে কয়েকটা তথ্য দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে এঁদের সংখ্যা মারাত্মক রকম বেড়ে গিয়েছিল। সেন্সাস রিপোর্টে পাই যে ১৮৯১ সালে তাঁদের সপরিবার সংখ্যা ছিল ৯,২৮,২৭৭; ১৯০১ সালে ১৫,১৬,১৪০--শতকরা তেষট্টি বৃদ্ধি! ১৯০১ থেকে ১৯১১-র মধ্যে তাঁদের বৃদ্ধির হার শতকরা তেইশ। অন্য দিকে, খাজনাদাতাদের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়ছিল না। ১৮৯১-১৯০১ সালের মধ্যে তাঁদের সপরিবার বৃদ্ধির হার শতকরা এগার জন; পরবর্তী দশ বছরে আরও কম, শতকরা পাঁচ জন। গড়পড়তা প্রতি একশ জন খাজনা-আদায়কারীর জন্য ১৯০১ সালে ছিলেন ২,৮০৭ জন খাজনাদাতা, ১৯১১ সালে ২,৪১০ জন, ১৯২১-এ ২,৩১৫ জন। আদায়কারীর ভাগে খাজনার পরিমাণ স্বভাবতই হ্রাস পাচ্ছিল। ১৯১১-২১ এই সময়ে তাঁরা বার্ষিক খাজনা পেতেন সাড়ে তের কোটি টাকা এবং ১৯২১ সালে তাঁদের সপরিবার সংখ্যা ১৩,১৯,৩০২। যদি গড়পড়তা ছ'জন নিয়ে একেক জন খাজনা-আদায়কারীর সংসার হয় তাহলে প্রতি সংসারের আয় ছিল বছরে ছ'শ কুড়ি টাকা, মানে মাসে পঞ্চাশ টাকার কিছু বেশি। এই আয়ের শতকরা দশ ভাগ যেত খাজনা আদায়ের ব্যবস্থায় এবং সরকারি তহবিলে। পেন্সিল ছাড়া হাতে বিশেষ

---

* তালিকাটি অসম্পূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধকালে আটশ-র উপর বাঙালিকে ভারতরক্ষা আইন আর তিন নম্বর রেগুলেশনের আওতায় আনা হয়েছিল। এই তালিকায় তাঁদের ধরা হয়নি।

কিছুই থাকত না।

শুধু সেন্সাস রিপোর্টে নয়, অন্য অনেক সূত্রেই জমিদার-তালুকদার গোষ্ঠীর দুরবস্থার খবর পাই। পূর্ব বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি লো মস্‌রিয়ে ১৯০৮ সালে বড়লাট মিন্টোকে জানাচ্ছেন যে তাঁর এলাকায় আন্দোলন সবচাইতে বেশি কারণ সেখানেই খাজনা-আদায়কারী ভদ্রলোকের প্রধান ঘাঁটি। সরকারি চাকরির সুযোগ বেড়েছে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধির হারের কাছে সে কিছুই না। লো মস্‌রিয়ের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি পাই ১৯১৫ সালে বাংলা জেলা শাসন কমিটির রিপোর্টে। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা থেকেও অনুরূপ খবর। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ১৯০৭ সালে লিখছেন যে আন্দোলনের কারণ 'প্রথমত অর্থনৈতিক'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে লাভ হচ্ছিল 'তাতে ভদ্রলোকের আর চলছে না, কেননা তাঁদের সংখ্যা ও খাইখরচ বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। অতএব অসন্তোষ।' ফরিদপুর জেলায় ঐ সময় যে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা হয় তার ভিত্তিতে একখানা বই লেখা হয় যার নাম *Economic Life of a Bengal District* (Oxford, 1916)। এর লেখক জ্যাক্‌ সাহেব প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলছেন যে ঐ অঞ্চলের বহু ভদ্রলোক অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটাতেন: জমির আয়ে অনেকেরই কুলোত না, তাঁরা সরকারি চাকরি অথবা জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করে কোন রকমে চালাতেন, নয়তো ইস্কুলে কিংবা বার-লাইব্রেরিতে ভীড় জমাতেন। ঢাকা আর ফরিদপুরের জেলা গেজেটিয়ারেও এক কথা: এই দুই জেলার, বিশেষ করে বিক্রমপুরের, ভদ্রলোকেরা অনেকেই প্রবাসী হতেন পরিবার প্রতিপালনের উদ্দেশে। সমগ্র বাংলায় সরকারী বৃত্তিনির্ভর খাজনা-আদায়কারীর শতকরা সংখ্যা, সেন্সাস রিপোর্টে জানতে পাই, ক্রমশ বাড়ছিল: ১৯০১-এ ছিল চোদ্দ; ১৯১১-য় সাতাশ।

এ থেকে শিক্ষিত বেকার কিংবা প্রায়-বেকার ভদ্রলোকের কথা এসে পড়ে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গোড়ার ইতিহাস বিষয়ে ম্যাক্‌কালির গবেষণা (*English Education and the Origins of Indian Nationalism*, N.Y., 1940) থেকে জানতে পারি যে কংগ্রেসের জন্মকালে ইংরেজি-শেখা বাঙালির বেশির ভাগই ছিলেন উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং বাঙালি ছাত্রসমাজের অধিকাংশই, ম্যাক্‌কালির ভাষায়, 'middle class' কিংবা 'lower middle class' থেকে আসত। ম্যাক্‌কালির বই বেরিয়েছিল বহু বছর হলো, ১৯৪০-এ। সম্প্রতি ডক্টর অনিল শীল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ নিয়ে যে গবেষণা করেছেন (*The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1968) সেখানে ম্যাক্‌কালির তথ্যের সমর্থন মেলে। ১৮৮৮-র পরবর্তী ছাত্রদের একই অবস্থা। ১৮৯৫-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতায় উপাধ্যক্ষমশাই ছাত্রদের 'very poor' অবস্থার জন্য শোক করছেন; ১৯১০-এ টাইম্‌স্‌ পত্রিকার ভারতবিশারদ ভ্যালেন্‌টাইন চিরল তাদের 'pathetic' দশা দেখে থ হয়ে গেছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের পুঁথিপড়া ঐতিহ্য তো ছিলই, অবস্থার চাপেও তাঁরা স্কুল-কলেজে ছেলে পাঠাতেন। যাকে উচ্চশিক্ষা বলে তা জোগাতে গরিব বাপ-মায়ের আত্মত্যাগে কসুর ছিল না।

আর তাঁদের পড়ুয়া ছেলেরা মলিন ঘরে বসে, নয়তো সমান মলিন মেসে হস্টেলে, কষে নোট্‌স্‌ মুখস্থ করতেন, বিদেশী ভাষায়, তাঁদের চেনা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয়ে, যেমন এখন তাঁদের প্রপৌত্রেরা করে যাচ্ছেন। আশ্চর্য কী যে তাঁদের অনেকেই পরীক্ষায় ফেল করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থে দেখছি ১৮৮৯ সালের এন্ট্রান্স

পরীক্ষায় সত্তর পার্সেন্টের বেশি ফেল! ১৯০৬ সালে দুই বাংলা থেকে ৬,৪১৬ জন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেন; তাঁদের মধ্যে পাশ করেন সাকুল্যে ১,৭৪৯ জন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও বিপ্লবীদের কে কতদূর লেখাপড়া করেছিলেন তা অবশ্য খুঁটিয়ে জানা অসম্ভব, কিন্তু আন্দাজ করা অসংগত হবে না যে যাঁরা ফেল করার ফলে চাকরি জোটাতে পারতেন না তাঁরা সরকারের উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না।

এ নয় যে পাশমার্কারা কিছু রাজভক্ত ছিলেন। পাশ করলে চাকরির দরখাস্ত করা যেত, চাকরি পাওয়াটা নিশ্চিত হত না। কেননা অন্যান্য প্রদেশেও ইংরেজি-জানা লোকের সংখ্যা বাড়ছিল। বিদেশী স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেনি, ঘটলেও ভদ্রলোকের ওদিকে প্রবৃত্তি হত না। ভদ্রলোকের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জমির আয়েও ঘাটতি পড়ছিল। মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলে-ইংরেজি-শেখা বাঙালি যুবকেরা যখন কুড়ি টাকা মাস মাইনের বুনোহাঁস ধরতে ব্যস্ত, মিস্ত্রী মজুরেরা কেউ কেউ তখন দিন এক টাকা রোজগার করত। সব মিলে চাকরির বাজারে ভদ্রলোকের অবস্থা কাহিল ছিল সন্দেহ নেই। চিরলের বর্ণনায় তাঁরা ছিলেন 'a semi-educated proletariate'।

সুতরাং অনেকে, সেকেলে গল্পে যেমন পড়ি, ল কালেজে আইন পড়ায় লাগলেন। 'আইন পড়ছ কেন?' প্রথম যুদ্ধকালীন বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ড জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তর: 'আমার আর কিছু করার নেই, তাই'। চেম্‌স্‌ফোর্ডের বহু পূর্বেই আইন সম্বন্ধে বাঙালির উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকেই গড়ে উঠছিল, বিপিনচন্দ্র যাকে বলেছেন 'ভকিল রাজ'। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে উকিলবাবুদের মুহুরীর সংখ্যা বাড়ল শতকরা ১৫৭ জন। ১৯১১-র মধ্যে উকিলদের সংখ্যা বেড়েছিল শতকরা কুড়ি, তাঁদের মুহুরীর সংখ্যা শতকরা একান্ন। ১৯২১ সালের আদমসুমারীতে জানা গেল কোচিন আর ত্রিবাঙ্কুর বাদ দিলে জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশেই আইননির্ভর মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বিচক্ষণ লো মসুরিয়ে ১৯০৭ সালে লক্ষ্য করেছিলেন যে সম্প্রদায় হিসেবে উকিলেরা সরকারবিরোধী। সেটা স্বাভাবিক। আইনে ভীড়, ভীড়ে হতাশা, হতাশায় বিদ্বেষ। অসন্তুষ্ট আইনজ্ঞের পক্ষে আইন-মানা প্রজা হওয়া অসম্ভব।

ভারতবর্ষে মাস্টার ও কেরানির দারিদ্র্য প্রবাদের সামিল। তবে কেরানিরা কেরানিদের মধ্যেই আবদ্ধ, শিক্ষকের প্রভাব আরও বিস্তৃত। শিক্ষকেরা মাইনে পেতেন সামান্য, রক্তগরম ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁদের বক্তৃতা স্বভাবতই সিলেবাস-ছুট হত। ১৯০৮-এ উভয় বাংলায় বেসরকারী হাই ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল এক লাখ আট হাজার, শিক্ষকের সংখ্যা চার হাজার সাতশ ত্রিশ। তাঁদের মধ্যে মাত্র ছেচল্লিশ জন মাসে একশ টাকার বেশি মাইনে পেতেন; চার হাজার একশ সাতান্ন জনের উপার্জন ছিল পঞ্চাশ টাকারও কম; তিন হাজার তিনশ বিয়াল্লিশ জনের আয় ছিল ত্রিশ টাকার নীচে; মাসিক কুড়ি টাকার কম পেতেন প্রায় দু হাজার শিক্ষক। ১৯১১ সালে লেখা বড়লাট হার্ডিং-এর একখানা চিঠিতে পড়ছি যে বাংলাদেশে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকের আয় মাসিক তিন টাকা, 'অথচ সেই মাইনেতেই প্রচুর লোক কাজ করতে রাজী'।

খাজনা-আদায়কারী বাদে বাঙালি ভদ্রলোকের গড়পড়তা মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের খবর আমাদের জানা নেই। ভদ্রলোক সমাজের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য নেই সংগ্রহে। ফরিদপুর জেলায় যে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ নেওয়া হয়েছিল তা থেকে জানা যায়

যে অকৃষক হিন্দু পরিবারগুলির শতকরা ছাব্বিশটি ছিল ঋণগ্রস্ত এবং তাদের গড়পড়তা ঋণের অঙ্ক দুশ আটান্ন টাকা। কৃষক পরিবারের গড় ঋণ এর অর্ধেকেরও কম। পার্থক্যের কারণ হয়তো এই যে অকৃষক পরিবারগুলির মধ্যে ভদ্রলোক-ছোটলোক দুরকমই ছিল। ভদ্রলোকেরা, সন্দেহ হয়, বেশি ধারে-ডোবা ছিলেন; ইংরেজি শিখে চাকরি না পেলেও তাঁদের সাংসারিক চাহিদা বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাছাড়া বর্ণগরিমা ও শিক্ষার জোরে সাধ্য-ছাড়ানো ধার পাওয়া ছিল সুবিধের।

কার্জনের কীর্তিকলাপে ভদ্রলোকের ভয় ধরল যে তাঁদের অর্থনৈতিক সুযোগ আরও সংকীর্ণ হতে পারে। 'অসুখী-বেকার বি.এ.রা' যাতে দলে ভারী না হন সেজন্য ১৯০৪-এ 'য়ুনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট্' পাশ করে শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারি খবরদারির ব্যবস্থা করা হয়। মহারানীর ঘোষণাপত্রের উপর ভর করেছিল শিক্ষিত ভদ্রলোকের বড় কাজের অমরাবতী। কার্জন তাঁদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে নানা বক্তৃতায় স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝিয়ে দিলেন যে বড় কাজে 'একমাত্র ইংরেজেরই অধিকার, কারণ সেসব কাজের জন্য যে শাসননীতি-বিষয়ে জ্ঞান, মানসিক গঠন ও উদ্যোগ আবশ্যক সে কেবল ইংরেজের ভিতর দেখা যায়; সে তাদের রক্তের মধ্যে, বেড়ে-ওঠার মধ্যে, শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে'।

তার উপর জমিদারি সুখনীড়ে বঙ্গভঙ্গ যেন শনি হয়ে দেখা দিল। জমিদারদের মধ্যে যাঁদের ঘরবাড়ি ছিল কলকাতায় আর জমিজমা নতুন-গড়া পূর্ববঙ্গে তাঁদের ভাবনা হল পাছে পদ্মা পেরতে হয়। অপরপক্ষে যাঁদের বসবাস পূর্ব বাংলায় এবং সম্পত্তি পশ্চিমে তাঁরা ভাবলেন কলকাতায় বুঝিবা উঠে যেতে হবে। যাঁদের সম্পত্তি সীমান্তের উভয় দিকে তাঁরা কলকাতা-ঢাকা দু জায়গাতেই নায়েব-গোমস্তা পুষতে হবে ভেবে বিরক্ত হলেন। কিন্তু যে ভয়টা তাঁদের কাউকে কাউকে বিপ্লবী সমিতির দিকে ঠেলে দিল সে হলো নতুন ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব-বিষয়ে চিন্তা। ভূপেন দত্ত তাই লিখেছেন। বঙ্গভঙ্গের সময় জমিদার ও অন্যান্য ভদ্রলোকের তরফ থেকে সরকারের কাছে যেসব আবেদন করা হয়েছিল তাতেও তাঁদের আশঙ্কা ধরা পড়েছে।

জমিদারেতর ভদ্রলোকের চোখে বঙ্গভঙ্গ ছিল তাদের না খাইয়ে মারবার সরকারি পরিকল্পনা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যেসব মিটিং করা হয়েছিল, স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছিল, তাদের প্রায় সব কটাতেই একথা বলা হয় যে কলকাতায় লেখাপড়া করার সুযোগ থেকে পূর্ববঙ্গীয়েরা বঞ্চিত হবেন, ফলে সরকারি কাজ তাঁদের ভাগ্যে জুটবে না। সবচেয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন ঢাকা জেলার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা, তাঁদের আবেদন পড়ে অন্তত তাই মনে হয়। বাংলা বিহার উড়িষ্যার কেরানিকুলে তাঁরাই ছিলেন প্রধান; পুরনো বাংলার আটচল্লিশটি জেলায় আর একটু উঁচু কর্মসমূহের এক-দশমাংশও ছিল তাঁদের দখলে। বাংলা যদি ভাঙা হয় তাহলে তাঁদের দাবী পুরনো প্রদেশে অগ্রাহ্য হবে, আসামেও তাঁরা ঠাঁই পাবেন না, তাঁদের খুশী থাকতে হবে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা নিয়ে। 'অতএব এই ঢাকা জেলার যুবকেরা চাকরির অভাবে উপোসে মরবে'। কলকাতার সঞ্জীবনী কাগজে আর এক আশঙ্কা প্রতিফলিত হলো : পুরনো প্রদেশে এখন যেহেতু বাঙালীর চেয়ে বিহারী দলে ভারী, সরকারি কাজে তাঁদের দাবী হবে অগ্রগণ্য।

মুসলমানদের নিয়েও হিন্দু ভদ্রলোকের উদ্বেগ ছিল। মুসলমানপ্রধান নতুন প্রদেশে হিন্দু ভদ্রলোকের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হবে ও মুসলমান স্বার্থ সরকারি আনুকূল্য পাবে, কার্জন তাঁর সে ইচ্ছে খুব একটা অস্পষ্ট রাখেননি। পূর্ববঙ্গের নয়া ছোটলাট

ফুলারসাহেবের বাংলা রূপকথা পড়া ছিল। তাঁর নিজের কথায়, 'এক স্ত্রীর জ্বালাতনে অস্থির হয়ে অপরার অঙ্কশায়ী', তিনি হিন্দুকে তাঁর 'দুয়োরানী', মুসলমানকে 'সুয়ো' বলে প্রকাশ্যেই কিছু বেচাল ঠাট্টাঠুট্টি করে ফেলেছিলেন। 'চাকরি পাবার যোগ্যতায় হিন্দুরা সরেশ' হলেও পূর্ববঙ্গে তাঁরা সংখ্যালঘু এবং চাকরিতে তাঁদের একচেটে অধিকার 'সরকারি স্বার্থহানিকর'—এসব কথা ফুলার ও তাঁর পরবর্তী লান্‌স্‌লট্‌ হেয়ার দুজনেই সম্যক জানতেন। এডিনবরায় রক্ষিত মিন্টোর ব্যক্তিগত কাগজপত্রে, তাছাড়া পূর্ববঙ্গের সরকারি নথিতে, তার প্রমাণ আছে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের চাপে অবশ্য বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত রদ হয়েছিল। স্বয়ং পঞ্চম জর্জ্‌ ভারতে অবতীর্ণ হয়ে ১৯১১ সালের দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। তাতে কিছুদিনের জন্য মডারেট মহলে রাজভক্তির সু-বাতাস বইল। টেলিগ্রামে, সাধুবাদে, হার্ডিং 'প্লাবিত' হলেন। তাঁর বেঙ্গলি কাগজে সুরেন্দ্রনাথ সুযোগ বুঝে 'constitutional agitation'-এর আর-এক দফা গুণকীর্তন করলেন। কংগ্রেসে অম্বিকা মজুমদার বক্তৃতা দিলেন : 'বার্ক্‌ আর গ্ল্যাড্‌স্টোনের জাত কখনই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারে না'। কলকাতায় সম্রাট এলেন, শহর ভেঙে পড়ল তাঁর দর্শনকামীদের ভীড়ে। রাজা-রানীর ভারত সফরের সরকারি ঐতিহাসিক--বেচারিকে কে যেন বুঝিয়েছিল বাঙালি গোমড়ামুখো--তাদের আহ্লাদ দেখে স্বস্তি পেলেন। তাঁর জানা ছিল না বিনিপয়সার হুজুগে এ শহর চিরকালই আন্দোলিত।

হুজুগ মিটলে ভদ্রলোকের হুঁশ হলো যে বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহের পুনর্মিলন ঘটলেও তার সুদিন আসে নি। এক দিকে আসাম অন্য দিকে বিহার-উড়িষ্যা ছিঁড়ে নিয়ে দুটি নতুন প্রদেশের জন্ম দেয়া হলো। ভারতবর্ষের রাজধানী অন্তরিত হলো কলকাতা থেকে দিল্লী। যেমন বাংলা প্রদেশের নষ্টস্বাস্থ্যের উদ্ধার ঘটলো না তেমনি ভদ্রলোকের কেরানি-সাম্রাজ্যের সীমা পূবে-পশ্চিমে থমকে গেল। জনৈক ভদ্রলোক খেদোক্তি করলেন: আমরা চাঁদ চেয়েছিলাম, পেয়েছি; কিন্তু ওরা যে সূর্য কেড়ে নিল!

ভদ্রলোকেরা কার্জনেই আপন্ন ছিলেন না। বন্যা আর অনাবৃষ্টি ছিল অন্য আপদ। ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলায় মারাত্মক বন্যা হয়; পরের দু বছর সেখানে ফসলও ভাল ফলে নি। উভয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বিভিন্ন জেলায়—পূর্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ, মৈমনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর; পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, নদীয়া, মেদিনীপুর; দক্ষিণে খুলনা আর যশোর; বিহারে মজঃফরপুর, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা; উড়িষ্যায় কটক ও বালেশ্বর—ভদ্রলোকেরা অনেকেই ঘোর দুরবস্থায় পড়লেন। লক্ষণীয় যে ঐ জেলাগুলির অনেক কটিতেই প্রথমে বয়কট পরে বোমার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। সরকারি রিপোর্টে এবং সে আমলের খবর কাগজে অন্যান্য জায়গা থেকেও খারাপ খবর পাই, তবে একটু কমের উপর : যেমন মালদা, বগুড়া, পাবনা, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা।

মূল্যবৃদ্ধি আর-এক দুর্দৈব। গোটা ভারতবর্ষেই কয়েক বছর ধরে দাম চড়ছিল: তবে ১৯০৫ থেকে বৃদ্ধি ছিল স্থির। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে যে সরকারি অনুসন্ধান হয়েছিল তার রিপোর্টে দেখছি যে ১৮৯০-৯৪ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে সাধারণ মূল্যমাত্রা শতকরা ষোল ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল; ১৯০৬ সালে শতকরা ঊনত্রিশ ভাগ; ১৯০৭-এ শতকরা তেত্রিশ। সাধারণ মূল্যমাত্রা চূড়ান্তে পৌঁছয় ১৯০৮-এ : শতকরা তেতাল্লিশ। আর

যদি চাল-ডালের দাম আলাদাভাবে বিচার করি তাহলে খবর কাগজে যাকে অচলাবস্থা বলে তাই হয়েছিল। ১৯০৮ সালে চাল-ডালের দাম বেড়েছিল যথাক্রমে শতকরা আটষট্টি ও ঊনআশি ভাগ; এর পূর্বে কোন দুর্ভিক্ষেও এতটা দাম চড়েনি। ১৯০৯ সালের পর থেকে শস্য ভাল হলেও ভারতীয় ব্যবসাদার সরকারি প্রশ্রয়ে আদ্যন্ত শূকরস্বভাবী, সুতরাং দাম কমার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। বরং প্রথম মহাযুদ্ধের তাড়নায় দাম আবার হু-হু করে বাড়ল। ১৮৭৩ সালে যে পরিমাণ চাল কিনতে একশ টাকা লাগত, ১৯১৪-য় সেই চাল কিনতে লাগল দুশ ছাপ্পান্ন টাকা।

মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্ষেতমজুরের বিশেষ অসুবিধে হয়নি, কেননা তারা খাদ্যবস্তুর বিনিময়ে মজুর খাটত। চড়া দামে ধান-পান বেচে কৃষকেরাও আগের চেয়ে সুখে ছিল। ভদ্রলোক-বহির্ভূত সমাজে বিপন্ন হয়েছিল শুধু দিনমজুর, চাকরবাকর, ছোটখাট ব্যবসাদার। ভদ্রলোকেরাই খেলেন সবচেয়ে বড় ধাক্কা। কেননা অন্যান্যদের তুলনায় অভাববোধ, সোজা কথায় চাল বজায় রাখার গরজ, তাঁদেরই বেশি; বাপের শ্রাদ্ধে কিংবা মেয়ের বিয়েতে আয়ের অধিক ব্যয় না করলে তাঁদের মানরক্ষা হয় না। ডাক্তার-উকিলের দর্শনী প্রথামাফিক; মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে সেটা চট করে বাড়ানো চলে না। অল্প মাইনের শিক্ষক আর কেরানির অবস্থা আরও খারাপ। শস্যাল্পতা নয়, দারিদ্র্যই তাঁদের খেয়েছিল। খাজনা-আদায়কারী ভদ্রলোক ও তাঁদের জমিদার প্রভুরাও দেখা গেল বিশেষ সুখে নেই। জিনিসের দাম বাড়ছিল অথচ খাজনা বাড়ছিল না। রায়তেরা চড়া দামে শস্য, বিশেষত পাট, বেচে দু পয়সা ঘরে আনছে, নির্দিষ্ট খাজনা দিয়েই তারা খালাস—এ দেখে খাজনা-আদায়কারী ও জমিদারের ভাল লাগার কথা নয়। উপরন্তু ঘন-ঘন খাজনা যে বাড়ানো যাবে, প্রজা উৎখাত করা যাবে তারও উপায় ছিল না। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের টেনান্সি অ্যাক্‌টের কল্যাণে রায়তের অবস্থার কিছু সুরাহা হয়েছিল। বার বছর কিংবা তার বেশি কোন জমি যদি রায়তের ভোগদখলে থাকত তাহলে সে জমি থেকে তাকে উৎখাত করা বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। বাংলা দেশে শতকরা আশি-নব্বই জন রায়তেরই এই ধরনের ভোগদখলের অধিকার ছিল। টাকায় দু আনা করে তাদের খাজনা বাড়ানো যেত, কিন্তু তাও একবার খাজনাবৃদ্ধির পর পনের বছর না গেলে আবার বাড়তি খাজনা সহজে চাপানো যেত না। সাধারণ দখলীস্বত্বসম্পন্ন রায়তের উপর জমিদারের প্রতাপ বেশি ছিল বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল সামান্য; আর মামলা-মোকদ্দমা না করে তাদেরও জমি থেকে ওঠানো যেত না। জমিদার ও তার অধস্তন খাজনা-আদায়কারী এই সব আইনের চাপে বাঁধা আয়ের ভদ্রলোকে পরিণত হয়েছিলেন। মূল্যবৃদ্ধিবিষয়ক রিপোর্টে, বিভিন্ন জেলা গেজেটিয়ারে এবং লো মসুরিয়ে-লিখিত বিবরণে মূল্যবৃদ্ধির পীড়নে সমগ্র ভদ্রসমাজের লক্ষ্মীছাড়া চেহারা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

গত শতকের শেষ দিক থেকে ভদ্রলোকের এই শোচনীয়তা রাজনৈতিক অর্থে তাদের খানিকটা বেপরোয়া করে তুলতে সাহায্য করেছিল। তার আগে ইংরেজিনবিশ ভদ্রলোকের সংখ্যা কম ছিল, অল্প আয়াসে ডেপুটি কিংবা—আরও ভাল—দারোগা হওয়া যেত; তাই ভদ্রলোকের পক্ষে মহারানী-বলতে-অজ্ঞান মডারেট হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু উনিশ শতকের অষ্টম দশম থেকে দুর্গত ভদ্রলোকের চাকরির দাবী—তা সে একজন কার্জনের কাছে যতই বিরক্তিকর ঠেকুক—তাদের এক্‌স্‌ট্রিমিজ্‌মের পথে পোঁছে দিল।

[ক্রমশঃ]

নেরভাল ও তাঁর রুপোলি দরোজা

কমলেশ চক্রবর্তী

জেরার্দ দ্য নেরভালের আসল নাম ছিলো জেরার্দ লাব্রুনিয়ে এবং জন্মেছিলেন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে সন্ধ্যে আটটায়। পিতা ছিলেন সামরিক চিকিৎসক। পুত্রের জন্মের সময় সপরিবারে থাকতেন পারীতে। পুত্রের কবি হবার বাসনায় পিতা কোনো সহৃদয় উত্তেজনা বোধ করতেন না বুঝতে পেরে নেরভাল তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হওয়া মাত্রই নিজের নাম বদলে নিলেন। যদিও নেরভালের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসক পিতার এমন কোনো দুরারোগ্য ক্ষীণ সম্পর্ক ছিলো না, যেমন ছিলো বোদলেয়ারের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় পিতা জেনরল য়োপীক্-এর। বস্তুত নেরভাল নানা ধরনের ছদ্মনাম গ্রহণ করতে ভালোবাসতেন। মনে মনে তিনি একটি খাঁটি ভবঘুরে বহুরূপী ছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত কয়েকটি ছদ্মনাম, কাদেৎ রুশেল, লুই জেরভাল, ফ্রিৎস্, লর্ড পিলগ্রিম, মঁসিয়ো বোগলাঁ, এক্স, মঁসিয়ো পেরসোনে, অথবা তাঁর ব্যবহৃত অন্য ছদ্ম সংক্ষিপ্ত নামঃ জি, জি দ্য এল, জিডি। এর ফলে তাঁর সব বিচ্ছিন্ন রচনা একত্রিত করার কাজটা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছিলো তাঁর মৃত্যুর পর। ১৮৪৪ কিংবা ৪৫-এ তিনি প্রথম তাঁর নাম হিসেবে নেরভাল ব্যবহার করতে শুরু করেন। তাঁর খুড়োর পরিবার তখন থাকতো ফ্রান্সের "ভালয়" অঞ্চলে নিজেদের "ক্লোজ দ্য নেরভাল" জমিদারিতে। কিছুদিন পর তখনকার অন্যান্য মধ্যবিত্ত ঘরের লেখকদের মতো তিনিও নামের অভিজাত অলঙ্কার হিসেবে নিজের নামের সঙ্গে "দ্য" যুক্ত করেন।

তিনি ভাবতে ভালোবাসতেন যে তাঁর পিতা ছিলেন জোসেফ বোঁনাপার্ত অথবা তিনি ছিলেন দ্বাদশ রোমান সম্রাট "নেরভালর" অধস্তন পুরুষ। মিশরে বাস করার সময়ে সম্ভবত সেই কারণেই শহরের পুরানো বাজার থেকে "নেরভার" প্রাচীন মুদ্রা ক্রয় করতেন। এ-সব প্রথম জীবনের চালিয়াতি হলেও পরে তাঁর মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার সময়ে এই অভিজাত বংশপরিচয়ের স্বপ্ন তাঁকে বিচলিত করেছিলো। নেরভালের তুলনায় গীয়োম আপোল্যনেয়ারের যাজক পিতার দাবি কেবল তাঁর রোমান্টিক মনেরই পরিচয় দেয়। অন্তত আপোল্যনেয়ারের ব্যক্তিগত জীবনে বা কবিতায় পিতার পরিচয় কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অথচ নেরভালের সমস্ত রচনায় এই ছদ্ম আভিজাত্য তাঁর কাব্যের সপক্ষে কাজ করেনি।

নেরভাল যে-বছরে জন্মালেন সে-বছরের ডিসেম্বরে তাঁর পিতা এতিয়েঁ লাব্রুনিয়ে রাইন-তীরের ফরাসি সেনাদলের সঙ্গে সেখানে গেলেন সস্ত্রীক। সদ্যোজাত শিশুকে ভালয়ের কাছাকাছি মোর্তেফোঁত্যাঁর লোয়াজি গ্রামে এক চাষী ধাইমার কাছে রেখে দিলেন, এর দু বছর পর সাইলেশিয়ায় মাদাম লাব্রুনিয়ে মারা গেলেন। এই মৃত্যুর বর্ণনা নেরভালের ওরেলিয়া উপন্যাসে লিপিবন্ধ আছে। মায়ের মৃত্যুর পর শিশুকে প্রতিপালনের জন্য পাঠানো হলো খুড়োর জমিদারিতে। এমনি করে নেরভালের শিশুমনে ভালয়ের গ্রাম্য প্রকৃতি স্থায়ী আসন পেল। প্রকৃতি ছাড়া, "ফ্রান্সের হৃদয়" ভিন্ন, নেরভাল এখানেই আবিষ্কার করলেন রুশোকে। রুশোর বাসভূমি ছিলো এই ভালয়। রুশোই নেরভালকে দীক্ষা দিলেন আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যে। রুশোর বিখ্যাত আত্মহত্যার দর্শনে নেরভালের আস্থা জন্মাল।

লোয়াজি গ্রামেই নেরভাল একটি চাষীর কন্যার প্রতি আসক্ত হলেন। মেয়েটির কথা তাঁর "সিলভিয়া" গল্পে রয়েছে। কবি যে মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তারও নাম ছিলো সিলভিয়া। কবির কাছে সিলভিয়া প্রকৃতি আর আদ্রিয়েন শিল্প। তাঁর সমস্ত গদ্যরচনায় এই দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি ও শিল্পের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। ফরাসি প্রতীকী কবিদের অধিকাংশ ভাবনা বা কাব্যাদর্শ বোদলেয়ারের কবিতায় সচেতনভাবে প্রকাশিত হলেও বস্তুত নেরভালই ফরাসি ভাষার প্রথম কবি যাঁর মধ্য দিয়ে প্রতীকী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। অথচ নেরভালকে কোনো বিশেষ সময়, বা সময়ের চিহ্ন পরিচিতি দিতে পারে না। তাঁর রচনা পরবর্তী লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশকেই সবিশেষ প্রভাবিত করেছিল। নেরভাল বস্তুত মরমী কবি। এবং ফরাসি কবিতা প্রতিদিন মরমীবাদের রহস্যময়তা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফরাসি কবিতার ইতিহাস লক্ষ্য করলে জানা যাবে মরমীভাবনাই তার প্রথম যথার্থ লক্ষণ। নেরভাল চেয়েছিলেন, "নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে"। আর এই ধারণাই পরবর্তী স্যুররিয়ালিস্ট ফরাসি কবিদের অভিনব মনে হয়েছিলো। বোদলেয়ার তাঁর "হেগেসিপ্পে মোরো" রচনায় নেরভালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। নেরভালের "ভোইয়াজ আঁ ওরিয়" থেকে বোদলেয়ার তাঁর বিখ্যাত "সিথেরায় যাত্রা" কবিতাটির প্রেরণা পেয়েছিলেন। নেরভালের ফাউস্ত প্রথম খণ্ডের ভাষান্তর অন্যান্য ফরাসি কবিদের জর্মন সাহিত্যে অনুরাগের জন্ম দিয়েছিলো। তিনি নিজে প্রভাবিত হয়েছিলেন হফ্‌মানের দ্বারা। প্রতীকী আন্দোলনের বছরগুলোতে নেরভাল সবচেয়ে বেশি পঠিত হয়েছিলেন। তাঁর পাঠকেরা অধিকাংশই সেদিনের সব কবি।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেরভালের পিতা আহত অবস্থায় সমরবিভাগ থেকে ছুটি পেয়ে এলেন পারীতে বাস করতে। পুত্রকে নিয়ে এলেন গ্রাম থেকে। শহুরে ইস্কুলে পড়াশুনোর জন্য দিলেন। এখানেই নেরভাল প্রথম পরিচিত হলেন গোতিয়ের সঙ্গে। আর এই বন্ধুতা দুই বিখ্যাত কবির জীবদ্দশায় কখনো ছিন্ন হয়নি। বস্তুত গোতিয়ের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই নেরভাল ফরাসি রোমান্টিক আন্দোলনের একজন অন্যতম সদস্য হয়ে উঠলেন। ইস্কুলে পড়ার সময়ই তাঁর প্রথম কবিতাগুলো প্রকাশিত হলো। অধিকাংশ কবিতাই সমকালীন রাজনীতি অথবা নেপোলেঁয়র কার্যকলাপের বর্ণনামূলক রচনা। এ সবের চেয়ে অনেক দামি কাজ তিনি তখন করছিলেন। ফাউস্তের প্রথম খণ্ড ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হলো ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। সমস্ত ফ্রান্স প্রথম শুনতে পেলো গ্যয়টের নাম। শুনতে পেলো জর্মনিতে যে ধরনের সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা সমসাময়িক ফরাসি সাহিত্য থেকে একেবারে ভিন্ন। একেবারে মুক্ত। ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মনির সাহিত্যক্ষেত্রেও যে দূরত্ব একদিন ছিলো নেরভাল তা দূর করলেন। ফরাসিরা যেমন এর ফলে জর্মন সাহিত্যের দ্বারা উপকৃত হলেন ঠিক তেমনি জর্মনরাও হলেন। গ্যয়টে নেরভালের ভাষান্তর পাঠ করে গর্বের সঙ্গে বলে-ছিলেন "ভলতেয়ার যে-ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন এতোদিনে সেই ভাষাই আমার জর্মন ফাউস্তকে গ্রহণ করলো"। ফাউস্তের ভাষান্তর পাঠ করে গ্যয়টে তরুণ নেরভালকে চিঠিতে লিখলেন, "দীর্ঘদিন জর্মন ভাষায় ফাউস্ত পড়ে পড়ে আমি ক্লান্ত হয়েছিলাম। আপনার ফরাসি ফাউস্ত পড়ে আমি এই লেখাটিকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে পারছি।" অন্যত্র গ্যয়টে লিখছেন, "আমি আর জর্মন ভাষায় ফাউস্ত পড়বো না। নেরভালের ভাষান্তর এতো টাটকা, নূতন এবং চমকপ্রদ হয়েছে।" গ্যয়টের এইসব উক্তি থেকে বোঝা যায় ফাউস্ত

অনুবাদের দ্বারা নেরভাল স্বদেশে ও বিদেশে কতো দ্রুত, কতো বেশি, যোগ্য সম্মান অর্জন করেছিলেন। থিওফিল গোতিয়ে তাঁর "রোমান্টিসিজমের ইতিহাসে" লিখেছেন, "ফাউস্তের মতো অদ্ভুত, দুরূহ অতি-রোমান্টিক নাটকের ভাষান্তর, বিশেষত ফরাসির মতো ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়া ভাষায়, কতো কঠিন তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কিন্তু নেরভালের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। জর্মনরা, যাঁরা নিজেদের অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছে অবোধ্য মনে করেন তাঁদেরও একথা মেনে নিতে হবে। ফরাসি ঈদিপাস জর্মন স্ফিংসের ধাঁধার জবাব জানতে পেরেছে।" নেরভাল ফাউস্ত অনুবাদে "জেরার্দ" নাম স্বাক্ষর করেন।

এর পরেই কবি ইস্কুল ত্যাগ করলেন। একে একে তৎকালীন সব লোক ও ছবি-আঁকিয়ে, গায়ক ও স্থপতি যুবকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। গোতিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভিকতর য়ুগোর কাছে। পরিচিত হলেন সেই রোমান্টিক যুগের অন্যতম উদ্গাতা অথচ ইতিহাসে উপেক্ষিত কবি পেত্রুস বোরেল-এর সঙ্গে। যেমন গোতিয়ে তেমনি বোরেলও নেরভালের আজন্মবন্ধু ছিলেন। ফাউস্তের প্রকাশনার পর নেরভাল কিছু জর্মন কবিতা ও তাঁর প্রিয় প্লেইয়াদদের কবিতার সংকলন প্রকাশ করলেন। কিন্তু এই জর্মন কবিতার অনুবাদগুলো তেমন সাড়া জাগালো না। "পোয়েজিয়ে আলেমাঁদে" পড়ে গ্যয়টেও মুগ্ধ হলেন না।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পারী শহর আন্দোলিত হলো এক ঘটনায়। তারই নাম য়েরনানির যুদ্ধ। ভিকতর য়ুগোর নাটক "য়েরনানি" সেদিন ধ্রুপদী সাহিত্য-সেবীদের সরব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অভিনীত হলো ফ্রান্সে। সেখানে তরুণ কবিদের সঙ্গে নেরভাল উপস্থিত ছিলেন। গোতিয়ে লিখেছেন, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় নেরভাল ঠিক রাত নটার সময় একবার ঐ জমজমাট আসর ছেড়ে বাড়ি গেলেন তাঁর পিতাকে শুভরাত্রি জানাতে। যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন নেরভাল প্রতিরাতে তেমনি করে তাঁকে শুভরাত্রি জানাতেন। সে রাতে নেরভালেরও পকেট ভর্তি ছিলো রক্তাক্ষরে "হিয়েরো" লেখা কাগজের মোড়কে। শোনা যায় তিনি গোতিয়েকে জিগগেস করলেন, "তুই এই বিরোধীদের কি করে জবাব দিবি?" উত্তরে গোতিয়ে চিৎকার করে বললেন, "মড়ার খুলি হাতে নিয়ে বায়রন যেমন করে নিয়্যুস্টেডের চার্চে সুরা পান করেছিলেন তেমনি উত্তর আমিও দেবো!" উত্তরে সমস্ত থিয়েটর হলের যুবক-যুবতীরা সমস্বরে ঘোষণা করলেন "স্থবিরের জন্য মৃত্যু পাঠাই!" আমরা জানি প্রভূত নিন্দাবাক্য, তিরস্কার সহ্য করেও সে রাতে য়েরনানি অভিনীত হয়েছিলো। আর এই য়েরনানি যুদ্ধে জয়লাভ করে রোমান্টিসিজম ফরাসি সাহিত্যের আরাধ্য হলো। গোতিয়ে তাঁর ইতিহাসে এই রোমাঞ্চকর, রঙিন দিনের কথা যথাযথ বিবৃত করেছেন। এইসব তরুণদের একটা আড্ডা গড়ে উঠলো "নরকের রাস্তার" এক ঘরে। সেখানে নেরভাল, গোতিয়ে ও য়ুগো ছাড়া আসতেন আরো অনেকে। আসতেন থিওফিল দোঁদে, এক যুবক, যিনি রাতে নিদ্রার সময় চোখে চশমা রাখতেন স্বপ্ন পরিষ্কার দেখবেন বলে। ঘরটা ছিলো আসলে বোরেলের। বোরেলের ছিলো মার্জারের মতো তীক্ষ্ন দাঁত, ব্যথিত তাঁর দু'চোখে তাকিয়ে থাকতেন পদতলে শায়িত স্পানিয়েল কুকুরের দিকে, দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল সুবাসিত হওয়ার ফলে মনে হতো কোনো বিদেশী পুষ্পের মতো। বস্তুত, গোতিয়ের মতে বোরেলই একমাত্র যুবক যাঁকে বলা চলে সেই যুগের যথার্থ প্রতিভূ। তাঁর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিলো সেযুগের অবিশ্বাস্য চারিত্র। প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর দাঁড়িতে, পোশাকে, রূপ-সজ্জায় ও নৈতিক চরিত্রে। বোরেলের ঘরে আসতেন, ওরলোফ কসাকদের বুট পরে, ইউজেনে

দ্যাভেরিয়া স্পেনিয় যুবকের বেশে, বুচার্দি উজ্জ্বল নীল ভারতীয় মহারাজার কোট গায়ে, আর নেরভাল সাজতেন গ্যয়টে রচিত তাঁর প্রিয় চরিত্র হের্বের্থরের পোশাকে। শুরু হ'তো এক উদ্দাম নৃত্য। যার নাম ওঁরা দিয়েছিলেন "নারকী নৃত্য"। তা সত্যিই এতো নারকীয় ছিলো যে দু-এক চক্রনৃত্যের পর ঘরের মেঝেতে দেখা যেত কবিদের দেহ শায়িত। পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে তাঁদের আবার সচেতন করা হতো। কবিরা পান করতেন কড়া রাম অন্য মদের সঙ্গে মিশিয়ে। মড়ার খুলিতে খেতেন আইসক্রীম। এরপর বোরেল শহরের বাইরে তাঁর বাড়ি নিলেন। বন্ধুরাও সেখানেই আড্ডা জমালো। তাঁদের আলোচ্য বিষয় হতো সাহিত্য থেকে রাজনীতি -সব। বিশেষত্ব হচ্ছে বাগানে যাঁরা এই আড্ডায় যোগ দিতেন সকলেই থাকতেন উলঙ্গ। প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু সমস্ত পারী সেদিন প্রতিবাদ জানালো যখন পারীর একটি বিখ্যাত অপেরা সমসাময়িক কবি গোতিয়ে, নেরভাল, বোরেল, ওর্নেড্ডি, আলফোঁস ব্রোট এবং ম্যাককীটের সম্মিলিত বাদ্যানুষ্ঠানের আয়োজন করলো। কারণ এইসব যন্ত্র এ'দের মধ্যে আসলে কেউই ব্যবহার করতে জানতেন না। পারীর বুদ্ধি-জীবীরা কবিদের এই দলের নাম দিল "ল্যো বুস্যাগো" অথবা কলহপ্রিয় দল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গোতিয়ে "লা প্রেসে" নামক খবরের কাগজকে প্রতিশ্রুতি দিলেন এই দল বিষয়ে নেরভালের একটা রচনা যোগাড় করে দেবেন। নেরভাল এই আলোচনাটি লিখেওছিলেন।

শোনা যায়, নেরভাল রচিত "কলহপ্রিয় দলের" গান উচ্চস্বরে গাইতে গাইতে পথ চলে একরাতে কবিরা পারীর শান্তি ব্যাহত করেছিলেন বলে তাঁদের হাজতবাস করতেও হয়ে-ছিলো। নেরভালকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়েছিলো স্যাঁৎ-পেলাজি জেলখানায়। তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে নেরভাল লিখলেন "রাজনীতি" কবিতাটি।

স্যাঁৎ-পেলাজি কয়েদখানায়
ধন্যরাজা রাজ্য চালায়
স্বপ্নব্যাকুল ভাবছি বসে
বন্দী আমি কোন সে দোষে।

ঠিক এইরকম অহেতুক কয়েদখানায় আটক থেকে আপোল্যনেয়ারও লিখেছিলেন কয়েকটি পর্বে একটি কবিতা। আপোল্যনেয়ারের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে নেরভালের কবিতা কতো ক্ষীণভাবে আমাদের মর্মস্পর্শ করে। কারণ হয়তো এই যে আসলে নেরভাল ছিলেন কাব্যময় গদ্যের লেখক। কবিতা তাঁর উপযুক্ত প্রকাশভূমি ছিলো না। কী প্রতীকী আন্দো-লনের যুগে, কী স্যুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের যুগে নেরভাল সেই কারণেই বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তাঁর গদ্যরচনার প্রতি। কবিতার উল্লেখ প্রায় শোনাই যায় না।

য়ুগো ও নেরভাল উভয়েই কলহপ্রিয় দলের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও দুজনেই গোতিয়ের মতে এমন একটা স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ক'রে চলতেন যে তাঁদের প্রতি অন্যান্যদের ছিলো এক গোপন, অনুচ্চারিত অভিযোগ। পোশাকের বেলায়ও তাঁরা ছিলেন অন্যান্যদের থেকে স্বাভাবিক। অথচ দুজনেই প্রত্যেকটি আড্ডা প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখে-ছিলেন। নেরভাল সম্পর্কে তবু নানা কাহিনী দীর্ঘদিন ফরাসি সাহিত্যে প্রচলিত ছিলো। সবগুলোই যে ঐতিহাসিক সত্য তা নয়। কিন্তু দু'একটির উল্লেখ প্রায় সব বিবরণেই পাওয়া যায়। নেরভাল একবার হাতের একটা পানপাত্র হিসেবে ব্যবহৃত খুলি দেখিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, "এইটি আমার মায়ের মাথার খুলি। এইটি আমার প্রয়োজন ব'লে, মাকে, আহা আমার আদরিণী মাকে নিজের হাতেই হত্যা করতে হয়েছে।" অন্য একটি সভায় বলে-

ছিলেন, খুলিটি একজন যুদ্ধমৃত দামামা-বাদকের। কবির সঙ্গে প্রায় সর্বদাই একটা রেড-ইন্ডিয়ানদের ব্যবহার্য বল্কল-তাঁবু থাকতো। বলতেন, কোথাও তাঁর রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ হ'লে তিনি এই তাঁবুই ব্যবহার করেন। রাত্রে ঘরের মেঝেয় টানিয়ে নেন তাঁর তাঁবু। তাতেই শয়ন করেন রাত্রে। কারণ তিনি নরম বিছানায় নিদ্রা উপভোগ করতে অভ্যস্ত নন। সকলেই তাঁর এই ত্রিকোণ বন্য তাঁবু দেখে অবাক হতেন। এসব ঘটেছিলো য়েরনানি অভিনয়ের দু'বছর পরে। এই সময়ই নেরভাল প্রকাশ করলেন একটি ছন্দগুচ্ছ, বলা উচিত মন্ত্রগুচ্ছ। নাম দিলেন, "গৌরবের হাত", লেখকের নাম "একজন সমর্থক"। এই পুস্তিকায় সংযোজিত হয়েছিলো এমন সব ছন্দোবন্ধ পদ যা সমবয়সী কবি ওনেদ্দির ভাষায় "বুড়োদের শিখিয়ে দিলো কি ভাবে ভালো লিখতে হয়।" অবশ্য অন্যান্য সকলের মতে নেরভাল এই রচনাগুলোয় ভবিষ্যতের ফরাসি কবিতার স্বরূপ দেখালেন। গোতিয়ের মতে, রচনাগুলোর লক্ষণ যথার্থ কিন্তু রচনাগুলো পরিণত নয়।

"য়েরনানি" অভিনয়ের চারবছর পর নেরভাল হঠাৎ কিছু বেশি পরিমাণে অর্থ পেলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। আর সেই দিন থেকেই নেরভালের দুঃখের দিন সুরু হ'লো। অর্থ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নেরভাল চললেন ইতালি। পথে পরিচয় হ'লো একজন ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে। তাঁর নাম কবি দিলেন ওক্‌টাভিয়ে। সমসাময়িক তাঁর সব লেখায় এই তরুণীর কথা কবি বারবার শোনালেন। লিখলেন তাঁর বিখ্যাত চতুর্দশপদী "দেলফিকা"। পথে মেয়েটির মুক্তোর মতো দাঁত দিয়ে আপেল খাওয়া দেখেছিলেন। দেলফিকায় সেই ঘটনার উল্লেখ করলেন। পম্পেই-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে বেড়াতে গেলেন ওক্‌টাভিয়েকে নিয়ে। ওক্‌টাভিয়ে নেরভালের চির অন্বেষণীয় আদর্শ রমণীতে উত্তীর্ণ হলেন। বস্তুত আদর্শ রমণীর চরিত্র নেরভালের সারা জীবনের ধ্যান ছিলো। ধারণাটা এসেছিলো গ্যায়টের ফাউস্ত থেকে। যখনি কোনো রমণীর সঙ্গে পরিচিত হতেন তাঁকে মিলিয়ে নিতেন গ্রেচেন বা মার্গারিটার সঙ্গে, মিলিয়ে নিতেন "তরুণ হেবর্থরের দুঃখ" উপন্যাসের নায়িকা লোটের সঙ্গে। গ্যয়টের হেবর্থর ও লোটে তখন য়ুরোপীয় যুবকদের স্বপ্নের নাম। যুবকরা হেবর্থরের মতো প্রেমের জন্য নিজেদের জীবন দিতেও ভয় পেত না। স্বয়ং নেপোলিয়ঁ গ্যয়টের বই পকেটে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যান।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নেরভাল পারীতে ফিরে বন্ধু কামুঈ রোজিয়ের ও আরসেঁ হুসেইর সঙ্গে বাসা নিলেন গোতিয়ের পাশের বাড়ি। চাকরি পেলেন, লা প্রেস কাগজে, যেখানে গোতিয়েও কাজ করতেন। গোতিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সহযোগিতা সত্ত্বেও নেরভাল স্বাভাবিক কাজকর্মে, বিশেষত নিয়মিত কাজে মন দিতে পারতেন না। কাজে অবহেলার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দুঃখজনক, আপত্তিকর উক্তিও শুনতে হ'তো। গোতিয়ের প্রতিপত্তিও নেরভালের অপরাধ ক্ষমার্হ করতে পারে নি। তখনও, ইতালি ভ্রমণের শেষেও নেরভালের পকেটে বেশ কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থাবশেষ ছিলো। আর এই সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো জেনি কোলোন-এর। নানা আসরে গায়িকা হিসেবে এই সোনালি চুলের কালো চোখের মেয়েটির তখন বেশ সুনাম। বুড়ো দুমা ও নেরভালের যুগ্ম রচনা "পিকিল্লো" নাটকে অভিনয় করে কোলোন ফরাসি দেশে তখন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। থিওফিল গোতিয়ে তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখলেন লা প্রেস কাগজে। নেরভাল ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন কোলোন-এর সঙ্গে। প্রথম থেকেই নেরভালের দৃষ্টিতে কোলোন কবির অন্বেষণীয় আদর্শ রমণীর প্রতিরূপ। শিল্প ও জীবনের বিমূর্ত প্রতীক হিসেবে নেরভাল

কোলোনকে গ্রহণ করেছিলেন। আর তারই ফলে কবিকে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা পোয়াতে হয়েছে। জেনি ভিন্ন নেরভালের আর কোনো মানসিক আশ্রয় নেই। কারণ জেনিই তাঁর রচনার ওরেলিয়া, এমন কি আদ্রিয়েন এবং অন্যান্য সব রমণীচরিত্র।

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী অভিনেত্রী-গায়িকার সঙ্গে প্রথম আলাপের মুহূর্ত থেকেই নেরভালের জীবন পরিবর্তিত হতে লাগলো। এই রমণীর জন্য ব্যয় করতে লাগলেন অসম্ভব অর্থ। অমূল্য উদ্যম এই রমণীর জন্য ব্যয় করতে লাগলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন "ল্য মোঁদে দ্রামাতিক্" বিপুল অর্থব্যয়ে। এই অভিনয়-বিষয়ক পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য হলো জেনি কোলোনের নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করা। রচনা করলেন কয়েকটি অসার্থক, ক্ষমতা-অপব্যয়ী নাটক জেনির জন্য। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে, এরপর নেরভালের কয়েকটি নাটক দর্শক ও পাঠকের প্রশংসালাভ করলো। যেমন ১৮৩৯-এ রচিত "লিও বুর্খার্ট"। এটা ভাগ্যের পরিহাস, কারণ যখন তিনি মূল্যবান নাটক লিখলেন তখন জেনি তাঁকে ত্যাগ করেছেন। অন্য একটি বিখ্যাত নাটক "লালকিমিস্ত" এই সময়েই রচিত। এতে অভিনয় করেছিলেন ইদা ফেরিয়ের। ইদা পরে দুমার পত্নী হন।

"ল্য মোঁদে দ্রামাতিক্"-এর জন্য নেরভালের বিপুল অর্থব্যয় হলো। অর্থ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগীরাও একে একে তাঁকে ত্যাগ করলেন। রইলেন অকৃত্রিম সুহৃদ, সে-যুগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান লেখক থিওফিল গোতিয়ে, কার, লাসাইল্লি এবং রোজের দ্য বোভোয়ার। আর ছবি আঁকিয়েদের মধ্যে রইলেন বন্ধু কামুঈ রোজিয়ের। শোনা যায় অল্পদিনের মধ্যেই এই পত্রিকার জন্য নেরভালের ব্যয় হয়েছিলো ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ এবং আজীবন বহনীয় ঋণভার। এমনি করে নেরভাল নিজেকে অর্থাৎ এক বিত্তবানকে নিঃশেষ করেছিলেন। নিঃশেষ করেছিলেন তাঁর পরিবারের উত্তরাধিকারীদের সৌভাগ্য। বন্ধুদের অনুরোধ করতেন জেনিকে নিয়ে কবিতা লিখতে। নিজে প্রেরণ করতেন সুদীর্ঘ আবেগপূর্ণ মূল্যবান পত্র। যে-পত্রের উত্তাপ গ্রহণ করার মতো ক্ষমতাও জেনির ছিলো না।

নেরভাল তাঁর চিঠিতে এবং বন্ধুদের কাছে বহুবার ব্যক্ত করেছেন যে তিনি জেনির সঙ্গে নারীপুরুষের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু গোতিয়ের মতে জেনি কখনো নেরভালকে বেশি আমল দেন নি। তাঁর সঙ্গে রাত্রিযাপন তো অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে গোতিয়ে নেরভাল যে রেনেশাঁ যুগের একটা বৃহৎ পালঙ্ক ক্রয় করেছিলেন জেনির সঙ্গে শয়ন করবেন বলে, তাও লিখেছেন। সেই পালঙ্কে একদিন নিদ্রা যেতেন মহামান্যা মার্গারিটে দ্য ভালয় যাঁর দিগন্তবিস্তৃত খিলানযুক্ত গৃহে এই রেনেশাঁর জাঁকজমকের স্মৃতি সহজেই শোভা পেতো। সেই পালঙ্ক নেরভালের ভাড়াটে কোঠায় বৃদ্ধার বেনারসীর মতো করুণ মনে হতো। এই পালঙ্ক নিয়ে কয়েকটি মজার গল্পও ফরাসি দেশে প্রচলিত। কয়েকটি লিখেছিলেন গত শতকের শেষে একজন থিওদোর দ্য বাঁভিঙ নামক সাধারণ ফরাসি লেখক। সেসব গল্পে নেরভালকে লৌকিক মহাকাব্যের নায়ক রোলান্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নেরভালের প্রেমপত্রগুলোতে লক্ষণীয় যে প্রেমিকের কোনো প্রকার সামাজিক বা গ্রাহ্য-নীতিবোধের যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি কোনো দায়িত্ববোধও তাঁর নেই। এই গ্রাহ্য-রীতিনীতি বোধের বিরুদ্ধাচরণ স্যুররেয়ালিস্তদের পরবর্তীকালে অন্যতম আদর্শ হলো। নেরভাল নিজেকে এই চিঠিগুলোতে প্রাচীন উপাখ্যানের বিনয়ী প্রেমিকের মতো উপস্থাপন করেছেন। সর্বত্র কেমন যেন একপ্রকারের নিবেদন, যা হীনমন্যতার পরিচায়ক। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য লম্পটশিরোমণি কাসানোভার আরক্তিম স্বাদও পাওয়া যাবে। কিন্তু একথা মনে

রাখতে হবে যে নেরভাল কখনও অশ্লীল লেখক ছিলেন না। যৌনতার সঙ্গে তাঁর যোগ নেহাত দৈবাৎ। কিন্তু এই প্রেমপত্রগুলো না থাকলে নেরভালকে পুরোপুরি বোঝা, তাঁর রচনার রহস্য উন্মোচন সম্ভব হতো না।

নেরভাল বলতেন, জেনির বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ হয় না। কখনো ভাবেন না, জেনি অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হতে পারে। নেরভাল আসলে জেনির রক্তমাংসের দেহটাকে ভালোবাসতেন না। তিনি ভালোবাসতেন একটি ধারণাকে, একটি আদর্শ রমণীর প্রতীককে। জেনি তাঁর কাছে একটি, যথার্থ, অবশ্যপ্রাপ্য প্রতীকমাত্র। এমন কথা, প্লেটোনির্দেশিত প্রেম-পন্থার কথা, তিনি জেনিকেও বলেছিলেন। আর সেই কারণে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন তিনি বলেছিলেন, "এই রেনেশাঁর পালঙ্কে আমি কতোদিন জেনিকে নিয়ে রাত্রিযাপন করেছি"। বুঝতে অসুবিধে হয় না কেমন করে, জেনির মতো সাধারণ রমণীর কাছ থেকে নানা অপমান পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি জেনির মৃত্যু পর্যন্ত, নিজের আত্মহত্যা পর্যন্ত তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। প্রুস্তের উপন্যাসেও আমরা দেখেছি মার্সেল ও গীলবার্ত-এর মধ্যে এই ধরনের অলৌকিক সম্পর্ক। সেখানে মার্সেল, বিনীত ক্রীতদাস আর গীলবার্ত, মধ্যযুগীয় সুন্দরী ললনা। যদি আমরা এই নারীপুরুষের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি তবে দেখবো এইসব স্বপ্নপ্রিয় রচয়িতাদের অবচেতন মন সর্বদা দ্বিধাবিভক্ত। নেরভালের মতো প্রেমিকরা শেষপর্যন্ত মৃগীরোগাক্রান্ত বা নিপীড়নকারী হয়ে ওঠেন। এবং প্রেমিকারা ক্রমাগত সবরকম নিষেধে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। একজন হন উপকথার স্যাটায়ার অন্যজন নিম্ফ। নেরভাল এই দুই গ্রীক চরিত্রের প্রতি বহুবার নিজের আত্মিক আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেছেন। ফলে সর্বদা অপ্রাপ্যর অসন্তোষে তাঁদের জ্বলতে হয়। আমরা নেরভালে তাই দেখবো, দেখবো মার্সেল প্রুস্তে। যাই হোক একথা অনস্বীকার্য যে জেনি কোলোনের প্রভাব নেরভালের ওপর ছিলো অসীম ও অনতিক্রমণীয়। যখনি নেরভাল জেনির উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অসমর্থ হলেন, জেনি নেরভালকে ত্যাগ করে একজন বাঁশিবাদককে বিবাহ করলেন। নেরভাল পালালেন জর্মানিতে।

নেরভালের পক্ষে এই পলায়ন দুটো কারণে মূল্যবান। প্রথমত, জর্মানিতে যাবার ফলে নেরভাল আরো প্রগাঢ়ভাবে হফমানের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। এমন কি তাঁর উপন্যাস ওরেলিয়ার নাম পর্যন্ত নেরভাল পেলেন হফমানের "সেরাপিয়নস ব্রুডের" থেকে। দ্বিতীয়ত, অস্ট্রিয়ায় ভ্রমণ করার সময় নেরভাল পরিচিত হলেন মারী প্লেয়েল-এর সঙ্গে। আর এক-মুহূর্তে নেরভাল তাঁকে অন্বিষ্ট আদর্শরমণী বলে চিনতে পারলেন। তাঁর নাম দিলেন প্যানদোরা। গ্রীক উপকথার সেই আশ্চর্য রমণীর নাম দিলেন এই প্লেয়েলকে।

ইতিমধ্যে নেরভাল পৌঁছুলেন ভিয়েনা। সেখানে রাত্রিযাপন করলেন এক মোটাসোটা সুন্দরী মহিলার সঙ্গে। যার নাম যথার্থ কারণেই কাতেরিনা কোলোসা। নেরভাল নাম দিলেন লা কান্তি। এবং নেরভাল এই রমণীর মধ্যে, নিঃসন্দেহ হলেন, কোনো আদর্শরমণীর ছায়ামাত্র নেই।

১৮৪০-এ ফিরলেন আবার পারীতে ফাউস্তের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ আরম্ভ করবেন বলে। এই সময় থেকেই তাঁর অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হিসেবে দেখতে লাগলেন সর্বদা সর্বত্র ফাউস্তের কুকুর। বন্ধুরাও লক্ষ্য করলেন নেরভালের মধ্যে একটা পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বন্ধুদেরই পরামর্শে নেরভাল দেশভ্রমণে গেলেন বেলজিয়ম। যখন ফিরলেন তখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি। তখন "একরাত্রে", গোতিয়েকে লিখছেন, "জেরাদির

প্রচণ্ড জ্বর হলো। ও ছটফট করলো খুব।” তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো কাছেই একটা মানসিক চিকিৎসালয়ে। তার পরদিন পাঠানো হলো ডঃ এসপ্র্যাৎ ব্লাসের বড়ো মানসিক চিকিৎসালয়ে। দীর্ঘ আট মাস সেখানে বাস করার পর চিকিৎসকদের মতে তিনি সুস্থ হলেন। তাঁর তখন অসুস্থ থাকাকালীন সব ঘটনা মনে পড়ছে। অথচ সেইসব ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারছেন না। অর্থাৎ তিনিই যে ঐসব ঘটনার জন্য দায়ী তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর এই সময়ের ইতিহাস “ওরেলিয়া” ও “ল্যা রেভ এ লা ভি”তে পাওয়া যায়। তাঁর মতে পাগলাগারদে সময়ের কোনো অর্থ নেই। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব একাকার হয়ে গেছে। এবং তাঁর বিশ্বাস সেই অবস্থায় তিনি যে-সব দৃশ্য দেখেছেন, চোখের সামনে ও মনে মনে সব মাত্র তিনিই দেখেছেন। জগতে অন্য কোনো মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দেখেনি। এবং এসব কাহিনী তাঁর লেখা উচিত অন্যান্যদের জন্য। এরই ফলে রচিত হ'লো ওরেলিয়া। স্বপ্নের দ্বারা অধিকৃত, আইওন বা ফের্দাসের স্বর্গীয় উন্মাদনায় বশীভূত, নেরভাল যেন পরিবর্তিত হলেন এক দৈববাণীতে। আপন সত্তাকে সচেতন বা অচেতন ভাবে দূর ক'রে লিখে চললেন অন্তর্নিহিত কথা, স্বপ্নের জগতের কথা তাঁর অবিস্মরণীয় উপন্যাসে। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্নের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য, অন্তত ওরেলিয়া লেখার জন্য এই সেদিনের স্যুররেয়ালিস্তরা এমন কি তার পূর্ববর্তী দাদাইস্তরা-ও নেরভালকে অনুকরণীয়, অনুধ্যারণীয়, পতিত, শিল্পের দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আঁদ্রে ব্রেতো এই রচনাকেই বলেছেন, “নিদ্রার কারুকাজ”। অন্যজন পীয়ের রেভের্দি লিখেছেন, “স্ফটিক অঙ্গুলির প্রলাপ।” এই স্বপ্নের কথাই বলেছেন নেরভাল তাঁর ওরেলিয়া উপন্যাসে। ওরেলিয়ার আরম্ভে আছে :

“স্বপ্ন আমাদের দ্বিতীয় জীবন। আমি ভয়ে না কেঁপে কখনো রুপোলি দরোজায় ঢুকতে পারি না। এই সেই রুপোলি দরোজা যা আমাদের অদৃশ্য জগৎ থেকে পৃথক করে রেখেছে। নিদ্রার প্রথম মুহূর্তগুলি মৃত্যুর প্রতীক। একটা গভীর বোধহীনতা আমাদের ভাবনা গ্রাস করে। আমরা বুঝতে পারি না, কখন, কেমন করে আমাদের আমিত্ব নূতনরূপে বাঁচার চেষ্টা করছে। ক্রমে ক্রমে একটা অস্পষ্ট গহ্বর আলোকিত হতে থাকে এবং নরকবাসী পাণ্ডুর মৃত্যুপ্রতিম স্থবির মূর্তিগুলি তাদের ছায়া আর রাত্রি থেকে দূরে সরে যায়। তারপর ছবি ফোটে। নূতন আলোয় ঝলমল করে, সচল হয়ে ওঠে এই অদ্ভুত ভৌতিক মূর্তিসব। আমাদের চোখে অশরীরী জগৎ দৃশ্যমান হয়।

“স্যোয়েডেনবোর্গ এই অলৌকিক অস্তিত্বের নাম দিয়েছেন, মেমোরাবিলিয়া। এইভাবে মানুষের আত্মা বিশ্লেষণের দুই কাব্যিক নিদর্শন হচ্ছে—আপুলিয়ুসের, সোনালি গর্দভ এবং দান্তের, স্বর্গীয় মিলন। তাঁদের অনুসরণ করে আমি আমার আত্মার রহস্যময় জগতে যে সুদীর্ঘ রোগযন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম, সে-কথাই আজ লিখতে চাইছি। অবশ্য বুঝতে পারছি না, কেন যে 'রোগযন্ত্রণা' শব্দটি ব্যবহার করলাম; কারণ আমার দৈহিক স্বাস্থ্য যদি বিবেচনা করি তবে সে-রকম ভালো আমি আর কখনো ছিলাম না। কখনো কখনো মনে হয়েছে আমার শক্তি, উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। যেন মনে হয় সবকিছু জানি, সব-কিছু বুঝতে পারি। আমার কল্পনা, আমাকে অশেষ আনন্দ দিয়েছে। তবে কি মানুষ যাকে যুক্তি বলে, তা ফিরে পেতে হলে আমাকেও ঐসব অমল আনন্দ বিসর্জন দিতে হবে?”

উপন্যাসখানি এই ভাষায় রচিত। উপন্যাসের শেষে নেরভাল লিখছেন, যে ভয়াবহতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে, এই দুঃখময়, আনন্দময় জীবনকেই প্রাচীন

লেখকরা বলেছেন নরকদর্শন, যে-নরকদর্শন স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেও করতে হয়েছিলো, দান্তে তাঁর স্বর্গীয় মিলন গ্রন্থে যে নরকের কথা লিখেছেন। বস্তুত নেরভাল ইতালির দান্তে ও জর্মনির গ্যয়টের ফরাসি উত্তরাধিকারী।

খুব ধীরে নেরভাল আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন। এবং মাঝেমাঝে কিছু রচনাও করছিলেন ১৮৪২-এ জেনি কোলোনের মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর জেনির মৃত্যুসংবাদ পাওয়া-মাত্র সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। পারী ত্যাগ করে চললেন পূর্বদেশে। অনেকদিন ধরে অনেক ফরাসি লেখক কখনো ব্যক্তিগত, কখনো রাজনৈতিক, কখনো শিল্পের কারণে পূর্বাঞ্চলে আত্মগোপন করেছেন। গোতিয়েও এসেছিলেন, এসেছিলেন ফ্লোবেয়র। কন্সতান্তিনোপলে নেরভালের সঙ্গে দেখা হলো পুরানো বন্ধু কামঈ রোজিয়েরে। তিনিও প্রেমিকার মৃত্যুশোক ভুলতে গিয়েছিলেন সেখানে। নেরভাল প্রথম কায়রোতো বসবাস শুরু করলেন। জুল জানিন এই সময়কার কথা লিখেছেন। কায়রোর পুরানো জিনিসের বাজারে ঘুরে ঘুরে নেরভাল কিনতেন অদ্ভুত সব জিনিস। কিনতেন, কখনো কোনো পুরানো রঙ উঠে যাওয়া ছবি, কোনো কাঠের টুকরো, পুরানো ধাতব মুদ্রা এবং কিনেছিলেন আর একটি বিপুলায়তন পালঙ্ক। পালঙ্কে তিনি শুতে পারতেন না। কারণ পালঙ্ক ক্রয় করে গদি কেনার মতো অর্থ তাঁর আর ছিলো না। কয়েকদিন পরেই নেরভালের মনে হলো কায়রোর আকাশের নিচে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন নৈতিক পাপ। গেলেন ক্রীতদাসদাসী বিক্রয়ের হাটে। কিনলেন, রূপ বিবেচনা না করে, দয়াপরবশত, একটি জাভাদেশীয় মেয়েকে। যার হাত, চোখের পাতায় ছিলো রঙ, দৃঢ়, তীক্ষ্ম স্তনযুগলে ছিলো উল্কি আঁকা আর বাম নাসিকায় বড়ো ছিদ্র। নাম জেনাব। কিন্তু তার সঙ্গে রাত্রিযাপন নেরভালের পক্ষেও অসম্ভব হলো। কারণ প্রতি রাত্রে জেনাব তাদের বিছানায় কাঁচা পেঁয়াজ ছড়িয়ে রাখতো যাতে তাকে কোনো দানোয় না পায়, নিদ্রা হয় নিশ্চিন্তে। নেরভাল বন্ধু গোতিয়েকে লিখলেন, "আমি জানি তুমি এই প্রাচ্যদেশীয় রমণীদের নিয়ে রাত্রিযাপন করতে ভালোবাসো, আর তাই আমার এই জেনাবকে আমি তোমাকে উপহার হিসেবে দিতে চাই।" গোতিয়ে এই উপহার গ্রহণ করতে অপারগ বলে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দিলেন।

পশ্চিমদেশে নেরভাল আবার খুঁজতে লাগলেন তাঁর আদর্শরমণী। লেবাননে এসে পেলেন স্থানীয় মোড়লের কন্যা সালেমাকে। নেরভাল যদিও জানতেন বিবাহিত জীবন তাঁর পক্ষে বরণীয় নয় তবু সালেমাকে তিনি বিবাহ করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু কিছুদিন পর হঠাৎ আক্রান্ত হলেন জ্বরে। চলে আসতে হলো কন্সতান্তিনোপলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। নেরভালের মতে এই অসুস্থতাই তাঁকে রক্ষা করেছে বিবাহ থেকে। যে-বিবাহ তাঁর পক্ষে ছিলো অত্যন্ত অসম্ভব। শারীরিক ও মানসিক উভয় কারণেই। চিঠি লিখলেন মোড়লকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে। সালেমার প্রতি কর্তব্য হিসেবে জেনাবকে পাঠালেন সালেমার কাছে, তার সহচরী হিসেবে।

সুস্থ হবার পর ফ্রান্সে ফিরলেন। আর ব্যবহার করতে লাগলেন তাঁর বর্তমান নাম, যে-নামে আজ তিনি আমাদের কাছে পরিচিত। ১৮৪৪-এ আবার গেলেন হলান্ড, গেলেন ইংলন্ড। পরের বছর গেলেন আবার জর্মনিতে। ফিরে এসে লিখতে লাগলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "প্রাচ্যে যাত্রা"-র অধ্যায়গুলো। এই পলায়নী গ্রন্থ ফরাসি রোমান্টিকদের কাছে কতো মূল্যবান হয়েছিলো তা প্রায় সবাই জানে। সবাই জানে বোদলেয়ার তাঁর "সিথেরা-যাত্রা" পর্যায়ের তিনটি কবিতা, মালার্মে তাঁর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন এই

গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। বস্তুত রোমান্টিক কাব্যভাবনায় যে পলায়নের কথা আমরা বহুবার শুনি তার প্রথম নিদর্শন হিসেবে হাইনরিশ হাইনের "বিমিনি" ও নেরভালের "প্রাচ্যে-যাত্রা" স্মর্তব্য। নেরভাল তাঁর প্রমত্ত মন ও সীমিত কাব্যক্ষমতা নিয়েও এইসব নানা কারণে রোমান্টিক, দাদাইস্ট, বা স্যুররিয়ালিস্ট কবির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নেরভাল সেইরকম কবি যাঁরা নিজেরা ভালো কবিতা না রচনা করেও অনেক ভালো কবির জন্ম দেন। এঁদের কথাই জীবনানন্দ তাঁর "কবিতার কথা" বইয়ে লিখেছেন। নেরভালের এই গ্রন্থ প্রকাশমাত্র ফরাসিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলো। তার আপাত কারণ হচ্ছে, নেরভালের সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্যের মানুষদের কাছে কায়রো বা তার চারপাশের দেশগুলো মাত্র ভৌগোলিক নামবিশেষ। নেরভালের বইয়ে তাঁরা পেলেন, ভূগোলের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা এক-একটা শহর। সেখানকার জীবন, দাসদাসী ক্রয়বিক্রয়ের হাট, রহস্যময় হারেম, মানুষের নৈতিক ও ব্যবহারিক চরিত্র।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নেরভাল আবার ফিরলেন নাটকে। আশ্চর্য লাগে, নেরভালের মতো সচেতন, সংবেদনশীল কবিও কেন বুঝতে পারেননি নাটকের প্রতিভা বা ক্ষমতা তাঁর নেই। এমন কি জেনির সঙ্গে ব্যর্থ হয়েও অন্তত তাঁর পক্ষে এই সত্য আবিষ্কার করা স্বাভাবিক ছিল। ভারতীয় নাট্যকার শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক" নামক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করলেন নেরভাল "শিশুর রথ" নামে। মারী লোরের মতো বিখ্যাত অভিনেত্রী অভিনয় করা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত এই নাটকও চললো না। অথচ পরবর্তীকালে লুনে-পোয়োর পরিচালনায় পারীর থিয়েটারেই এই অনুবাদ নাটক প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছে। নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুজান্ দেস্প্রে আর মঞ্চসজ্জায় ছিলেন জগৎ-বিখ্যাত তুলুজ-লোত্রেক।

পরের বছরই নেরভাল আবার অসুস্থ হলেন। যেতে হলো মানসিক হাসপাতালে। একবছর পর হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরলেন নূতন উদ্যমে লেখার জন্য। লিখলেন "লিমাজিয়ের দ্য হারলেম" নাটক, লিখলেন "ল্যে ইলুমিনে," গদ্যগ্রন্থ। যাতে ফ্রান্স ও ইতালির সব বিখ্যাত উন্মাদ, অর্ধোন্মাদ লেখকের কথা আছে। এই সময়ই নেরভাল হাইনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। হাইনের অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। হাইনে তখন পারীতে বসবাস করছেন। হাইনের পত্নী ম্যাথিলডের সঙ্গেও নেরভালের বেশ শোভন একটা সৌহার্দ হয়েছিলো। ম্যাথিলডের ছবির অ্যালবামে নেরভাল একটা ছোটো কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। একথা বোধহয় না উল্লেখ করলেও চলবে এইসব নাটক বা গদ্যরচনা নেরভালকে আর্থিক প্রাচুর্য দেয়নি।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের অগস্ট মাসে নেরভালকে পুনরায় যেতে হলো ডাক্তার এমিল ব্লাসের কাছে। ডাক্তার ব্লাসে ভিন্ন অন্য কোনো চিকিৎসকের প্রতি কবির কোনো আস্থা ছিলো না। পরের বছর মে মাসে নেরভাল আবার ভালো হয়ে ছাড়া পেলেন। হাসপাতাল থেকে অসম্পূর্ণ "ওরেলিয়া"র পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলেন। চিকিৎসকের মতে তখনও নেরভাল সম্পূর্ণ সুস্থ নন। অথচ তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে চিকিৎসক কবিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই বছরই অগস্ট মাসে তাঁর বিখ্যাত গল্প "অগ্নিশিখার কন্যারা", "সিলভি"র সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয় এবং ফরাসি সাহিত্যে নেরভালের আসন পাকাপাকি নির্ধারিত হয়। বইটি প্রকাশের পর তাঁকে পুনরায় হাসপাতালে অন্তরীণ করা হয়। আর সে বছরের অক্টোবর মাসে নেরভালকে শেষবারের মতো হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এতোদিন তাঁর বন্ধুরা ও গুণমুগ্ধেরা বুঝতে পেরেছেন যে নেরভালের এই অল্পস্বল্প

মানসিক অসুস্থতা এবারে দুরারোগ্য মানসিক রোগে পরিণত হয়েছে। এবং সম্ভবত তাঁর আর পরিত্রাণের পথ নেই। একদিন নীল সুতোয় একটা গলদা চিংড়ি বেঁধে নেরভালকে রাজ-প্রাসাদের বাগানে ভ্রমণরত দেখা গেল। জিগগেস করলে জবাব দিলেন, "প্রথমত, গল্‌দা চিংড়ি কুকুর বা বেড়ালের মতো চেঁচামেচি করে না; দ্বিতীয়ত, এরা গভীরের রহস্য, অতলের রহস্য জানে, তাই আমি গল্‌দা চিংড়ি নিয়েই ভ্রমণ করতে ভালোবাসি"। এই ঘটনা ও ব্যাখ্যা সাহিত্যে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। জেমস জয়সও তাঁর "স্টেফান হেরো"-তে এর উল্লেখ করেছেন। নেরভালের আরো অনেক পাগলামি সাহিত্যে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। নের-ভালের অভ্যেস ছিলো রেস্তোরাঁয় গিয়ে পয়সা দিয়ে টস্‌ করার এবং চিড়িয়াখানায় কোনো জলহস্তী দেখলেই নিজের টুপি তার মাথায় ছুঁড়ে দেবার। গীরাদো তাঁর নাটকের অনেক চরিত্রেরই এইসব অভ্যেস দেখিয়েছেন।

এতৎসত্ত্বেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, তখন পর্যন্ত নেরভাল যা কিছু রচনা করেছেন সবই আংশিক, অসম্পূর্ণ। "দুঃসাহসী বাউণ্ডুলে" যাতে তিনি সাহিত্য-সমাজ বিষয়ক তাঁর বিচ্ছিন্ন মতপ্রবাহ লিখেছেন অথবা দু-একটি জর্মন নাটকের অনুবাদ করলেও নেরভালের তখন দিনের অধিকাংশ সময় কাটতো ছিন্ন পোশাকে, ক্ষুধার্ত, শীতে কম্পমান অবস্থায় পারীর পথে পথে। বাস করতেন সস্তা হোটেলে বা ধরমশালায়। তাও অর্থাভাবে বদল করতেন প্রত্যহ। তাঁর বন্ধু শার্ল আসেল্যোনো বলেছেন, নেরভালের হোটেল বা বাস-স্থান এতো দ্রুত পরিবর্তন করার পেছনে অর্থাভাব ছাড়াও বড়ো কারণ ছিলো চিকিৎসক ব্লাসেকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছে। অথচ নেরভালের শেষদিনগুলোতে ডাক্তারকে লেখা চিঠি-গুলোতে দেখা যায় ডাক্তারের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিলো। সেই চিঠিগুলো নেরভালের জীবনীরচয়িতাদের মূল্যবান উপাদান। নেরভাল এখন আর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করেন না। কারণ নিজের দুঃখ, যন্ত্রণা তিনি অন্যদের কাছে, বন্ধুদের কাছেও প্রকাশ করতে চান না। তখনকার নিজের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন, "আমি যেন একটা আহত জন্তু। ক্রমাগত নির্জনতায় পালিয়ে যাচ্ছি যাতে অন্য কেউ আমার অভিযোগ শুনতে না পায়।" কিন্তু প্রায় প্রত্যহ রাত্রিশেষে দেখা হতো প্রহরারত পুলিশের সঙ্গে। পুলিশ প্রশ্ন করতো, "কে তুমি?" উত্তর পেত, "আমি শ্রীযুক্ত জেরার্দ দ্য নেরভাল।" "কী করছো?" উত্তর হতো, "স্বপ্ন দেখছি!" এই সময় নেরভাল পারীর ভিখারীদের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটাতেন।

নেরভালের শেষদিনগুলোর বিষয়ে যে-সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মিল থেকে গরমিলই বেশি। তবু মোটামুটিভাবে অনেকগুলো বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। যেমন, মৃত্যুর একদিন আগে নেরভাল মেরীর বাড়ি গিয়ে তাঁকে ডেকেছেন; না পেয়ে একটা ধাতব মুদ্রার উপর আঁচড় কেটে ক্রশ এঁকে রেখে এসেছেন তাঁর কষ্টের প্রতীক হিসেবে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তিনি এক অসম্ভব সুন্দর চিঠি তাঁর মাসীকে লিখলেন। তাঁর দুঃখের সঙ্গে, শারীরিক কষ্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই চিঠি হলো সহজ ও উত্তপ্ত, আর্ত ও আহ্লাদিত।

পরদিন নেরভাল আসেল্যোনোর কাছে সাতটা স্যু ধার নিলেন। বেশি নিলেন না, কারণ একরাতের ধরমশালার ভাড়ার অধিক তাঁর প্রয়োজন নেই। সে-রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিলো। রাস্তায় তুষার ঝরছিলো। অথচ নেরভালের দেহে বস্ত্র ছিলো নামমাত্র। ভোররাতে তাঁর সঙ্গে প্রহরীর সাক্ষাৎ হলো। তারপর ঘুরে বেড়ালেন নানা নোংরা গলিতে, শাতেলোর

প্রাসাদের আশেপাশে, যেখানে বর্তমানে অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ট-এর নামে থিয়েটর হল হয়েছে। এই রাস্তাটা নেরভালের প্রিয় ছিলো। কারণ এখানেই এক দোকানী খদ্দের আকর্ষণের জন্য দোকানের সামনে রেখেছিলো একটি মিশরীয় মমি। ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন একটি ধরমশালার দরোজায়। রাতটা ঠাণ্ডা বলে কেউ দরোজা খোলেনি। প্রভাতে কয়েকটি মালী কবি নেরভালের মৃতদেহ আবিষ্কার করলো। মৃতদেহটা ঝুলছিল রাস্তার একটা রেলিং থেকে। মেয়েদের কটিবন্ধনী ব্যবহার করেছিলেন। বলতেন, কটিবন্ধনীটি আসলে ছিলো সেবার রানীর। মৃতদেহের মাথার আকাশে উড়ছিলো একটা দাঁড়কাক। চিৎকার করে একঘেয়ে সুরে বলছিলো—“আমি তৃষ্ণার্ত!” দাঁড়কাকটি নেরভালের পোষা। এই কথাটুকু নেরভালই তাকে অতি যত্নে শিখিয়েছিলেন। নেরভালের পকেটে ওরেলিয়ার শেষ পৃষ্ঠাগুলোর পাণ্ডুলিপি ছিলো। ২৬শে জানুয়ারী মর্গের রিপোর্টে জানা গেল, নেরভাল, আত্মহত্যা করেছেন।

অবশ্য এখনো অনেকের ধারণা নেরভাল আত্মহত্যা করেন নি; তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো। অবশ্য আমরা জানি পারীর ক্যাথলিক চার্চ তাঁর মৃতদেহ বিধিবদ্ধ সৎকারের আদেশ দিয়েছিলেন, যা একমাত্র স্বাভাবিকভাবে মৃত সত্যিকারের খৃষ্টানদেরই প্রাপ্য। ভেরলেনের মৃত্যুর পরও এমনি আলোচনার ঝড় উঠেছিলো ফরাসি দেশে।

২

নেরভালের প্রথম কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো যখন তিনি নিতান্ত কিশোর। অধিকাংশ কবিতার বিষয় ছিলো রাজনীতি ও ফরাসি দেশের, বীর ফরাসি জাতির জয়গান। এইগুলো একত্রিত করে নাম দিলেন, “জাতীয় এলেজি”। এর পরের রচনাই গ্যয়টের ফাউস্তের প্রথম খণ্ডের ভাষান্তর। গ্রেচেনের চরকা কাটার গান তাঁর মনমতো হওয়ায় বহু জায়গায় অনুবাদ কবিতা হিসেবে ছাপিয়েছেন। একারমানকে গ্যয়টে বলেছিলেন, “এই দৈবশক্তিসম্পন্ন শিশু কবি একদিন ফরাসিদেশের অন্যতম লেখক হবেন।” ভাষান্তরে তিনি এমনই মগ্ন হয়েছিলেন যে ১৮২৯ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত সময়ে তিনি অন্তত পাঁচবার ভাষান্তর করেছেন আর একজন জর্মন লেখক, বুরগার-এর একটি গাথা। অনুবাদ করেছিলেন, ক্লোপস্টোকের, শিলেরের, হাইনের কবিতা। যে-অনুবাদের নিন্দে করেছিলেন গ্যয়টে। “ষোড়শ শতকের কবিকুল” নামে একটা কাব্যসংকলন করলেন তখনই রোঁসার্দ, দ্যু বেলে এবং প্লেইয়াদের আরো কয়েকজনের কবিতা নিয়ে। এঁরা সকলেই কোনো না কোনো উপায়ে নেরভালের কাব্যধারায় প্রভাব ফেলেছিলেন। অথচ “দুঃসাহসী বাউণ্ডুলে” গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে এঁদের সম্পর্কে তাঁকে অত্যন্ত নিরপেক্ষ সমালোচকের ভূমিকাতেও দেখা যায়। বেন জনসন উদ্ধৃতি দিয়ে এঁদের সম্পর্কে বলেছেন, “এঁরা প্রদর্শক কিন্তু পরিচালক নন।”

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ‘য়েরনানি’র অভিনয় দেখে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তিনিও নাটক রচনায় প্রেরণা পেলেন। “ওদেলেত্তে” লেখার সময় স্বেচ্ছায় তিনি রোসার্দকে গঠনরীতির জন্য অনুকরণ করলেন। যেহেতু তখন ফরাসিদেশে কেউ আর পুরানো রীতিতে কিছু রচনা করেন না, সুতরাং নেরভালের এই নাটক অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করলো। অবশ্য আমরা জানি তাঁর নাটক রচনার পেছনে আর একটি আবশ্যিক কারণ ছিলো জেনি কোলোনের প্রতি আসক্তি। অথচ তাঁর নাটক রচনার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিলো না বলে কেবল

"লিও বুর্খার্ট" ব্যতীত অন্য কোনোটাতেই সার্থক হতে পারেননি।

"লিও বুর্খার্ট" নাটকটির বিষয়ও জর্মানির "স্টুর্ম উন্ড ড্রাংগ" সময়ের, শিলেরের তরুণ বয়েসের, রাজনীতিভিত্তিক। এই নাটকের অন্তত কয়েকটি দৃশ্য অসাধারণত্বের দাবি করে। যেমন, যে-দৃশ্যে ছাত্রদের বিচারশালা লিও-এর মৃত্যুদন্ডাদেশ জারি করছে। লিও, আসলে বিচারক ছাত্রদেরই দলভুক্ত। ছদ্মবেশী। ফলে অন্ধগোঁড়া ছাত্রনেতা আদর্শবাদী ফ্রান্ৎস্ লেহবাল্ড-কে যখন লিওকে হত্যা করতে পাঠানো হলো তখন ফ্রান্ৎস্ নিজেকেই হত্যা করলো। লিও-র চরিত্রও অসাধারণ। আদর্শগত ভাবে বিপ্লবী। যাঁকে বলা হয়েছিলো, জোর করা হয়েছিলো তাঁর আদর্শগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে, যাতে তিনি বুঝতে পারেন রাজনীতির কতো ফাঁক আছে, রাজনীতি তাঁর পক্ষে কতোখানি অসম্ভব ব্যাপার। পক্ষান্তরে ফ্রান্ৎস্ তার প্রেম, লেও-র পত্নী মার্গারিটের প্রতি তার প্রেম এবং নিজের বিপ্লবী আদর্শের দোলাচলে পর্যুদস্ত। মনে হয় ফ্রান্ৎসের চরিত্রটি একটু বেশি রোমান্টিক, একটু বেশি ভাবালু।

নেরভালের প্রথম রোগাক্রমণের পর, প্রাচ্যদেশে ভ্রমণের পর, তিনি লিখলেন "প্রাচ্যেযাত্রা"। গ্রন্থটি পাঠ করে থিওফিল গোতিয়ে লিখলেন, "এই গ্রন্থ আদরণীয়, ভালোবাসবার মতো, যেমন আকাশ এবং আলোর মালা।" ভ্রমণের রোমাঞ্চ ছাড়াও গ্রন্থটির অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে এর অনিন্দ্য গদ্য, স্বর্গের চিহ্ন মর্তের প্রতীকে ধরার প্রয়াস।

এই সময় থেকেই নেরভালের অনেক কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে নানা পত্রিকায়। কবিতা ছাড়া এই সময়কার দুটি রচনা তাঁর সুনাম অর্জনের সহায়তা করেছিলো। দুটোই আত্মজীবনীমূলক। "দুঃসাহসী বাউন্ডুলে" গ্রন্থের একটা অংশ যাতে তাঁর পারীর জীবন লিপিবদ্ধ আছে; অন্যটি "জর্মানির স্মৃতিচিহ্ন" গ্রন্থ, যাতে তাঁর জর্মানির দিনের কথা লিখেছেন। অবশ্য নেরভালের প্রথম সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর রচনা "সিলভি" নামক নভেলটি। এইটিই বোধকরি ফরাসি ভাষার অন্যতম গ্রাম্য পরিবেশের কাহিনী। "সিলভি" পাঠেই হাইনে নেরভালের সঙ্গে আলাপ করতে চান। "সিলভি"-র বিষয় হচ্ছে লেখকের কৈশোরে তাঁর খুড়োর কাছে ভালয় থাকাকালীন নানা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ঘটনা। উপন্যাসের অসামান্য অন্তরঙ্গতা, সিলভির দুঃখ, জীবনের প্রয়োজনে সময়ের ব্যবহার, সময়ের কালক্রমকে অস্বীকার ইত্যাদি রচনাটিকে জগতের অন্যতম অপ্রাপ্তবয়স্কের আত্মজীবনীর সম্মান দিয়েছে। এই রচনাটি এতো পবিত্রতায় পুণ্যস্নান করতে পেরেছে, কারণ উপন্যাসের লিখনভঙ্গীতেও নেরভালের নিরভিমান আত্মার স্পর্শ পৌঁচেছে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে. সিলভি, এমিলিও অন্যান্য গল্প একত্রে "অগ্নিশিখার কন্যারা" নামে প্রকাশিত হয়। "এমিলি" নেরভালের অন্যান্য গল্পের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন ধরনের। গল্পের কাঠামো অত্যন্ত নিপুণ। মেরিমি অথবা মোপাসাঁর মতো। অথচ এখানেও আত্মহত্যার ভাবনা গল্পের মূল বিষয়কে তাড়না করে ফেরে। অবশ্য নেরভালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা ওরেলিয়া লেখকের জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর আত্মহত্যার পর উপন্যাসের শেষখন্ড লেখকেরই পকেটে পাওয়া যায়। মনে হয় মৃত্যুর দু-একদিন আগেই উপন্যাসটির শেষ অংশ রচিত হয়েছিল। গোতিয়ে এই উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন, "অপ্রকৃতিস্থতাই এই গল্পে নিজের কথা বলেছে," যে-কারণে স্যুরেয়ালিস্তরা "ওরেলিয়া"কে আদর্শ বলে মনে করেছেন। উপন্যাসের মূল বিষয় হচ্ছে নেরভালের ওরেলিয়ার প্রতি অসার্থক ভালোবাসা। ওরেলিয়া প্রায় সব বিশেষজ্ঞের মতেই জেনি

কোলোন। আর এখানেই প্রকাশিত হয়েছে নেরভালের বিশৃঙ্খলার জগতে আত্মিক যাত্রা। ওরেলিয়া আবশ্যিক প্রয়োজনে লেখকের নিকট বিরাজিচে। কিন্তু গ্রেচেন নয়। সে নেরভালের কাছে উৎসর্গীকৃত কুমারী, আবহমানকালের মাতা। তাই সম্প্রতি সেবিলোত্তে তাঁর নেরভাল বিষয়ক গ্রন্থে লিখেছেন, "অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে 'ওরেলিয়া'য় ঈদিপাস কমপ্লেক্স কাজ করেছে অমোঘভাবে। এই স্বপ্ন ও বাস্তবের আলো-আঁধারিতে স্বপ্ন ও বাস্তব উভয়ই প্রবলভাবে উপস্থিত। বাস্তব জীবনের প্রতীকে দেখি, জেনির প্রতি লেখকের এক অনির্বচনীয় যৌন তৃষ্ণা। আর স্বপ্নের জীবনের প্রতীকে তাই পরিবর্তিত হয়েছে পারত্রিক তৃষ্ণায়। অন্যান্য মরমী লেখকদের মতো, বিশেষত হফ্‌মান্‌-এর মতো নেরভালের ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়াতীত ও ছদ্ম-ইন্দ্রিয়াতীত ভাবনাই তাঁর প্রধান উদ্দীপিত আবেগ ও প্রেরণা। ভৌতিক জগতের দৃশ্যগুলির সঙ্গে তিনি সহজেই যেমন বাস্তবের প্রতীক মিলিত করতে পারেন তেমনি কখনোই তাঁর ভৌতিক জগতে বিপর্যয় ঘটানোর জন্য বাস্তব চৈতন্য হানা দেয় না। আর এমনি করেই নেরভালের স্বপ্নের প্রতীকগুলি তাঁর বাস্তবের প্রতীকগুলির অর্থাৎ স্মৃতির উন্মোচন ঘটনায়। যেমন আমরা দেখলাম মার্সেল প্রুস্তের উপন্যাসে।"

নেরভালের ওরেলিয়া, ফলে, আমাদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে উপন্যাসের বিষয়-বৈশিষ্ট্যে। একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, ভয়াবহ সঙ্গহীন এক অপহৃত অজানিত জগতের পথে পথে হেঁটে বেড়ায় এই উপন্যাসে। যেখানে পথের প্রস্তরখন্ডও তাঁকে তিরস্কার করে আর অন্ধকারে অবয়বহীন কণ্ঠস্বর আর্তনাদ করে প্রতিবাদে, অনীহায়, তৃষ্ণায়। পাঠ করতে গিয়ে মনে হয় ওরেলিয়া উপন্যাসে যেন নেরভাল আমাদের ধমনীর রক্তবহনক্ষমতাকে স্তব্ধ করে দেবেন। এই উপন্যাস তেমনই সময়াতীত যেমন বোদলেয়ারের ও ভেরলেনের নগর বিষয়ক কবিতাগুলো। কে জানে আরো কতো যুগ এইসব কবিদের শহরগুলো আমাদেরও প্রত্যহের চেনা শহর হয়েই বেঁচে থাকবে।

নেরভালের কবিতা, বস্তুত, তাঁর মৃত্যুর পর একত্রিত করা হয়। এবং তখনই বোঝা যায় কবি হিসেবে তিনি তাঁর গদ্যরচনাকে ছাড়াতে সক্ষম হননি। নেরভালের সব কাব্যপ্রচেষ্টা তিনভাগে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম জীবনের কবিতাগুলি বিশেষভাবে রাজনীতি বা সমসাময়িকতায় অনুরঞ্জিত। বেশিরভাগ কবিতাই প্রাগুক্ত কোনো না কোনো কবির প্রতিচ্ছায়া মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, অধিকাংশ সমসাময়িক জীবনের স্মৃতিকথা। যেহেতু আত্মকথনই নেরভালের রচনার প্রধান সূত্র এবং যেহেতু এই আত্মপ্রকাশের মধ্যেই তিনি দুর্নিবার হয়ে ওঠেন তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের কবিতায় নেরভাল অনেক বেশি প্রকাশিত, অনেক বেশি স্বাবলম্বী। এই অধ্যায়েই রচনা করেন "লুক্সেম্বুর্গের একটি গলি" নামক তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কবিতা।

এক্ষুনি সে সুমুখ দিয়ে ঝলক তুলে
পাখির মতো চপলগতি গেল চ'লে
হাতে ছিলো রক্তগোলাপ প্রেমের মতো
কানে কেন পেঁছুল না গানের কলি
গাইলো কতো।

এই মেয়েটি হয়তো কেবল বিশ্বমাঝে
আমার বুকের গোপন কথা বুঝতে পারে

চোখের কোণে চাইলে পরে আমার সাঁজে
জ্বলে ওঠে আলোর মালা রাত্রি জুড়ে
সারে সারে।

কিন্তু আহা—বৃথা আশা বয়স হলো
বিদায় মৃদু ঝলক তোলা আলোর ক্ষণ
প্রেমিকা, সুর, বিলাস যতো তাদের বলো
গন্ধ মিলায় গন্ধ মিলায় মিলায় সব
যেমন নিয়ম।

আর তৃতীয় পর্যায়ে নেরভাল রচনা করেছেন সেইসব কবিতা যেগুলোকে তিনি বলেছেন সুপারন্যাচারালিস্ট। এই পর্যায়ের কবিতাগুলো নেরভালের "ল্যে সীমের" এবং "ওত্রে সীমের" কাব্যগ্রন্থে আছে। এই দু'টি গ্রন্থের সব কবিতাই চতুর্দশপদী। যার অধিকাংশ কবিতাই রহস্যময় ও ব্যক্তিগত প্রতীকের দ্বারা দুর্বোধ্য। কিন্তু কবিতাগুলোর গঠনভঙ্গী নেরভালের অন্যান্য সব কবিতা থেকে বেশি নিপুণ। তাঁর জীবনের শেষ কবিতা তাঁর 'এপিটাফ'। যেখানে তিনি বলছেন, এমন একদিন ছিলো যখন তিনি প্রেমে-বিরহে, তৃপ্তিতে-বিষাদে ঘুরে বেড়াতেন। হঠাৎ একদিন কে যেন দরোজায় টোকা দিলো। মৃত্যু। তিনি মৃত্যুকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন কারণ তখনও তাঁর শেষ চতুর্দশপদীটা শেষ হয়নি। এই সনেটই হচ্ছে তাঁর এপিটাফ।

আদ্রেঁ ব্রেতো আর পোল এলুয়ার এঁরা দুজনে নেরভালের মূল্যবান রচনার উত্তরাধিকারী। দুজনে একটি প্রবন্ধ একত্রে স্বাক্ষর করে প্রকাশ করেছিলেন, যাতে তাঁরা বলেছেন, "হিস্টোরিয়া শিল্পনির্মাণের নূতনতম প্রক্রিয়া।" দেস্নোস্, ত্রিস্তা ৎসারা, স্যুপোল্ৎ এবং তাঁদের ছবি-আঁকিয়ে বন্ধুরা বিশ্বাস করতেন "ভৌতিক দৃশ্যের দ্বারা প্রভাবিত স্বজ্ঞায়"। স্যুররেয়ালিস্তরা এমনি করেই নেরভালকে অনুকরণীয় ভেবে নেরভাল যে সাহিত্য-ভাবনার গোড়াপত্তন করেছিলেন তাকেই পরিণতি দেবার চেষ্টা করলেন। অথচ উন্মাদ, বিষণ্ণ, একাকী কবি নেরভাল কোনোদিন জানতে পারবেন না তিনি নিজের মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার ফলে ফরাসি সাহিত্যে, বিশ্বসাহিত্যে কী সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাই যখন আমরা দৈবাৎ শুনি পাগলাগারদ থেকে জেরার্দ দ্য নেরভালের আর্তনাদ তখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের আসন্ন পতনের গভীরতা আর সাহিত্যের, কবিতার মুক্তির তীব্রতা।

আধুনিক সাহিত্য

মাত্র কয়েক দশক আগেও বাঙলাদেশের প্রায় প্রত্যেক বড় লেখক ছোটদের জন্য লেখার উৎসাহের প্রমাণ দিয়েছেন। প্রমাণিত হয়েছে, ছোটদের জন্য লেখা ছোট লেখা নয়, যেমন হাসির লেখা হাস্যকর লেখা নয়। সেই শিশুসাহিত্য সার্থক যা ছোটবেলায় পড়লেও সারা-জীবনের ভাবনায়, স্মৃতি ও স্বপ্নে সম্পৃক্ত। মাত্র কয়েক দশক আগে বাঙলাদেশের প্রথম সারির লেখকরা, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ ইত্যাদি ছোটদের জন্য কম-বেশী লিখেছেন। এ'দের মধ্যে শিশুসাহিত্য রচনায় শিবরাম চক্রবর্তী এখনো অক্লান্ত। ছোটদের জন্য রচিত লীলা মজুমদারের গল্প-উপন্যাসের মধ্যবয়সী পাঠকের সংখ্যাও অনুল্লেখ্য নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একালের তরুণ লেখকদের ছোটদের জন্য লেখার বিষয়ে অনীহা আশ্চর্য লাগে। হয়ত সত্যি, বাঙলা সাহিত্য ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা একালে শুধু মনোরঞ্জনের জন্য লেখেন না, তাঁরা তাঁদের রচনায় প্রতিদিন আরো জটিল ও কঠিন বিষয় স্পর্শ করতে চাইছেন, একথাও সম্ভবত সত্যি। কিন্তু একালের লেখকরা অনিশ্চয়তা, শূন্যতাবোধ, অস্বস্তি, বিশ্বাসের অভাব, আত্মিক যন্ত্রণা ইত্যাদিতে এতই মগ্ন যে ছোটদের জন্য লিখবার কথা ভাববার অবকাশ পান না, এমন কথা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়। একালের তরুণ লেখকদের মধ্যে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর গদ্যে অবনীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই প্রসঙ্গে অবশ্য শিশুসাহিত্য রচনা করেন এমন আরো কয়েকজনের পরিচ্ছন্ন গদ্য মনে আসে।

ইংরেজ লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনা একালের অনেক ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত। তাঁর প্রভাবের বৃত্তও ভৌগোলিক সীমা অতিক্রান্ত। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর একটি গল্প বিষয়ে সম্প্রতি কিছু উল্লেখ্য তথ্য জানা গেল। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর এই গল্পটি পড়লে, অবনীন্দ্রনাথের কথায় বলতে ইচ্ছে হয় : ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ 'ছবি লেখে'।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাস *Mrs Dalloway*-র পাণ্ডুলিপি বৃটিশ জাদুঘরে রয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি খুঁটিয়ে দেখবার সময় ওয়ালেস হিলডিক তার মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা এই গল্পটি পেয়ে যান। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে গল্পটির পাণ্ডুলিপি মিশে গিয়েছিল। একবার লেখিকার ভাইঝি অ্যান স্টিফেন যখন তাঁর শৈশবে তাঁর পিসিমার কাছে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন, গল্পটি সেই সময়ে রচিত। ওয়ালেস হিলডিকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ গল্পটি বছর তিনেক আগে *The Times Literary Supplement*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এখন গল্পটি সচিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ও যে ছোটদের জন্য এমন একটি গল্প লিখেছেন, তাঁর অনুরক্ত পাঠকদের কাছে তা একটি তৃপ্তিকর সংবাদ। গল্পটির চিত্রধর্মিতায় এক আশ্চর্য জাদু আছে। একটি স্থিরচিত্র এবং পরে সেই চিত্রে গতি সঞ্চারিত। শেষের দিকে রাক্ষসী বুড়ির মুখের আদলের বর্ণনা শিশুদের খুশী করার জন্য অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই, তথাপি ওই

বর্ণনায় ব্যবহৃত বাকপ্রতিমা বয়স্কমনকেও তৃপ্তি দেবে। গল্পটির একটি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এখানে সংযুক্ত হল :

একবার খুব জোরে তার নাক ডাকলো। মাথাটা ঝুঁকে পড়লো বুকের ওপর, চশমাটা উঠে গেল কপালে। সে বসে ছিল চেয়ারে, শীতে তাপ পাবার জন্যে পায়ের কাছে মালশায় তুষের আগুন। ছুঁচের খোঁচা থেকে আঙুল বাঁচাবার জন্যে সে একটা আঙুলের ডগায় সোনালী জল করা একটা পেতলের ছোট ঠুলি পরেছে, যার নাম অঙ্গুস্তানা। তার হাতের ছুঁচটায় লম্বা সুতো পরানো ছিল। তার নাক ডাকছিল, তার নাক ডাকছিল খুব জোরে। তার কোলের ওপর একটা বড় নীল রঙের পর্দার কাপড়, তার ওপর সে নানারঙের সুতো দিয়ে অনেক পশু-পাখি-মানুষের নকশা তুলেছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—গুলতানি বুড়ির নাক পঞ্চমবার ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে নীল পর্দার কাপড়ে সুতো দিয়ে তৈরি প্রাণীগুলো নড়ে উঠলো। হ্যাঁ, বুড়ি ঘুমিয়েছে। হরিণটা মাথা নেড়ে জিব্রাকে ইশারা করে দিলো, জিরাফটা দাঁত দিয়ে একটি পাতা কেটে নিলো গাছের ডাল থেকে। গুলতানি বুড়ি নীল পর্দার কাপড়ে রঙিন সুতো দিয়ে তৈরি করেছিল একটি হ্রদ, একটি প্যাগোডা, একটি নৌকো, হ্রদের ওপরে একটি সেতু আর পৃথিবীর সব রকমের জন্তু-জানোয়ার। তারা সবাই যেন সেই হ্রদের জল খেতে যাচ্ছে মিছিল করে।

যতক্ষণ গুলতানি বুড়ি সেলাই করছিল, নকশা তুলছিল, ততক্ষণ কিন্তু তারা নড়েনি : হাতীর শুঁড়টা আকাশের দিকে তোলাই ছিল, জিব্রার সামনের পায়ের খুর মাটি থেকে একটু ওপরে ছিল, জিরাফ শুধু পাতার গন্ধ শুঁকছিল, জিভ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে পারছিল না, আর বাঁদরটি তার থাবায় শুধু ধরেই রেখেছিল কয়েকটা বাদাম। এই নকশা-তোলা নীল কাপড়টা গুলতানি বুড়ির পাশের বাড়ির হৈমবতী দেবীর বসার ঘরের বিরাট সুন্দর জানলার পর্দা হবে। গুলতানি বুড়ি যতক্ষণ সেলাই করছিল, প্রাণীগুলো ছিল শুধু রঙিন সুতোর নকশা। কিন্তু যেই বুড়ির নাক ডাকতে শুরু করল, নীল কাপড়টা মিশে গেল নীলাভ হাওয়ায়, গাছপালা দুলে উঠল, হ্রদের জলের ঢেউ তীরে আঘাত করার শব্দ শোনা গেল, সেতুটার ওপর দিয়ে লোকজন হ্রদ পার হয়ে চলতে লাগল বাজারের দিকে। তখনই প্রাণীগুলোর মিছিল এগিয়ে গেল হ্রদের দিকে।

সবার আগে হাতী আর জিব্রা, তাদের পিছনে জিরাফ আর বাঘ, তারপর উটপাখি, বেবুন, কাঠবেড়ালি আর বেজি। মিছিলের পাশে পাশে হেলেদুলে এগোচ্ছিল পেঙ্গুইন আর পেলিকান পাখি। তাদের সবার মাথার ওপরে গুলতানি বুড়ির আঙুলের ডগার সোনালী জল করা পেতলের টুপিটা জ্বলছিল সূর্যের মতন। গুলতানি বুড়ির নাক ডাকার শব্দে তাদের মনে হচ্ছিল, গাছপালার মধ্যে গর্জাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। জল খেতে তারা হ্রদের দিকে এগোচ্ছিল। নীল পর্দার কাপড়ের জমিনের বদলে এখন তাদের পা ছুঁয়ে গেল ঘাস, গোলাপ, গুলবাহার, শাদা পাথর, লাল পাথর। গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল, খানাখন্দে নলখাগড়া, গাড়ির চাকায় কাটা গভীর খাদ আর ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাঙগুলো তাড়াতাড়ি লাফ মেরে পালাচ্ছে; তারা তো হাতীর পায়ের চাপে মরতে পারে না!

মিছিলটা এগিয়ে গিয়ে হ্রদের পাড়ে থামল, তারা জল খাবে। সত্যি সুন্দর লাগছিল দৃশ্যটা, আর ভাবতে চমক লাগছিল—টেবিল-বাতির নরম আলোয় নাক ডাকিয়ে চেয়ারে ঘুমন্ত গুলতানি বুড়ির কোলের ওপর এমন মিছিল! তার কোলের ওপর লাল গোলাপ, সবুজ ঘাস, এমন বড় বড় বুনো জন্তু-জানোয়ার! গুলতানি বুড়ি তো চিড়িয়াখানার খাঁচার

গরাদের ফাঁক দিয়ে তাদের ছাতার বাঁটের খোঁচা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেনি!

হিংস্র জন্তুদের বড় ভয় করে গুলতানি বুড়ি। যদি সে জানতে পারত, তার ঘুমের সময় তার কোলের ওপর ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে এত সব হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, তাহলে কী বলত গুলতানি বুড়ি? আহা বেচারী গুলতানি বুড়ি! একটা পোকা দেখলেই তো বুড়ি ভয়ে চিৎকার করে। আর এখন তার কোলের ওপর বনের হরিণ, সমুদ্রের বিরাট পাখি, হাতী, পেঙ্গুইন, হিংস্র বুনো চিতাবাঘ। অবশ্য ক্লান্ত ঘুমন্ত বুড়ি কিছুই তো জানতে পারছিল না।

তখন হাতীরা জল খেল, জিরাফরা চিবোতে লাগল আকন্দপাতা। সেতুর ওপর দিয়ে যেসব লোক হ্রদ পার হয়ে যাচ্ছিল তারা লুফে নেবার জন্যে জন্তু-জানোয়ারদের দিকে ছুঁড়ে দিল আপেল, আনারস আর মধুমাখানো পাটিসাপটা। ওইগুলো বাঁদরদের বড় পছন্দ। সেতুর ওপর দিয়ে তাঁর সুন্দর পালকিতে চড়ে চলে গেলেন শহরের রানী। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, নৌসেনাপতি, জল্লাদ আর অন্য সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজের নিজের কাজে সেতুর ওপর দিয়ে শহরের দিকে চলে গেলেন। সেই সুন্দর শহরটির নাম সুদূর-মধুরনগরী। জন্তু-জানোয়ারদের কেউ কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করল না। সবারই জানা ছিল, কেউ তাদের কখনো ধরতে পারবে না।

কারণ, লোকে বলত, এক বিরাট রাক্ষসী তার মন্ত্রের অদৃশ্য জালে ওই জন্তু-জানোয়ারদের বন্দী করে রেখেছে। রাক্ষসীর নাম গুলতানি। তার মুখখানা পাহাড়ের গায়ের মতন এবড়োখেবড়ো। তার চোখ, চুল, নাক, দাঁতের দিকে তাকালে পাহাড়ের ভীষণ খাড়াই, পাহাড়ের গা বেয়ে তীব্র বেগে নেমে-আসা বরফের চাঁই, দুই পাহাড়ের মাঝখানের গভীর অন্ধকার খাদ ইত্যাদি মনে আসে। রাক্ষসী ওই জন্তু-জানোয়ারদের ধরেছে, তাদের জড়িয়েছে মন্ত্রের অদৃশ্য জালে। তারা রাক্ষসীর কোলের ওপর সারাটা দিন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রাত্তিরে রাক্ষসী ঘুমোলে তারা সুদূরমধুরনগরীর কাছে হ্রদের পাড়ে মিছিল করে চলে আসে জল খেতে।

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে গুলতানি বুড়ি জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল, আড়মোড়া ভাঙল, আর জেগে উঠল পুরোপুরি।

একটা বড় নীল মাছি টেবিলবাতিটাকে ঘিরে ভন্‌ভনিয়ে উড়তে উড়তে বুড়িকে জাগিয়ে দিল। তখনই আবার সব পশু-পাখি-মানুষ বুড়ির কোলের ওপর নীল পর্দার কাপড়ে রঙিন সুতোর নকশা হয়ে গেল। আর গুলতানি বুড়ি পাশের বাড়ির হৈমবতী দেবীর বসার ঘরের জানলার জন্যে নীল নকশাতোলা পর্দায় আবার ছুঁচ ফোটাল।*

সুধাংশু ঘোষ

*Nurse Lugton's Golden Thimble. *By* Virginia Woolf. The Hogarth Press. 6s.

স মা লো চ না

Obsolete Communism & The Left-Wing Alternative. *By* Cohn-Bendit. André Deutsch. London 25*s*.

১৯৬৮ সনের মে-জুন মাস। ছাত্র আন্দোলনের নানা সংবাদ তখন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। রেডিও ও টেলিভিশন মারফতও এইসব সংবাদ দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আজ রোমের সংবাদ,—কাল পশ্চিম বার্লিনের। ফরাসীদেশের ছাত্র-আন্দোলন তো ঐ দুমাস অশান্ত, বিক্ষুব্ধ রূপ নিয়ে, ফেঁপে ফুলে উঠে প্রায় ব্যাপক বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছে। সেই ছাত্র-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক হিসাবে কনি বেনডিট্ আবির্ভূত হন।

কনি বেনডিট্-এর জন্ম ফরাসী দেশে। জাতিতে তিনি জার্মান। তাঁর বাবা-মা ছিলেন জার্মান উদ্বাস্তু। কৈশোরে কনি বেন্ডিট জার্মানীর স্কুলে ভর্তি হন এবং আঠার বছর বয়সে জার্মান নাগরিকতা গ্রহণ করেন। ফরাসীদেশে বেনডিট্ ভিসা নিয়ে বসবাস করেছেন। ন্যানটিয়ারে যে গোলযোগ হয় সেই গোলযোগের সঙ্গে বেন্ডিটের সম্পর্ক আছে মনে করে ফরাসী স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ১৯৬৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এক পুলিশী অনুসন্ধান কমিটির সামনে হাজির হবারও তাঁর কথা ছিল। পরে অবশ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাদের মত পালটায়। তারা বলে যে বেনডিটকে শাস্তি যদি দিতেই হয় তবে বিশ্ব-বিদ্যালয় তা দিক। রাষ্ট্রের তরফে এ ব্যাপারে কিছু করা সঙ্গত হবে না। তবুও ন্যানটিয়ারে গুজব রটে যায় যে, অসদাচরণের অভিযোগে বেন্ডিট বিতাড়িত হতে যাচ্ছে। ফরাসী দেশে যে ছাত্র-বিক্ষোভ-এর তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে, সেই তরঙ্গ যেসব কারণসমাবেশে ঘটেছিল, তার মধ্যে বেন্ডিটের বিতাড়নের কাহিনীটিও অন্যতম। মে মাসের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে নানা মহলে ফরাসী দেশের ছাত্রবিদ্রোহের মূল্যায়ন হতে থাকে। দক্ষিণপন্থীরা বলেনঃ এসব হল বালখিল্যদের খোকামি রোগ। এসব খোকারা রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী, দুমড়ে মুচড়ে, গায়ের জোরে, ভাঙচুর করে এরা জগৎ সংসারকে পাল্টে দেবে ভেবেছে। কিন্তু দেখা গেল ফরাসী দেশের আত্মা অপরাজেয়। ফরাসীদের জাতীয়তাবোধও সুদূরপ্রসারী। তাতে উত্থানপতন হয়তো আছে, কখনও কখনও সেই জাতীয়তাবোধ পথভ্রষ্ট হতেও পারে, তবে শেষ পর্যন্ত তার শুচিশুভ্র প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

বামপন্থী মহলে আবার এই ছাত্র-আন্দোলনকে দেখা হয়েছে গভীর সামাজিক আলোড়নেরই প্রকাশ হিসাবে। সমাজে শোষণ আছে, আছে নিপীড়ন। আধুনিক গণসমাজ তো আকৃতি-প্রকৃতিহীন এক অদ্ভুত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এরই প্রতিফলন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র। প্রাণহীন আমলাতান্ত্রিক তামসিকতার মোহ কাটিয়ে উঠে স্বাধিকারপ্রমত্ত, সাত্ত্বিক প্রকাশে স্থিত হওয়ার তীব্র আবেগ হতেই ছাত্রবিদ্রোহের জন্ম।

ছাত্রবিদ্রোহের আশু কারণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা। দেগ্যল (De Gaulle) শিক্ষাসংস্কারের জন্য কিছু করেননি, ঐ অনুযোগ অনেক দিনের। একথা ঠিক যে ফরাসী সরকার 'ফুচে (Fouchet) পরিকল্পনা' গ্রহণ করেন। শিক্ষাসংস্কারের এই পরিকল্পনা

ছাত্রসংগঠনদের অবশ্য আশ্বস্ত করতে পারেনি। শিক্ষকসমাজও মানসিক আলস্য কাটিয়ে উঠে নতুন সমাজকে চিন্তা ও কর্মের কোন পথ দেখাতে পারেননি। চাপা অবিশ্বাস ও ক্রোধ সঞ্চিত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তারপর ঘটেছে বিস্ফোরণ। ন্যানটিয়ারে ছাত্ররোষ-বহ্নি জ্বলে উঠেছে, সোরবোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা সেই আগুনের হলকায় ঝলসে গেছে এবং 'বুর্জোয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাঠামো কেঁপে উঠেছে ছাত্রবিক্ষোভের ভূমিকম্পে।

ড্যানিয়েল কনি বেনডিট্ ও তাঁর ভাই গ্রেবিয়েল কনি বেনডিট্ ১৯৬৮ সনের মে-জুন মাসের ছাত্রবিক্ষোভের ইতিহাস ও তত্ত্ব আলোচনা করেছেন *Obsolete Communism: The Left-Wing Alternative* নামক পুস্তকে।

সাম্যবাদী ইস্তাহার প্রকাশিত হবার পর ১২০ বছর কেটে গেছে। প্রথম আন্তর্জাতিক স্থাপিত হবার পর ১০৪ বছর কেটে গেছে। প্যারী কমিউনের পর ৯৭ বছর কেটে গেছে। রুশ বিপ্লবের পর ৫০ বছর কেটে গেছে। স্পেনের বিপ্লবের পর ৩০ বছর কেটে গেছে। হাংগেরীর শ্রমিক অভ্যুত্থানের পর ১২ বছর কেটে গেছে। অধুনা একদিকে চলছে ভিয়েৎ-নামের লড়াই, আমেরিকার নিগ্রোদের স্বাধিকারের লড়াই, অন্যদিকে নানাদেশে ছাত্রদের সংগ্রাম। বেন্‌ডিট্ বলছেন ঃ ফরাসী দেশের ছাত্র-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে, শিল্পোন্নত দেশে বিপ্লবী রূপান্তরের পথ আজও রুদ্ধ হয়নি এবং এই রূপান্তরপ্রক্রিয়ায় ছাত্রদের ভূমিকা সামান্য নয়। ফরাসী দেশে ছাত্ররা নানাভাবে লড়াই করেছে—ব্যারিকেড যুদ্ধ করেছে, শ্রমিকদের সাথী হিসাবে পেয়েছে। অথচ কি দক্ষিণ কি বাম—দুপক্ষের সরকারী দলগুলি এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে মৌন থেকে একে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। ছাত্রবিদ্রোহের সেই আগুন-ঝরা মাসগুলির অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বেনডিট্ ভ্রাতৃদ্বয় বিপ্লবের কলাকৌশল, রাজ-নৈতিক দল, শ্রমিকসংস্থা, ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের চরিত্র প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে পুঁজিবাদ যেমন আজ অচল তেমনি সাম্যবাদও আজ অচল। দুই ব্যবস্থায় আজ স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার প্রবণতা সুস্পষ্ট। আমলাতন্ত্র-এর দৌরাত্ম্য দুই ব্যবস্থায়ই প্রকট। নতুন সমাজ, নতুন মানুষ যদি গড়তে হয় তবে আজ নতুন 'বামপন্থী বিকল্প' প্রয়োজন।

সাম্যবাদী ইস্তাহারের অনুকরণ করে লেখকদ্বয় বলেছেন : ইউরোপের চোখেমুখে আজ আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে—ছাত্রবিদ্রোহের আতংক। প্রাচীন ইউরোপের সব শক্তি ঐ আতঙ্ক কাটাবার জন্যে পবিত্র সন্ধি করেছে। এই সন্ধিপত্রে যোগদানকারীদের মধ্যে আছে পোপ্ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি, কিসেংগার ও দেগ্যল্, ফরাসী সাম্যবাদীরা এবং জার্মানীর পুলিশ গুপ্তচরেরা। আজ এই ছাত্র-বিদ্রোহাতঙ্ক সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বার্কলে ও বার্লিন, টোকিও, ম্যাড্রিড্ ও ওয়ারশ—সর্বত্র দাবানলের মতো ছাত্র-বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ছে। সর্বত্র কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসা : ছাত্রদের একি খোকামি রোগ দেখা দিল? লেখকরা বলেছেন : এর জবাব খুবই সোজা। উদাহরণ দিয়ে লেখকেরা বলেছেন : ১৯৬৪ সনের বার্কলের ছাত্র-সংগ্রাম প্যারীর ঘটনাবলীর চারবছর আগে ঘটে। বার্লিন কিংবা প্যারীর ঘটনাবলী ঘটবার অনেক আগে বার্কলেতে ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবার অধিকার রক্ষা করবার জন্য লড়াই-এ নামে। বিদ্যায়তনের আভ্যন্তরীণ বিধিনিষেধ না মেনে ভিয়েতনাম-যুদ্ধ বিরোধী সংগ্রামে সামিল হয়। ওখানকার কর্তৃপক্ষ বলে : বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে চাঁদা তোলা এবং তাঁরা অনুমোদন করেন না এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ প্রচার করা চলবে না। ফলে সংঘাত দেখা দেয়। আমলাতন্ত্রের এই অক্ষম চাল প্রতিহত করবার জন্য প্রথমে কিছু ছাত্রকে

আন্দোলনের পথে নামতে হয়। আর কর্তৃপক্ষ যতই তাঁদের ক্ষমতা জাহির করতে থাকে ততই বেশি বেশি সংখ্যায় ছাত্র সংগ্রামের ময়দানে সামিল হয়। এই সংগ্রামের ফলে ছাত্রেরা কয়েকটি মৌলিক সত্যের মুখোমুখি হয়। তারা রাষ্ট্রের স্বরূপ কেমন তা চিনতে শেখে। বিশ্ববিদ্যালয় যে শুধু সারস্বতভবন নয়, ব্যবসার জগতের সঙ্গে, স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে এবং পুলিশের সঙ্গেও যে এর নানাধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ঐ সত্যও ছাত্রদের গোচরে আসে। বার্কলের ছাত্রসংগ্রামের তাৎপর্য এখানে যে, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন কিন্তু আমলা-তান্ত্রিক সমাজের অনপনেয় সংকটের চেহারাটা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে ছাত্রদের চোখে।

কয়েক বছর পরে বার্কলের ছকে বার্লিনের ছাত্রসংগ্রাম শুরু হয়। আর প্যারীর ঘটনাবলী তারপর ঘটে। জার্মানীর বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলি একদিকে শিক্ষাসংস্কার অন্য দিকে জার্মান রাষ্ট্রের বিরোধিতায় সংগ্রাম আরম্ভ করে। সঙ্গে ভিয়েতনামে আমেরিকার নৃশংস বর্বরতার প্রতিবাদ তো ছিলই।

জার্মানির ছাত্রেরা যখন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিল তখন ফরাসী দেশের ছাত্রেরা ফরাসী সংস্কারবাদী ছাত্র-আন্দোলনের সম্পর্কে ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। এই সময় অতিবামেরা 'পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী বিশ্লেষণ' নিয়ে ব্যস্ত রইল অথচ ছাত্রদের সংগ্রাম সংগঠিত করবার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় রইল। ভিয়েতনামবিরোধী সংগ্রাম যত জোরদার হল, ফরাসী দেশের ছাত্রেরা ততই বিদ্যায়তনে বেশি বেশি বিক্ষোভে সামিল হল। যুদ্ধ সম্পর্কে প্রবল ঘৃণা একদিকে, অন্যদিকে এই উপলব্ধি যে বিশ্ববিদ্যালয় আসলে পুঁজিবাদী যন্ত্রেরই অংশবিশেষ,—এই দুই মনোভাব ছাত্রদের ক্রমশঃ সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনল। তারপর স্ট্যাস্‌বুরগ্‌-এ যখন ছাত্রদের জাতীয় সংগঠনে (National Union of French Students) সংগ্রামী ছাত্রেরা সংখ্যাধিক্য অর্জন করল তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত করল যে সারস্বতভবনের যা আসল রূপ তাকে উদ্ঘাটন করতে হবে। প্রথমেই ছাত্রদের নতুন কমিটি সাবেকি কায়দা বর্জন করে নতুন নতুন পদ্ধতি চালু করল। একজন অধ্যাপক যেই বক্তৃতা শেষ করলেন অমনি তার গায়ে টোম্যাটো ছুড়ে মারা হল। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য পোস্টারে ছাত্রদের দাবি প্রচারিত হল। ছাত্র-কমিটির একটি পুস্তিকা : "অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, যৌন ও বুদ্ধিজৈবিক বিষয়ে ছাত্রজীবনের দারিদ্র্য এবং তা দূর করবার উপায়"—হাজারে হাজারে বিলি হল। এই ভাবে যে আন্দোলনের সূত্রপাত সেই আন্দোলনই বিরাট জলপ্রপাতের মতো পরবর্তীকালে নেমে এলো ফরাসী দেশে, সব কিছু ভেসে যাবার উপক্রম হল বিক্ষোভের তরঙ্গাঘাতে।

বেনডিট্‌ ভ্রাতৃদ্বয় সেই তরঙ্গক্ষুব্ধ ফরাসী দেশের দু'মাসের ইতিহাস লিখেছেন। মুখবন্ধের পর লিখেছেন : ১। বিপ্লবী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও রণকৌশল; ২। রাষ্ট্রের রণকৌশল; ৩। স্টালিনবাদী আমলাতন্ত্র ও ফরাসীদেশের শ্রেণীসংগ্রাম; ৪। বলশেভিজমের প্রকৃতি ও রণকৌশল; ৫। পরিসমাপ্তি। মে-জুন মাসের ছাত্রবিদ্রোহের পিছনে কী কারণ-সমাবেশ ছিল, এই বিদ্রোহ কি শুধুই ছাত্রদের উন্মার্গগামিতার হঠকারী প্রকাশ, অথবা এর পিছনে নতুন শিক্ষা, নতুন সমাজ, নতুন মূল্যবোধের প্রেরণা ছিল, এ প্রশ্ন গ্রন্থকারেরা আলোচনা করেছেন। ফরাসী রাষ্ট্র কিভাবে এই বিদ্রোহের মোকাবিলা করেছিল এবং দেগ্যল-বাদের সারবস্তু কেমন সে আলোচনাও পুস্তকটিতে পাওয়া যাবে। ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে বেনডিট্‌ ভ্রাতারা একথাই বলতে চান যে, এ পার্টি গেঁজে গেছে,—আমলাতান্ত্রিকতার বদ্ধজলায় আটক পড়ে এর প্রাণশক্তি গেছে নিঃশেষ হয়ে।

পরিশেষে লেনিন ও ট্রট্স্কির নায়কতায় সংগঠিত রুশবিপ্লব কেন ব্যর্থ হল, কেন রুশদেশে স্বৈরাচার ও অসমসমাজ চিরস্থায়ী হল তার আলোচনা।

মে-জুন মাসের ঘটনাবলী একদিকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের ভাঙনকে যেমন প্রকাশ করেছে অন্যদিকে তেমনি তথাকথিত 'বামপন্থী' স্থিতাবস্থাকামীদের বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির অবক্ষয়কে তুলে ধরেছে। এ সব পার্টি আজ বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নয়। লেখকদের বক্তব্য অন্ততঃ তাই। লেখকদ্বয় প্রশ্ন তুলেছেন ঃ আজকের দিনে বামপন্থী মতবাদের স্বরূপ কি? কমিউনিজমকে বামপন্থী মতবাদ-এর মর্যাদা আজ আর কেন দেওয়া সম্ভব নয়। জবাবে তাঁরা বলেছেন : বামপন্থার ইতিহাস বাস্তবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে যা কিছু 'প্রকৃত বিপ্লবী' তারই ইতিহাস। প্রুঁধোর তুলনায় মার্ক্স ছিলেন বামপন্থার দিকে, আবার বাকুনিন ছিলেন মার্কসের তুলনায় আরও বামে। সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংস্কারবাদকে যখন বিরোধিতা করেছিলেন তখন লেনিন ছিলেন 'বামপন্থী'। আবার ১৯১৭-র বিপ্লবের সময় যখন তিনি নিজের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিট ব্যুরোর বিরুদ্ধতা করেন তখনও তাঁর বামপন্থার পরিচয় মেলে। বিপ্লবোত্তর কালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যে 'শ্রমিকদের বিরোধীদল (workers' opposition) গড়ে ওঠে, সেই দলই ছিল পার্টির মধ্যে সবচাইতে বিপ্লবী উপাদান। আর উক্রাইনে অ্যানারকিস্ট ম্যাখনো (Makhno) পার্টির বাইরে সব চাইতে বিপ্লবী আন্দোলনের ছিলেন প্রবক্তা। আজও শ্রমিক-আন্দোলন 'বাম' ও 'দক্ষিণ' এই দুই ধারায় বিভক্ত। লেখকদ্বয় বলেছেন যে ফরাসীদেশের মে-জুন ঘটনাবলী যখন ঘটে তখন 'বামপন্থা'র প্রশ্নটি বেশ বড় হয়ে দেখা দেয়। তাঁদের প্রশ্ন—সমকালীন যুগে বামপন্থার প্রকৃত প্রতিভূ কে? চতুর্থ আন্তর্জাতিক? সিচুয়েশনিষ্ট আন্তর্জাতিক? অথবা অ্যানারকিষ্ট ফেডারেশন?

উত্তরে তাঁরা বলছেন যে বিপ্লবী ইতিহাসে যা 'নতুন' তাই বামপন্থা এবং এই পন্থা সর্বদা পুরাতনের আক্রমণের সম্মুখীন। এই নতুন উপাদানকে বামপন্থীদের রক্ষা করতে হবে। না হলে বামপন্থার মধ্যে যে অচলায়তন আজ সৃষ্টি হয়েছে তার ভারে নতুন বাম-পন্থা পিষ্ট হবে।

আধুনিক রক্ষণশীল বামপন্থা যে অনেকখানি পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ও রূপান্তরের প্রতিফলন তাতে সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুললে চলে না যে রুশ-বিপ্লব আজ আমলাতান্ত্রিক প্রতিবিপ্লবী চেহারা নিয়েছে এবং আধুনিক রক্ষণশীল বামপন্থা এই বাস্তবেরও প্রতিফলন। এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থন সব দেশের তথা-কথিত 'বামপন্থী' কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য কাজ। একথা বুঝলে সহজেই বোঝা যায় কেন মে-জুন মাসে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামে নামেনি। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ আর রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েটের আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণই যেখানে এই পার্টির মুখ্য কাজ সেখানে এর অন্যথা হলেই ইতিহাস বিড়ম্বিত হ'ত। ফলে লেখকদের সিদ্ধান্ত এই যে কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্রের চরিত্র যদি কেউ যদি না বোঝে তবে বিপ্লবী তত্ত্বে ও কর্মে আজ আর কেউ সার্থকতা লাভ করতে পারবেন না।

যে বিরাট ছাত্রবিক্ষোভের ইতিহাস লেখকেরা লিপিবন্ধ করেছেন সেই আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, এই আন্দোলনের নির্ভরতা স্বতঃস্ফূর্ততার উপর। বিপ্লব সফল করতে হলে পার্টি চাই, নেতৃত্ব চাই, অগ্রণীবাহিনী চাই, নিটোল মতাদর্শ চাই —এসব কেতাবী তত্ত্বে লেখকদের আস্থা নেই। বরং তাঁরা মনে করেন যে অগ্রণীবাহিনী-তত্ত্ব

বাস্তবে এক ধরনের অভিজাত মতবাদ যাকে বর্জন না করলেই নয়। দ্বিতীয়তঃ, লেখকেরা মনে করেন যে কি পুঁজিবাদ কি আধুনিক সাম্যবাদ—দুই ব্যবস্থাই নিপীড়নমূলক। দুই ব্যবস্থাতেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার প্রবণতা আজ সুস্পষ্ট। তৃতীয়তঃ, লেখকেরা মনে করেন যে শোষণ নিশ্চিহ্ন করতে হলে চিরন্তন সংগ্রামের লাইন নিতে হবে। মানুষের মুক্তির জন্য যদি প্রকৃত শ্রেণীহীন, সম-সমাজ সৃষ্টি করতে হয় তবে তা বলশেভিক মডেলে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে হবে না। ঐ মডেলের মধ্য দিয়ে যদি বিপ্লব সম্পন্ন হয় তবে সে বিপ্লব হবে অসমাপ্ত, খণ্ডিত, এবং সমাজে 'নেতা' ও 'জনসাধারণে'র মধ্যে বিভেদ স্থায়ী হবে। ক্ষমতা অর্জন করে নেতারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে অসমতার নানারকম সাফাই গাইবেন, প্রতিবাদ দেখা দিলে 'স্বাধীনতা'কে খর্ব করে শৃঙ্খলার নাগপাশে সমাজকে বাঁধবেন। চতুর্থত, লেখকদের মতে অধুনা বিপ্লববিরোধী শক্তি এরা—পুঁজিবাদী সমাজ, রাষ্ট্র, ট্রেড ইউনিয়ন, সব দেশের স্তালিনবাদীরা এবং বলশেভিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নানা দল, উপদল। পঞ্চমতঃ, লেখকদের মতে বিপ্লবী নেতাগিরি করবেন না। বিপ্লবীরা হয়তো সংখ্যায় সামান্য হবেন। নানা স্তর থেকে তাঁরা আসবেন। তাঁদের থাকবে বিশিষ্ট বিপ্লবী মতাদর্শ। যেখানেই নিপীড়ন দেখা যাবে তাঁরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, শাসক-শ্রেণীর ও আমলাতন্ত্রের মিথ্যার জালে তাঁরা বিভ্রান্ত হবেন না। সজোরে তাঁরা ঘোষণা করবেন যে শ্রমিকরা নিজেদের ভাগ্য জয় করে নিতে পারেন শুধু নিজের প্রচেষ্টায়। তাঁরা আন্দোলনে ও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মনে রাখবেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা জন্ম নেবে, স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী আন্দোলন থেকেই তত্ত্ব সৃষ্টি হবে। বিদেশের ছাত্র-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে বুঝতে হলে পুস্তকটি অবশ্যপাঠ্য। লেখকদ্বয় বয়সে নবীন। মতামত হয়তো অনেক জায়গায় ছেলেমানুষি-ঘেঁষা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পুস্তকটিতে ভাববার ও জানবার কথা নেই।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

Helen Huddleson *By* Amanda Ros. *Edited By* Jack Loudan. Chatto & Windus. London. 25*s*.

অ্যামান্ডা রস্ এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের আইরিশ লেখিকা। স্বল্পখ্যাতা এই লেখিকার উল্লেখ প্রামাণ্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যদিচ আলোচ্য বইটির ভূমিকা থেকে জানা যায় যে অল্ডাস্ হাক্স্লী ও মার্ক টোয়েন এঁর লেখার প্রশংসা করেছিলেন। এটি তাঁর তৃতীয় এবং অসমাপ্ত উপন্যাস। অ্যামান্ডার জীবনীকার জ্যাক্ লাউডান বহু অধ্যবসায়ে এর পাণ্ডু-লিপি উদ্ধার করে, চতুর্দশ ও শেষ অধ্যায়টি লিখে একে পূর্ণাঙ্গ কলেবরে প্রকাশ করেছেন।

এই আধা-রোমান্স ঠাটের স্বল্পায়তন গল্পটিতে অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীর ছাপই বেশী। উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের ব্যালিনাহিন্‌চ্ গ্রামের হেলেন হাড্‌ল্‌সন তার প্রেমিক, অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী মরিস মান্‌রোর সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায় যাত্রা করে; কিন্তু লম্পট লর্ড রাস্‌বেরী (মান্‌রোর বন্ধু, হেলেনের অনুরাগী) তাকে অপহরণ ও সত্য বা সাজানো বিয়ে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে। হেলেন একফাঁকে পালিয়ে এক পরোপকারিণী মহিলা

ম্যাডাম পেয়ারের কাছে আশ্রয় নেয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে পরোপকারিণী ওই মহিলা আসলে এক বেশ্যা, তার বাড়ীতে হেলেন নতুন করে বিপদে পড়ে। মধ্যরাত্রে খুনখারাপী কাণ্ডের মধ্যে পালিয়ে হেলেন যার কাছে এবার আশ্রয় নেয়, সে উপকারী চেহারার এক পাদরী, কিন্তু কার্যত দেখা যায় আর-এক লম্পট। সেখান থেকেও হেলেন পালিয়ে যায়, কিন্তু ফের রাস্‌-বেরী'র হাতে পড়ে। অদম্য নায়িকা চতুর্থবারে তার অদেখা কাকা ও খুড়তুতো ভাইয়ের সাহায্যে (দুজনেরই নাম হেনরী হাড্‌ল্‌সন) পালিয়ে তাদের সঙ্গে ক্যানাডা চলে যায় (এই সময় একবার পাঠকের মনে প্রত্যাশা জাগে যে পিতা-পুত্রের একজন হয়তো অন্য এক ভক্ষক রূপে দেখা দেবেন, যদিও তা হয় না।) ক্যানাডা প্রবাসকালে আয়ার্ল্যান্ড থেকে এক চিঠি মারফৎ হেলেন জানতে পারে যে মরিস্‌ অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছে ও রাস্‌বেরী মারা গেছে। আয়ার্ল্যান্ডে তার প্রত্যাবর্তন ও মরিসের সঙ্গে মিলনে কাহিনীর সুখকর সমাপ্তি। কাহিনী'র আরম্ভ কিন্তু নায়িকাকে দিয়ে নয়, হেলেন পটার নামে আর এক কিশোরীকে দিয়ে। এই আর এক হেলেন বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে বিশেষত মরিস—প্রথমার অন্তর্ধান-রহস্য একটু একটু করে জানতে পারে: এরপর প্রথমা হেলেনের ইতিহাস আরম্ভ হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে। হেলেন পটারই নায়িকাকে চিঠি লিখে আয়ার্ল্যান্ডে আনিয়ে কাহিনীর শেষ ঘটায়।

গল্পটিতে আধুনিক, বয়স্ক মনের পরিচয় খুঁজতে যাওয়া ভুল হবে। এর বিষয়বস্তু মামুলী ধরনের নীতিপরায়ণতা : রাসবেরীর মৃত্যু ও হেলেনের সুখী পরিণতিতে পাপের বেতন মৃত্যু ও পুণ্যের জয় এই যুগলবন্দেজী বিষয়বস্তু। প্রকৃতপক্ষে রূপকথা-গন্ধী রোমান্‌স্‌ হিসেবেই গল্পটিকে গ্রহণ করা সম্ভব (অন্যভাবে আমি অন্তত চেষ্টা করেও পারি নি।) কাহিনীটির এই চরিত্র হওয়ার দরুন ঘটনার কার্যকারণসম্বন্ধ অসম্ভাব্যতার ছাঁচে ঢালা। হেলেন কেন রাস্‌বেরীর সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেল—যা থেকে তার সমস্ত অ্যাড্‌ভেন্‌চারের সূত্রপাত—তা'র ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তা'র বারে বারে খারাপ লোকেদের হাতে পড়া আর প্রতিবারেই তাদের কবল থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হওয়া সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। রাস্‌বেরীর হঠাৎ অসুস্থতা ও তার পরে মৃত্যু—যা'র জন্যে হেলেনের মরিসের সঙ্গে মিলন সম্ভব হল—কারণবিহীন। তেমনই অকস্মাৎ জাহাজের ক্যাপ্‌টেন নর্‌ম্যান ক্যারথারের নাটকীয় মুহূর্তে এসে হেন্‌রী পরিবার ও হেলেনকে ক্যানাডা নিয়ে যাওয়া (ক্যানাডায় না গেলেও গল্পের ক্ষতি বৃদ্ধি হত না)। আর, হেলেনের দুঃখ-ধন্দের সুখকর পরিণতি রূপকথার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। গল্পটির ফ্যান্‌টাসী-প্রকৃতির কারণে তার আবেগ-দুঃখগুলি মনে গভীর দাগ কাটে না ও চরিত্রগুলিকে পোস্‌টারের ছবির মত দ্বিমাত্রিক বলে মনে হয়; বস্তুত, তাদের অতি সহজেই রঙীন কার্টুনের মানুষদের চেহারায় কল্পনা করা যায়। কিন্তু আগেই বলেছি, সাধারণ বাস্তবতার নিরিখে গল্পটিকে বিচার করতে যাওয়া বোধহয় সমীচীন হবে না।

তবু, রূপকথার আমেজ থাকলেও গল্পটি রূপকথা নয়, তাই কতকগুলি প্রত্যাশিত সাধারণ কানুন না মেনে চলার জন্যে ওই লক্ষণগুলি মধ্যে মধ্যে পীড়া দেয়। এর থেকে বড় কথা, কাহিনীটির মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান আছে যা রূপকথা বা বাস্তবাশ্রয়ী উপন্যাস কোথাও বাঞ্ছনীয় নয়, ফলে লেখিকার কলমকে কাঁচা বলে মনে হয়। বইটিতে অবাস্তব ভাবালুতা আর মেলোড্রামার ছড়াছড়ি। বিপ্রলব্ধ মরিস হেলেনের ছবি বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর "কেঁপে কেঁপে কাঁদে"। অপাপবিদ্ধা, কোমলহৃদয়া নায়িকা অবশ্যই বিপদে পড়ে কাঁদতে থাকে, কিন্তু দুরাত্মা রাস্‌বেরীও হেলেন-হরণের আগে 'হেলেন' 'হেলেন' বলে

কে'দে ঘুমিয়ে পড়ে ও পরে তার জন্যে মরিসের মতই বুক চাপড়ে হাহাকার করে; লম্পট ধর্মপ্রচারক গ্যের্ডো-ও হেলেনের কাহিনী শুনে চোখের জল ফেলে। তা ছাড়া, ভিলেনদের যত মন্দ উদ্দেশ্যেই থাক, তারা লেখিকা ও "ভালো" চরিত্রদের সঙ্গে একসুরে হেলেনের 'পবিত্রতা'র প্রশংসায় মুখর (একবারও মনে হয় না তারা ভণ্ড অথবা অভিনেতা)। রাস্‌বেরীর পিস্তল বার করে হেলেনকে খুন করার ও আত্মহত্যা করার ভয় মামুলী ও অত্যন্ত আবেগী কায়দা। তেমনই মেলোড্রামাটিক ম্যাডাম পেয়ারের বাড়ীতে রাস্‌বেরীর ছবি দেখে হেলেনের 'আমি তোমায় চিনি' বলে চে'চিয়ে ওঠা ও আপাত-ভালো লোকেদের হঠাৎ খারাপ বলে প্রতিপন্ন হওয়া (ম্যাডাম পেয়ার, ফাদার গ্যের্ডো)।

শুধু এই নয়; অবান্তর উপাদানে কাহিনীটি ভরা। লেখিকা যখন-তখন গল্পের মধ্যে তাঁর নিজের জবানীতে ও চরিত্রদের সংলাপের মাধ্যমে অনধিকার প্রবেশ করেছেন ও অপ্রয়োজনীয় চরিত্রদের টেনে এনেছেন। প্রধানত তিনটি বিষয় নিয়ে (তবে অন্যও আছে) তাঁর একাগ্রতা এর উপলক্ষ্য: নীতিপরায়ণতা, আইন ও ধর্ম। প্যারিস পাপের পীঠস্থান, রাস্‌বেরী কত লম্পট, লম্পটরা ও লাম্পট্য কত খারাপ (অবশ্যই খারাপ, কিন্তু তা বলার অপেক্ষা রাখে না) ইত্যাদি ধিক্কার-বাণীতে তিনি মুখরা। এর চেয়ে বিচিত্র লেখিকার আইন ও ধর্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা। উকিলদের সম্বন্ধে অ্যামান্ডার প্রচণ্ড বিদ্বেষ, কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাদের হাতে সম্পত্তি নিয়ে প্রচুর নাজেহাল হয়েছিলেন। এই বিদ্বেষ দেখা যায় গল্পটির মধ্যে তাঁর উকিলদের সম্বন্ধে অনবরত বিষোদ্‌গিরণে। দুষ্টা ম্যাডাম পেয়ারকে দেখানো হয়েছে দুষ্টতর এক উকিলের কন্যা হিসেবে। আর এক উকিলের বর্ণনায় অবান্তরভাবে এক পাতা ভরানো—সে রাস্‌বেরীর বাড়ীর পূর্বতন বাসিন্দা ও লম্পট, চরিত্রহীন। উকিল-চরিত্রগুলি ও আইনের সঙ্গে গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। একইভাবে অবান্তর ও গল্পের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, লেখিকার অ-প্রেস্‌বিটারিয়ান, বিশেষত রোমান ক্যাথলিক যাজকদের সম্বন্ধে অনীহা ও রাগ।

এরকম অপটুতা বিষয়বস্তু উপস্থাপন ছাড়া অন্যত্রও দেখা যায়। গল্প বলার ভঙ্গীতে বেশ কায়দার প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু আঙ্গিকের ওপর দখল না থাকায় লেখিকা শেষ অবধি সামলাতে পারেন নি। প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে হেলেন-পটার অংশে মনে হয় তার মাধ্যমে এক দূর অতীতের কাহিনী আসছে। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ফ্ল্যাশব্যাকে হেলেন হাড্‌ল্‌সনের কাহিনী সরাসরি আরম্ভ যখন হয়, পাঠকের মনে হেলেন পটারের দৃষ্টিকোণে ফিরে আসবার প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু নায়িকা হেলেনের আখ্যানে অ্যামান্ডা এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেছেন যে দ্বিতীয়া হেলেনকে আমরা প্রায় ভুলেই যাই (জ্যাক্‌ লাউডান শেষ অধ্যায়ে তাকে কতকটা জবরদস্তি করেই টেনে এনেছেন)। অ্যামান্ডার হেলেন পটারের কাছে ফিরে আসবার রাস্তা খুঁজে না পাওয়া কাহিনীটি অসম্পূর্ণ থাকার অন্যতম কারণ হতে পারে। এর ফলে হেলেন পটার অংশটি প্রায় নিরর্থক হয়ে গেছে। অথচ দ্বিতীয়া হেলেনের প্রথমার অপরাত্মা চরিত্র হিসেবে বেড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল (নাম ছাড়া অন্য বিষয়েও তাদের মিল আছে)।

স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, লেখিকা কল্পনা ও বাস্তবতা মেশানো এক ব্যক্তিগত মানস-জগতে বাস করতেন এবং তাঁর উপন্যাসে এই জগৎকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কল্পলোক-রূপায়ণ, ইচ্ছাপূরণের গল্প ভালো সাহিত্য নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু লেখিকা হিসেবে অ্যামান্ডা অত্যন্ত সাদাসিদে, এই রূপায়ণের ক্ষমতা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। যে জন্য তাঁর গম্ভীর নীতিবাক্যকে পরিহাস ও তাঁর কল্পনাকে কৌতুককর বলে মনে হয়।

আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, ঘটনা-সংগঠন, সবেতেই তিনি অত্যন্ত শিশুসুলভ আত্মকেন্দ্রিক। তাই, কাব্য-গদ্য মেশানো গল্প রচনার প্রয়াসে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন পাওয়া গেলেও তা পুরোপুরি সফল হতে পারে নি। ফলে, গল্পটি নিটোল, বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপের বদলে লেখিকার মনের এলোমেলো প্রতিচ্ছবির চেহারাই বেশী নিয়েছে।

কাহিনীটি ভাষার ওপরে নির্ভরশীল। বইটিতে প্রচুর কথার ফেনা, লেখিকা তো বটেই, চরিত্ররাও আবেগে কথা বলতে আরম্ভ করলে সহজে থামতে চায় না। মনে হয়, অ্যামান্ডা গদ্য ও কবিতার মিশ্রণে এক নতুন মাধ্যম তৈরী করতে চেয়েছেন, কিন্তু তার কিছু গুণ থাকলেও এই ভাষা গল্পটি উপভোগ করার পক্ষে বেশ বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অ্যামান্ডার প্রবল অনুপ্রাসপ্রীতি পাতায় পাতায় ছড়ানো : ধ্বনিগত প্রয়োজনীয়তা থাক বা না থাক, তিনি সুযোগ পেলেই কথার আরম্ভে একই অক্ষর বসিয়ে দেন। এর সঙ্গে আছে অদ্ভুতভাবে শব্দ-ব্যবহার। কয়েকটি উদাহরণ : Frivolous fraternity of fragiles fitting about. To raise the pen of pigdom or pique, jealousy or jadery, revenge or revision. সন্দেহ হয়, লেখিকা কি ঠাট্টা করছেন? কিন্তু ঠাট্টা কাকে? আর, ঠাট্টা যে নয়, তা বোঝা যায়, যখন গম্ভীর, ক্রুদ্ধভাবে তিনি প্যারিসের দুর্নীতি সম্বন্ধে বলেন : Inside whose area the most reprehensible dens of dignified damndom.

লেখিকার অনুপ্রাসপ্রীতি নামগুলির মধ্যেও পাওয়া যায় : হেলেন হাড্‌ল্‌সন, মরিস মান্‌রো, মেবেল মোয়াগ্‌, পিটার প্লাম্‌, লিলি লেন্টিল, সুজান্‌ সিল্‌ভেস্‌টার, সাইমন সোয়াগ, রিচার্ড রোল্যান্ড রুবেন্‌স ইত্যাদি। বাড়ীর নাম : মডেস্‌টি ম্যানর, অ্যাশ্‌ব্রুক অ্যাবি, হ্যান্ডি হল্‌।

অলংকার, বিশেষত উপমা ও অতিশয়োক্তির প্রতি লেখিকার অসাধারণ আসক্তি, কিন্তু এগুলি এত কষ্ট-কল্পিত যে এলিজাবেথীয় দেমাককেও ছাড়িয়ে যায়। কয়েকটি উদাহরণ আগের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই আছে, আরো কয়েকটি নমুনা : Spotless spotlessness of her sanctified soul; nobody of masculine gender; soon-to-be morgue of noble mortality.

শ্রীমতী অ্যামান্ডার প্রায়-আকৃতিহীন, অলংকার-বহুল, অনুপ্রাস-আকীর্ণ, অদ্ভুত-শব্দবহুল বাক্যগঠনের একটি মাত্র প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেবো; মরিস্‌ মান্‌রো হেলেন পটারের কাছে তার দার্শনিক খেদ প্রকাশ করছে As the earth revolves on its axis exhibiting its ephemeral revolutions, so families revolve round the world's wicked wheel, at one time close to its nave, at another climbing down its spokes, and lastly becoming imbedded in its iniquitous axle crushing out their existence forever thus leaving their offspring to mourn beaten to a shadow like me with the mallet of sorrow and remorse, then death ends the hunt. Such—is—life.

এমন ভাষায় কেউ কথা বললে কি আমরা তা শুনবো? হয়তো লেখিকার কেল্‌টিক কল্পনা-বিলাস এর জন্যে দায়ী, কিন্তু এ ধরনের অন্য অনেক উদাহরণ তো আমরা দেখেছি।

অমিতাভ সিংহ

Hanoi *By* Mary McCarthy. Weidenfeld & Nicolson. *London. 25s.*

স্টালিনের আমলে যাঁরা রুশ-দেশ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকে তৎকালীন রাশিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রুশ নেতারাই স্টালিনের আমলের অনেক অকীর্তি-কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন এবং তখন সম্ভবত উক্ত লেখকগণ যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। ফিলিপ টয়েনবি বর্তমান বইখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে কথাটি উল্লেখ করেছেন। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট : মেরি ম্যাকার্থি হ্যানয়ের শাসন ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা ধোপে টিকবে তো? কালের বিচারে অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে কি?

এ প্রশ্নের জবাবে সহজেই বলা যায় যে কোন ভ্রাম্যমাণের পক্ষে দু-চার সপ্তাহ বা দু-চার মাসের মধ্যে কোন দেশের আদ্যন্ত সবকিছু জানা কখনো সম্ভব নয়। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটুকুই তাঁর একমাত্র সম্বল, আলোচ্য দেশ সম্পর্কে তাঁর যতকিছু মন্তব্য তা তাঁর অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে সত্য, অবশ্য যদি তিনি সজাগ অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাকে বিচার করতে পেরে থাকেন।

বইয়ের শেষের দিকে লেখিকা নিজের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু আভাস দিয়েছেন। কিছুকাল আগে স্টালিনবাদ-বিরোধী, অথচ বাম-মনোভাব-সম্পন্ন যে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব হয়েছিল, এককথায় যাঁদের নাম দেওয়া যায় non-Communist Left, লেখিকা নিজেকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের অনাচার অবিচার উদ্দেশ্যহীনতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে এক আদর্শ নয়া জেরুজালেমে তিনি উপনীত হবেন—এই অলস স্বপ্ন দেখাই তাঁর মানসিক বিশেষত্ব। যখন তিনি এই স্বপ্নে বিভোর তখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মে তিনি ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর উপার্জনশীল স্তরে উন্নীত হয়েছেন; এবং এ কারণে তাঁর অপরাধী চেতনা প্রাচুর্য এবং লেখার অবাধ স্বাধীনতার জোয়ারে ভেসে গিয়েছে। এই সামান্য আত্মবিশ্লেষণ থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নিজের সম্পর্কে লেখিকার কোন অনাবশ্যক অহমিকা নেই। উত্তর ভিয়েৎনাম পরিদর্শনে যাওয়ার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—বিচার করা, দক্ষিণের সঙ্গে তার পার্থক্যের পর্যালোচনা করা এবং তাঁর স্বদেশবাসী আমেরিকানদের কাছে ফলাফল নিবেদন করা। এ জন্য প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতা এবং নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর আছে বলে তিনি মনে করেন, তবে এ সম্পর্কে তিনি একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ নন।

লেখিকার বক্তব্য থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট, যদিও তিনি কোন দলভুক্ত নন। এই সম্ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি উত্তর ভিয়েৎনামের বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে কালে কালে জনসাধারণের মনে হয়তো সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক সমাজের জন্য কেন্দ্রানুগ শাসনব্যবস্থা দরকার বলে তাঁর মনে প্রাক্-ধারণা বিদ্যমান।

তাছাড়া একথাও ঠিক উত্তর ভিয়েৎনামে তিনি নিছক সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে যান নি। তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য হল শান্তিস্থাপনে সহায়তা করা। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ হবে তা নির্ধারণের অধিকার সে-দেশের জনসাধারণের এই নীতিতে সকল আমেরিকাবাসীর আস্থা নেই। তাদের উদ্দেশ্য করে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন যে উত্তর

ভিয়েৎনামের শাসন ও সমাজব্যবস্থা আমেরিকার সমাজব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে, কিন্তু তা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে অনেক বেশী উৎকর্ষসম্পন্ন, সুতরাং সমর্থনযোগ্য।

যে দেশ বহু যুগের কারিগরী পশ্চাদ্বর্তিতা নিয়ে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় দেশকে বছরের পর বছর যুদ্ধে লিপ্ত রাখতে পারে, শুধু গেরিলা যুদ্ধে শত্রুকে বিব্রত রেখে সন্তুষ্ট না থেকে প্রচণ্ড অভিযানের পর্যায়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে একের পর এক শত্রু-ঘাঁটিকে ভেঙ্গে খান খান করে দিতে পারে, সে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রায় এবং চরিত্রে যে অসাধারণ কিছু আছে তা সহজ অনুমানসাপেক্ষ। লেখিকার কৃতিত্ব এইখানে যে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দান প্রসঙ্গে তিনি সার্থকভাবে এই অসাধারত্বের খানিকটা আভাস দিতে পেরেছেন। ভিয়েৎনামীদের গর্ব এইখানে যে তারা সাবালক জাত। উত্তর ভিয়েৎনামীরা শিল্পে অনগ্রসর জাতি, তার উপরে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করে করে সর্বস্বান্ত; তথাপি নিজেদের অনাড়ম্বর এবং দরিদ্র জীবনযাপনের জন্য তাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই; লেখিকার বাক্স-প্যাঁটরার বহর দেখে তারা কৌতূহলাবিষ্ট, কিন্তু ঈর্ষান্বিত নয়। ম্যাকার্থির বিবরণ পড়ে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে সাম্যবাদী চেতনা ভিয়েৎনামীদের স্বভাবগত। সাম্যবাদ শুধু ধনবৈষম্য হ্রাস নয়; এ এমন একটি মানবিক বোধ যা নিছক সম্পদসৃষ্টি বা সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল নয়।

হ্যানয় গরিব শহর হলেও এখানে লেখিকা অযত্ন বা অনাহারের চিহ্ন কোথাও দেখতে পাননি। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তিনি অনেক পুষ্টিহীন রোগগ্রস্ত শিশু দেখেছেন। কিন্তু এখানে তিনি শহরে এবং বাইরে সর্বত্রই শিশু-বৃদ্ধকে সবল, স্বাস্থ্যবান, প্রফুল্ল এবং সৌজন্যপরায়ণ দেখেছেন। দক্ষিণে অনেকের মুখে তিনি ঘৃণার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন; কিন্তু এখানে কেউই অখুশী নয় বলে পরিচিত অপরিচিত সবাই তাঁকে সহজ প্রীতির সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। যুদ্ধকে এরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মতই সহজভাবে নিয়েছে; এজন্য তাদের আপসোস নেই, অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ক্ষতির জন্য কোন উদ্বেগ বা কাতরোক্তি নেই। কিন্তু তাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাস-শিক্ষা যে সমকালীন ব্যাপার সম্পর্কিত প্রচার মাত্র, তাদের সাহিত্যে ও সিনেমায় একমুখিনতা ও বৈচিত্র্যের অভাব, ভাষায় কতকগুলি বাঁধা-ধরা শব্দ ও বাক্যাংশের পুনরুক্তি করার প্রবণতা,—প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি লেখিকার কাছে ভাল লাগেনি। জনকল্যাণে উৎসর্গিত দুজন ক্যাথলিক ডাক্তারের ভিয়েৎকংদের হাতে মৃত্যুবরণের অবাঞ্ছিত ঘটনাও লেখিকা উল্লেখ করেছেন।

শুরুতে লেখিকা আমেরিকা যুদ্ধ থেকে সরে এলে তাদের উপর নির্ভরশীল দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে—এ যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

অচ্যুত গোস্বামী

রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা— তরুণ সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতার বই "মাটির বেহালা"। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "অন্ধকার উদ্যানে যে নদী"। "মাটির বেহালা"য় লোকায়ত জীবনের স্পর্শ ছিল, মাটির গন্ধ তার সর্বাঙ্গে।

তখনকার তরুণ সান্যাল অত্যন্ত সহজ অথচ বক্তব্য প্রকাশে তীব্র ও বলিষ্ঠ। গভীরতার ছোঁয়াচ পাওয়া গেল দ্বিতীয় গ্রন্থে। কখন চারপাশের হতাশার অন্ধকারের মধ্যে নদীর সাবলীলতায় অসীম ও সুদূরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আলোচ্য গ্রন্থটিতে যেন কিছুটা আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টা আছে। এতদিন চারপাশে তাকিয়ে কবি এবারে যেন নিজের মনের গভীরে তাকানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেখানে তাকিয়ে কবির মনে এক বিষণ্ণ অনুভূতি জন্মায়। যাঁদের সঙ্গে কৈশোরে প্রথম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চলছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ অন্য পথের পথিক, আবার কেউ কেউ পথচলা বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ কবি দীর্ঘদিন সেই নিঃসঙ্গ পথের পথিক। তাই বোধহয় এই বইয়ের বেশ কিছু কবিতায় নিঃশব্দ আর্তনাদের প্রতিধ্বনি।

ব্যক্তিগতভাবে তরুণ সান্যালের পক্ষে এই বেদনা বোধ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মুষ্টিমেয় যে কজন কবি পঞ্চাশের দশকে বলিষ্ঠ প্রগতিশীলতা সামনে রেখে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন তরুণ সান্যাল তাঁদের অন্যতম। তিনি এখনও আদর্শে অবিচল, কবিতা রচনায় একনিষ্ঠ। যুগ ও পরিবেশ ক্রমশই জটিল ও যন্ত্রণাসংকুল হচ্ছে। বিশেষ করে যাঁরা নতুন সমাজ গড়তে চান তাঁদের জীবনের প্রতিটি স্তর সংগ্রামমুখর। এই রণক্ষেত্রে কবি দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে চলেছেন। তাই বোধহয় এই বইয়ের নাম "রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা"। হয়তো এ সমস্তই আমার অনুমান। কিন্তু, বইয়ের শেষ কবিতায় শেষ কয়েকটি পংক্তিতে এই বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছে

হে সময় আমার সময়
পৃথিবীর শ্যাম-রুক্ষ রণক্ষেত্রে শুয়ে আছি মাথা রেখে
বাহুর ধনুকে দীর্ঘবেলা
লক্ষ বৎসরের মৃত করোটির অক্ষিপটহীন চোখে কালো অন্ধ গুহা
চেয়ে আছে নিনেভ হরপ্পা হয়ে কলকাতার দিকে।
(রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা)

দেশের প্রতি এই কবির অনুরাগ সন্দেহাতীত ঘটনা। তরুণ সান্যালের তৃতীয় গ্রন্থে বার বার তাই বাংলাদেশের কথা ভেসে আসে। ভাঙা বাংলার জন্য কবিতায় আর্তনাদ শোনা যায়। আবার স্বল্প কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর জন্য সোনার বাংলা বিধ্বস্ত হচ্ছে দেখে কবির কণ্ঠে ক্রোধ গর্জে ওঠে। এই কবিতাগুলি পাঠককে মুগ্ধ করেছে। যখন বাংলাদেশের কবিতার রাজ্যে নৈরাজ্যের আবহাওয়া, অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিলাস আর দুর্বোধ্য জটিল মানসিকতার প্রশ্রয় তখন তরুণ সান্যাল সুস্থ ও সবল দৃষ্টিতে দেশজ ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়েছেন। তাই পায়ে পায়ে জন্মভূমির কাছে তিনি ফিরে এসেছেন

বড় দীর্ঘ প্রবাস।
এখন রক্তের দাবী,
যাই,
জন্মমৃত্তিকায়, রক্তমৃত্তিকায় ফিরে যাই।
(কতদূর অন্ধকার)

কেননা, এখন ঘরে ফেরার পালা। 'এইবার ঘরে ফিরতে চাই'। এই ঘরে ফেরার কবিতাগুলি কোথাও অমিয় চক্রবর্তীকে আবার কোথাও-বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু কবির বলার ভঙ্গী ও চিত্রকল্প তাঁর একান্ত নিজস্ব।

আমার অপার বাংলা
দেবী প্রতিমার দীর্ঘচোখের আলস্যে ঘুম যায়:
* * * * *
পাকা ধান, ভেজা পাটে
দূরের বাঁশির সুরে
মনে হয়
অশ্রুতবিষাদ, শ্যামলিমা, এই
বিধ্বস্ত প্রতিমা, বাংলা দেশ।
(বাংলা দেশ)

সন্ধ্যা হল বৃষ্টিশেষে
ঐ তো ঝিকমিক তারা
মা আমার
চলেছেন একা চলেছেন
পিছে
মাটির কলসীতে স্মৃতি কেটে যায়
আকাশ উধাও ছায়াপথ
(সন্ধ্যা হয়)

বাংলা দেশ ও বাঙালী জননীর কথা বলতে গিয়ে কবির মনে পড়েছে আর একটি দেশের মাটি ও মায়ের কথা। সে-দেশের নাম ভিয়েৎনাম।

পথে যেন পা ফেলতেই অ্যাসফল্টের খাতে
লালনদী বয়ে যায়, শাদানদী, দ্রুত পদক্ষেপ পতাকায়
যায় ভিয়েৎনামে
কলকাতায়।
(নদীগুলি)

কেবল দেশ বা রাজনীতি বড় হয়ে উঠলে কবিতা জনপ্রিয় হতে পারে কিন্তু তা সব সময় কবিতা হয়ে ওঠে কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। হৃদয়ের যে গোপন স্নিগ্ধ অনুভূতিগুলি মহৎ শিল্প ও সাহিত্যের স্রষ্টা প্রকৃত কবির পক্ষে তাদের বাদ দেওয়া অসম্ভব। ভালোবাসার কথা, হৃদয়ের আনন্দ ও বিষাদের কথা, সৃষ্টির সংকটের কথা কয়েকটি কবিতায় কবিকে বলতেই হয়েছে। আর তা বলা হয়েছে অপরূপ দক্ষতার সঙ্গে। তরুণ সান্যালের যে গুণের কথা আগে বলেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। এত সহজ সুরে সহজ ভাষায় গভীর কথা বলতে তাঁর সমসাময়িকদের অনেকেই পারেন না

বুকের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁকে আমার
বাইরে আনা দায়
লুকিয়ে আমায় যান কোথায়, একা ঘোরেন বাইরে
ছায়াচ্ছন্নতায়।
(বুকের মধ্যে যিনি)

সব ভালোবাসা আমি সূর্যোদয় সূর্যাস্তবেলার
কানে কানে বলি

সব ভালোবাসা আমি মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে শোনাই
(এ পরবাসে কে)

বুকের ভিতরে কেন নখ ঘসছো
দাঁতের ধারালো ছুরি কেটে বসছে
বুকের বাঁদিকে
তুমি
এ বয়সে রয়েছো কবিতা?
(বুকের ভিতরে তুমি)

বিদ্যুতের মতো এক-একটি লাইন চোখ ঝলসে দিয়ে চমকে ওঠে, তরবারির ক্ষিপ্রতায় হৃদয়কে বিদ্ধ করে দেয়

(১) আনন্দ যাহার নাম, বেদনার সধবা বধূটি।
(২) কবিতা এমন বেদনার কাছে, কয়েকগ্রন্থ মালা মৃত্যুর সমতুল।
(৩) সব দুঃখ দুঃখ নয়, ও কেবল অভিমানে দুঃখ দুঃখ খেলা।
(৪) যারা দুঃখ আনতে চায়, তারা কী সন্ধ্যায় ঘরে আসে।

এ-জাতীয় অসংখ্য উজ্জ্বল পংক্তি প্রমাণ করে যে সংগ্রামমুখর পরিবেশে নিঃসঙ্গতার বেদনায় কাতর হয়েও কবি কবিতার জগৎ থেকে বিদায় নিতে রাজী নন। তাঁর বলিষ্ঠতা তাঁকে ভেঙে পড়তে দেয়নি, আবার সংকীর্ণমনা হওয়ার প্রশ্রয়ও তিনি পান নি। তাই রণ-ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল একাকী থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই আশাপ্রদ উপলব্ধি

আলো, চতুর্দিকে দুঃখ, অন্ধকার চতুর্দিকে হাসি,
এখনও বন্দরে আছি, প্রস্তুতি, হে জাহাজের বাঁশি।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

একদিন-চিরদিন—মনীষীমোহন রায়। সৃজনী। বহরমপুর। মূল্য ২·৫০

বাঙলা কবিতার এখন মরশুম। বাঙলার জনসংখ্যার সঙ্গে তাল দিয়ে কবির সংখ্যাও ক্রম-বর্ধমান। কবি বলতে কবিতার বই যাঁরা বার করেন তাদের কথা বলছি না, যাঁদের মধ্যে সত্যিকার কবিত্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাঁরাও সংখ্যায় কম নন। মনীষীমোহন সত্যিকারের কবিলক্ষণাক্রান্ত এক কবি একথা নির্দ্বিধায় লিখে দলিলগত করছি।

অবশ্য একথা মানতেই হবে কবিতামাত্রেই সৃষ্টি, এবং সৃষ্টিকার নিজেকে নিজে আবিষ্কার করে চলবেন কবিতা থেকে কবিতায়, এবং প্রথম দিককার লেখায় কাঁচা অপটু হাতের ছাপ থাকবেই। শুধু আশ্চর্য লাগল বর্তমান কবির লেখায় কিছুটা কাঁচা হয়ত আছে কিন্তু অপটু হাতের ছাপ নেই।

প্রকৃতিপ্রণয় ও যুগযন্ত্রণায় যুগপৎ অভিভূত, এই কবির ধরাশায়ী না হয়ে আস্তিক্যে উত্তরণ এক আশ্চর্য ও চমকপ্রদ ঘটনা। তিনি যখন বলেন,

কারা যেন কানে কানে কেঁদে যায়
অদূরে কোথায় মূর্ছিত ফুলের দল

দারুণ বসন্তে ঝরে যায়
(বয়ঃসন্ধি)

এবং সাথে সাথে বলেন,

তোমার কাঁখে আছে কি নারী
নন্দনীয় বারি ?
তবে এসো, হৃদয়পুরে ফিরি
(শুকসারি)

স্বীকার করছি, পরিণতির ছাপ নেই এতে, শুধু উন্মেষের উপলব্ধি। কিন্তু কবি মাত্রেরই উন্মেষের যুগটাই প্রতিশ্রুতিময়। এই কবির বেলায় এ সত্য সত্যই প্রোজ্জ্বল। কবির মধ্যে অপর কি কি যুগোপযোগী বা দশকোপযোগী চিহ্ন আছে সে সব দশকে দশকে যাঁরা কবি থেকে অকবিতে মহাপ্রস্থান করেন তাঁরা বলবেন। আমি অন্তত একটি কবিতায় মনীষীমোহনের কাব্যরাজ্যে দৃঢ় এবং স্থায়ী পদক্ষেপের সন্ধান পেয়েছি, সেটা তুলে ধরি :

"বিবিধ প্রসঙ্গ থাক। সাতাশ বছর বয়সী আকাশে
শুধু কি স্বপ্নেই দীর্ঘ হয়েছি ? আর স্বপ্নের বাগানে বাতাসে
সবুজ প্রাণের গর্ভে কোমল পা ফেলে ঘাসে ঘাসে
শুধুই কি শিশির ঝরিয়েছো ? শিশিরে শরীরে
মিশে কোনো কান্না কাঁদেনি কি বুক চিরে
ভরা ঢেউ ভরা বেগ বিংশতি জলধিতীরে ?
আকিঞ্চন ক্রন্দনে নীল সূর্য ডুবে গেলে
বিরহিণী ক্রন্দসী বলে ঘোমটা খুলে ফেলে
হাজার হাজার বছরের মতো আমি আসি, তুমিও কি এলে ?
(হাজার বছরের মতো)

এই কবি সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য হোলো তিনি ছলনাচাতুরিময় বাঙলার কৃত্রিম তথাকথিত প্রাণ-কেন্দ্র কলকাতা থেকে বহুদূরে থাকেন এবং নিজের সাথে, সময়ের সাথে, জগতের সাথে তাঁর আত্মিক আদান-প্রদান একান্ত নিভৃতে, একান্ত নির্ভরে। তিনি দূরে থেকেই শিল্প ও জীবন আত্মগত করে কাব্যের অমরাবতীতে নিজের স্থান করে নেবেন, এমন প্রতিশ্রুতি রয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

মণীশ ঘটক

বাংলা কবিতা বার্ষিকী ১৩৭৫—শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। সখী সংবাদ প্রকাশনী। কলিকাতা ৩৪। মূল্য তিন টাকা।

কবি বলেই হয়তো শক্তি চট্টোপাধ্যায় এ-ধরনের অ-বাণিজ্যিক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হতে পেরেছেন। অবাণিজ্যিক বললাম এই কারণে যে, বছর কয় আগে 'কবিতা সংসদ' নামে একটি কবিগোষ্ঠী "এক বছরের কবিতা" নাম দিয়ে অনুরূপ একটি সংকলন বার করেছিলেন। মনে পড়ছে, প্রতি বছরই একটি করে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়

গ্রন্থটি আজও প্রকাশিত হয়নি। তবু স্বীকার করব, এই ধরনের সংকলন-গ্রন্থ প্রতি বৎসরই প্রকাশিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। তার কারণ, প্রথমত, এতে বাংলা কবিতার এক বৎসরের সার্থক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ বছরে বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আঁচ করা সহজসাধ্য হয়। আরেকটি বড়ো দিক হল, অনেক তরুণ কবিরই কবিতা-গ্রন্থ যথাসময়ে বা আদৌ প্রকাশিত হয় না। এই রকম সংকলন-গ্রন্থ থাকলে তাঁদের উল্লেখ্য রচনা বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায় যে, প্রতি বৎসরই তিনি এ-রকম "বার্ষিকী" প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আলোচ্য সংকলনটিকে সঠিক অর্থে ১৩৭৫-এর বার্ষিকী বলতে পারা যাচ্ছে না। জানি না, শক্তি চট্টোপাধ্যায় "বার্ষিকী" অর্থে কী ভেবেছেন; কারণ, এই সংকলনের বেশীর ভাগ কবিতাই ১৩৭৫-এর পূর্বে রচিত। এমনকি, কয়েকটি কবিতার প্রকাশকাল সাত-আট বছরেব বেশী পূর্বে। অথচ বছর কয়েক আগে যেসব তরুণ কবি বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কয়েকজনের এই সংকলনে অনুপস্থিতির কারণ বোঝা গেল না। শুধু কয়েকজন তরুণ কবি কেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর পূর্ববর্তী কোনো প্রধান কবির কবিতাও এই সংকলনে নেই। এরই বা কী কারণ? এঁদের অনন্তর্ভুক্তি বার্ষিকীকে অসম্পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় এর উল্লেখ থাকলেও তাঁব 'পরিকল্পনা' অনুধাবন করা সম্ভবপর হতো। তাও নেই।

এ-কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই বার্ষিকীতে অতি-তরুণ কবিদের জন্য অনেকটা বেশী জায়গা ইচ্ছে করেই ছেড়েছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এর পিছনে যে-সৎ উদ্দেশ্য সক্রিয়, তা এই সংকলনটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কারণ, নামকরা কবিদের একটি কি দুটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা একজন সম্পাদকের কৃতিত্বের পরিচায়ক হতে পারে না। বরং সদ্য তরুণ কবিদের যথার্থভাবে মূল্য বিচাব করা ও তাঁদের সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ আগামী কালের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ততর করা, এবং কাজ হিসেবেও কঠিনতর। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেদিক থেকে অবশ্যই ধন্যবাদভাজন। এ-ছাড়া, পূর্ব বাংলার সমকালীন কিছু কবিতার সংযোজনও এই বার্ষিকীটিকে অন্য দিক থেকে স্বতন্ত্র ও মূল্যবান করে তুলেছে—এ-কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই বার্ষিকীতে, আগেই বলেছি, তরুণতর কবিদের প্রাধান্য। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট করে বোঝা গেল যে, সদ্য তরুণ কবিদের সম্পর্কে বিশৃঙ্খলার যে-অভিযোগ করা হয়ে থাকে তা সর্বাংশে সত্য নয়। বরং অনেকের কবিতাতেই আত্মপ্রকাশের ঋজুতা প্রকাশমান। ষাটের কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ভাস্কর চক্রবর্তী, মঞ্জু মিত্র, শান্তনু ঘোষ, শুভাশিস গোস্বামী, শামসের আনোয়ার, সুব্রত চক্রবর্তী, যোগব্রত চক্রবর্তী, প্রলয় শূর, তপন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, কালীকৃষ্ণ গুহ, দেবারতি মিত্র, নিমাই চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু উজ্জ্বল পংক্তি রচনা করেছেন। বলার ভঙ্গিতে অনাড়ম্বতা ও সহজ সপ্রতিভতা এঁদের কবিতার বৈশিষ্ট্য; লিরিক-প্রবণতাব কারণেই হয়তো কবিতার মধ্যে মিনমিনে ভাব মাঝখানে যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এখনকার কবিতায় সেটি সম্পূর্ণভাবে কেটে গিয়েছে, এটি নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ষাটের কবি তুষার রায়-এর 'পাঁচ তারিখে' কবিতাটি এই সংকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোগ বলা যায়।

সযত্ননির্বাচিত পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক যে-কবিতাবলী শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই সংকলনে উপস্থিত করেছেন তা পেয়ে রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"র একটি উক্তি বিশেষভাবে মনে

পড়ে, 'সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে, তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া মনে অনত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।' বস্তুত, দুই বাংলার সাম্প্রতিক কবিতার আত্মা ও শরীরের সাযুজ্য বিস্ময়কর। রাজনৈতিক খণ্ডতা মানসিক আবহাওয়াকে যে কোনক্রমেই প্রভাবিত করতে পারে না, পূর্ব বাংলার তরুণ কবিদের রচনায় তার সাক্ষ্য আনন্দদায়করূপে বিধৃত।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পাপুর বই। প্রাপ্তিস্থান : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ৯।

পাপু একটি ছেলের নাম। ভাল নাম সুব্রত সরকার। লেখক ও সাংবাদিক নিখিল সরকারের (শ্রীপান্থ) ছেলে। বয়েস ন' বছর হবার আগেই পাপু দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছে। খুব ছোটবেলা থেকে পাপু ছবি আঁকতো। প্রথমে পেন্সিল ও কলম ব্যবহার করেছে, পরে তার মা তাকে রঙের বাক্স কিনে দিয়েছিলেন। কিছুদিন ধরে ছবি আঁকার পর পাপু লিখতে শুরু করেছিল, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, প্রবন্ধ, সব কিছু। তার কিছু কিছু ছবি আর লেখা নিয়ে এই বই।

পাপুর এতটুকু জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত বিস্ময়বোধ, খুশী, কিছুবা কষ্ট এই লেখা ও ছবিগুলিতে ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি ছবি ও লেখায় এমন একটি মনের স্পর্শ রয়েছে যা একদিন হয়তো পাপুকে বড় শিল্পী করে তুলতো। তার আঁকা ছবিগুলির এক-একটি টানের বলিষ্ঠতা, তার লেখায় আশ্চর্য সংযম এবং শব্দ বাছাই লক্ষ্য করলে সবাই একথা স্বীকার করবেন। পাপুর কবিতাগুলি, বিশেষত সেই কবিতাটি যার শুরুতে 'ওগো আকাশে ওড়া পাখী' এবং শেষে 'আমরা নিচের তলায় থাকি', প্রমাণ করে, সে যা কিছু দেখেছে, শিল্পীর চোখে দেখেছে।

সুধাংশু ঘোষ